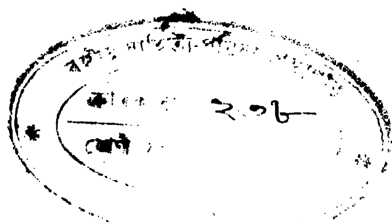
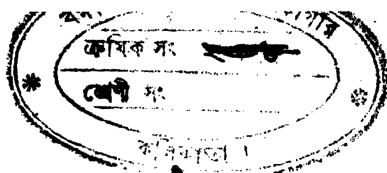




কুশদহ

মাসিক পত্র

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

অষ্টম বর্ষ

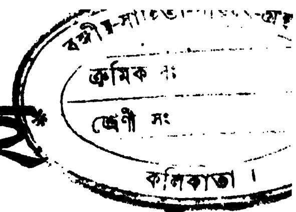
১৩২৩ সাল

কার্য্যালয়—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা

বার্ষিকমূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

১৩২৩ সালের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায়?

অষ্টম বর্ষ, | বৈশাখ, ১৩২৩ | প্রথম সংখ্যা

প্রারম্ভে

হে মঙ্গলবিধাতা, তুমি সকল অবস্থাতেই যে আমাদের মঙ্গলবিধান কর, তাহাতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে? কুশদহর সপ্তমবর্ষ নিতান্ত বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া অবসান হইল—সকলের সম্মুখে তুমি আমাদের অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া দেখাইলে, ইহাতেও আমাদের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে। হে প্রভু, আমরা যেন তাহা তোমার আলোকে বুঝিতে পারি। আজ আর একটি বৎসর আরম্ভ হইল, ইহার মধ্যেও কত পরীক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু আর বৃথা ভাবনা চিন্তার সময় নাই। ঘটনার ভিতর দিয়া তোমার ইঙ্গিত, আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে আমাদের বিচার-বুদ্ধি পরাস্ত হইতেছে। কেবল মাত্র তোমার করুণাই আমাদের ভরসার স্থল। তাই তোমার নাম করিয়া অগ্রসর হইলাম, চিরদিন তুমিই লজ্জা নিবারণ সর্ব্ব-সঙ্কটহারী দীনবন্ধু! দেখো যেন লজ্জা নিবারণ—মুখরক্ষা হয়। যে উদ্দ্যেশ্যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ তাহা যেন সুসিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা যেন দেশের কল্যাণ হয়। ইহাই তোমার চরণে বিনীত নিবেদন।

মিলন

"সখি বয়ে যায় বেলা শুধু হাসি-খেলা
একি আর ভাল লাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত নব অনুরাগে।"

সপ্তাহব্যাপী বর্ষার পর একটি বিমল রবি-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে কলেজের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছাত্র অনিলকুমার যখন দুটি নীলোৎপল আঁখির ধ্যানে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি ঘটাইয়া কলেজের রসায়নাধ্যাপকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে জমিদার-ভবনের একটি নিভৃত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে সমদুঃখভাগিনী সমবয়স্কা ভ্রাতৃজায়ার চিত্তে সহানুভূতি জাগাইয়া সুহাসিনী গাহিতেছিল—"শুধু হাসি খেলা একি আর ভাল লাগে সখি একি আর ভাল লাগে।"

তরুণীর মর্ম্মবেদনা যেন গানের সুরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার সজল আঁখির ব্যথা-ভরা দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সে-সঙ্গিনীর কমলানন বিষাদ-ম্লান করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু তরঙ্গে মিশিতেছিল!

ক্রমে গান থামিল; গৃহ নীরব হইল। কণ্ঠস্বর যখন নীরব হইল, হৃদয়ের অভিব্যক্তি তখন নয়নে-নয়নে চলিল! বারিভরা নয়নের সে নীরব দৃষ্টি কত কথা কত ভাব ব্যক্ত করিল। হৃদয়ের কত চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইল! সরলা আবেশ-বিহ্বলা তরুণীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণপণ চেষ্টায় নিরপরাধার এ মনোবেদনা দূর করিব। স্বামীর সহিত সুহাসিনীর মিলন ঘটাইব!

রায় বিশ্বম্ভর চৌধুরীর তৃতীয় কন্যা সুহাসিনীর তখন পূর্ণযৌবন, অনুপম সৌন্দর্য্যে দেহটি ঘেরা, অনাবিল হৃদয়খানি গভীর প্রেমে পূর্ণ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সোৎসাহে উজ্জ্বল উচ্ছল!

পিতৃ-ভবনে তাহার আদর-যত্ন বিলাস-বিভবের অন্ত নাই।' আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ-প্রীতির অভাব নাই। তথাপি কেন যে হাসা-কৌতুকের অন্তরালে তাহার

অন্তর দুঃখের ভারে দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহা ভ্রাতৃজায়া সরলা ভিন্ন আর কেহই বুঝিত না। সকলেই ভাবে তাহার দিন বড় সুখে কাটে। বাহির হইতে সকলে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিই দেখে, কিন্তু অন্তরটি তাহার হাস্যোজ্জ্বল কি অশ্রুম্লান, হর্ষোৎফুল্ল কি বিষাদ-মথিত সে-খবর কেহ রাখে না।

পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু অনিলকুমার বা সুহাসিনী কেহ আর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিতে পায় নাই। দুই তিনবার কুটুম্ব-গৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়া দৈবযোগে সুহাসিনীর স্বামীসন্দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল মাত্র। তাহার পিতার সহিত শ্বশুরের বিবাদ! মনান্তরের মূলে উভয় পক্ষেরই আভিজাত্যের অভিমান, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব-হেতু সম্মান লাঘবের বৃথা আশঙ্কা। সুতরাং কুটুম্বদ্বয়ের মানের বোঝাপড়ার মাঝে পড়িয়া পরস্পরের সান্নিধ্যপ্রয়াসী নিরীহ নবদম্পতি জীবনের সুখ-শান্তি হারাইতে বসিয়াছিল।

২

শ্বশ্রূর সহায়তায় বহুচেষ্টার ফলে সরলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। অনিল সুহাসিনীর সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইল। কিন্তু হায়, কে জানিত এই ক্ষণিকের সাক্ষাৎই তাহাদের মহাঅনর্থের কারণ হইবে! মিলনের মধুক্ষণের মধুরতা অনুভব করিতে না করিতেই বিদায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অভিশপ্ত মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িবে!

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও অনিল ধরা পড়িল। আনন্দবিহ্বল মুগ্ধ দম্পতি শিহরিয়া মর্ম্মাহতচিত্তে পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। ক্রোধে কোপন-স্বভাব বিশ্বম্ভর চৌধুরীর মূর্ত্তি ভীষণ হইল। সুহাসিনী মনে-মনে প্রমাদ গণিল। অবিবেচক অভিভাবকের অন্যায় শাসনে শাসিত দম্পতির পরিণাম চিন্তা করিয়া সরলা স্তম্ভিত হইল। আর এমন সঙ্কটের দিনেও কন্যা-জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশে অসমর্থ উপায়ান্তরবিহীনা জমিদার-গৃহিণীর বক্ষ যেন দুঃখের ভারে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল!

* * * * *

কোন রকমে কথাটা অতিরঞ্জিতভাবে অনিলের পিতার কর্ণে উঠিল। জমিদার ভূপাল রায় বুঝিলেন, তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া অনিল অপমানিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। অহঙ্কৃত জমিদারদ্বয়ের এই সূত্রে বিবাদটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উভয়েই পিতৃশাসন উল্লঙ্ঘনকারী

পিতৃগর্ব্ব-খর্ব্বকারী কুলাঙ্গার পুত্র-কন্যাকে উচিতমত ভৎর্সনা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরশাসন-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলেন!

৩

বহুদিনের হতাশার পর অনিলের দ্বিতীয় পত্র অসম্ভাবিতরূপে সুহাসিনীর হস্তগত হইল। সে চিঠিতে আর কিছুই নাই, কেবল পত্রখানির ছত্রে ছত্রে গভীর অতুলনীয় প্রেমের বিকাশ আর আকুল আহ্বান, নানারূপে নানাভাবে কেবল লেখা "এস এস প্রাণের সুহাস একবার নিকটে এস, হতভাগ্য অনিলের দুর্দ্দিনের সাথী হও।"

সুহাস একবার দুইবার বারবার সে পত্রখানি পাঠ করিল। বারবার সরলা তাহা শ্রবণ করিল। দুটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্থির করিতে পারিল না এখন তাহাদের কর্ত্তব্য কি?

ক্ষণেক চিন্তার পর সরলা বলিল, "তুই একটু বোস ভাই, আমি একবার মার ঘরে যাই।"

সরলা চলিয়া গেলে সুহাসিনী লক্ষ্যহীন অবসাদগ্রস্ত মনটাকে স্থির রাখিবার জন্য তাহার প্রিয়চিন্তা হইতে জোর করিয়া সরাইয়া লইয়া একখানা পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল। সুহাসিনী বুঝিয়াছিল লোকে যাহাকে "সুখ" বলে, জগতের সেই দুর্লভ লোভনীয় পদার্থটির নিকট হইতে চিরদিনই তাহাকে দূরে থাকিতে হইবে। পিতৃপ্রদত্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ আর তালুকের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করিতে করিতে মৌখিক হাস্যামোদের ভিতর দিয়া গুণটানা নৌকার মত তাহার জীবনটাকে কোনোরকমে মরণের দ্বারে পৌছিইয়া দিতে হইবে। ইহাই তাহার নিয়তি, তাহার ভাগ্যফল।

পুত্রবধূ সরলার মুখে সুহাসিনীর জননী, জামাতার পত্রের কথা শুনিয়া অনেক চিন্তার পর সুহাসকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠানই স্থির করিলেন।

৪

"অনিল!" পিতার জলদগম্ভীর স্বরে চমকিত হইয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে পিতার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পিতা ভাবিলেন, ছোঁড়াটা একেবারে উচ্ছন্ন গেছে, পড়তে বসেছে তাও সেই ছোটলোকের মেয়ের ফটোখানা সাম্‌নে রেখে! ধিক্ পিতৃগর্ব্বখর্ব্বকারী কুলাধম পুত্র! থাম, শীঘ্রই এর উপযুক্ত প্রতিবিধান করচি। তিনি সম্মুখের

চেয়ারখানিতে বসিয়া একখানি পত্র পুত্রের হস্তে দিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ দেখি চিঠিখানা কার হাতের লেখা! পাত্রীর পিতাকে আমার কোন্ শত্রু এ চিঠি লিখলে?"

অনিল পত্রখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমি,—এ চিঠি আমিই লিখেছিলুম।"

"কেন? কার বুদ্ধিতে কোন্ সাহসে আমায় লুকিয়ে এমন চিঠি তুমি লিখলে?

"আমি আর বিবাহ কোরবো না।"

"করবে না?"

"না"। রুদ্রমূর্ত্তি পিতার সমক্ষে অনিলের পরিষ্কার স্পষ্ট উত্তর—"না।"

দুর্ব্বল নিরীহ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, শত্রুর যম প্রবলপ্রতাপ ভূপালচন্দ্র রায়ের মুখের উপর এমন স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করা। কি দুঃসাহস! ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"না? বিয়ে করবে না? ওঃ স্পর্দ্ধা তো কম নয়! আমার হুকুম—ও ছোটলোকের মেয়ের মায়াত্যাগ করে তোমায় বিবাহ করতেই হবে।"

অনিল পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল,—"না তা হবে না, আর যা বলেন পারবো কিন্তু আপনার এ অন্যায় আদেশ আমি পালন করতে পারবো না!"

পুত্রের উত্তর দিবার ভঙ্গি দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া বলিলেন—"জান, আমার আদেশ অমান্য করে আমায় অসন্তুষ্ট করলে তোমায় আমি ইচ্ছা করি তো আমার বিপুল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারি?"

অনিল নিরুত্তরে রহিল।

ক্রোধোন্মত্ত জমিদার আবার বলিলেন, "শোন অনিল, যদি আমার অবাধ্য হও তোমায় আমি ত্যজ্যপুত্র কোরবো, আমার অতুল সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে তোমায় সম্বলহীন পথের ভিখারী কোরবো।"

তথাপি অনিল নিরুত্তর!

বহুক্ষণ বহু তর্জ্জন গর্জ্জনের পরও পুত্রকে নিরুত্তরে নতশিরে থাকিতে দেখিয়া অবশেষে অনুমান করিলেন, পুত্র ভীত হইয়াছে। সত্যই তো সাধ করিয়া কে এমন পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে চাহে। সুতরাং মৌনই সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া তিনি পুত্রকে তাঁহার আদেশ বুঝাইয়া দিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

৫

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে সুহাসিনীর পাল্কী জমিদার ভূপাল রায়ের অন্তঃপুর ভবনের একটি গুপ্তদ্বারে নামিল। পাল্কী-বেহারা ও সঙ্গের লোকজন সকলেই তাহারই আদেশে নীরবে ফিরিয়া গেল।

কম্পিতহৃদয়ে ধীর পদক্ষেপে সুহাসিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দের কোলাহলে চৌদিক ধ্বনিত করিয়া যেথানে তাহার রাণীর মত গৌরবে দাঁড়াইবার কথা, সেই সুখের স্বামী-গৃহে সে কি না আজ সন্ধ্যার আঁধারে নিঃশব্দে চোরের মত গুপ্ত-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। কোন্ পথে প্রবেশের সুবিধা হইবে তাহাও অনিল পত্রে লিখিয়াছিল; এখানে যে অনিলের অপেক্ষা করিবার কথা; সে পথ দেখাইয়া না লইয়া গেলে সুহাসিনী কোথা যাইবে; এ ভবনের সর্ব্বস্থান তো তাহার সুপরিচিত নহে। উৎকণ্ঠিত-ভাবে অবগুণ্ঠন সরাইয়া সুহাসিনী একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল—একি! সহসা সন্ধ্যার গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ও ধূপ ধূনার সৌরভের সহিত মিশ্র-কুসুমের সুবাস ও নহবতের এমন মধুর ধ্বনি কোথা হইতে আসিল? প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী যেন শুনিতে লাগিল দুঃসাহস! দুঃসাহস!

প্রাঙ্গণে পা দিতেই যে সংবাদ সুহাসিনীর কর্ণে পৌঁছিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সুহাসিনী দেখিল অগণিত দাস দাসী আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ পূর্ণ, সারাভবনখানি আনন্দের হাস্যরোলে মুখরিত। শুনিতে পাইল প্রভাতে তাহার স্বামী অনিলকুমারের বিবাহ! মর্ম্মাহতচিত্তে সুহাসিনী ভাবিল এমনই যদি মনে ছিল, তবে কেন অমন চিঠি তাহার স্বামী তাহাকে লিখিলেন? সুহাসিনীর জন্য যদি চরণে স্থান নাই, তবে কেন বৃথা আশা দিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিলেন? সেই চিঠি যাহা লইয়া সে আজ পিতার অজ্ঞাতসারে জননীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ মাত্র পাইয়া দীনবেশে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়াছে এখনও যে তাহা তাহার নিকটে রহিয়াছে। সে বুঝিল এখানে আর তাহার কোনো অধিকার নাই, সামান্য একজন দাসীর যে জোর—যে সম্মানটুকু আছে এ সংসারে তাহার তাহাও নাই। এ গৃহে দীনহীনা ভিখারিণীরও স্থান আছে, কিন্তু তাহার নাই; এখানেও আশ্রয় নাই, পিতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া আসিয়াছে সেখানেও আর ফিরিবার উপায় নাই। হায়, কোন্ সাহসে কি আশায় এ দুঃসাহসের কাজ করিলাম!

সে চক্ষে আঁধার দেখিল, তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে

লাগিল। আর এক পদও অগ্রসর হইবার তাহার সামর্থ্য রহিল না। আশঙ্কা অনুতাপ ও উদ্বেগে যখন তাহার রক্ত হিম, দৃষ্টি ব্যাকুল, চরণ গতিশক্তি-হীন,—কাহার মৃদুস্পর্শে চমকিত হইয়া মুখ তুলিতেই দেখিল অনিল! রুদ্ধ নিশ্বাসে পাংশু মুখে সুহাসিনী সম্মুখে হেলিয়া পড়িল, তাহার পদদ্বয় আর তাহার ভারবহন করিতে পারিল না! প্রসারিতহস্তে অনিল অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতাকে রক্ষা করিল।

৬

বধূর কপাল ভাঙিয়া বৈবাহিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উৎকট আগ্রহে সুহাসিনীর শ্বশুরমহাশয় বহু অনুসন্ধানে এক উপাধিধারী রাজার একমাত্র কন্যার সহিত অনিলের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।

রাজকন্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক নয়, ভবিষ্যতে অনিল উত্তারাধিকার-সূত্রে শ্বশুরের সমুদয় সম্পত্তিই লাভ করিতে পারিবে এবং বিবাহকালে যৌতুক-স্বরূপ যাহা পাইবে তাহাতে স্বয়ং জমিদার মহাশয়েরও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হইবে ;. অধিকন্তু বধূ আপন অতুলনীয় রূপের দ্বারা অনিলের হৃদয় হইতে সুহাসিনীর ছবি—এমন কি তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে মুছিয়া দিতে পারিবে। এই অভাবনীয় আনন্দে জমিদার-দম্পতির হৃদয় পূর্ণ, বিবাহের মাসাধিকব্যাপী উৎসব আয়োজনের মাঝে তাঁহাদের উৎসুক-চিত্ত কেবল সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে—যখন রাজপুত্রী কনকলতা বধূরূপে আসিয়া তাঁহাদের গৃহ উজ্জ্বল ও সুহাসিনীর জীবন চিরবিষাদে আচ্ছন্ন করিবে।

পিতার ইচ্ছায় বাধা দিবার পক্ষে অনিল, জননীর নিকট কিছু সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিল কিন্তু বুঝিল সে আশাও দুরাশা মাত্র। বিবাহে নিতান্তই অনিচ্ছা বুঝিয়া জননী যখন আগ্রহভরে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূর প্রতিকৃতিখানি তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন, এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তাহার উচিত নয় এবং তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে সে তাহা পরিবেও না, তাঁহাদের আদেশ ও অভিলাষ অনুসারে তাহাকে পত্নীত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রহণ করিতেই হইবে। সে তখন আর অনর্থক বাদানুবাদ অনুনয় বিনয় না করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কনকের ফটোখানি লইয়া গেল।

ছবিখানি আর ফিরিয়া না পাইয়া মা হাসিয়া ভাবিলেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" মত ফিরিতে দেরী লাগিবে না।

নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে সুহাসিনীর সযত্ন-রক্ষিত ফটোখানির পার্শ্বে কনকলতার

প্রতিকৃতিখানি রাখিয়া পলকহীন নেত্রে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া অনিল ভাবিল, হাঁ সুন্দরী বটে! কুমারীর দেহখানি যেন বসন্তের কুসুম সুষমা লইয়া গঠিত। কিন্তু এ অতুলনীয় রূপরাশি কি জীবনব্যাপী অশান্তির তাপে শুকাইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে! না কখনই না। যে আধারে তোমার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, সৌন্দর্য্যের জীবন্তপ্রতিমা কনকলতা তোমায় আমি সেই আধারে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৭

সুহাসিনীর যখন বোধশক্তি আবার ফিরিয়া আসিল, সে দেখিল আলোকোজ্জ্বল পুষ্প-গন্ধময় সুসজ্জিত কক্ষে সে তাহার প্রিয়তমের হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টির নিম্নে কুসুম-শয়নে পুষ্প-উপাধানে শায়িত।

কি আনন্দ! সুহাসিনী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একবার হাসিল, মনে হইল স্বপ্ন! স্বপ্ন! তা হোক্ দুঃখিনীর ভাগ্যে সত্যকার দুঃখের চেয়ে সুখের স্বপ্নও ভাল। তাহাও প্রার্থনীয়, লোভনীয়!

তাহার মনে পড়িল ছয়বৎসর পূর্ব্বের সেই ফুলশয্যার দিন। সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—"ঠিক সেই দিনের মতই না?"

সুধামাখা কণ্ঠে প্রসন্নমুখে অনিল উত্তর করিল, "হাঁ, সুহাস ঠিক সেই দিনের মত সবই, কেবল সে দিন ঘরে অনেক লোক ছিল, অনেকের মাঝে তুমি আমায়, আমি তোমায় চিনেছিলাম, আর আজ সব বাধা-বিঘ্ন-ভয় ভাবনাকে দূরে সরিয়ে তুমি আমায় আমি তোমায় পেয়েছি। অতীতের দুঃখ ভুলে দেখ সুহাস আজ কেবল আনন্দ উল্লাস, সুখ-শান্তি। কি সুন্দর জীবন আমাদের, কি সুখের মিলন।

* * * * *

প্রভাতে কুসুম-ভূষণা ঊষারাণীর সঙ্গে সঙ্গে এয়োগণ সধবার উজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া প্রসন্নমনে মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলিত হইয়া প্রতিক্ষণে অনিলের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বধূ সুহাসিনীর আগমন অনিলের কৌশলক্রমে কাহারো গোচর হইতে পায় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কাহারো মনে কোনই প্রশ্ন উঠিল না। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হইল গাত্রহরিদ্রার লগ্ন উত্তীর্ণ হইতে চলিল তথাপি অনিল বাহিরে আসিয়া শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিল না দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। আজিকার দিনে অনিলের এই অশিষ্ট আচরণে রুষ্ট জমিদার মহাশয়ের তর্জ্জন

গর্জ্জনে সারাভবন কম্পিত ও নর-নারীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; ভৃত্যদের প্রতি অনিলের শয়ন কক্ষের দ্বার ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়া তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বার ভগ্ন করিতে হইল না, অর্গলহীন রুদ্ধদ্বার সামান্য আঘাতেই খুলিয়া গেল ; প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সকলে দেখিলেন গৃহ শূন্য ! অনিল নাই, কেবল সহস্র সুগন্ধি পুষ্পের সুবাসামোদিত কক্ষমধ্যে পালঙ্কের উপর সযত্নে রচিত একটি পুষ্পশয্যা মধুনিশি অবসানে হর্ষ-বিহ্বল দম্পতির মিলন-স্মৃতি জাগাইয়া অলসভাবে পড়িয়া আছে।

পরদিন বৈকালে যে সময় বরের শোভাযাত্রা বাহির হইবার স্থির ছিল—অনুসন্ধানে প্রেরিত লোকজন ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গতরাত্রে অনিলের সবিশেষ চেষ্টায় তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কুমুদরঞ্জন রায়ের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে শুভক্ষণে রাজপুত্রী কনকলতার শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বন্ধুর বিবাহে অনিল সস্ত্রাক উপস্থিত ছিল, ইহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদ কেহ জানে না।

প্রয়াগ প্রবাসিনী।

সহিষ্ণুতা

—*—

গরুড় পুরাণে একটা গল্প আছে। সেটা গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত লইয়া। গরুড়ের জননী বহুদিন থেকে সন্তান-সন্ততির মুখ দেখ্‌তে না পেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন। বিধাতা সন্তুষ্ট হ'য়ে গরুড়-জননীকে দুইটি ডিম্ব দিয়ে বলে গেলেন, "এদের খুব যত্ন করে দুহাজার বৎসর রাখ্‌তে হবে। তারপর এই দুই ডিম্বের আবরণ ভেদ করে দুই সুকুমার পুত্র বাহির হবেন। তাঁরা পৃথিবীতে অত্যন্ত বলশালী, অজেয় পুরুষ হয়ে উঠবেন।"

বিধাতা-প্রদত্ত সেই ডিম্বদুটি নিয়ে গরুড়-জননী আপনার ঘরে বহু যত্নে রেখে দিলেন। কতশত বৎসর কেটে গেল, তবুও গরুড়-জননী প্রত্যহ অতি যত্ন ক'রে ডিম্বদুটিকে রে'খে দিতেন এবং পুত্রলাভের সুদূর ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে বড় আনন্দিত হ'তেন। এই রকম করে হাজার বছর কেটে গেল, কিন্তু

তবুও ডিম্ব ভাঙিয়া বিধাতা-কথিত সুকুমারের আবির্ভাব আর হয় না। গরুড়-জননী ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর সমস্ত শ্রম, আয়োজন, আশা ও যত্ন নিষ্ফল হচ্ছে ভেবে তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। একদিন এমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যে, আর থাকতে না পেরে দুইটি ডিম্বের একটি স্বহস্তে ভেঙে ফেললেন। যেমন ডিম ভেঙে গেল অম্‌নি গরুড়-জননী দেখ্‌তে পেলেন তার ভিতর থেকে একটি পরমসুন্দর সুকুমার দিব্যপুরুষ মাটির ওপর পড়্‌লেন। তাঁ'র সমস্ত অঙ্গ তখনও পূর্ণতালাভ করে নি; হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ সম্পূর্ণ গঠিত হয় নি; কেবলমাত্র মাথাটা হয়েছে। দেখে গরুড়-জননী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি ভাবলেন, তাঁর পুত্রের সমস্ত-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকাশ লাভ করেনি, সুতরাং কিছুকাল পরেই তার মৃত্যু সুনিশ্চত, তখন আপনার দুর্ব্বুদ্ধির কথা মনে করে তিনি অধীরা হয়ে পড়্‌লেন।

সেই সদ্যপ্রসূত মানবটি দেখিতে ঠিক্ একজন সুপুরুষ যুবকের ন্যায়। সে তার সেই অপূর্ণ অবয়ব নিয়ে মাতাকে সম্বোধন করে বল্‌ল "মা! তুমি একি কর্‌লে? হায়! আর পাঁচশত বৎসর পরে আমি যে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে ধরণীকে ধন্য এবং তোমাকে ভাগ্যবতী করতাম। কেন তুমি এই অল্পসময় সহিষ্ণু হয়ে থাক্‌তে পারলে না? হায় মাতা! তোমায় এই "মা" বলে শেষ সম্বোধন করলাম আর ত আমি মর্ত্ত্যে থাক্‌তে পারব না।"—বলিয়া সেই সুকুমারটি নীরব হইল। জননী বুঝতে পারলেন নিজের দোষেই তিনি এক ভাগ্যবান্ পুত্ররত্ন হারালেন। পুত্রটির তখনই মৃত্যু হইল।

ইহার পর গরুড়-জননী দ্বিতীয় ডিম্বটিকে সযত্নে, রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁহার মন ক্ষণে ক্ষণে অধীর হয়ে উঠ্‌লেও তিনি অন্য ডিম্বটির কথা স্মরণ করে নীরব হতেন। এই রকম করে আর এক হাজার বৎসর কেটে গেল। যে দিন দু'হাজার বৎসর শেষ হয়ে গেল, জননী ডিম্বটির পার্শ্বে প্রতীক্ষা করে রইলেন। শেষে আপনিই ডিম্বটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, ভিতর হ'তে একটি সুকুমার এবং অসীম বলশালী পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী বার হলেন। বলা বাহুল্য এই নবজাত পুরুষটিই গরুড়। গরুড় ভূমিষ্ট হইয়াই তাঁহার জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আনন্দে গরুড়-জননীর দুই গণ্ড দিয়ে অশ্রু ঝরিতে লাগ্‌ল। গরুড়ের ন্যায় পুত্রলাভ করে তিনি খুসী হলেন বটে কিন্তু তবুও তাঁ'র বুকের মধ্যে এক জায়গায়, পূর্ব্ব ডিম্ব-জাত সেই মুমূর্ষু পুত্রের বাক্যগুলি কাঁটার মত বিঁধে ছিল।

এই গল্পটা থেকে আমাদের শিক্ষা করবার বিশেষ একটা বিষয় আছে। বৃহত্ত্ব লাভ করতে হলে, কোনো বড় জিনিষ পেতে গেলে, আমাদের জীবনে বহুকাল ধরে' তারজন্য একটি সহিষ্ণুতা ও স্থির সাধনার আবশ্যক আছে। তা' না থাকলে আমরা জীবনে অকালে ব্যর্থ হয়ে যাই। ঐ গরুড়-জননীর মত অসময়ে মহাদ্রব্যের আশায় যা' হতে একটা মহত্ত্বের সম্ভাবনা ছিল, তাকে নষ্ট করে দিয়ে মহত্ত্বের ভ্রূণহত্যা করে দিই। যা' বড় ত'া গড়ে উঠ্‌তে সৃষ্টি হয়ে আস্‌তে কত শত শত বৎসর যে লাগে তার ঠিকানা নেই। আমাদের এইজন্য বড় হবার জন্যে সহিষ্ণুতা থাকা চাই। কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আমাদের দেশে, সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে এই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ কি ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত হয়ে উঠ্‌ছে না? কিন্তু তবুও ত বল্‌তে হবে, ধৈর্য্য চাই, ধৃতি চাই।

দেশ যখন দুর্দ্দশার পঙ্ক কুণ্ডে লুণ্ঠিত, মহাপুরুষেরা দেশকে মুক্তি দিতে তখনই আবির্ভূত হন। তাঁহাদের বিরাট-পক্ষযুক্ত দেহ সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়া হাওয়াকে কাঁপিয়ে দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে যায়। এরজন্যেও দেশের ধৈর্য্য এবং ধৃতির আবশ্যক। জীবনে বা দেশের মধ্যে মহত্ত্ব লাভ করার প্রস্তাব আজ উঠ্‌ল, কালই যে, সে মহত্ত্ব আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হবে, তা নয়। অনেক বৎসরের সাধনা ও তপস্যা চাই; তার পর সফলতা।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

—০—

নারীজীবনের লক্ষ্য

—০—

উদ্দেশ্য লইয়াই মানব-সমাজ চলিতেছে। সকলেই কোনো-না-কোনো লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতেছে। সভ্য-অসভ্য, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ও দেশভেদে উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার। নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি? কেহ বলিবেন,—জগতের সেবাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য; আর কেহ হয় তো বলিবেন,—আদর্শ মাতৃজীবন-প্রতিষ্ঠাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। আমি এই দুইজনের কথাই শিরোধার্য্য করিলাম। কারণ সেবাই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেবা অতি উচ্চ ধর্ম্ম। প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষজাতিও অক্লান্তভাবে স্বজাতি

ও জগতের সেবা করিতেছেন। সেবার অর্থ দাসত্ব নহে। প্রেমই সেবার মূল। নারী, প্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া লোকের সেবা করিবেন এবং দুর্গম সংসার-পথে সকলের পক্ষে আলোক-স্বরূপিনী হইবেন। সামাজিক হীনতা হইতে দাসত্বের উৎপত্তি। নারীজাতি জ্ঞান ও প্রেম-বলে সমাজে আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই তাহার সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির যে এত দুরবস্থা, আত্মসম্মানের অভাবই তাহার মূল কারণ। গৃহধর্ম্ম অতি পবিত্র এবং নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য আপনাকে কেবল গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। লোকহিতৈষণা-ব্রত তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বজাতি অর্থাৎ নারীর জ্ঞানধর্ম্ম ও নীতিবৃদ্ধির জন্য সাধনা নারীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাই লোকসেবার প্রকৃষ্ট পন্থা। কোনো মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া যদি আপনি অশিক্ষিতা নারীসমাজ হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে নারী-জাতির উন্নতির আশা কোথায়? মরুভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় উহা নিষ্ফল নহে কি? সেবা নারীজীবনের ধর্ম্ম। পরিবারের সেবা, স্বদেশের সেবা, স্বজাতির সেবা বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল মহাপুরুষ আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে উৎসাহিত করিতে-ছেন, তাঁহারাও সেবা-ব্রতে ব্রতী। কেহ জ্ঞান দ্বারা, কেহ শরীর দ্বারা, কেহ-বা অন্যান্য বিষয় দ্বারা মানবের সেবা করিতেছেন। যে-সকল মহাপুরুষ পৃথিবী পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সেবাব্রতে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাকে সেবা ভিন্ন আর কি বলিব? সেবাব্রত কেহ যেন হেয় মনে না করেন। মানবকে প্রীতি করিলে, ঈশ্বরকেই প্রীতি করা হয়; কারণ মানব তাঁহারই সন্তান। লোকসেবা ও লোকপ্রীতি নরনারীকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর করে। ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবের সেবা নারী-জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। যদি এই আদর্শ ভারতের প্রত্যেক নারী-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে কত মেরী কার্পেণ্টার, কত সঙ্ঘমিত্রা ভারত-বক্ষে অভ্যুদিতা হইয়া স্বদেশের দুঃখ দূর করিতে পারেন। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের প্রিয়তমা কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সহচরীবৃন্দ-সহ সিংহলে গমন করিয়া রাজান্তঃপুরবাসিনীদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিতা করেন।

হিন্দুজাতি যে-বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার কয়েকটি শ্লোক বিশ্ববারা, নাম্নী মহিলা-রচিত। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী অতি দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন। নারীর সেবাও আধুনিক নহে।

নারীর শিক্ষাও আধুনিক নহে এবং নারীর ব্রহ্মজ্ঞানও আধুনিক নহে। ভারতের নারীবৃন্দ আত্মবিসর্জ্জনে ও আত্মদানে চিরদিনই অভ্যস্থা। ভারতের সেবাপরায়ণা মহিলাগণ স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সংসার ও ধর্ম্মের জন্য অম্লানবদনে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আধুনিক সময়ে ভারতাকাশে অনেক লীলাবতী খনা প্রভৃতি বালসূর্য্য উদিত হইয়া আপনার জ্যোতি বিস্তার করিতে অনেক বিলম্ব আছে। কবি গাহিয়াছেন,—"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।"

মানব জাতি চিরউন্নতিশীল। এজগতের কেহই চিরদিনের জন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতে আসে নাই। জগদীশ্বর সকলকেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি অসভ্য যে আমেরিকার নিগ্রোজাতি, তাহারাও সুশিক্ষাদ্বারা আপনাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছে। তাহারাও এখন স্বায়ত্তশাসনও লাভ করিতেছে। তবে কি শুধুই ভারতীয়া নারীবৃন্দ এই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে? না, পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গীয় আলোক দ্বারা ভারতীয়া নারী জাতির অজ্ঞানান্ধকার—মোহান্ধকার দূরীভূত করিবেন।

দ্বিতীয় আদর্শ মাতৃজীবনের বিষয়। সন্তান মাতার নিকট যত শিক্ষা লাভ করে, বোধ হয় তত পিতা কিংবা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করে না। পুরাকালে ভারতবর্ষে শক্তি স্বরূপিণী মাতৃজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইত। কিন্তু আধুনিক সময়ে ভারত-বক্ষ হইতে নারীজাতির সে মর্য্যাদা ম্লান হইলেও ধনসম্পদ-বিধায়িনী লক্ষ্মী, দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গা ও জ্ঞানদায়িনী বাগ্দেবী নারীরূপেই হিন্দুর গৃহে-গৃহে প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

অনেকে বলেন শাস্ত্রকারগণ প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষজাতি ছিলেন বলিয়া তাঁহারা নারীর প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা না করিলে প্রতিপদে ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—"যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" ভারতের আজ যে শোচনীয় অবস্থা, ইহা মাতা-ভগিনী-কন্যা-রূপিনী নারীগণের অবনতির ফল। তাই বুঝি প্রথমেই কবির হৃদয়ে নারীর ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার কথা মনে হইয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

কবির সঙ্গীত অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। যদি কোনো দিন ভারত জ্ঞান ও ধর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে নারীর উপযুক্ত সুশিক্ষা

তাহার অন্যতম মূল কারণ হইবে। মাতা যদি সুশিক্ষিতা না হন, তাহা হইলে সন্তান সুশিক্ষিত হইবার আশা কোথায়? পুত্র যেখানে বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, মাতা সেখানে সাংসারিক সম্পদের আলোচনা করিতেছেন। ইহা যে কিপ্রকার বিসদৃশ, প্রিয়-পাঠক পাঠিকাগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। মাতা সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা ও সুসংযতমনা হইলে সন্তান নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। মহাশক্তির অংশরূপিনী মাতাকে অশিক্ষিতা রাখিয়া সুশিক্ষিত সন্তান লাভের আশা কোথায়? সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন,—"সতী-গর্ভে সাধু সুত, এই জগতের রীত, রসালে কি হীন ফল ফলে?"

আমরা পৃথিবীতে যে-সকল মহাপুরুষের কল্যাণে ধর্ম্ম-জগতে এবং সংসারের নানাবিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিতেছি এবং যাঁহাদের আদর্শ আমরা সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহাদের জননীগণও নানাগুণের অধিকারিণী ছিলেন।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে ভারতীয় নারীদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতীয় নারীদিগকে সুশিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষা-কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে * * * * * সন্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না। গৃহ জ্ঞান ও আনন্দের আধার হইবে না।"

জগতে সকল পদার্থই ধ্বংসশীল, কিন্তু মহাজনদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম চিরস্থায়ী। শিপ্রাতট-শোভিনী উজ্জয়িনী নগরী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাব্যসুধা এখনো জ্ঞানীদিগের জ্ঞানক্ষুধা চরিতার্থ করিতেছে।

এই মরণশীল জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ। আমি ভগবানের পরমপদে ভারতীয় মাতা ও ভগিনীদিগের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া চিরস্মরনীয়া হইতে পারেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

— ——

নারীর দীক্ষা

নারীর শিক্ষা হবে না সফল—
দীক্ষা না যদি কঠিন হয়,
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
শত ক্লেশ নারী শিখিতে সয়!

প্রলোভন যদি না পারে দলিতে
না পারে ঠেলিতে পথের বাধা;
দুর্ল্লভ যেই প্রেমের সাধনা!
সুগভীরে তার হয় না সাধা!

আপনারে যদি না পারে ঢাকিতে
লৌহ-কঠিন বর্ম্ম পরি',—
সঞ্চিতে নারে অন্তর-মধু
ভক্তি-সুধার পাত্র ভরি!

বায়ু আসি তবে উড়াবে তাহার
চঞ্চল শ্লথ বসনখানি;
অগ্নি আসিয়া দহিয়া তাহারে
চলে যাবে শুধু ভস্ম দানি!

ব্যর্থ তাহার যত বৈভব
গৌরব শত মিথ্যা হবে;
অভিশাপ সম নারীর জীবন
ধরার বক্ষে জাগিয়া রবে!

না রহিবে তার অসীম ধৈর্য্য
ধরণীর ভার ধরিতে বুকে;
না রহিবে তার কঠিন বীর্য্য
তেয়াগিতে প্রাণ পরের দুখে!

সে মহা প্রেমের পরম সাধনা
সাধিতে জগত নারিবে শেষে;
নারী-হৃদয়ের তপের প্রভাব
তার সনে আজ যদি না মেশে!

হৃদয়ের বল সাধনার ফল—
বিলাবার লাগি সবারে জেন,
জীবনের সার দীক্ষা তোমার
হয়েছে হে নারি! কঠিন হেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

সৎপ্রসঙ্গ

উদ্দেশ্য—কুশদহে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যেসকল প্রবন্ধ বাহির হয় তাহা পাঠ করিয়া কাহার মনে কিরূপভাব হয়, তাহা জানিবার তেমন কোনো উপায় নাই। এজন্য এবার আমরা ধারাবাহিকরূপে এমন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে চাই,

যাহা দ্বারা লেখক এবং পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত একটি যোগ স্থাপিত হইতে পারে। প্রসঙ্গ মধ্যে ধর্ম্ম এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় থাকিতে পারিবে। প্রথমে যে বিষয়টি ধরিয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইবে, তাহা পাঠ করিয়া যদি কেহ কিছু অভিমত লিখিয়া পাঠান কিম্বা প্রশ্ন করেন, তবে তাঁহার সেই অভিমত অথবা প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দেওয়া হইবে। প্রয়োজন হইলে অভিমত-লেখক অথবা প্রশ্নকারীগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মতামতের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারে ক্রমশ প্রসঙ্গ চলিতে পারিবে। তবে কোনো কুতর্ক বা বৃথা বাদানুবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। যেখানে মতভেদ হইবে সেখানে উভয়পক্ষে ধীরভাবে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা থাকিলে প্রসঙ্গ চলিতে পারিবে। আমাদের পাঠকবর্গ এ বিষয়টির প্রতি মনযোগ প্রদান করিলে তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

নবীন-রূপ—কিছুকাল পূর্ব্বে ইয়োরোপে যেপ্রকার নাস্তিক্যবাদ প্রবল ছিল, বর্ত্তমানে তাহার স্রোত অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এখন আস্তিক্য-বাদের দিকেই অধিকাংশ লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ নাস্তিক্যবাদ কয়েক প্রকারের ছিল। তাহার মধ্যে যাঁহারা একেবারেই ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন, তাঁহারাই নাস্তিক নামে অভিহিত হইতেন। আর একদল লোক যাঁহারা বলিতেন, "যদিও ঈশ্বর থাকেন কিন্তু তাহা প্রমাণ করা যায় না।" তাঁহাদিগকে সন্দেহবাদী বলা হইত। আর যাঁহারা বলিতেন, "জগতের একজন স্রষ্টা আছেন বটে, কিন্তু তিনি মনুষ্য বুদ্ধির অতীত! তাঁহাকে কেহ জানিতে পারেনা।" তাঁহারা ছিলেন, অজ্ঞেয়বাদী। আমাদের দেশে চার্ব্বাক ছিলেন প্রধান নাস্তিক। তদ্ভিন্ন বৌদ্ধমতকেও নিরীশ্বরবাদ বলা হইত। যাহা হউক সুখের বিষয় এখন সকল দেশের সকল প্রকার নাস্তিক্যবাদ খর্ব্ব হইয়া ঈশ্বরাস্তিত্বের পরিচয় সহজ জ্ঞানে সকলে লাভ করিতেছেন।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনুষ্য-বংশ যুগযুগান্তরের সাধনার দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্বের তিন প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন—(১) বৈদিকযুগ, প্রকৃতির ভিতর দিয়া,তাই তাঁহারা বলিলেন।

"যোদেবাঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।"

অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

(২) বৈদান্তিকযুগ, আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মার দর্শন। তাই তখনকার ঋষিরা বলিলেন ;—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—

তারপর পৌরাণিকযুগ, জনসমাজের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখা, যথা—"লীলারসময় হরি।"

প্রথম জ্ঞানযোগ, দ্বিতীয় ধ্যানযোগ, তৃতীয় ভক্তিযোগের পথে সাধনা চলিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ—সমন্বয়ের যুগ। এযুগের ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধকগণ তিন প্রকারেই ঈশ্বর দর্শন করিবেন। বেদ বেদান্ত পুরাণ, তিনের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মরাজ্য গঠিত হইতেছে।

আজ নববর্ষদিনে প্রকৃতির ভিতর দিয়া তাঁহার যে নবীনরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই একটু প্রসঙ্গ করিতে চাই।

এজগৎ পুরাতন একঘেঁয়ে হইয়া না যায় এই জন্য যেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি এক এক ঋতুর পরিবর্ত্তন কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই পরিবর্ত্তনে একেবারে অন্তর-বাহির পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহার ভিতর এই যে বসন্ত ঋতুটি কি চমৎকার—সমস্ত যেন একেবারে নূতন হইয়া যায়। গাছগুলি পাতা ফুল ফল পর্য্যন্ত সমস্ত নবীন। তৃণরাজি পর্য্যন্ত নবীন সাজে সজ্জিত। কত রকমের প্রাণী—কত রঙের প্রজাপতি এসময় দেখা যায়, কত বিচিত্র রঙে চিত্রিত কি সুন্দর নবীন মূর্ত্তি তাহাদের। সাধারণ মানুষের মনও এসময় কিয়ৎপরিমাণে প্রফুল্ল হয়। ভক্ত-বিশ্বাসীর চক্ষু প্রকৃতির এইরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রাণে অনুভব করিয়া ভক্তি-পিপাসু প্রাণ তাঁহার প্রেমসুধা—আনন্দরস পান করিয়া কৃতার্থ হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে ঈশ্বর দর্শন কোনো একটা অলৌকিক ব্যাপার নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ফল-স্বরূপেই দর্শনলাভ হয়।

বিবিধ

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে স্মৃতিভবন

বর্ত্তমান সময়ের ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, আর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে ইউরোপের বৃষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁহার এক সমাধি-মন্দির স্থাপন দ্বারা তাঁহার মৃত্যু-স্মৃতিকে সুদৃঢ় করা

হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম-স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য এতদিন কোনোরূপ আয়োজন করা হয় নাই।

রাজার ঊর্দ্ধতন এবং নিম্ন পুরুষের মধ্যে কেহ নির্ধন ছিলেন না, অথচ তাঁহার জন্ম-ভিটাটুকু ঘটনা বশত হস্তান্তর হইয়া গিয়াছিল। এতদিনের পর খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় রাজার ভিটাভূমিটুকু উদ্ধার করিয়া আজ দেশের এবং দশের অশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন।

বিপিনবাবু এবং রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, ঐ ভিটাভূমির উপর এক স্মৃতিভবন ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ এবং জলাশয় খনন করা হইবে। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহে আজ ঐ মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গত ৯ই বৈশাখ শনিবার রাধানগর গ্রামে রাজার জন্মভূমির উপর স্মৃতিভবনের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ৮ই বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র প্রভৃতি ৭টি মহিলা এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পুত্র এটর্ণী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, হেয়ার ইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু, মান্দ্রাজবাসী শ্রীযুক্ত সাম্ভশিব রাও, মুসলমান সমাজের এক প্রধান ব্যক্তি সাহা আবদুল্লা প্রমুখ ৫৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে নানারূপ পথ শ্রম স্বীকার করিয়া রাজা রাম-মোহনের দেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

প্রথমে হাওড়া তেলকলঘাট হইতে মার্টিন কোম্পানির ৪খানি রিজার্ভ রেলগাড়ি যাত্রীদল লইয়া ৮টা ২৫ মিনিটে ছাড়িয়া, বেলা ১২টার পর চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছে; তারপর ১৫ খানা পাল্কী ২টা হাতীতে এবং অবশিষ্ট লোকসকল পদব্রজে প্রায় ৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৭টার পর রঘুনাথপুরে রাজার পৌত্র—পরলোকগত হরিমোহন রায়মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবীর ভবনে উপনীত হন। হাওড়া হইতে প্রত্যেক ষ্টেশনে এবং পথিমধ্যেও স্থানে স্থানে পানীয় এবং ভোজ্যদ্রব্যের অতি সুবন্দোবস্ত ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাত্রীদলের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শুক্রবার রাত্রিতে ও শনিবার দুইবেলা গোলাপসুন্দরী দেবী প্রচুর অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করিয়া সমস্ত লোকের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনিই

এই মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। রাজার অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা বিধায় স্বয়ং দেশে উপস্থিত হইতে না পারিয়া তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়কে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আহারের সকল সময়েই উপস্থিত থাকিয়া সকলের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের দিবসে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাটীতে আহার করাইয়া পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে তহশীলদারের কর্ম্ম করিয়া অনেক বিত্ত-সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, এবং কর্ম্মদক্ষতার জন্য 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজার পিতা রামকান্ত রায় মহাশয়ও নবাব-সরকারে নয় লক্ষ টাকার ইজারদার ছিলেন। রাজার পুত্র, রমাপ্রসাদ রায় সদরদেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদের পুত্র প্যারীমোহন ও হরিমোহনের পত্নী বিস্তৃত জমিদারী ভোগ করিতেছেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের জগৎপূজ্য পিতামহের স্মৃতিভবন গড়িয়া তুলিতে সবিশেষ উদ্‌যোগী হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রামকান্ত রায় মহাশয় পরিবারবৃদ্ধিহেতু রাধানগর হইতে দারকেশ্বর নদীর পশ্চিমতীরস্থ লাঙ্গলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাল্যকালে রাজা সেই বাটীতেই ছিলেন এবং সেখান হইতেই তাঁহার অন্তরে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মানুভূতি জাগিয়াছিল। রাজার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীপতি রায় মহাশয় এক্ষণে ঐ বাটীর স্বত্বাধিকারী। কিন্তু তিনি এক্ষণে উত্তরপাড়ায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং ঐ পুরাতন বাটী এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ প্রাচীর মাত্র এখনো দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভগ্ন বাটীর ইষ্টকস্তূপের উপর বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে ঐ প্রাচীরটুকুর চিহ্ন পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একমাত্র পরব্রহ্মে বিশ্বাস হেতু, যে-বাটী হইতে ১৬ বৎসর বয়সে রাজা পিতাকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন—যে-বাটীতে পরম সত্য পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইয়া সকল নিগ্রহ সহ্য করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিয়াছিলেন, সেই বাটীর স্মৃতিরক্ষা কার্য্যে যাঁহারা উদ্‌যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন তাহাতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে?

রাজা যে সময়ে চাকরি-সূত্রে রংপুরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাটী আসিয়াছিলেন, কিন্তু

পৌত্তলিকতা বর্জ্জন-হেতু মাতা পুত্রকে গৃহে স্থান দিলেন না। তারপর মাতার জমিদারীর মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য ভূমি চাহিলেন, মাতা তাহাও দিলেন না। তখন লাঙ্গলপাড়া গ্রামের সংলগ্ন নদীতীরে রঘুনাথপুর গ্রামে এক বৃহৎ শ্মশান-ক্ষেত্র ছিল। শ্মশানের কেহ মালিক নাই দেখিয়া রাজা তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক বাস করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তথায় যেসকল ঘর তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহা এখনো বর্ত্তমান আছে।

দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রাজার বাটীর সম্মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের পত্নী স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। এই ভীষণ দৃশ্য রাজার মনে এমন বেদনা দিয়াছিল যে, তিনি এই হইতে সহমরণ-প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। যে-স্থানে সহমরণ হইয়াছিল, সেখানে একটি স্তম্ভ ছিল। কিন্তু এখন তাহা নাই।

এই অনুষ্ঠানের প্রথম রাত্রে রঘুনাথপুরে শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবীর ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হয়। দ্বিতীয় দিবস রাধানগর গ্রামে রাজার জন্মভিটায় যে-স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেইস্থানে, 'ওঁ তৎসৎ' অঙ্কিত ইষ্টক-দ্বারা 'স্মৃতি-ভবনে'র ভিত্তি, রাজার আধ্যাত্মিক পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পৌত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, কুমুদিনী বসু, বাসন্তী মিত্র এবং আরো কতিপয় মহিলা-পরিবৃতা হইয়া স্বহস্তে স্থাপন করেন। ভিত্তিস্থাপনের সময়ে মহিলা ও পুরুষে প্রায় দুই সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। রাজা নারীজাতির পরম বন্ধু ছিলেন, আজ সেই নারীজাতি তাঁহার স্মৃতিভবনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ভারতে এই ঘটনা হইতে কি পুণ্যফল প্রসূত হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

স্বর্গীয় রাজার জীবন বর্ত্তমান সভ্যজগতে মহান্ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে। রাজার চরিত্রে জ্ঞান এবং প্রেমের সামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়াছিল। জ্ঞানশূন্য প্রেম আসক্তি বা মায়া, প্রেমশূন্য জ্ঞান অহঙ্কার বা মোহ। কিন্তু সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ পায়। রাজার জীবন বঙ্গভূমির প্রতি, ভারতভূমির প্রতি, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ, এক গোধূলীর অন্ধকার ভেদ করিয়া একটু ভূমিখণ্ডের উপর সূতিকাগৃহে ফুটিয়া উঠিয়া মাতৃমুখে যে-হাসির রেখা টানিয়া ছিল, আজ সেই প্রফুল্লতা জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তাই ভূমিটুকুর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি ও যত্ন পড়িয়াছে। রাজার আদর্শের মূল কি? কিসের উপর তাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? যিনি সত্যস্তকে লইয়া

এক, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করাই এক সত্যের উপাসনা। রাজার জীবনে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠাতেই তাঁহাকে এমন এক উচ্চ আদর্শে পরিণত করিয়াছিল।*

হিন্দুসভা ও ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী—গত ১১ই ও ১২ই এপ্রিল অর্থাৎ ২৯শে ও ৩০শে চৈত্র হরিদ্বারে ভারতীয় হিন্দুসভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। হৃষিকেশ হইতে রামনাদ এবং গুজরাট হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সকল স্থানের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। এই সভায় কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয়ের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হইয়া শেষে ধর্ম্মবিষয়ে "সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে সন্ধ্যা ও ঈশ্বরোপাসনা" প্রবর্ত্তনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

তারপর গত ৯ই বৈশাখ ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-গৃহে হইয়াছিল। মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা শশিশেখরেশ্বর প্রভৃতি বহু রাজা মহারাজা এবং রায় বাহাদুর ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন, রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "সন্ধ্যার প্রয়োজন" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তর্কচূড়ামণি মহাশয় এবং কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন।

বর্ত্তমান নবযুগে জাগরণের এই একটি লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, সকলেই স্ব-স্ব সম্প্রদায় ও জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, বস্তুত যদি একদিন জাতির সমন্বয় হয়,— সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনে একটি পূর্ণদেহ হয়, তবে অগ্রে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পুষ্টিসাধন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শরীরের বৃদ্ধি বা পুষ্টির হেতু প্রাণ! প্রাণহীন চেষ্টা বৃথা আড়ম্বর মাত্র। হিন্দুসভাগুলি প্রাণসঞ্চারের কি উপায় স্থির করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উহা কি ধনবল পদগৌরব আর পাণ্ডিত্যের দ্বারা এবং গতানুগতিকের পথে চলিলেই লাভ হইবে? আমরা এপর্য্যন্ত তো এমন একজনকেও দেখিলাম না, যিনি সমগ্র হিন্দুসমাজের ভিতর কোনো একটি দোষনীয় নীতিকে বর্জ্জন করিয়া সন্নীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন। এখানে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলিতেছি না। যদি কেহ কোনো প্রথার পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হন, অমনি আর একজন উঠিয়া প্রমাণ করিবেন, "আমাদের যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা অতীব

* এই বিবরণ সঞ্জীবনী পত্রিকার সাহায্যে সঙ্কলিত। (কুঃ সম্পাদক)

সুন্দর, তাহা সনাতন, তাহা শাশ্বত।” তবে যাহা-কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা যুগের প্রভাবে এবং উন্নতিশীলদিগের দৃষ্টান্তের ফল-স্বরূপে। যাঁহারা একসময় যে-বিষয় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই আবার সত্যের প্রভাবে, অজ্ঞাতসারেও অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে যুগের প্রভাব।

সংস্কারে কালের প্রভাব

জগতে সংস্কারের যুগ আবার দেখা দিয়াছে। আমাদেরও জাতীয় জীবন এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে ইহার সকলরকম সংস্কারেরই প্রয়োজন বোধ হইতেছে। তাই ধর্ম্মে, সমাজে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, শিক্ষায় এবং কিসে-নয়, একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সংস্কারে ও জীর্ণ-সংস্কারে অর্থাৎ ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়া আর তালি দেওয়া এই দুই কাজেই সংস্কারকগণ লাগিয়া গিয়াছেন। এখন সমুদ্রমন্থনের মত সমাজ বিক্ষোভিত হইতেছে, রত্ন যে উঠিবে না তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না, কিন্তু সুধাভাণ্ড লইয়া কোন ধন্বন্তরী উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই, যে বিষের হাঁড়ী দেখা দিয়াছে তাহা যদি কেহ অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বলিতে হয়, বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে রঙীন চশমা পরিলে যেমন চারিদিক মেঘলা-মেঘলা বলিয়া মনে হয় অথচ মাথার উপর রৌদ্রের প্রচণ্ডতা কমে না, তদ্রূপ 'নাই' বলিয়া বিষটাকে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও বিষের ফলভোগ করিতেই হইবে। নানাদেশের সংস্কারের কথা শুনা যায়, তথা হইতে প্রায়ই ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গঠন করিবার সংবাদ আসে। তাহার পর যখন তাহাদের দেখা যায়, তখন যেন তাহারা নূতন জগতের নবীন জাতি, নূতন তাহাদের উদ্যম, নবীন তাহাদের আশা ও সকলেই যেন নব জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সে-দিনের কথা, হেমবাবুর আমলের "অসভ্য জাপান," দেখিতে দেখিতে কি হইয়া উঠিল! সমাজের বন্ধনই বা তাহাদের কেমন ছিল, তাহাদের সংস্কারকইবা কি ভেল্কী জানিত, আর দেশের লোকেরাইবা কিরূপ সমজদার ছিল তাহা ভাবিয়াই পাই না। জর্ম্মণীতেই শুনা যায় বৎসর কতক পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যই ছিল না! বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন কি, চীন যখন নিজের হস্তে টিকী কাটিয়া আফিমের খরচ

তুলিয়া দিয়া মান্ধাতার আমলের সংস্কারটাকে অবলীলাক্রমে উল্টাইয়া দিল, তাহারাই যখন পৃথিবীর সপ্তআশ্চর্য্যের একটা আশ্চর্য্য—তাহাদের দেওয়ালের গণ্ডীর বাহিরে পা দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিল, তখন ভাবিয়াই পাই না আমাদের দেশটাই বা কেমন! আমাদের এখানে সমজদার লোকের অভাব নাই, সংস্কারকের অভাব ত কোন কালেই হয় নাই, রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দুই দলের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও অপরাধের দণ্ডবিধি বেশ গুছাইয়া বলিতেছেন ও লিখিয়া যাইতেছেন। আশার কথাও বড় কম শুনা যাইতেছে না, কিন্তু যেমন সমুদ্রের জল বাড়িয়া নদীতে জোয়ারই বহাক, আর নদীর জল শুকাইয়া সোজা সমুদ্রে গিয়া নাই পড়ুক, সাগরের যে-জল সেই জলই বজায় থাকে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। আমাদের হরে-দরে হাঁটুজল আর ঘুচে না! সামাজিক উন্নতি এবং মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত চোখে যে পড়িতেছে না তাহা নহে। কিন্তু সবই দেখা যাইতেছে খাপছাড়া, কোন সংস্কারই জমাট বাঁধিতেছে না। যেন এখানকার প্রয়োজন ওখানে বোধ হইতেছে না, যেন ইহাদের বেদনা উহারা বোধ করিতেছে না। দেহের যে-কোন অংশে ক্ষত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তাহার সাড়া থাকে কিন্তু এই সমাজদেহের যেখানে ক্ষত সেইখানেই বেদনা আর সব অঙ্গ অসাড়! এ রোগের চিকিৎসা কি? সংস্কারের বা চিকিৎসার যে প্রয়োজন তাহাও সকলে জানেন, সংস্কারকমণ্ডলী যে অকাতরে ও অকপটে সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন তাহাও না হয় মানিয়া লওয়া হইল, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইতেছে? কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"(আমি) কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে।
(তাই) আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥"

সকলই যেন আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে হইতেছে। সমাজসংস্কার চাই তা বেশ, কিন্তু কোন্ সমাজের সংস্কার, কাহাদের সমাজ! বাঙ্গালী সমাজ, না মাড়োয়ারী সমাজ? হিন্দু সমাজ না ব্রাহ্ম সমাজ না আর্য্য সমাজ না মুসলমান সমাজ! জাতীয় সংস্কার? কোন্ জাতীয় সংস্কার, ব্রাহ্মণ জাতীয় না শূদ্র জাতীয় না ছত্রিশ জাতীয়? তাহাদের 'পৃথক পৃথক' সংস্কার না সকলকে লইয়া এক জাতি গঠন-প্রয়াস? হিন্দুসমাজ বলিলে যেমন কেবল বাঙালীর কথা বলা হয় না, বাঙালী সমাজ বলিলে তেমনি এক দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্মীর কথাও বলা হয় না। দেশের সংস্কারই হউক আর জাতীয় সংস্কারই হউক কিছুই স্বতন্ত্র ভাবে হইবে না; হইলেও স্থায়ী হইবে না। সংস্কারকগণকে

মনে রাখিতে হইবে যে সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে তাঁহারা শক্তি পাইবেন না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি জুড়িয়া যেমন মূর্ত্তি গঠিত হয়, তেমনি সমাজের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সকল অংশই একত্র করিয়া সমাজদেহ বা জাতির নেশানাখ্য বিরাটরূপ গঠন করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে, যাহাদের চাই আর যাহাদের চাই না, যাহাদের ছুঁই আর যাহাদের ছুঁই না তাহাদের কাহাকেও ছাড়া হইবে না। যাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিব না তাহাদের সেবা লইব তাহাদের দ্বারা সমাজ-বন্ধন দৃঢ় করিব ইহা কবির ঐ আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতিভেদটা যে জাতীয় শক্তিসংগঠনের অন্তরায় একথা বুঝেন অনেকেই, কিন্তু বুঝাইয়া দিতে গেলে এখন আর চলিবে না, তর্কের মীমাংসাও হইবে না, কারণ আলোর যেমন দরকার, ছায়ারও তেমনি দরকার আছে। এবং যেটা যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করে তাহারই গুণগান সে করিবেই। সকল বিষয়েরই আলো-ছায়ার মত দুইটা দিক আছে। দুইটারই প্রয়োজন হয় এবং একটাকে উড়াইয়া দিয়া আর একটা রাখা চলে না। নর নারীর কার্য্য ও প্রকৃতি প্রবৃত্তি-অনুসারে সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বৈচিত্র্য ঘটিবেই উহা সমাজের স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া ব্রাহ্মণ জন্মিবার ও বৃদ্ধি পাইবার পর সমাজবদ্ধ হইলে, স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে চতুর্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। সেই চতুর্বর্ণ এখন এত শাখা ও প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং মূল হইতে এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে একই যে বহু হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যাইতেছে এবং অনেকে তাহা রহিত করিবার চেষ্টায়ও ব্রতী হইয়াছেন। ফলে ভেদভাব নব নব ভাবে ফুটিয়া পড়িতেছে। সুতরাং সকলে মিলিয়া সমাজটাকে "প্রয়োজন" মত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া বরং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের লোক স্বতন্ত্রভাবে ও আপনাদের "মনের মত" করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। এবং যেখানে তাঁহারা বাধা পাইতেছেন, সে বাধা-বিঘ্নগুলি অর্থ-বলে, শাস্ত্র-বলে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভণ্ডামিরও বলে অপসারিত করিবার চেষ্টায় আছেন। বিপক্ষদলগুলি তাই পরস্পরের মস্তকে নিক্ষেপ করিবার জন্য "মোহমুদ্গর" লইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এই সংস্কার নামক সংগ্রামক্ষেত্রে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠই কি, আর নিকৃষ্টই বা-কি সমাজদেহের আপাদমস্তক আলোড়িত হইতেছে। প্রকৃত স্বজাতিবৎসল স্বদেশহিতৈষী অকপট প্রেমিক দেবচরিত্র নরনারীর কথা বলিতেছি না, তাঁহারা চিরদিনই আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন। সেই বিশিষ্ট জনগণের বাহিরে যে বিরাটদেহ সমাজ ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসা

[illegible], ছুৎমার্গ প্রভৃতির বিষে জর্জরিত হইয়া প্রতিকারের জন্য চীৎকার করিতেছে তাহারই কথা বলিতেছি। এমন সংবাদপত্র দেখিনা যাহার ভিতরে এই কথার আলোচনা না হয়। ব্যাধি যে সমাজদেহকে বিলক্ষণ চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঠিক যেন রোগের মূল স্থানে কোন চিকিৎসকেরই দৃষ্টি পড়িতেছেনা। অনেকেই সে স্থান পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাতে ফল হইতেছে না। নেতৃবৃন্দ সকলে মুক্তিপথ দেখাইবার পূর্ব্বে আপনারা প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হউন এবং সমবেত পরামর্শে নিদান স্থির করিয়া একপ্রকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করুন। তাহা না করিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত খৃষ্ট জগতের মত—"ঈশ্বর এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" বলিয়া চীৎকার করিলে প্রেম ঝরিয়া পড়িবে না, কেহ জীবনও পাইবে না। এখানে প্রেম প্রীচ করিলে চলিবে না, প্রেম করিয়া দেখাইতে হইবে তবেই জীবন পাইবে। কিন্তু প্রেম করিতে হইলে একদিক হইতে কেবল আশীর্ব্বাদ আর এক দিক হইতে দণ্ডবৎ আসিয়া প্রেমের সৃষ্টি করেনা। বাহুতে বাহু বদ্ধ করিয়া হৃদয়ে হৃদয় মিলাইতে হয়। স্পর্শাক্রামক সমাজে তাহা হইবে কি? "আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" গাহিতে বেশ, শুনতেও সরেশ। কিন্তু ভালবাসা জিনিষটা সুরের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে মিলাইয়া যায়। কারণ, তাহার স্থায়িত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সোনার বাংলাকে যে ভালবাসে সে যে সোনার বাংলার হীরের টুক্‌রা বাছাদের ভালবাসে না তাহাও কি সম্ভব? কিন্তু বাছারা কোল পায়না! ঐ দূরে থেকে ভালবাসার ভাবটা কেমন কেমন ঠেকে! তথাপি আশা আছে—আশা আছে, কারণ সংসারটা চক্র এবং ভ্রাম্যমান চক্র। কাল তাহার পরিচালক, তাই ভরসা!

চক্রের যেটা উপরে সেটা চিরদিন উপরে থাকে না, যেটা নিম্নে সেটা নিম্নেও থাকে না আর কাল কাহারও সুপারিশ শোনে না, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দলাদলি, ভেদাভেদের ধার ধারে না। ভরসা এই যে কাল কাহার খাতির রাখে না। যাহা কালক্রমে উদয় হয়, কালেই তাহা লয় পায়। এই যে স্থিতিশীল দলের মর্ম্ম বিদারণ করিয়া পুরাতন সমাজটি, কাহার চক্ষে নূতন এবং কাহার মতে উচ্ছৃঙ্খল পথ ধরিয়া চলিয়াছে, আহারশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, শোণিতশুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইয়া, (সংখ্যায় অত্যল্পাত্রে বিরল দৃষ্টান্ত হইলেও) উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের কণ্ঠালিঙ্গন করিতেছে;

ব্রাহ্মণ সমাজ, ক্ষত্রিয় সমাজ, বৈশ্য সমাজ এবং বিবিধ শ্রেণীর শূদ্রগণের বিভিন্ন সমাজ আত্মোন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সেই প্রবল পরিচালক কালেরই প্রভাব জনিত বুঝিতে হইবে। কালের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ঐরূপ হইতেছে। ইহার ফলে এই হইবে যে পুরাতন আর ফিরিয়া আসিবে না অথচ নূতনকে ভাঙ্গিয়া পুরাতন করিয়া কেহ গড়িতেও পারিবেন না। ব্রাহ্মণ সমাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জগতে যে সকল সমাজ গঠিত হইতেছে সেই সকল সমাজের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়া প্রতিকূলের প্রতিকার করিয়া অগ্রসর হইতেছেন কি ? অথবা অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন ? যাহারা তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া রাখিবেন, তাহারা যদি তাঁহাদের হাত ধরিয়া চলিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়া সেই উদ্দেশ্যপথেই অগ্রসর হইতে থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্বে তাহাদের প্রতিষ্ঠাস্থান প্রস্তুত না হইয়া পরস্পরের সংঘর্ষক্ষেত্র অর্থাৎ জাতীয় প্রভাসে পরিণত হইবে। আর সংঘর্ষে কাজ নাই। এখন প্রেমেই বশ করিতে হইবে, এখন প্রধানকেই অনেক বিষয়ে ছাড় দিতে হইবে। চরিত্রবলে, মহত্বে, ধর্ম্মবলে, পাণ্ডিত্যে অভিভূত মুগ্ধ করিয়া সকলকে একস্থানে টানিয়া লইতে হইবে এবং এই কার্য্য বর্ণনির্ব্বিশেষেই হইবে। তখনও যে নিয়মে হইত আজও সেই নিয়মে হইবে। কেবল বক্তৃতার জোরে হইবে না, অভিশাপের ভয়ে হইবে না, যুদ্ধের জোরে হইবে না মোহমুদ্গরের আঘাতেও হইবে না, কাল তাহা ঘটাইবে, কারণ গতিশীলও যে কালের হস্তে পুত্তলিকাবৎ নৃত্য করিতেছেন, স্থিতিশীলকেও সেই কালে ধরিয়া আছে। কালের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ কেহ করিতে পারিবে না। তাহার গতি রোধ করাও কাহারও সাধ্য নহে। সংস্কারক কালের সহায়তা করিতে পারেন এইমাত্র ; কিন্তু এখানেও ভুলিলে চলিবে না যে, কালই তাঁহাকে স্বীয় সহায়করূপে গঠন করিয়া লইয়াছে। সুতরাং এখন কালেরই প্রতীক্ষা !

ক্রমশ

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

অভ্যর্থনা সভা—কুশদহর অন্তর্গত গৈপুর গ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু B. SC. (Lond) F. G.S. মহাশয় বহুদিবস পরে দেশে আগমন করিতেছেন শুনিয়া, গৈপুর গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্রমণ্ডলী সমবেতভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গত ৬ই বৈশাখ বুধবার অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল আপিসে এক মহতী সভার আয়োজন করেন। বসু মহাশয় কলিকাতা হইতে বেলা ৩টার সময় গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে গোবরডাঙ্গার সুবিখ্যাত জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এবং বসু মহাশয়ের ভ্রাতৃগণ ও কয়েকটি আত্মীয় এবং ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া প্রথমে জমিদার-ভবনে লইয়া যান।



তরুণ বয়সের ফোটো হইতে

তৎপরে প্রায় ৫টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গিরিজাপ্রসন্নবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে ঐক্যতানবাদন ও সঙ্গীত হয়। তৎপরে আশীর্ব্বচন এবং অভিনন্দনপত্র পাঠ ও প্রদান করা হয়। তৎপরে কবিরাজ কৃষ্ণনাথ ভিষকাচার্য্য, বাবু জ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাবু সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী-সম্পাদক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও কুশদহ-

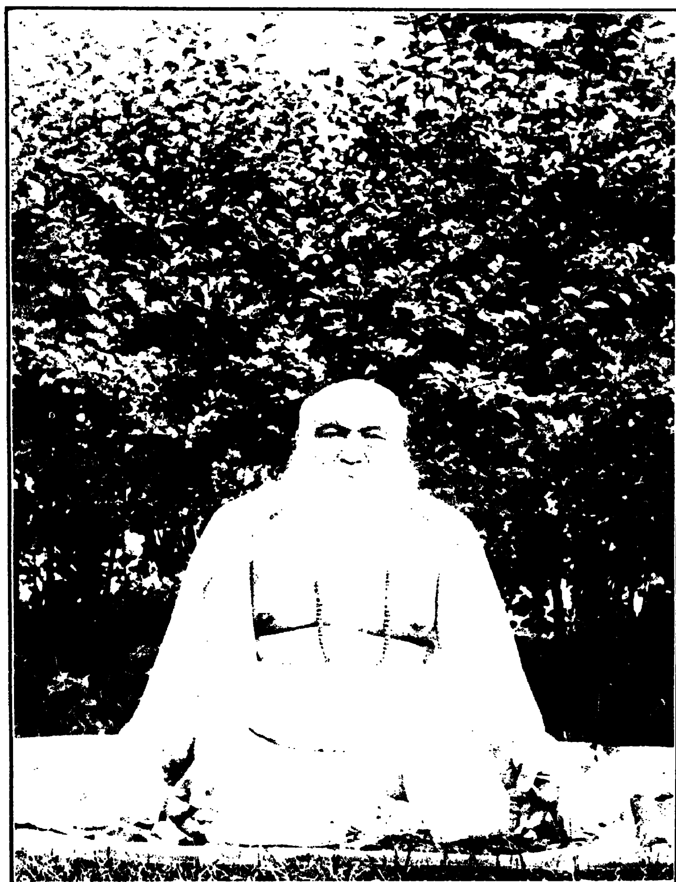
সম্পাদক বক্তৃতা করেন। এবং বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ একটি সুললিত কবিতা পাঠ করেন।

এই অভ্যর্থনা সভা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে। সমবেত-ভাবে আমারা বসু মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের বহুদিনের একটি অপূর্ণ অবশ্যকর্ত্তব্য পূর্ণ করিতে পারিলাম। তজ্জন্য এই সভার প্রধান উদ্‌যোগী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে আমরা সর্ব্বাগ্রে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আর এই সভা সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসের কথা যাহা তাহাও সরলভাবে প্রকাশ করিতেছি, আশা করি মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং দেশবাসী ভদ্রমহোদয়গণ তাহা সদ্ভাবেই গ্রহণ করিবেন।

প্রায় সমস্ত বক্তারই বক্তৃতার মূলে এই কথাই পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইয়াছিল—"বসু মহাশয় কৃতবিদ্য জগৎবিখ্যাত। পণ্ডিত ব্যক্তি এবং রাজসরকারে পদস্থ সম্মানিত; আমরা তাঁহার নিকট দেশের জন্য অনেক আশা করি," ইত্যাদি।

বসু মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার যদি কেবল এই উদ্দেশ্য হয় যে, আমরা তাঁহার দ্বারা দেশের কিছু কাজ করাইয়া লইব, তবে বলিব, আমরা তাঁহাকে খাঁটিভাবে সমাদর করি নাই। উহা কেবল বাহিরের একটি ক্ষণিক ভাবপ্রকাশ মাত্র। আর যদি এই হয় যে, আমরা তাঁহাকে ভালবাসা দ্বারা দেশের প্রতি তাঁহার আর একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র, তবে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা টুকুই হইবে আসল জিনিষ। কিন্তু আসল ভালবাসার লক্ষণ কি? কেবল কি নামরূপের প্রতি কতকগুলি সুললিত বাক্য প্রয়োগ? না ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা? ব্যক্তিত্বের পরিচয়ত স্বভাব-চরিত্রে? আসল মানুষটিকে যথার্থ ভালবাসিলে তিনি যাহা ভালবাসেন তাহার প্রতি ভালবাসা না হইয়া পারে না। অনেকে হয় তো বলিবেন এ কথার অর্থ কি? বসু মহাশয়কে আমরা আদর অভ্যর্থনা করিয়াছি বলিয়া কি তাঁহার ভাব এবং আচার অনুষ্ঠানেরও অনুসরণ করিতে হইবে? আমরা সেই কথাটিই বেশি জোর দিয়া বলিতে চাই। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার 'চরিত্রে' যদি শ্রদ্ধা না থাকে, চরিত্রবানকে 'চরিত্র' হইতে—পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য হইতে—সাধুকে সৎ হইতে পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে গেলে ভালবাসা সার্থক হয় না। সে ঐ একটা বাহ্যিক কোনো বিষয় মাত্র।

আমরা এ কথা বলিবার, আর একটি কারণ, সভা-অন্তে আমরা এইরূপ সমালোচনার কথাও কাহারো কাহারো মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সভাটি ঠিক খাঁটি ভাবের হয় নাই। সভায় যতদুর সদ্ভাব দেখানো হইয়াছে, সকলের



পরলোকগত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আন্তরিক ভাব ঠিক ততদূর নয় কিন্তু আমরা মনে করি ঐরূপ বৈধভাব যদি কাহারো থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু অধিকাংশের ভাব সেরূপ নহে। যাহা তাঁহারা করিয়াছেন, তাহা সরলভাবেই করিয়াছেন।

আর প্রধান কথা এই যে, আজ আমরা আমাদের দেশের একজন মনস্বী জ্ঞানী, বিদ্বান, উদারচরিত—বিশেষত বর্ত্তমান সময়োপযোগী, ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে যিনি সংস্কার-প্রয়াসী—কার্য্যত যিনি অগ্রসর, আমাদের এমন আপনার জনকে আজ সমবেতভাবে আমরা যে সাদরে গ্রহণ করিলাম, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

পরলোকগত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—আজ আমরা বাস্তবিক বড় বেদনাযুক্তপ্রাণে প্রকাশ করিতেছি যে, 'খাঁটুরা-নিবাসী' উত্তর-পশ্চিম প্রবাসে প্রায় আজীবন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ৪ঠা বৈশাখ সোমবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার দেরাদুন-প্রবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্নী অবিদ্যমানে পুত্র-কন্যাগণ বর্ত্তমান রাখিয়া অন্যূন আশীতিবর্ষ বয়সে অক্লিষ্ট দেহে, স্বাভাবিকভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা একপক্ষে দুঃখের কথা নহে, কিন্তু তিনি সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামের প্রাক্কাল হইতে এত বয়স পর্য্যন্ত, সযত্নে-পালিত স্বাস্থ্যনীতি রক্ষা করিয়া সুস্থ শরীরে প্রসন্নচিত্তে আজো যেভাবে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা আমাদের বিবিধ ব্যাধিক্লিষ্ট অপ্রসন্নমনা দেশবাসীর সমক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ বিশেষ। এবং আমরা যখনই তাঁহার বিষয়ে ভাবিতাম তখনই একটি সুস্থ শরীরের একখানি ছবি, ফটোর মত আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া, একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করিত, সুতরাং আজ সেই আনন্দরূপের তিরোধানে আমরা সত্যই একটা বেদনা অনুভব করিতেছি।

আমরা এতক্ষণ কাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছি তাহা হয় তো কুশদহ-বাসী অনেকেই কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। কেন না তাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কখনো সন্দর্শনও করেন নাই, তাঁহার নাম পর্য্যন্তও হয় তো অনেকে শুনেন নাই। সত্যই তিনি যেপ্রকার দীর্ঘপ্রবাসী, তাহাতে অনেকের পক্ষে তাঁহাকে না জানাই সম্ভব। কিন্তু তিনি আমাদের দেশের—আমাদেরই একজন। তাই আজ আমরা তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা বলা আরো প্রয়োজন এবং কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি।

খাঁটুরা গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা ৺প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। খাঁটুরার ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে কাহারো কাহারো তিনি গুরু ছিলেন।

সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৈতৃক গুরু-পুরোহিত-বৃত্তি ছাড়িয়া মিসনরী ইস্কুলে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তরুণ বয়সেই পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। তখন ও-প্রদেশে সকলবিভাগেই কাজ-কর্ম্মের পথ সুগম ছিল। যে সকল প্রবাসী বাঙালী কর্ম্মদক্ষতায় যশস্বী হইয়াছিলেন, অথবা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

তিনি প্রথমে সামান্য অবস্থা হইতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ক্রমশ উচ্চ পদে উন্নীত হইয়া স্থানপরিবর্ত্তনসহকারে শেষে লাহোর সুপারিণ্টেণ্ডিং আপিসে ২৫০৲ টাকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ৩৫ বৎসর কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ২২ বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ১২৫৲ টাকা পেন্‌সন ভোগ করিয়াছিলেন।

ইহা তাঁহার বিষয়-কর্ম্মের কথা। তারপর তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা, সে এক বিচিত্র বিবরণ। যদিও তাঁহার ধর্ম্মমত পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,—সে সম্বন্ধে এখন আর আমরা সমালোচনাও করিতে চাই না—তথাপি তাঁহাতে যে একটা ধর্ম্মভাব চিরদিন জাগ্রত ছিল এবং সে-ভাবের মধ্যে যে একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা আমরা বরাবর অনুভব করিয়াছি; যাহাহউক সে সম্বন্ধে আমরা আর স্বতন্ত্র কিছু না বলিয়া সুবিখ্যাত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বহু অনুসন্ধানলব্ধ মন্তব্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই আমাদের কুশদহবাসিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশবাসী একজন দীর্ঘপ্রবাসে থাকিয়া কি করিয়াছেন।

"১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া দিল্লী, আম্বালা, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন, এবং পরে ফিরোজপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করিয়া ১৮৬২ সালে লাহোরে বদলী হন। এই বৎসরে তাঁহার বাটীতে "লাহোর ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদাবাবু তাহার আচার্য্য হন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি পঞ্চনদবাসীর যে ঘোর বিদ্বেষ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল, * * * এক্ষণে বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহা বহুল পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। স্থানীয় অনেক বাঙালী ও পাঞ্জাবী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সারদাবাবুর সম্পাদকতায় এবং পণ্ডিত ভানুদত্ত

বসন্তরাম প্রমুখ বর্দ্ধিষ্ণু পাঞ্জাবিগণের সহায়তায় বাঙালী বালকদিগের জন্য বাংলা ও ইংরাজী নাইট-ইস্কুল এবং পাঞ্জাবীদিগের জন্য "সৎসভা" প্রতিষ্ঠিত হইল। সারদাবাবু গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মোপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। তিনি এদঞ্চলে প্রধান প্রধান কি কি কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহার আভাস মাত্র প্রদত্ত হইল।

সারদাবাবু কাংড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ ওয়াজীর আলীখান ও সর্দ্দার আমীন চাঁদ বাহাদুরের সহায়তায় কাংড়ার আঞ্জুমান সভা স্থাপন করিয়াছেন। জলন্ধরে রেভারেণ্ড গোলকনাথের সহায়তায় একটি সাধারণ পাঠাগার ও বক্তৃতা সভা স্থাপন করিয়াছেন। শিমলা শৈলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও কাশ্মীরের মহারাজার অর্থ-সাহায্যে সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজা, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য হন। সারদাবাবু হাজরা জেলার এবটাবাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে "হাজরা আঞ্জুমান" সভা স্থাপন করেন। কমিশনার বাহাদুর, ফ্রন্টিয়ার কমাণ্ডার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। এই "হাজরা আঞ্জুমান" হিন্দু মুসলমান, এবং ইংরাজদিগের মধ্যে সখ্যস্থাপনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সারদাবাবু হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া "হাজরা আঞ্জুমান" স্থাপন কেন করিলেন, তাহা বলিতেছি। পাঞ্জাবের এই সীমান্ত-প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায় অতি প্রবল। এখানে অনেক কাবুলীর বাস। কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর বোখারার প্রিন্স, অম্বের নবাব, গক্করাজ, হাজারার রইস কাজী মীরমালম, খানপুরের রাজা ফিরোজ খাঁ এবং সেখ আলি গৌহর প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত হিন্দু খৃষ্টানের সদ্ভাব স্থাপিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের (এখানে ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও "জ্ঞানসমাজ" "আর্য্য সমাজ" ইহারই ফল) প্রচার হইবে না এবং বাঙালী অথবা অন্যান্য হিন্দুর বাস নিরাপদ ও সুখের হইবে না, এই ভাবিয়া সারদাবাবু তথায় "আঞ্জুমান" প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সকল প্রধান ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এই সভা সীমান্তপ্রদেশের গোঁয়ার আফগান এবং অশিক্ষিত দুর্দ্দান্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, উন্নতি ও সদ্ভাবের বীজ রোপণ করিয়াছে। ইনি যখন ১৮৮৬ সালে এবটাবাদ হইতে লাহোর যাত্রা করেন, তখন স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকগণ সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করেন এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন—

"* * * This station advanced from many others in the Panjab and all this is the result of Babu Saheb's untiring energy. * * * we may call him the founder of the Anjuman, our first instructor, kind adviser and in the short, life and soul of all this progress."

এই সভায় সারদাবাবুর একখানি চিত্র রক্ষিত হইতেছে। ইহার সম্বন্ধে

একটি কথা এখনও বলা হয় নাই। ইনি সিদ্ধাবতীতে কোন সাধুর সংস্রবে আসিয়া (তাহার পর হইতে) সনাতন ধর্ম্ম বা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রচারে দেহমন নিয়োগ করেন। "শিমলা সনাতন ধর্ম্মসভা" তাহারই ফল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে প্রথম আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদাবাবু তাহার সহকারী সভাপতি হন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেই আর্য্যসমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই এই পরিবর্ত্তনের মূল। (বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দয়ানন্দ-চরিত,—পৃঃ-৪৭-৪৮, ২য় ভাগ, দ্রষ্টব্য) পরে ইনি "Indo-Aryan Independent mission" অর্থাৎ "স্বাধীন আর্য্য মিশন" খুলিয়া ভারতীয় পরিব্রাজকের দল গঠিত করেন। তাহার ফলস্বরূপ "অমরনাথ হাজরা" "প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।"

তা'পর তাঁহার স্বাস্থ্যনীতির কথা আরো একটু উল্লেখ করিব। তিনি চিরদিন অতিশয় সতর্কতার সহিত যত্নপূর্ব্বক শারীরিক নিয়মপালন করিতেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহাকে উচ্চ ইউরোপীয়ানের ন্যায় মনে হইত। সেই প্রাতরুত্থান হইতে স্নান, আহার, ভ্রমণ, বিশ্রাম, লিখন, পঠন,—দৈনিক সাধন-ভজন পর্য্যন্ত সমস্তই যেন তাঁহার ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটার মত ছিল। কোনো দিন কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না। তাহার ফলে অশীতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ স্বাভাবিক সুস্থ ছিল।

এইবার শেষ কথা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের লোক। তিনি বিদেশে আপনার জীবনকাল যাপন করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যদি তিনি দেশে থাকিয়া ঐরূপভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে তাহার ফল কিরূপ হইত, তাহা আর বলিতে হইবে কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার এক সহোদরা খাঁটুরা-নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র (হড়) চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী। শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর, বীরেশ্বর, তারকেশ্বর প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি ভাগিনেয় আছেন। আর তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ, কলিকাতা ১৫ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার এক জামাতা গোবরডাঙ্গা স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—অল্পদিন পরলোকগত হইয়াছেন। আর তিন কন্যা ও জামাতাগণ এবং কয়েকটি দৌহিত্র দৌহিত্রী আছেন। এখন ভগবানের কৃপায় পরলোকস্থ আত্মা সদগতি এবং তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের কামনা।

এবারে বিবরণ অধিক সংগ্রহ না হওয়ায়, কুশদহ-পঞ্জি বাহির হইল না; আগামী সংখ্যা হইতে বাহির হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায়।

অষ্টম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সঙ্গীত

মল্লার —যৎ

দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়
চাহি না সম্পদ সুখ ওহে হরি দয়াময়।
সকল সন্তাপহারী, তুমি পিপাসার বারি,
হেরিলে তোমার মুখ সব দুঃখ দূরে যায়।
তোমার প্রেমের লাগি, শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন যোগী,
উদাসীন সর্ব্বত্যাগী ত্যজিয়ে দুখিনী মায়—
করিলে তাঁরে ভিখারী, দণ্ডধারী বনচারী,
শুনিলে সেসব কথা গলে পাষাণ হৃদয়।
তব পবিত্র সন্তান, প্রিয় যিশু গুণধাম,
ক্রুশে হারাইলেন প্রাণ পরহিত কামনায়,—
ভ্রমিলেন পথে পথে, পতিত জনে তারিতে,
যাহার শোণিতপাতে হইল প্রেমের জয়।
যখন যেভাবে যেখানে, রাখ এ দীন সন্তানে,
থাকি নির্ব্বিকার মনে এই মিনতি তব পায়,
বিপদে মঙ্গল দেখি, দুঃখেতে হইব সুখী,
দয়াময় নাম গানে যেন প্রাণ অন্ত হয়।

(ব্রহ্ম-সঙ্গীত।)

পদার্থ ও শক্তি এবং মানবজীবনের কর্ত্তব্য *

বিশ্বের সূক্ষ্মতম অণু হইতে অতি বিশালায়তন সূর্য্য পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্ট পদার্থই ক্রিয়াশীল। স্থূলদৃষ্টিতে যাহা নিষ্ক্রিয় দেখিতে পাই তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রিয়াহীন নহে। পদার্থনিচয়ের উপাদান, আকার, গঠন, গুণ, আপেক্ষিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর ক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা প্রকাশ পায়; এবং শক্তির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের উপর অনেক পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও রূপান্তর নির্ভর করে। শক্তি পদার্থরূপ আধারাশ্রয় করিয়া ক্রিয়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকে; এবং সেই ক্রিয়ার ফল অনেক স্থলে নূতন জাতীয় পদার্থের জন্ম সূচনা করে।

আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদ্রবারি প্রতিনিয়ত অংশুমালীর উত্তপ্ত কিরণে বাষ্পে পরিণত হইয়া সুদূর ব্যোমমণ্ডলে উত্থিত হইয়া নীরদাকারে সমীরণভরে দূর-দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শৈত্যসংস্পর্শে বারিধারারূপে মেদিনী-বক্ষে পতিত হয় এবং বেগবতী স্রোতস্বিনীরূপে উন্মাদিনীর মতো কলগান করিতে করিতে, আবার সেই সরিৎপতির উদ্দেশে ধাবিত হইয়া তাহাতে মিশিয়া যায়। সাগরের ক্রোড় হইতে উদ্বর্ত্তন ও তথায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সেই জল, কতশত দেশ প্লাবিত করিয়া কতশত প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনপোষণ করিয়া আইসে।

উল্লিখিত উদাহরণে বুঝা যায় যে, সূর্য্যের তাপশক্তি জলরূপ আধারকে বাষ্পে পরিণত করাতে, উহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে প্রতিহত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়, এবং তৎপরে বায়ুর প্রবাহিকাশক্তিপ্রভাবে বহুদূরে নীত হইলে শৈত্যশক্তিসংযোগে, সূক্ষ্মজলকণায় পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া মেদিনীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির বলে ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিধারারূপে পতিত হয় এবং নিম্নাভিমুখী হইয়া নিম্নতম সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়। এইরূপে অবস্থাভেদে একই বস্তুর অথবা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক শক্তিকে কার্য্য করিতে দেখা যায়।

পদার্থ-মধ্যে শক্তির ক্রিয়া অতি জটিল রহস্যে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অনেক স্থলে, শক্তিবিশেষের প্রয়োগে পদার্থের আণবিক বা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—বিদ্যুৎসংযোগে উদজান ও অম্লজান বাষ্পের জলরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ধরা যাইতে পারে। শৈত্যযোগে জল তুষারাকার ধারণ করিলে তাহার অনুপুঞ্জ (moleculcs) ষষ্ঠভুজ (Hexagon) হইয়া যায়।

* কাশী সারস্বত সম্মিলনীতে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য ও বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, বিশ্বে প্রকাশ্যভাবে দুই জাতীয় বস্তুর মধ্যে একত্রে অন্যোন্য-সাপেক্ষভাবে প্রতিনিয়তই কার্য্য চলিতেছে। সেই দুইটি বস্তুর মধ্যে একটির নাম পদার্থ, অপরটির নাম শক্তি। শক্তি না থাকিলে পদার্থের কোনোরূপ প্রকাশ বা বিকাশ হইত না, পদার্থের আকার গঠনাদি হইত না, এবং পদার্থের আকার ও অবয়বাদির পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইত না। অপরদিকে আবার পদার্থই শক্তির অস্তিত্বের পরিচায়ক ; পদার্থ না থাকিলে শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত না। অবশ্য পদার্থ ও শক্তি বলিতে গেলে বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

রাসায়নিক একই পদার্থ একাধিকরূপে বিদ্যমান থাকিলেও রূপ-পার্থক্য হেতু বিভিন্ন শক্তির অধীন থাকায় বিভিন্ন গুণের পরিচয় দিয়া থাকে। অতি উজ্জ্বল নয়নাভিরাম স্বচ্ছ হীরক ও কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার,—ইহারা উভয়েই রাসায়নিক একই উপাদানে গঠিত ; উভয়ই দগ্ধ হইলে, অম্লজান-অঙ্গারক বাষ্প (carbon dioxide gas) হইয়া যায় বটে, কিন্তু আলোকশক্তি হীরকের মধ্য দিয়া কিরূপ অবাধে সুন্দরভাবে গতাবিধি করে, অথচ অঙ্গারের কৃষ্ণদেহ ভেদ করিতে পারে না। হীরকের ভিতরে আলোক-শক্তির তরল ক্রীড়া দেখিলে তাহাকে অতি কোমল বলিয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে ; কিন্তু উহা এতই কঠিন যে, উহা দ্বারা ইস্পাতেরও অভেদ্য কাচকেও কর্ত্তিত করা যায়। আণবিক আকর্ষণশক্তির প্রভাবে হীরকের অণুসমষ্টি অতিদৃঢ় ও একরূপ বিশেষভাবে সন্নিবেশিত ও আকৃষ্ট থাকায় উহার আলোকপ্রবহনীয়ত্ব ও কাঠিন্যগুণ জন্মিয়াছে। অঙ্গার-মধ্যে উক্ত শক্তির প্রভাব, অন্যান্য শক্তির সমসাময়িক প্রয়োগ বশত কথঞ্চিৎ শ্লথভাবে কার্য্য করায় উহা আলোকের প্রতিবন্ধক ও হীরকাপেক্ষা কোমলতর হইয়াছে।

বিশ্বসংসারে প্রকৃতিদেবী অনন্ত পদার্থরূপে এবং অনন্তশক্তিরূপে সতত ক্রিয়াশীল। এক একটি শক্তি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর শক্তির আবির্ভাব হইতেছে এবং সেইসকল শক্তিই স্ব স্ব পদার্থরূপ ক্ষেত্রে নিয়তই কার্য্য করিতেছে। কোথাও বা একজাতীয় পদার্থের সহিত অন্যজাতীয় শক্তির সংঘর্ষ ঘটায় পদার্থের এবং শক্তিরও রূপান্তর হইতেছে, আবার কোথাও বা কোনো বিশিষ্ট জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া একাধিক জাতীয় শক্তি মিলিত হইয়া এক অভিনবশক্তির উৎপত্তি সাধন করিতেছে। এইরূপে

শক্তি ও পদার্থের অনন্ত রহস্যময়ী ক্রীড়া অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তরূপে চলিতেছে। কিন্তু এই অনন্তরূপিণী প্রকৃতিদেবীর অনন্ত পদার্থশক্তিরূপ ক্রীড়া, বুদ্ধিহীন আকস্মিক উত্তেজনা-প্রণোদিত নহে। প্রত্যেক শক্তির মূলে ও অন্তরালে এক একটি জ্ঞানময় অপরিবর্ত্তনীয় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই, এবং সেই শক্তির প্রয়োগপ্রণালী ও প্রয়োগফল ভূয়োদর্শন দ্বারা অন্তরে ধারণা করিতে পারিলেই প্রকৃতিদেবী আমাদের নিকট সেই তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। এবম্প্রকারে বিভিন্ন পদার্থ-মধ্যে এক একটি শক্তির ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তাহার মূল উদ্দেশ্য, ভূয়োদর্শন ও বিচার-সাহায্যে আয়ত্ত করিতে পারিলে আমরা ক্রমশ খণ্ডশক্তিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তর শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হই। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অতিমাত্র ধীরতা ও বিচারসহ কঠোর সাধনার একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বে সকলের মধ্যেই শক্তি; সময়ে সময়ে স্থূল দৃষ্টিতে যদিও কোথাও কোথাও বিরুদ্ধভাব দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ কোনো প্রতিকূলতা নাই। প্রত্যেক শক্তির আদিভূত প্রত্যেক উদ্দেশ্যের পশ্চাতে বিশ্বের মূল উন্নতি ও হিতকর মহান্ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া সমুদয় শক্তি ও পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেসকল মহাত্মা এই মূল উদ্দেশ্যের আভাস পাইয়া তাহা জানিবার জন্য একাগ্রমনে তৎসাধনায় রত হইয়া সিদ্ধিলাভ করত হৃদায় পবিত্র চিদাকাশে তাহার নির্ম্মলোজ্জ্বল জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পান, তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃতি-দেবীর কিছুই অদেয় থাকে না। প্রকৃতিদেবী তাঁহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার সেই মহাপুরুষদিগের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন। তখন সেই মহাত্মাগণ প্রকৃতির মহদুদ্দেশ্য-চালিত হইয়া জগতের মঙ্গলসাধনে সোল্লাসে প্রবৃত্ত হন।

উপরে যেসকল কথার অবতারণা করা হইল তাহা বিশদভাবে বুঝিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটি উদাহরণের আশ্রয় লইব : অনেকে ইহা অবগত আছেন যে, উত্তাপশক্তিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিদ্যুৎশক্তির উৎপত্তি করা যাইতে পারে। উত্তাপশক্তি জলের নিকট প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি জলের মধ্যে অবাধে যাইতে পারে। দুইটি বিভিন্ন ধাতু এ্যাসিড-(acid) মধ্যে স্থাপিত করিলে এই তিনের সংস্পর্শে বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হয়। এই তাড়িৎ-শক্তির লৌহকে আকর্ষণ করিবার চৌম্বিকশক্তি থাকে না। কিন্তু ইহাকে

ধাতুময় তারের বেষ্টনী (coil) দিয়া প্রবাহিত কারিলে চৌম্বকশক্তির উদয় হয়। চিনির উপর গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এইরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত সত্য প্রমাণিত হইবে।

পদার্থ ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ অনন্ত হইলেও, তদ্বিষয়ক কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। পদার্থের উপর প্রত্যেক শক্তির এক একটি বিশেষভাবে কার্য্য কারিবার উপযোগিতা থাকিলেও, অনেকস্থলে সেই বিশেষ কার্য্য লক্ষিত হয় না। তাহার কারণ এই যে, পদার্থ যতই জটিল আকার ধারণ করে, ততই তন্মধ্যে অনেক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্পন্ন শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। একই স্থানে একই বস্তুর উপর বিভিন্ন গুণাক্রান্ত বিশিষ্ট শক্তি-নিচয়ের যুগপৎ ক্রিয়া হইতে থাকায় একটি বিশিষ্ট নূতন শক্তি-সমবায়ের উৎপত্তি হয়। সেই বিশিষ্ট নূতন শক্তির পরিচয় ও লক্ষণ নূতন প্রকারের হয়। কিন্তু যেখানেই পূর্ব্বকথিত শক্তির একত্র সমাবেশ হয়, সেইখানেই শেষোক্ত বিশিষ্ট অভিনব শক্তির অভ্যুদয় হইবেই হইবে। নিয়মের এই প্রকার স্থিরতা আছে বলিয়াই বিজ্ঞানের স্থান হইয়াছে। পদার্থ অদ্য একরকম আকারযুক্ত রহিয়াছে, কল্য অন্যরকম হইতে পারে; অদ্য তাহা একটি শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়াক্ষেত্র আছে, কল্য তাহা অন্য শক্তিনিচয়ের রঙ্গভূমি হইতে পারে। কিন্তু যেসকল নিয়মের বশে উহার মধ্যে শক্তির খেলা চলিতেছে, তৎসমুদয়ই সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

পুরাকালে পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন এবং বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য মনীষীগণ পুনঃ পুনঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাবৎ পদার্থের আদি সূক্ষ্ম উপাদান একই ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিল; কিন্তু তন্মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত শক্তিপ্রবাহ চলিতে থাকায় কালবশে, পদার্থ ও শক্তির পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষের ফলস্বরূপ নিত্য নূতন নূতন জটিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। শক্তির ক্রিয়া-বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া পদার্থ-সকলকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইসমস্ত শ্রেণী-বিভাগ অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল।

আমাদের জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই পদার্থ ও শক্তির আশ্চর্য্য বিষয় আমরা ক্রমশ বেশি-বেশি জানিতে পারিতেছি। বিজ্ঞান আমাদের বর্দ্ধমান জ্ঞানের মানদণ্ড-স্বরূপ। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি

কোনো বিষয় ঘৃণা করেন না; কাহারো মত উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত অলীক বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন না; অথচ স্বয়ং প্রমাণ না করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। নিয়ম-সম্বন্ধে কোনো মত সত্য কিনা তাহা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ধীরতা সহিষ্ণুতা শ্রমশীলতা বিচক্ষণতা ও বিচার-বুদ্ধিমত্তা-সহকারে অনুসন্ধানে রত হন। প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা বিশ্বরাজ্যে একটি প্রবল শক্তি। এই শক্তির সহায়তায় যথার্থ জ্ঞানার্থীর সম্মুখে নিয়ম-বিধির মূলতত্ত্বের গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। জ্ঞান লাভ করিবার পথে প্রকৃত জ্ঞানার্থীকে অনেক দুঃখ কষ্ট যাতনা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। তিনি সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়-বলে স্বীয় লক্ষ্য-পথে চালিতে থাকেন; এবং যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধকাম হইতে পারেন সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ভগ্নোদ্যম বা বিরত হন না। যখন সামান্য অর্থলাভ করিবার উপযোগী বিদ্যার্থী কতই না ক্লেশ সহ্য করিতেছে, তখন অনন্ত জ্ঞানের প্রার্থী যে তদপেক্ষা শতসহস্র গুণ কষ্ট সহ্য করিবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি? জ্ঞানই প্রকৃত বল।

জীবন অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত। অনন্ত অনন্তকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য অনন্ত-কাল ধরিয়া আকুলভাবে ছুটিয়াছে। এই অবিরাম গতির পরিচ্ছেদ নাই। এই গতির ফলে কত অমূল্য রত্নরাজি জ্ঞান-জলধির অনন্ত গর্ভ হইতে প্রতিনিয়ত উত্থিত হইয়া মানবজীবনকে ধন্য করিতেছে।

পিপাসা না থাকিলে জলপান করিবার চেষ্টা আসে না। পিপাসার অর্থ পান করিবার ইচ্ছা। জল পান না করিলে রস ও রক্তের জলীয়াংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য শরীররক্ষার্থ পিপাসার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের প্রাণশক্তি, জীবদেহমধ্যে পিপাসা ও তাহা দূরীকরণ-চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবদেহ রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞান-পিপাসা না থাকিলে আমাদের বুদ্ধি ও মন প্রশস্ত ও উন্নত হয় না। সেজন্য জগদীশ্বর আমাদিগের মধ্যে উক্ত পিপাসা দিয়াছেন। জ্ঞান-পিপাসার উত্তেজনায় আমরা পদার্থ ও শক্তিঘটিত বিভিন্ন ও বিচিত্র তত্ত্বের আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। এইরূপ আলোচনা করিতে যুক্তিসঙ্গত বিচারের প্রয়োজন। আমরা যতই মনোযোগ-সহকারে পদার্থ ও শক্তির সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ করি, ততই তাহাদিগের মধ্যে নূতন নূতন সম্বন্ধ জানিতে পারি। এই প্রকার নূতন নূতন সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান মানসিক ধারণা বা সংস্কাররূপে আমাদের চিত্তফলকে অঙ্কিত হইয়া যায়। এক জাতীয় পদার্থ ও শক্তি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া অপর

জাতীয় পদার্থ ও শক্তি-বিষয়ক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার সময় প্রথমোক্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণা বা সংস্কার চিত্ত হইতে আপনি ফুটিয়া উঠে। এবং আমরা বিচারবলে উভয় তত্ত্বের সমত্ব বা পার্থক্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নূতন ধারণা প্রাপ্ত হই। এইরূপে নূতন নূতন পদার্থ ও শক্তি-সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হই। ইহাতে আমাদিগের অনেক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। শুধু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ পদার্থমাত্রেই বা পদার্থের সমস্ত অংশই ইন্দ্রিয়বোধ্য নহে। যাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধ্য তাহাই ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জানা যাইতে পারে। বিশ্বসংসারে যে-কোনো পদার্থই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু আছে। অতি স্থূলপদার্থ, যথা হীরকখণ্ড; ইহার মধ্যে স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বর্ত্তমান আছে; কারণ সংযোগশক্তি আদি (force of cohesion) শক্তিনিচয়ের সমবায়, উহার অণুসকলকে হীরকাকারে ধরিয়া রাখিয়াছে। উহার অণুগুলিও অঙ্গার (carbon) প্রভৃতি কতকগুলি মূল উপাদানের (elemant) রাসায়নিক সম্মিলনের ফল; আবার উক্ত অঙ্গার (carbon) প্রভৃতিও তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর মূল উপাদানের (electrons) এর উপর সূক্ষ্মতর শক্তির ক্রিয়ার ফল। এই প্রকারে স্থূল ইন্দ্রিয়বোধ্য পদার্থের মূলে পদার্থশক্তির কার্য্য-কারণ-রূপ শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়বোধ্য বলি, সেরূপ পদার্থ-সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানলাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ববিষয়ও জানিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশ জানা সম্ভবপর হইলেও তৎসাহায্যে ইন্দ্রিয়াতীতাংশ অবগত হওয়া অসম্ভব। কারণ, স্থূল সূক্ষ্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

এমতে দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বসংসারে শক্তি ও পদার্থ নামক দুইটি বস্তুরই ক্রীড়া লক্ষিত হইয়া থাকে। তৃতীয় বস্তু নাই। পদার্থ-মধ্যে কতকগুলি জড় এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম। তদনুসারে শক্তিও কতকগুলি জড় এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম। প্রকৃতপ্রস্তাবে শক্তি জড় নয়, জড়ের মধ্যে ক্রিয়া করে বলিয়া শক্তিকে জড় বলিয়া সুবিধাজনক আখ্যা দেওয়া হয় মাত্র। ভাষার দীনতা-নিবন্ধন এইরূপ নামকরণ করা হয়। জড় পদার্থের মধ্যেও জড়ত্ব বিভিন্ন পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন—বরফ, জল ও বাষ্প। এই তিনই মূলত জল, কিন্তু উত্তাপ-শক্তির অভাব ও সদ্ভাবের জন্য

একই পদার্থের বিভিন্ন গুণযুক্ত অবস্থা ঘটে। এই তিনটিই জড় পদার্থ হইলেও বরফ প্রস্তরবৎ কঠিন, যেখানেই রাখা যায় সেইখানেই থাকে। জল তদপেক্ষা কোমল—সতত নিম্নগামী, বাষ্প অতি কোমল, লঘু ও উর্দ্ধগমনশীল। এই তিনটি আকারে তিনটি স্বতন্ত্র ও নূতন শক্তির ক্রিয়ারও অভ্যুদয় হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, জল বাষ্পাপেক্ষা জড়তর এবং বরফ তদপেক্ষা জড়তর। ঐরূপ শক্তিও সূক্ষ্মত্ব হিসাবে বিভিন্নাবস্থায় ক্রিয়া করে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, একটি লোষ্ট্রখণ্ড কাহারো প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; ইহাতে লোষ্ট্রটির উপর যে-শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা লোষ্ট্রের ন্যায় কঠিন জড় পদার্থকে চালিত করিবার উপযোগী; সুতরাং জড়। উহা ছুঁড়িবার পূর্ব্বে ছুঁড়িবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই সঙ্কল্প আপনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এই শক্তি আপনার হস্তরূপ যন্ত্র-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত নিক্ষেপোযোগী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তিশক্তি, ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। ঘৃণা হিংসা রোষ প্রভৃতি মানসিক শক্তিনিচয়, তাদৃশ প্রবৃত্তির অন্তরালে থাকিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। অথবা আপনি কেবল "খেয়ালে" ঢিল ছুঁড়িয়াছিলেন। কাহাকেও আঘাত করিবার ইচ্ছা আপনার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঢিলটি কাহারো মস্তকে পড়িল। এই ঢিল নিক্ষেপের পশ্চাতে যেসকল শক্তি ক্রিয়া করিয়াছে, তৎসমুদয় সূক্ষ্মত্ব হিসাবে ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। আবার ইচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক ঢিল ছুঁড়িলে যদি কাহারো গায়ে লাগে তজ্জন্য তাহার আঘাতজনিত বেদনা কম হইবে না। কারণ শক্তির ফল অবশ্যম্ভাবী। এক ধর্ম্মবিশিষ্ট শক্তিদ্বারা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত শক্তিকে প্রতিহত করা যায় মাত্র। একটি রজ্জুকে একদিক ধরিয়া টানিলে, তাহারই দিকেই ধাবিত হইবে; কিন্তু উহার অপরদিকে তুল্য অথচ বিভিন্নমুখী শক্তি প্রয়োগ করিলে রজ্জুটি বহিঃদৃষ্টিতে নিশ্চল হইয়া থাকিবে। ঐ উভয়মুখী শক্তিদ্বয়কে ঠিক্ সমানভাবে বৃদ্ধি করিতে থাকিলেও কিয়ৎকাল রজ্জুটি স্থিরই থাকিবে, কিন্তু পরিশেষে ঠিক্ মধ্যস্থলে ছিন্ন হইয়া, ছিন্নাংশগুলি বিভিন্ন দিকে চলিয়া যাইবে। সুতরাং শক্তির বহিঃক্রিয়া প্রতীয়মান না হইলেও শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় ইহা অনুমান করা সঙ্গত নহে। শক্তি আপনার সাধ্যানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে।

পদার্থ ও শক্তির কার্য্য লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি

শক্তি মন্দফলপ্রসূ এবং কতকগুলি কল্যাণকর। প্রত্যেক বুদ্ধিযুক্ত কার্য্যের মূলে অন্ততঃ একটি উদ্দেশ্য থাকে। অনেকস্থলে আবার একাধিক উদ্দেশ্যও একই কার্য্যাভিমুখী হয়। পানীয় জলাভাব নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে পুষ্করিণী খনন করা হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা মৎস্য সংরক্ষণ, তীরসন্নিহিত ক্ষেত্রসেচন, সন্তরণশিক্ষা, অবগাহন প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

মনোরাজ্যের উচ্চতর লোকে উদ্দেশ্য ভাব (idea) রূপে উদ্ভূত হয়। পরে সাফল্যোপযোগী পদ্ধতিবিশেষ কল্পনারূপ মনে উদিত হইলে, তদনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। উদ্দেশ্যের অনুকূল পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার উপর পদ্ধতিনির্ব্বাচন নির্ভর করে। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিশদ হইলে কার্য্যও সুন্দর হয়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সাধু হইলে কার্য্যফলও সাধু হইয়া থাকে, অন্যথা অসাধু হয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একটি বিশেষত্ব আছে। উদ্দেশ্যকে এক হিসাবে কর্ম্মবীজও বলা যাইতে পারে। কারণ যে পর্য্যন্ত অভিপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার জন্য একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা বা প্রেরণা বিদ্যমান থাকে। উদ্দেশ্য যত সুস্পষ্ট হয়, উহার প্রেরণাও তত বেগশালিনী হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য জড়েতর বলিয়া তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়বোধ্য নহে। আমরা ক্রিয়াফল দেখিয়া যুক্তি ও অভিজ্ঞতাজনিত ধারণার বলে উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়া থাকি। ভূয়োদর্শনসাহায্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা-সম্বন্ধে যতই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, ততই যথার্থরূপে কার্য্যসকলের অন্তরালস্থিত উদ্দেশ্যনিচয়ের স্বরূপ কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। যদি কেবলমাত্র অগ্নির উপর হইতে ধূমোদ্গত হইতে দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে শীতকালে দূর হইতে জলাশয়ের উপর ঘনীভূত বাষ্পরাশি উত্থিত হইতে দেখিয়া জলাশয়-স্থানকে বহ্নিমান্ বলিয়া স্থির করিব; কারণ আমাদের ধারণায় অগ্নির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধূমকে একত্রে অবস্থিত ধরিয়া লইয়াছি। তাদৃশ অপূর্ণ ধারণার সাহায্যে যুক্তি আমাদিগকে জলাশয়স্থানে অগ্নির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বলিয়া দিবে। সূর্য্যের তাপশক্তি-প্রভাবে জল প্রতিনিয়তই বাষ্পাকারে উত্থিত হইতেছে; এবং সেই বাষ্প শীতল বাতাসে ঘনীভূত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা জানিলে ধূম দেখিলেই অযথা ক্ষিপ্রতার সহিত ধূমোদ্গম-স্থানমাত্রেই বহ্নির অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত না করিয়া, সমস্ত ধারণা ও যুক্তির সাহায্যে ঐ ধূমোদ্গারের প্রকৃত হেতু কি তাহা স্থির করিতে পারি।

আমাদের অভিজ্ঞতার অপূর্ণতা-নিবন্ধন কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; তজ্জন্য যাঁহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানী ও সত্যবাদী বলিয়া আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি, তাঁহারা যে-কার্য্যের যে-উদ্দেশ্য বলেন, তাহা প্রথমত মানিয়া লইয়া পরে পরীক্ষাদ্বারা আমাদিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। নিয়মের সত্যাসত্য পরীক্ষার দুইটি প্রশস্ত বিচারের উপায় আছে। একটি "অবরোহক" (Deductive) অপরটি "আরোহক" (Inductive)। বড় মত হইতে ছোট মত স্থির করার পদ্ধতিকে "অবরোহক" প্রণালী বলে। যথা-মানুষমাত্রেই মরণশীল ; হরি মানুষ, সুতরাং হরি মরণশীল। কতকগুলি পরিচিত ক্ষুদ্রধারণার ছাঁচে ফেলিয়া যুক্তিসাহায্যে বড়মত স্থির করার পদ্ধতিকে "আরোহক" প্রণালী বলে। যথা—রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে ; ইহারা সকলেই মানুষ, সুতরাং সকল মানুষই মরণশীল।

পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের পূর্ব্ব ধারণা লইয়া প্রত্যক্ষ অনুমানাদি বিবিধ প্রমাণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া আমরা নূতন পদার্থশক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। আজি যাহা সিদ্ধান্ত করি, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত কালি তাহা পরিবর্ত্তন করি। যে-পর্য্যন্ত না পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই, সে-পর্য্যন্ত চক্রবাল-রেখার ন্যায় আমাদিগের জ্ঞানের গণ্ডী নিয়তই সরিয়া যাইতে থাকে।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জ্ঞানদর্শী মহাত্মাগণের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিলে আমাদিগের অনেক সুবিধা হয়। ধীরতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিলে তাদৃশ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

জ্ঞানীগণ বলেন যে, এক হইতে বহু উৎপন্ন হইয়াছে। একটি মূল উদ্দেশ্য, একটি মূলশক্তি হইতে বহু উদ্দেশ্য বহুশক্তি, এবং একটি মূল পদার্থ হইতে বহুরূপী বহুগুণাক্রান্ত পদার্থ জন্মিয়াছে।

বায়ু, বিদ্যুৎ ও জলপ্রবাহাদিশক্তি যেরূপ বিশ্বের স্থূলাংশের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রাণশক্তিও বিশ্ব বেষ্টন ও ভেদ করিয়া সমগ্র সজীব পদার্থের জীবন পোষণ করিতেছে। বায়ু ও জল-প্রবাহাপেক্ষা প্রাণশক্তি সূক্ষ্মতর বিধায়, জল ও বায়ু-মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত রহিয়াছে। এই প্রাণশক্তির প্রভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে অগণিত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের জন্ম ও বৃদ্ধি হইতেছে। জড় দেহান্তে তাহা হইতে এই শক্তির প্রভাবে নূতন দেহের উৎপত্তি ও পোষণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।

উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে পদার্থশক্তিতত্ত্ব জানা যায়। বিশ্বের অনন্ত পদার্থ শক্তি ও উদ্দেশ্য একটি মহৎ সদ্‌বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কোনো পদার্থ-বিশেষ ও শক্তিবিশেষ আপাত দৃষ্টিতে ক্রিয়ার অকল্যাণকর অনুমিত হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে বিশ্বের মূল উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হইতে পারে না। এই মূল উদ্দেশ্যের বশে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবরজঙ্গমাত্মক তাবত বস্তুই প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্রমোন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের কোনো শক্তিই এই মূল উদ্দেশ্য-জাত শক্তির গতি স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে না। বিশ্বে মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময় শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মন্দ শক্তি চির-স্থায়ী নহে। মঙ্গল শক্তিকে প্রবৃদ্ধ ও প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্যই ইহার সৃজন ও সার্থকতা। মন্দ থাকার জন্যই মঙ্গল মঙ্গলময় বলিয়া বোধ হয়। মন্দ থাকার জন্যই মঙ্গলের গৌরব। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের মর্য্যাদা কোথায় থাকিত? দুঃখ না থাকিলে কে সুখের আদর করিত?

ইতর প্রাণীগণ স্বাভাবিক শক্তির বশে চালিত হয়। তাহাদিগের মধ্যে হিতা-হিত বিবেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না। কর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বাধীনতা না থাকায়, তাহারা কর্ম্মের শুভাশুভের জন্য দায়ী নহে। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র। মানুষের বুদ্ধি আছে, সদসৎ বিচারশক্তি আছে—সর্ব্বোপরি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। এইজন্য প্রাণীজগতে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবং এইজন্যই প্রাণী-মধ্যে কর্ম্মের জন্য মানুষেরই অত্যধিক দায়ীত্ব রহিয়াছে। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি থাকার জন্য মানুষের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে। জ্ঞানই প্রকৃত বল। শারীরিক বল, জ্ঞানবলাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্টতর। মানুষ বুদ্ধি ও বিচার-বলে, কোনো পদার্থ ও শক্তিঘটিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তৎসহ উপযুক্ত কর্ম্ম করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ দায়ীত্ববোধের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধি ও বিচারশক্তি উন্নত হওয়ায়, নূতন নূতন পদার্থ ও শক্তিতত্ত্বে তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে।

আহারনিদ্রাদি দৈহিক ক্রিয়ার হিসাব ধরিলে মানুষ প্রাণী; বিচার ধারণাদি মানসিক ক্রিয়া ধরিলে মানুষ মানুষ; এবং দয়া, ক্ষমা, স্বার্থত্যাগাদি উচ্চতর বৃত্তি ধরিলে মানুষ দেবতা। মানুষের ভিতর এই ত্রিবিধ ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে।

মানুষের এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য আছে। সাধারণ প্রাণীগণ দেহরক্ষার্থে স্বাভা-বিক প্রবৃত্তিচালিত হইয়া মাংস, উদ্ভিদ্ বা শাকসব্জী ভক্ষণ করে; মানুষও তাহাই করে। তবে, মানুষের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, মাংসাশী ইতর জন্তুগণ ইচ্ছা করিয়া

উদ্ভিদ্‌ভোজী হইতে পারে না ; কিন্তু মানুষ মনে করিলেই মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইতে পারে। খাদ্য প্রধানত স্থূল শরীরের উপর ক্রিয়া করিলেও গৌণত মনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকেও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। চিন্তা মনের খাদ্য। সৎচিন্তায় মনের পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধান হয়, অসৎচিন্তায় মন পীড়িত হয়। সেজন্য সচ্চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ সচ্চিন্তা পরিপোষক হিংসাবর্জ্জিত খাদ্য নির্ব্বাচন করেন। সচ্চিন্তারূপ শক্তি, ক্রিয়া করিবার জন্য উপযুক্ত শরীররূপ আধার চায়। হিংসালব্ধ খাদ্যে সচ্চিন্তার বিকাশোপযোগী দেহ গঠিত হইতে পারে না, অসৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিবার জন্য দেহকে উপযুক্তরূপ শক্তিশালী করিবার জন্য অসৎখাদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আততায়ী মদ্যপান করিয়া বিবেক বুদ্ধিকে প্রতিহত করত হত্যা করিয়া থাকে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

ঘটনা ও কুসংস্কার

অদ্য প্রভাতে উঠিয়াই কাহারো মুখ দেখিলাম। হয়ত নানা অবস্থায় পড়িয়া আমার আজ কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল। আমার চিত্ত অথবা মানবচিত্ত স্বভাবতই দুর্ব্বল ; কাজেই আমি ঠিক করিয়া লইলাম, সকালে অমুকের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া আমার দুর্ব্বিপাক হইল। এরূপ ঘটনা মানবজীবনে প্রত্যহই ঘটিতেছে। একই ঘটনায় কোনো কারণ না থাকিলেও একই ফল একাধিকবার ঘটিতেছে। আমরাও ঠিক করিয়া লইতেছি যে, কোনো বিশেষ ফল বিশেষ ঘটনা হইতেই হইয়া থাকে। যখনই দুর্ব্বল মানব এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার মনে কুসংস্কার সঞ্জাত হইয়াছে। সেই কুসংস্কার ক্রমশ ছড়াইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রভাতে উঠিয়াই রজকের মুখ দেখিয়া হয়ত বহু অতীত কালে কাহারো কোনো দিন বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছিল। তাই আজো আমরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, প্রভাতে রজক মুখ দর্শন দুর্নিমিত্তের লক্ষণ। গৃহ-শিখরে বায়স কর্কশরবে চীৎকার করিল—গৃহস্থ আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে গমনোদ্যত ব্যক্তিও হাঁচি বা টিকটিকির শব্দে গমনে বিরত হয়। এই সমস্তই কুসংস্কারের

ফল ভিন্ন কি হইতে পারে? যদি কাক, শৃগাল, টিক্‌টিকি মানুষের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয়, তবে আমরা যে তাহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়ি, তাহা সাময়িক দুর্ব্বলতায় আমরা বিচার করিতে পারি না। অথবা এরূপ ভাবিবারও অবসর পাই না যে, এই সমস্ত লক্ষণ আমাদের দেশে অমঙ্গল-সূচক বটে, কিন্তু অন্য দেশের লোকে তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করে না। এই সমস্ত কুসংস্কার দেশব্যাপী। ব্যক্তিবিশেষেরও কুসংস্কার আছে। মহামতি নেলসন্ বৎসরের কোনো একটি তারিখকে বিশেষ শুভ-সূচক মনে করিতেন। কিন্তু নেল্‌সন্ কি বুঝিতেন না যে, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই? এমন কি হয়ত এরূপ শুভ দিনের মাঙ্গল্য শক্তিতে তিনি বিশ্বাসই করিতেন না। তথাপি তিনি সেই শুভদিনের অপেক্ষা করিতেন। এরূপ করিবার একমাত্র কারণ অভ্যাস। কোনো কার্য্যের অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইলে আর রক্ষা নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা সমস্ত অতিক্রম করিয়া অভ্যাস কার্য্য করিতে থাকে। জগতে এমন লোক নাই, যিনি কুসংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, কুসংস্কারের কোনো মূল্য নাই এরূপ বুঝি বটে, কিন্তু তাহার হাত এড়াইতে পারি না। পল্লীবাসীমাত্রেই জানেন যে রজ্জুতে গাভী আবদ্ধ হইয়া চরিতে থাকে, সেই রজ্জু উল্লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। গোরুটি যদি শান্ত-শিষ্ট সুপরিচিত হয় তথাপি সে রজ্জু ডিঙাইয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে। এমন কি দড়িটি না ডিঙ্গাইয়া যাইলে কাদা বা কাঁটায় কষ্ট পাইতে হইবে, তথাপি দড়ি ডিঙাইয়া যাওয়া হইবে না। এরূপ সময়ে জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও আমরা বিচার করিতে পারি না যে, দুষ্ট গোরুর দড়ি ডিঙাইবার সময় বিপৎপাত হইতে পারে এই আশঙ্কায় এইরূপ কুসংস্কার উদ্ভূত হইয়াছিল। যদি গৃহস্থের কোনো রমণী দৈবাৎ একটি পাথর বা পাথর-বাটি ভাঙিয়া ফেলে, তাহা হইলে বহুদিন সংসারের "অমঙ্গল" হইবে বলিয়া পল্লী-গৃহস্থ ভীত হয়। জ্ঞানবান গৃহস্বামীও বিচার করিয়া উঠিতে পারেন না যে, পাথর কোনো-এক সময়ে দুর্মূল্য ছিল, কাজেই পাথর ভাঙিয়া গেলে পুনরায় পাথর ক্রয় করিতে অনেক দিন ধরিয়া অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক, এই কারণ হইতেই এই সংস্কার উদ্ভূত হইয়াছে। বিলাতে নাবিকগণ শুক্রবারকে (Friday) অত্যন্ত শুভবার বলিয়া বিশ্বাস করে। কোনো লোক শুক্রবারে জাহাজের পত্তন করিল, শুক্রবারে জাহাজ জলে ভাসাইল, শুক্রবারে জাহাজে মাল বোঝাই করিল, এমন-কি Friday নামক কাপ্তেন নিয়োগ করিল; শুক্রবারে জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা করিল।

এমন শুভদিন দেখিয়া সমস্ত কার্য্য করা হইল, তথাপি জাহাজ আর ফিরিল না, অথবা জাহাজের কি দশা হইল তাহাও কেহ জানিল না,—তথাপি শুক্রবার শুভবার। মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিলে সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। আমার এক পরিচিত লোক মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিয়াছিল বটে, কিন্তু পথে সর্পাঘাতে পরলোকগমন করিল। এরূপ লক্ষ লক্ষ শুভ অনুষ্ঠানে অশুভ ফল এবং অশুভ অনুষ্ঠানে শুভ ফলের উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেকেরই জীবনে এরূপ শত শত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যেকেই ইহা অবগত আছেন। কিন্তু একটির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটি আমি কাহারো নিকট শুনিয়াছিলাম, ইহা সত্য কি মিথ্যা, বলিতে পারি না। সুবিখ্যাত মতিলাল শীল কোনো গরীব লোককে একটি কর্ম্ম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে কোনো-এক নির্দ্দিষ্ট দিনে অবশ্য আসিতে বলিয়া দিলেন। লোকটি দেখিল, নির্দ্ধারিত দিন অশুভসূচক, অতএব পরবর্ত্তী বিশেষ শুভদিনে আসিয়া শীল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া বিদায় দিলেন,—তুমি যেদিন চাকরি পাইবে, তাহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে অন্যদিন শুভ হইবে ইহা ভাবিয়া যখন তুমি তোমার নিজের কার্য্যে অবহেলা করিতে পার, তখন আমার কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় তুমি নিশ্চয় আরো অবহেলা করিবে। অতএব তোমার মতো লোকে আমার প্রয়োজন নাই। শুভদিন দেখিয়া কর্ম্মে আসার এই ফল হইল। এত জানিয়া শুনিয়াও তবু আমরা কেন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হই? কেননা আমরা ভাবি —"কাজ কি গোলমালে, কি হইতে কি হইবে, শুভক্ষণে কাজ করাই ভালো"।

বাস্তবিকই সমাজের, লোকের ও দেশের অনিষ্টজনক বহুবিধ কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টায় আমাদিগকে ঐ কারণেই এত অকৃতকার্য্য হইতে হয়। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিলেই শুভ হইবে, অন্য ক্ষণে করিলে শুভ হইবে না, ইহা প্রমাণ করা বড় শক্ত। ফল কি হইবে কে বলিতে পারে? যদি প্রমাণ করিতে যাওয়ায় কুফল হয় তাহা হইলে রক্ষা নাই; যদি সুফল হয় তবে লোকে বলিবে ভাগ্য ভালো তাই এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছে।

অনেক সময়ে কুসংস্কার নষ্ট করিতে যাইয়া দৈবাৎ ঘটনা-পরম্পরা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, কুসংস্কার আরো বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে যাঁহারা কোনো লাভের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শুধু কুসংস্কার তাড়াইবার চেষ্টা করেন তাঁহারাও ব্যর্থমনোরথ হন। কোনো দেশে এক পণ্ডিত বাস

করিতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল তিনি প্রসিদ্ধ গণৎকার। কিন্তু লোকে বলিত, তিনি ইচ্ছা করিয়াই কাহারো কিছু গণিয়া বলিয়া দেন না। এক বৃদ্ধা এক দিবস ২।৩ ক্রোশ দূর হইতে তাঁহার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তাহার একখানি মূল্যবান অলঙ্কার হারাইয়া গিয়াছিল। উহা কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা গণিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। পণ্ডিত দেখিলেন, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত। বৃদ্ধা মাত্রেই বাক্‌পটু, কাজেই তিনি যদি তাহাকে বুঝাইতে পারেন যে, গণনার কোনো মূল্য নাই তাহা হইলে অনেক কাজ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি খড়ি ও পাজি পুঁথি লইয়া এক প্রকাণ্ড ঘর আঁকিয়া তাহাতে "হ য ব র ল" লিখিয়া বলিয়া দিলেন যে, অমুক খানায় তোমার অলঙ্কার রহিয়াছে। বৃদ্ধা চলিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, যখন বৃদ্ধা অলঙ্কার সেইস্থানে না পাইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিবে, তখন তিনি বৃদ্ধাকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে গণনা সব বুজরুকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুইদিন পরে বৃদ্ধা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে জানাইয়া গেল যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে কুসংস্কারের কোনো মূল্য নাই। কিন্তু তথাপি আমরা ইহার যথেষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছি। দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইলে শুভ হয়,—এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। অতএব আমরা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী বলিয়া যেমনই দক্ষিণ চক্ষু নাচে অমনই আনন্দে আত্মহারা হইয়া লাভের কথা ভাবি, কিন্তু অল্পকাল পরেই দেখিতে পাই—গাঁটকাটায় পকেট মারিয়াছে; হয়ত এই দুর্ঘটনার সময়েও আমার দক্ষিণ-চক্ষু নাচিতেছিল। আজ যদি সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিই যে, সকালে উঠিয়া চুরুট ধরাইবার সময় প্রথম দেশালাইটি নিভিয়া গেলে, সে দিনটি সুখে কাটিবে; তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বলিবে যে বস্তুতই প্রথম দীপশলাকা নির্ব্বাপিত হওয়া শুভ লক্ষণ। যাবতীয় কুসংস্কার এইরূপেই প্রচারিত হইয়াছে।

এই কুসংস্কারের জন্য ভারতের যত ক্ষতি হইতেছে, এত আর অন্য কোনো দেশের নহে। এই কুসংস্কারের জন্যই আমরা ভীরু, কাপুরুষ, পরমুখাপেক্ষী। এই কুসংস্কারের জন্যই আমাদের অর্দ্ধেক কার্য্য পণ্ড হয়। কিরূপে কুসংস্কার নষ্ট হইবে তাহার উপায় খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুষ্কর। একে ভারতবাসী রক্ষণশীল জাতি, তাহাতে ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই আমরা কুসংস্কারে লালিত ও পালিত হইতেছি। অতএব কুসংস্কার যাইবে কেমন করিয়া?

ত্রিশকোটী লোকের মধ্যে আমাদের শতকরা তিনজন মাত্র শিক্ষিত। যদি কুসংস্কার দূর করিতে হয়, অন্তত কুসংস্কারের কুফল কতকটা প্রশমিত করিতে হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত লোককেই শিক্ষিত করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব সমস্ত লোককে শিক্ষিত করিয়া দেশের কুসংস্কার তাড়াইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হইলে কুসংস্কার নষ্ট হইতে পারে। মানব অনুকরণপ্রিয় জীব। যদি শতকরা তিনজন শিক্ষিত লোক বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার অবসর পায়, অতঃপর অবশিষ্ট জীবন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ না করে তাহা হইলে অন্য লোকেও তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া কতকটা কুসংস্কার এড়াইতে পারে।

কিন্তু কুসংস্কার লব্ধ হয় বাল্যে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কথা ভাবিলেই বুঝিতে পারি, কেন আমরা এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শতকরা যে তিনটি পুরুষ শিক্ষিত, তাহাদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী নিতান্ত অশিক্ষিত ও কুসংস্কারবিমূঢ়। এই শিক্ষিত লোক তিনটি বাল্যে কুসংস্কারে লালিত, কৈশোরে কুসংস্কারে শিক্ষিত, যৌবনে কুসংস্কারে মুগ্ধ, প্রৌঢ়াবস্থায় কুসংস্কারে অনুরক্ত কাজেই বার্দ্ধক্যের অবসানে কুসংস্কারেই পরলোকগত। অতএব এই তিনটি শিক্ষিতকেও যদি উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের জননীকে, তাহাদের ভগিনীকে, তাহাদের সহধর্ম্মিণীকে শিক্ষিত করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকেরও কুসংস্কার দূর হইবে না। এম-এস-সি পাশ করিয়া কে কবে কোথায় টিকৃটিকি, হাঁচি, দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন অগ্রাহ্য করিয়াছেন? যদি তিনি শিক্ষিত জননী পাইতেন, যদি বাল্যে এরূপ কুসংস্কারের বেগ সহ্য না করিতেন, যদি যৌবনে জীবন-সঙ্গিনী গৃহকর্ত্রী তাঁহার কর্ণে কুসংস্কারের মন্ত্র অনবরত উচ্চারণ না করিতেন, তিনি তাহা হইলে কতকটা পরিত্রাণ পাইতে পারিতেন। আমি স্ত্রীলোকের পুরুষজনোচিত শিক্ষার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যে-শিক্ষায় নারী আদর্শজননী হইতে পারেন, আদর্শ ভগিনী হইতে পারেন, আদর্শ গৃহকর্ত্রী হইতে পারেন, আমি স্ত্রীলোকের সেইরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী। যদি দেশ হইতে কুসংস্কার তাড়াইতে হয়, যদি দেশের কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিকগণের মন হইতে কুসংস্কার দূরীভূত করিতে হয়, তবে প্রথমে রমণীগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিতে হইবে।

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে :—কুসংস্কার রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতে উন্নতির কি অন্তরায় হইতেছে? এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে,

এত কথা বলিবার আছে যে, তাহাতে মহাভারতের ন্যায় একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। আমি দুই একটি কথা বলিব মাত্র। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি 'ত্রিশূল' পত্রে একবার লিখিয়াছিলাম, সৎ ব্রাহ্মণ নিজ ভোজ্যপাত্রের নিকট অস্পৃশ্য মার্জ্জার রাখিয়া অনায়াসে ভোজ্য গলাধঃকরণ করিতে পারেন, কিন্তু গৃহ-মধ্যে শূদ্র প্রবেশ মাত্রই মহা অনর্থপাত হয়। ইহার কি কুফল তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শত্রু নহি; যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বুজরুকি আসিয়াছে,তাহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী। এই কুসংস্কারের দোষেই আজ ভারতবাসি-গণের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের মধ্যে প্রভেদ থাকে থাকুক। কিন্তু যেসমস্ত অন্তরায় ব্রাহ্মণকে শূদ্রের সহিত মিশিতে দেয় না, তাহা বিদূরিত না হইলে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে কেমন করিয়া?

বিদ্যার্জ্জনের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইউরোপে পরের নিকট বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেহ মানুষ হইয়া দেশে ফিরিল। কুসংস্কার অমনি বলিল, বিদ্বান বটে, কিন্তু কালাপানি পার হইয়াছিল, গোবর খাইলে তবে তাহাকে লইব নতুবা সে মরুক্। ইহা কি কুসংস্কার নহে? যদি সেই বিদ্বান মরে, যদি সে সমাজে না ফিরে, তবে ক্ষতি কাহার? সেই বিদ্বানের? না, মৃতপ্রায় সমাজের? যদি গোবর খাইয়া সে সমাজে ফিরে তাহা হইলে আমরণ সে ভাবিবে, এই হতভাগা সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করিয়া লাভ কি? সে আর সমাজের মুখের দিকে সাধ্য সত্ত্বেও ফিরিয়া চাহিবে না।

জননী বলিলেন,—"বাবা, বৃদ্ধ বয়সে গৌরীদান করিব।" জননী নাছোড়-বান্দা, কাজেই বিদ্বান বুদ্ধিমান পুত্রও জননীর নাতিনীর অর্থাৎ নিজের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার জন্য একটি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পাত্র যোগাড় করিল। অতএব ভবিষ্যতে কি ফল হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অমাবস্যায় কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে অতএব কন্যা বিধবা হইবে, এই ভাবিয়া কত জননী যে কন্যার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ফলে বালিকা প্রথম হইতেই শিক্ষা করে, মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে বুঝি এইরূপেই কষ্ট পাইতে হয়। সে আমরণ ভীরু থাকে, তাহার গর্ভে উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রত্যাশা দুরাশা।

আজ কুসংস্কারের জন্যই "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী", আজ কুসংস্কারের জন্য অথবা জাত্যাভিমানের জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম্ম করিতে পারে না। দেশে

শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দেশের জননায়কগণ সমাজের অবস্থা এবং দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিয়া দেশ হইতে যাহাতে কুসংস্কারের দারুণ কুফল কতকটা প্রশমিত হইতে পারে তাহার আশু উপায় নির্দ্ধারণ না করিলে আমাদিগকে জগতের অভ্যুদয়ের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিসে অগ্রগামী হইতে পারিব, তাহার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইবে। কেননা—

"আগে চল আগে চল ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

(বিজ্ঞান—মার্চ্চ, ১৯১৬)

আংটির মূল্য

(গল্প)

মালতী নামটি তোমাদের কেমন লাগে? হয় তো ভালো না লাগিতেও পারে। কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষে প্রেমের আকুল মলয়-পরশে যখন আমার হৃদয়-ব্রততীর অস্ফুট বাসনা মুকুলগুলি সকলের অগোচরে অল্পে-অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছিল, মোহিনী কল্পনার উন্মাদিনী তরঙ্গে গা ভাসাইয়া আমার অতৃপ্ত অন্তরাত্মা দূরে কোন্ অজানা মঙ্গলময় রাজ্যে আমারই বাঞ্ছিতার পানে ছুটিয়া চলিত, নন্দনের কোন্ মন্দাকিনী-তীরে অনির্দ্দিষ্ট কোনো স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কল্পনার হৈম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা কোনো দেববালার চরণ-কমলে যখন আমার হৃদয়ের নবোদ্ভিন্ন আকাঙ্ক্ষাগুলি চক্ষের অগোচরে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত তখন ঐ নামটি যে কত প্রিয় ছিল তাহা তোমরা কিরূপে বুঝিবে!

জীবনের সেই শুভক্ষণে যখন কল্লোলিনীর প্রত্যেক কলতান আমার নিকট অমৃতধারার অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হইত, বিহঙ্গকুলের প্রতি-কাকলীতে আমি মিষ্ট রাগিণীর ঝঙ্কার শুনিতে পাইতাম, দূর-দূরান্তচারী পাপিয়ার করুণ উচ্ছ্বাসে বোধ হইত, এ যেন আমারই অন্তস্তল হইতে উত্থিত সকরুণ অসমাপ্ত প্রেম-কাহিনীর সরস উৎস! যখন এ বিশ্বচরাচর কোন্ এক অচিন্তনীয় অনবদ্য মঙ্গল-মধুর আনন্দে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, তখন ঐ নামটি আমার নিকট কত আদরের ছিল তাহা তোমাদিগকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

তখন আমি পিতামাতার স্বর্গীয় স্নেহ এবং আত্মীয়-বন্ধুদের অযাচিত ভালোবাসার সুপ্তি-ঘোরে শায়িত—তন্দ্রালস-নয়নে চাহিয়া আমি তখন নশ্বর পার্থিব বস্তুর ক্ষণস্থায়ীত্ব বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মানবের করায়ত্ব এত সুখৈশ্বর্য্য যে অনন্ত কালের একটি ইঙ্গিতে তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর ছিল।

কিন্তু সময়ে আমার অলস সুখ-সুপ্তির মাঝে কঠোর অশান্তির জাগরণ আসিয়া বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম-রহস্য আমার গোচর করাইয়া দিল! শুধু তখনই জানিতে পরিলাম, বিধাতার রাজ্যে একটি সামান্য ঘটনাও একটি জীবন-মরণ-ব্যাপী সঙ্গীন ঘটনা-শক্তিরই ন্যায় এক মুহূর্ত্তে জীবনের সব সুখটুকু, প্রাণের সব শক্তিটুকু কাড়িয়া লইতে পারে।

যে সামান্য ঘটনায় আমার অসমাপ্ত জীবনের এক স্বর্গীয় অঙ্ক সহসা কালিমাঙ্কিত হইয়াছিল, যে তুচ্ছ ঘটনায় আমার মৌন হৃদয়ের নব সঞ্চারিত প্রেম-মন্দাকিনী একবার সাড়া পাইয়াই আবার অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল, সে-কথা খুলিয়া না বলিলে তোমারা বুঝিবে কিরূপে?

চির তৃপ্তির উৎস পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মতো আমার বাল্য জীবনের লুপ্ত কাহিনী, আমার স্নেহহীন পাষাণ হৃদয়ে একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্গের একপ্রান্তে কোনো এক ক্ষুদ্র পল্লীর ক্রোড়ে আমাদের সেই আবাস-বাটীখানি, তাহারি পার্শ্ববাহিনী বিরলবসতি নদীর তীর, সরল হাস্যময় শৈশব-সঙ্গীদের সুখস্পর্শ, বাল্যজীবনের সেই বাধাহীন আকুল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, এ-সকল কথা আমার আজো বেশ মনে পড়ে। পিতামাতার স্নেহ-সুধায় সিঞ্চিত হইয়া উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে জীবনের ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু মিশাইয়া ধীরে ধীরে সংসারের বুকে পাঁচ ছয়টি বৎসর কাটাইলাম।

তারপর কর্ম্মবহুল সংসারে কর্ম্মময় গৃহের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা অর্জ্জনের জন্যই কিছুদিন বিদ্যালয়ে পুস্তক-হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বিদ্যালয়ের সেই শিশুহৃদয়উন্মেষকারী অজ্ঞান-তিমিরহারী অনেক সংশয়চ্ছেদী শিক্ষকগণ তাঁহাদের এই শান্তশিষ্ট ছাত্রটিকে কয়েক বৎসর খুব ঘষামাজা করিয়া শেষে টানিয়া হিঁচড়িয়া সপ্তম্যাত নবমীর ছাগবৎসের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। আমিও পিতামাতার আশীর্ব্বাদে এবং ঈশ্বর-কৃপায় ঐ যজ্ঞ-ভবনের পাণ্ডাদের হাত হইতে কোনোরূপে নিষ্কৃতি পাইলাম।

যেদিন আমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ আসিল, সেদিন যেন উহা কোনো দূরাগত শুভ আশীর্ব্বাদের মতোই সকলের নিকট প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। শিক্ষক মহাশয়েরা খুব খুসী হইলেন।

তারপর কয়েকটি মাস হাস্য-পরিহাস ও আলস্যে কাটাইয়া আমার বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ লইয়া যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়াই জীবনের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতে—জীবনের প্রেমালোকদীপ্ত মধ্যাহ্নের কোনো এক অমঙ্গলের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম।

২

স্বার্থপর মানব নিজ-নিজ সুখ-সুবিধার জন্য যতটুকু সাধ্য পরিশ্রম করিয়া ভাবে, এই বুঝি যথেষ্ট হইল। কিন্তু সকলের অগোচরে থাকিয়া ভাগ্যদেবতা তর্জ্জনি হেলনে যে আমাদের জীবন-প্রপঞ্চ আপন ইচ্ছামতো গতিতে প্রবাহিত করিতেছেন, সময়ে সময়ে মানবের সুখ-দুঃখের কারণ হইতেছেন, কর্ম্মব্যস্ত মানব তাহা শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অদৃষ্টের ভ্রূকুটিতে যে সুধামন্থনে গরল উঠিয়া পড়ে, তাহা বুঝি কেহ ভাবিয়াও ভাবে না।

আমার শরীর কোনোদিনই তেমন সুস্থ ছিল না। পরীক্ষা শেষ হইবার পর নানারূপ অসুখে আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বাবা আমাদের জেলা কোর্টে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। আমার অসুখের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়া কিছুদিনের জন্য কটকে বদলী হইলেন। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভ করিতে আসিয়া আমি কিরূপে আমার জীবনের সব সুখ-শান্তি হারাইলাম, সেই কথাই আজ বলিব।

যেদিন প্রথম কটকে আসিলাম, সেদিন মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু নিত্য নূতন দৃশ্য দর্শন ও নূতন আমোদ প্রমোদে শীঘ্রই মনের সে চাঞ্চল্য দূর হইল। নূতন স্থানে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদে ও আযচিত একবিন্দু পবিত্র ভালোবাসার জন্য বেশি দিন আমাদের কষ্ট পাইতে হয় নাই। কটকে অনেকেই আমাদের বেশ সহৃদয়তার চক্ষে দেখিতেন। তথাকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমাদের আলাপ হইল। কিন্তু একজনের সহিত মৌখিক পরিচয় হইতে হইতে আত্মীয়তাটা একটু নিবিড়তর হইয়া উঠিল। তিনি গুরুসদয় বাবু।

গুরুসদয় বাবুর বাসা আমাদের বাসার পাশেই ছিল। একটি মাঝারি রকমের ফুলের বাগান দুই বাড়ির মাঝে থাকিয়া দিন-রাত্রি আমাদের যাতায়াতে

সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। আমাদের এই দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা শীঘ্রই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুসদয় বাবুর কন্যা মালতী আর তাহারি ছোট ভাই অমিয় তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের সরল মাধুর্য্যে আমাদের হৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসার দাবি করিয়া বসিল! মালতীর মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে আপনার মাসীর মতো মান্য করিতাম। মালতী ও অমিয় দুই একদিন আমার একটু দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের ভাবান্তর হইল। তাহারা আমাকে 'নিখিল দা' বলিয়া ডাকিত। আমিও তাহাদিগকে ছোট ভাই-বোনের মতোই ভালোবাসিতাম। বলা বাহুল্য যে, মালতী ও অমিয়র সাহচর্য্যে আমার প্রবাসের দিনগুলি বেশ সরস হইয়া আসিল।

আমাদের সেই গৃহসংলগ্ন উদ্যানে অনেক ফুলের গাছ ছিল। মালতী ও অমিয় প্রত্যহ তথায় ফুল তুলিতে আসিত। অমিয় আসিয়াই আমাকে টানিয়া বাগানে লইয়া যাইত, কারণ চাঁপাফুল তাহারা পাড়িতে পারিত না। খুব আগ্রহের সঙ্গেই আমি তাহাদের অভাব মোচন করিতাম। আর কি জানি-কেন ভালো গোলাপ বা ফুটন্ত যূঁইএর গোছা পাইলেই তাহা মালতীর সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কবরীতে গুঁজিয়া দিতাম।

প্রত্যহ বৈকালে মালতী ও অমিয় আসিয়া জুটিত। আমি তাহাদের সহিত পুষ্পোদ্যানের একটি লতাকুঞ্জে গিয়া বসিতাম। তাহারা কত গল্প করিত। হয় তো মালতী তাহার স্বভাবকোমল কমনীয় কণ্ঠে স্বপ্নদৃষ্ট কোনো রাজকুমারীর জন্য উন্মত্ত রাজপুত্রের আলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দুষ্টু অমিয় বলিয়া উঠিত—"দূর, তুই জানিস নে—সে রাজকন্যার নাম বেলবতী নয়—চম্পা।" তারপর দুইজনে খানিক ঝগড়া হইবার পর পুনরায় গল্প চলিত। কখনো আমি কোনো সরল কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতাম, কখনো-বা কোনো গল্পের বই পড়িয়া তাহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিতাম। কোনোদিন বা মালতী আমাকে 'ছেলেদের রামায়ণ' পড়িয়া শুনাইত। মালতীর মৃদুমধুর কণ্ঠোচ্চারিত সেই রামায়ণপাঠ আমার কর্ণে যেন মিষ্ট সঙ্গীত-ধারা ঢালিয়া দিত। এমনিভাবে নিত্য নব নব আমোদে আমার অবসর কাল কাটিয়া যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীরে বেড়াইতে যাইতাম। কিছুক্ষণ বেড়াইয়া সেই নদীতীরস্থ বাঁধের উপর বসিয়া নদীর সায়াহ্ণ-সুষমা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। অবিরাম অবিশ্রাম একইভাবে একই গীতি গাহিয়া

গাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে বক্ষে লইয়া তরঙ্গিণী পুঞ্জীভূত সান্ধ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া ধীরে গম্ভীরে চাঞ্চল্যে কি-জানি-কাহার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইত! দূরে স্রোতস্বিনীর পরপারে আকাশ ও ধরণী সেই পুণ্যক্ষণে পরস্পর পরস্পরের নিভৃত সুষমা ঢালিয়া দিয়া সন্ধ্যারাগরক্ত দিগন্তসীমায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া থাকিত! সেই বিহ্বল মিলনের মাঝে কী যে আগ্রহ, কী যে নির্ভরতা বিরাজ করিত, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব কী বুঝিবে! আমরা মুগ্ধনেত্রে সেই ছায়ালোকময় রহস্যক্ষেত্রের পানে চাহিয়া থাকিতাম। আমাদের মাথার উপর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ পাখীগুলি কেমন উড়িয়া যাইত, গৃহাগমনাকুল নৌকারোহীদের দাঁড়ি-মাঝিরা কেমন সত্বরপদে গুণ টানিয়া চলিয়া যাইত, আমরা বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতাম। তারপর আমাদের চক্ষের সম্মুখে দূর আকাশ-বক্ষে একটি একটি করিয়া অসংখ্য সাঁঝের তারা ফুটিয়া উঠিয়া সুধাংশুর আগমন ঘোষণা করিত। কখনো-বা নৌকারোহীর অস্পষ্ট সঙ্গীতের প্রথম চরণ "বেলা গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে" উচ্ছৃঙ্খল পবন-হিল্লোলে ভাসিয়া আসিত। কতক্ষণ পরে পশ্চাতে বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া স্বর্ণ ফলের মতো আপন গরিমায় আপনি চন্দ্রদেব পা টিপিয়া টিপিয়া আকাশপথে উদিত হইতেন। আমরাও হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ি ফিরিতাম।

এমনিভাবে আমার জীবন-নাটকের কোন্ এক অঙ্ক অভিনীত হইতে চলিল।

৩

দেখিতে দেখিতে অনন্ত কাল-সাগরে ক্ষণস্থায়ী জল বুদ্বুদেরই মতো ছয়টি মাস আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইয়াই আবার ডুবিয়া গেল। এই কয় মাসে মালতী আমার বড় আপনার হইয়া পড়িল। তাহার সরল লাবণ্যোচ্ছ্বাসিত মূর্ত্তিখানি, তাহার বড়-বড় ভাসা-ভাসা চোখদুটি, রঞ্জিত ললিত অধরের ঘটাময়ী মৃদুমধুর হাস্য-লহরী ও তাহার স্বভাবসরল হৃদয়ের সহজ আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহাকে কোনো মহিমময়ী চির-শ্রী-বিভূষিতা হৈমবরণী দেব-বালিকা বলিয়াই বোধ হইত। সে তাহার কিশোর হৃদয়ের সরল সৌন্দর্য্যে আমাদের গৃহে নন্দনের শোভা বিকীর্ণ করিয়াই বিরাজ করিত। সে যখন হাসিত, তাহার হাসির সুরটি মঙ্গল-মধুর তানে চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সে যখন আভাময়ী চপলার মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া বেড়াইত, তখন তাহার চরণ-পরশে তাহার চরণ-মঞ্জীরের অনবদ্য ঝঙ্কারে আমাদের মৌন ভবন কি-এক কোমল সোহাগে মুখরিত হইয়া উঠিত!

আমার সেতার ছিল, মালতীকে সেতার বাজাইতে শিখাইয়াছিলাম।

তাহার স্বর্ণ-অঙ্গুলি-পরশে সেতারের সুমধুর সুর যেন জীবন্ত হইয়া আমার হৃদয়ের চারিধারে কি-এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিত! আমি নিজে গান গাইতে ভালোরূপ পারিতাম না। কিন্তু মালতী ও অমিয় আমার গান খুব ভালোবাসিত। এবং তাহাদের আগ্রহ ও অনুরোধে আমার প্রতিদিনই প্রায় দুই একটি গান গাহিতে হইত। মালতী যদিও আমার সম্মুখে কোনো দিন গান গায় নাই, তথাপি সে যে সঙ্গীতে বেশ পারদর্শিনী তাহা আমি জানিতাম। একদিন আমি কোনো কার্য্য বশত একটু দূরে গিয়াছিলাম, তথা হইতে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম,—আমাদের বাড়িতে কয়েকটি স্ত্রীলোক বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা মহিলা। আমি তাঁহাদের অগোচরে খড়খড়ির ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের দুই একটা কথা শুনিয়াছিলাম। অবশেষে নারী-স্বভাবসুলভ অনুচ্চ কণ্ঠোচ্চারিত অনেকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে মালতীর একটি গান শুনিয়াছিলাম। সেই গানটি সেই অধিবেশনে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়াছিল। মালতী গাহিয়াছিল ;—

"যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে,
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা, নিচ্চে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
যেথায় তুমি বস দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে?
নিত্য নূতন রসে ঢেলে, আপনাকে যে দিচ্চ মেলে—
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে।"

মালতীর মধুর সঙ্গীতে যেন সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের চরণে তাহার কোমল হৃদয়ের ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত প্রীতি-প্রসূন উপহার দিবার জন্য একটা আকুল প্রার্থনা সুরের পরদায়-পরদায় নাচিয়া উঠিতেছিল!

পরদিন আমি যখন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাকে ও-গান কে শিখিয়েচে?" লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল ও কর্ণযুগল লাল হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, "তুমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনে নিয়েছ।"

তারপর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া একদিন আমি কোথায়ও বাহির হই নাই। ঘরে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম, এমন সময় অমিয় হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো ছুটিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল.

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মালতী কোথায়?" সে বলিল, "দিদি ঘুমুচ্চে, ডেকে আনি", বলিয়াই সে আবার ঝড়ের মতো ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘরে মা ও মাসীমার কথা শুনিতে পাইলাম। সে-দিকে আমার তত মন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের মুখে আমার নাম শুনিয়া খড়খড়ির পাশে গিয়া কতকটা শুনিতে পাইলাম। মাসীমা বলিতেছেন, "কি কোরবো বোন্, অদৃষ্ট মন্দ, না হ'লে এমন সোনার চাঁদ ছেলে ছেড়ে মালতীকে কি অপরের হাতে দিতে যাই? আমাদের প্রথম মেয়েকে পাল্‌টি ঘরে না দিলে কুলরক্ষা হয় না! আহা, তোমরা কেন কুলীন হলে না!"

মা কিছু বলিলেন না। সেই সময় মালতী আসিয়া সেইখানে বসিল। শুনিলাম মেসোমহাশয় বদলি হইয়াছেন; সুতরাং আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই মালতীর বিবাহ দিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল! হায় রে দেশাচার!

৪

আমার হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া যথানিয়মে সে-মাস অতিবাহিত হইল। ৬ই মালতীর বিবাহ। লোকাভাবে আমাকেই বিবাহের বাজার করিতে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে আসিয়া দেখিলাম, বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ। বহু আত্মীয়-স্বজনের সমাগমে মালতীদের বাড়িখানি ভরিয়া গিয়াছে। অমিয় যেন নব বসন্তের প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এ কয়দিন মালতীর সহিত আমার দেখা হয় নাই। দেখা হইবার সম্ভাবনা হইলেই আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছি।

বিবাহের পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে একাকী ঘরে বসিয়া আপন মনে কত কি ভাবিতেছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে মন বড়ই অবসন্ন হইল। সেতারটি লইয়া গান গাইতে লাগিলাম;—

"সকলি ফুরাল স্বপন-প্রায়,
কোথা সে লুকালো কোথা সে হায়!
কুসুম-কানন হয়েছে ম্লান পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
সব হেরি শূন্যময় কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল, সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
সে আর আসিবে না কোথা সে হায়।"

গাইতে গাইতে কি-জানি কেন অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। গান থামিল, তবু যে অশ্রু থামে না!

এই সময় মালতী আমার ঘরে প্রবেশ করিল। আমার অবস্থা দেখিয়া যেন সে স্তম্ভিত হইল; বলিল, "দাদা তুমি কাঁদচ ?" আমি চোখের জল মুছিতে গিয়া অশ্রুবেগ আরো বাড়াইয়া নিজেও কাঁদিলাম, আর স্নেহময়ী মালতীকেও কাঁদাইলাম। সে আমার ক্রন্দনের কারণ জানিতে পারিল কি না বুঝিলাম না। তবে সে যে তাহার বস্ত্রাঞ্চলে প্রথম ও শেষবার আমার অশ্রু মুছাইতে যাইয়া আমার অবরুদ্ধ অশ্রুধারা চিরমুক্ত করিয়া দিল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। সে উদাস চাহনিতে অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া আমার হাতখানি তাহার হাতে তুলিয়া লইল। তারপর আমার আঙুলের আংটিটি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "দাদা এটা আমায় দেবে ?"

মালতীকে অদেয় আমার কি ছিল ? তখনি আমি সেই আংটিটি মালতীর চম্পক-কলিতুল্য সুকুমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলাম।

এমন সময় অমিয় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "নিখিল দা তোমরা এখানে ? চল, মা তোমাদের ডাকচেন।" মালতী ও আমি অমিয়র সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

পরদিন বিবাহ। সমস্তদিন খুব পরিশ্রম করিতে হইল। বিবাহ-বাটীর কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও মালতী আমার খবর লইয়াছিল। বৈকালে একবার বাড়ি আসিলাম। তখন আমার হৃদয়-মনের অবস্থা বড়ই নিরাশাক্লিষ্ট, প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা আকুল হাহাকার উত্থিত হইয়া আমাকে যেন একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া কোন অতলে লইয়া যাইতেছিল! সেই অবস্থায় আমি আমার ঘরে জানালার ধারে বসিলাম। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে বিবিধ পুষ্পের মৃদুমধুর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আমার ঘরের মধ্যে আসিতেছিল! অনতিদূরে বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটা কোকিল কতক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিতেছিলাম, হায়, আজ যদি মালতীহারা এই অপরাহ্ণ বসন্তের সুশোভন মধুর না হইয়া তাহার সংস্পর্শ-মধুর অথচ দুরন্ত প্রভঞ্জনময় ঝরিঝর বারিপাত-মুখর একটা উচ্ছৃঙ্খল অপরাহ্ণ হইত, তাহা হইলেও আমি কত সুখী হইতাম! আজ হর্ষ-বিষাদ-মাখা অতীতের দিনগুলির সুমধুর স্মৃতি আমার দীর্ণ হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল! ভাবিতেছিলাম, আজ আমি জীবনের সুখময় মধ্যাহ্নে পিতামাতার স্নেহ-পালিত সকলের বড় আদরের পাত্র হইয়াও বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষপাতিত্বে হৃদয়ের সব শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া যে একবিন্দু শান্তির জন্য একজনের মুখ চাহিয়া আছি, ইহার জন্য দায়ী কে ?

ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মতো সেতারটি টানিয়া লইলাম। কিন্তু সুরের

পরতে পরতে আমার মানস-চক্ষে বড় বেদনার—বড় শূন্যতার স্তর যেন ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল! সেই প্রকৃতির কমনীয় হাস্যোচ্ছ্বাসিত সুন্দর অপরাহ্ণে মালতীর একটা স্নেহ-সম্ভাষণ, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাহার একটি সস্নেহ করস্পর্শের জন্য হৃদয় বড়ই লোলুপ হইল। কিন্তু হায়, আমার বড় স্নেহের মালতী আজ উচ্চতর সোপানে দণ্ডায়মান! আর আমার জীবনের অপরাধ ও অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের ঘনীভূত দুঃখ তরল হইয়া অশ্রুভরে গলিয়া পড়িতেছিল। গৃহের প্রত্যেক বস্তুই যেন মালতীর স্নেহ-স্মৃতিতে সঞ্জীবিত হইয়া আমার বেদনা-ব্যাকুল মুহ্যমান হৃদয়কে শতধা চূর্ণ করিবার উপক্রম করিল। আমি উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম।

যথাসময়ে মালতীর বিবাহ হইয়া গেল। আমি সেদিন সর্ব্বদাই মালতীর কাছে-কাছে ছিলাম। সমস্তদিনের উপবাসক্লিষ্টা মালতী আমারই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। কতক্ষণ পরে বরকন্যা বাসরে গেল। এদিকে নিমন্ত্রিত-গণের ভোজন-ব্যাপারও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমি কিন্তু আর থাকিতে পারিলাম না। দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া সকলের অলক্ষ্যে বাটীর বাহির হইলাম।

তখন কৌমুদী-প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছিল। খানিকদূরে আসিয়া আমি উন্মুক্ত জ্যোৎস্নায় প্রকৃতির তারকাখচিত চারু চন্দ্রাতপতলে বসিয়া পড়িলাম। বাসর-গৃহ হইতে তরল হাস্য ও সঙ্গীত-ধ্বনি আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সেস্থান ত্যাগ করিয়া আমি নদী-তীরে চলিলাম। নদী-বক্ষে জ্যোৎস্নার আবেগময়ী নৃত্য, তীরবর্ত্তী শ্যাম বিটপীর মর্ম্মর উচ্ছ্বাস, অদূরস্থিত উদ্যানে সদ্যপ্রস্ফুটিত হাস্নুহানার সুরভি নিশ্বাস আর তটিনীর কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দ ছাড়া তখন আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। আমি নির্জ্জন নদী-তীরে বাঁধের উপর শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত প্রকৃতি তখন নীরব। শুধু দূরে ঘাটে বসিয়া এক বাঙালী গাহিতেছিল ;—

"এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে,
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।
এস হে গিরি-শিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কানন-ভূমি,
গগন ছেয়ে এস হে তুমি গভীর গরজনে।
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে ;
এস হে এস হৃদয়ভরা, এস হে এস পিপাসাহরা
এস হে আঁখি শীতল-করা ঘনায়ে এস মনে।"

সঙ্গীতের প্রতি চরণ যেন সুস্পষ্ট সজীব হইয়া সলিল-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আমায় আকুল করিয়া তুলিল। আমি বাড়ি ফিরিলাম। আমাকে খুঁজিতে অনেকে ব্যস্ত ছিলেন। বাড়ি আসিয়া নাম মাত্র আহার করিয়া আমি শয়ন করিলাম। রাত্রে ভালো নিদ্রা হইল না।

প্রভাতে তরুশিরে অরুণিমা নূতন প্রভাত জমাইয়া তুলিল। বাসন্তী রাগ-রঞ্জিত সুন্দর প্রভাতে বরকন্যা বিদায় হইল। অশ্রুমুখী মালতী শুধু "দাদা ছোট বোনটিকে ভুলো না" বলিয়াই প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আমি আর কি বলিব? নবমুঞ্জরিত অথচ বজ্রাহত অশোকতরুর ন্যায় নিশ্চলভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিলাম। দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন ঘুমাইয়াছিলাম জানি না। মা যখন ডাকিয়া তুলিলেন, তখন বেলা প্রায় ১১টা।

কয়েক দিন বড় কষ্টে কাটিল। প্রভাতে যখন পাড়ার মেয়েরা সাজি-হস্তে ফুল তুলিতে আসিত, তাহাদের পায়ের মলের শব্দে মালতী আসিতেছে বলিয়া আমার ভুল হইত। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। হায়, যদি তাহাদের মধ্যে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতাম!

যখন যেদিকে চাই সেই দিকেই যেন মালতীর মাধুর্য্যের কমনীয় সজীব স্মৃতি বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাইতাম। বৃন্ত-চ্যুত কুসুমরাশি অনাদরে অভিমানে রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত। মালতী নাই, তেমনি আগ্রহে যত্নে কে আর ফুল কুড়াইবে!

বৈকালে নদী-তীরে বেড়াইতে যাইতাম। বোধ হইত যেন সারা পথে মালতীর কোমল চরণ-পরশ পড়িয়া আছে! নদী-তীরে আর তেমন শান্তি পাইতাম না। তারপর বসন্তের শ্যাম-সন্ধ্যায় প্রকৃতির আনন্দ-উচ্ছ্বাস দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! যখন সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চলে সমগ্র ধরণী আচ্ছন্ন হইত, কর্ম্মশ্রান্ত নগরবাসীরা দিনের কাজ শেষ করিয়া যে-যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইত, সেই অশান্ত সহরের পথ-কোলাহল ধীরে ধীরে নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে মিশিয়া যাইত, তখন আমার কর্ম্মহীন শান্তিহীন স্নেহহীন ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা যেন চক্ষের অন্তরালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিত—মালতী, মালতী, মালতীরে!

৫

ইহার পর চারিটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই কয় বৎসরে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মালতীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সংসারের সব সুখ নষ্ট করিতে

বসিয়াছি। পিতামাতার বহু অনুরোধ-আদেশেও সংসারের প্রতি একটুও টান পড়ে নাই; শত অনুরোধেও বিবাহ করিতে সম্মত হই নাই।

মালতী আমাকে দেখিবার জন্য কতবার মিনতি-ভরা অনুরোধ পাঠাইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত দেখা করিতে আমার সাহসে কুলায় নাই। মালতীর বাবা রাঁচি ও আমার বাবা হাজারিবাগ বদলি হইয়াছেন। আমি বি-এল পাশ করিয়া অর্থের বিশেষ অনটন না থাকিলেও শান্তিতে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইবার জন্য কাঁকীপুরে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি। বাসায় পরিজনের মধ্যে ভৃত্য, পাচক ও মুহুরি!

প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিতাম। তথাকার অধিবাসীরা আমাকে খুব ভালোবাসিত। আমি তাহাদের অভাব অভিযোগের সংবাদ লইতাম। কোনো কোনো দিন তাহাদের সহিত গল্প করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করিয়া সকালটা কাটিয়া যাইত। কোনো দিন-বা তাহাদের আদর-অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে কিছু আহার করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতাম।

এইরূপে সেইস্থানে আমার সময় বেশ কাটিতেছিল। চারিদিকে অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী; মাঝে মাঝে জলাশয়—বিবিধ জলচর-পক্ষীর কলরবে শব্দায়মান। আর তাহারই পাশে কুসুম-কুন্তলা চারু ব্রততীগুলির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার নৈরাশ্যপীড়িত শান্তিহীন হৃদয়েও অপার্থিব আনন্দানুভব করিতাম। সমস্ত দিনই প্রায় এইরূপ উৎসাহহীন আনন্দে কাটিয়া যাইত। কোর্টে প্রায়ই যাইতাম না। গেলেও শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতাম। শুক্লপক্ষের রজনীতে যখন মাঠের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া থাকিত, আর তাহারই উপর দিয়া সমীরণ হা হা রবে বহিয়া যাইত, তখন মনে হইত—হায়, কি ছিল কি হইয়াছে! চারি বৎসর পূর্ব্বের দিনগুলি কী মাধুরীপ্লুত! কী শোভাময়! কী নির্ম্মল শান্তি-স্রোতোচ্ছ্বাসিত ছিল! তখন যে-হৃদয়ে হেলায় হরষে নিত্য কারণে-অকারণে হাসি ও আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠিত, আজ নিঃসঙ্গ দুঃখবিলীন সেই হৃদয়মধ্যে শুধু নৈরাশ্য ও নিরানন্দের তীব্র ঝঞ্ঝা ব্যতীত আর কিছুই নাই। হৃদয়ের চারিধারে কে যেন কঠোরতার প্রাচীর গাঁথিয়া দিয়াছে! তাই রুদ্ধ হৃদয়ের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্ক্ষার ভাষা নয়নের অন্তরালে নিরন্তর গুমরিয়া মরিতেছে—বিশ্ববাসী কেহ তাহার সন্ধান পায় না।

এমনিভাবে দিন কাটিতেছিল। একদিন সকালে আকাশটা খুবই মেঘলা করিয়া ঝড়ো বাতাস বহিতেছিল। আমার মনটা বিষণ্ণ—প্রকৃতিরই মতো তামস-মলিন! বসিয়া আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতেছিলাম। ঠাকুর চা দিয়া গেল। সেদিন চা-টা খুবই ভালো লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য রামদহিন আসিয়া কয়েকখানি খবরের কাগজ রাখিয়া গেল। আমি কাগজগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতেছিলাম। হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! সেটি এই—

হাজার টাকা পুরস্কার!

পুরুলিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী মালতী দেবীর একটি আংটি হারাইয়াছে। তাহার উপরিভাগে N.C.B. এই তিনটি অক্ষর খোদিত আছে। যিনি ঐ আংটির সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি একহাজার টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

আমারই সেই তুচ্ছ আংটির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার! হায় রে অপরিমেয় মনোরাজ্য! আমার তুচ্ছ স্নেহের স্মৃতি মালতীর নিকট এত মূল্যবান! দুই বিন্দু অশ্রু আমার অলক্ষ্যে সেই কাগজখানির উপর গড়াইয়া পড়িল!

শ্রী N. C. B.

অসমাপ্তি

সেদিন বসেছি যবে
লেখনীটি ধরি'
কবিতা লিখিতে নানা
আয়োজন করি',
গুটা'য়ে এনেছি জাল
মুদিয়া নয়নে,
ছন্দ আসিয়াছে ধীরে
নেচে নেচে প্রাণে।

ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটিরে
ধরেছি সঠিক,
মিল টিল সবি প্রায়
হইয়াছে ঠিক।
হেনকালে ভৃত্য কহে,
"ডাকিছে হুজুর ;"
আনমনে বলিলাম,
"দূর দূর দূর।"

কল্পনায় আসিয়াছে
পূর্ণিমা রজনী,—
যমুনার কালো জলে
বিহার তরণী।
ভুরু ভুরু কুসুমের
মৃদু গন্ধময়,
পরীর পাখার বায়ু
উড়ু-উড়ু বয়—
লক্ষ্যহারা যাত্রা যেন!—
চুলিছে নয়ন
আবেশে গলিয়া পড়ে
সারা তনু-মন।
ভৃত্য কহে কাছে এসে
"ডাকিছে হুজুর,"
বলিনু, "হুজুর তোর
যাক্ যমপুর!"

হৃদয়ে উঠেছে জাগি'
প্রিয়ার আনন,
প্রিয়ার অধর আর
প্রিয়ার নয়ন।
পরশে যেন-বা দেহ
উঠে কণ্টকিয়া,
তাহার কুন্তল-মাঝে
হারায়েছি হিয়া!

কবিতার ছন্দে তার
বাজিছে নূপুর!
ভৃত্য কহে চীৎকারিয়া,
"ডাকিছে হুজুর,
ডাকিতেছি বার বার
তবু হুঁস নাই!"
আমি বলি—"তাই নাকি!
এই যাই—যাই।"

চমকি' উঠিয়া দ্রুত
কাব্য-কলা ফেলি',
ভেঙে চুরে কল্পনার
সব কল-কেলি,
ছুটিনু "কোথায় তিনি"
বলি' বার বার!
আনন্দের ইন্দ্রালয়
সব চুরমার!
ভাবিতে ভাবিতে চলি
তাড়াতাড়ি ছুটি'
কোন্ কার্য্য অসমাপ্ত?
কী করেছি ত্রুটি!
হুজুরের ডাক এযে
দুর্ব্বাসার হাঁক,
পদ্মবনে হস্তী যেন
বৃন্দাবনে ঢাক।

[illegible] চক্রবর্ত্তী।

সৎপ্রসঙ্গ

সম্পাদকের বিনীত নিবেদন—গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত সৎপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন আমরা পাই নাই। সুতরাং মনে করিতেছি, এ-সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসের কথা দুই একটি বলা আবশ্যক। কারণ, সত্যের প্রকাশে সুফলেরই আশা করা যায়।

আজকাল প্রায় সমস্ত মাসিকপত্রেই গল্প উপন্যাস এবং অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মটা যেন একটা কুসংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। হয়তো অনেকে মনে করেন, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি ? যাহা মানুষের আন্তরিক বিষয়, তাহা যিনি যেভাবে বোঝেন সেই ভাবেই তিনি ধারণা করিয়া চলেন। একের সঙ্গে অন্যের মত না মিশিলে যে তাহার পক্ষে তাহা মিথ্যা, ইহা বলা যায় না ; কারণ, ও-বিষয়ের কোনো মীমাংসা নাই। সুতরাং ও-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া বরং যেসকল বিষয়ে আমাদের শত শত অভাব আছে, তাহার যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই আলোচনা করা প্রয়োজন। কাজেই ধর্ম্মালোচনাটা যেন অনেকের মতে নিষ্ফল বিষয় বা ঢেঁকির কচ্‌কচি বলিয়াই বোধ হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মানবজীবন পবিত্র শক্তিশালী হইতে পারে না। মূলে ধর্ম্মভাব না থাকিলে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের প্রকৃত উন্নতির অভাবে কোনো উন্নতিই সম্ভবপর নয়। ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে যে গভীর আনন্দ আছে তাহা যে মানুষ বোঝে না, তাহার জীবন অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন—কেবল নানা আপদ ও অশান্তির লীলাভূমি মাত্র। মানুষ যদি সৎশিক্ষা-বশে অন্যায় অত্যাচারী মন্দ-লোক নাও হয়, তথাপি সে-মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভক্তিরস শূন্য হইলে তাহার জীবন কখনই পবিত্র হইতে পারে না। সংসারের পাপ-তাপের জ্বালা এড়াইবার তাহার শক্তিও জন্মে না, সে-মানুষ যথার্থ সাধু বা সৎও হইতে পারে না।

দিন দিন দেখা যাইতেছে, জনসমাজ-মধ্যে ধর্ম্মভাব কমিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে প্রায় অধিকাংশ মানুষের মুখ মলিন—দুঃখ-ক্লেশ-ভারাক্রান্ত। ধর্ম্মভাব মানুষের যে কি দুর্জ্জয় শক্তি, আর ধর্ম্ম-বিমুখিনতা মানুষকে যে কী দুর্ব্বল করিয়া রাখে, একথা কেন যে, মানুষ বোঝে না তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা যাহা বলিতেছি তাহা আমাদের মনকল্পিত কথা নহে, সমস্ত সাধু মহাজন এই কথাই বলিতেছেন; "ধর্ম্মই মানুষের মধু-স্বরূপ।" মানবজীবন সুমিষ্ট হইবার আর তো কোনো পন্থা নাই! আমরাও জীবনে একথার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম; তাই পিপাসু ভাই-বন্ধুদিগের পায় ধরিয়া বলিতেছি, আসুন আমরা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ের জন্যে সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হই। মহাত্মা যিশু বলিলেন, "তোমরা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, তারপর তোমাদিগকে সমস্তই দেওয়া হইবে।" একথা কি মিথ্যা?

কুশদহ আমাদের স্থানীয় পত্র। স্থানীয় গ্রাহকগণ অনেকেই বলেন, কুশদহে স্থানীয় সংবাদ এবং দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অধিক লেখা থাকা আবশ্যক। তারপর গল্প উপন্যাস থাকিলে সাধারণের সুখপাঠ্য হইতে পারে।

আমরাও দেশের বাহ্য বিষয়ের উন্নতি চাই। যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব তাহার আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা সেই প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি—আর একথা কেই-বা বিশ্বাস করেন না যে, কেবল বাহ্য উন্নতির চেষ্টা করিলেই মানুষের প্রকৃত উন্নতি হয় না। ধর্ম্মভাব সত্যনিষ্ঠা পবিত্র মনের বল না হইলে কখনই কাহারো প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না।

তারপর অমাদের ধর্ম্মালোচনাকে অনেকে সম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কোনটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন, অথচ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব যে জনসমাজে নাই তাহা নয়। মানুষের দেহকে নিরাপদে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে একখানি সীমাবদ্ধ ঘর বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে হয়; কিন্তু সে যদি কেবলই সেই ঘরের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তবে সেই বদ্ধ বায়ুই তাহার শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ঘরে বাস করিয়াও তাই তাহাকে বাহিরের বাতাস গ্রহণ করিতে হয়। ধর্ম্মসাধন-পথেও উদার মতাবলম্বী হওয়াও তদ্রূপ সম-বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রয়োজন। মণ্ডলীর সহিত যোগ রক্ষা না করিলে সাধনোন্নতি হইতে পারে না। একা-একা নিয়ত থাকিলে ভাব শুকাইয়া যায়, সম্যক উন্নতি বা উদার জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব সকল ভাবাপন্ন খাঁটী বিশ্বাসীগণের কথার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক মিল আছে। বিশ্বাসীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া কখনো কাহারো অপকার হইতে পারে না। কিন্তু অন্ধভাবে সত্যগ্রহণও কোথাও চলে না। জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপারে জ্ঞানেরই প্রয়োজন। এইজন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস

করি যে, আমরা সম্ভাব যদি এই ধর্ম্মালোচনা একটি ধারাবাহিকরূপে চালাইতে পারি, তবে তাহাদ্বারা কখনো কাহারো অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই বরং ইহাতে আমাদের উপকারই হইতে পারে। ঈশ্বর-কৃপা এবং পিপাসু বন্ধুগণের অনুরাগের উপর আমাদের প্রাণের শুভ ইচ্ছা নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর-ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

বিবিধ

কর্ম্মে কুসংস্কার—আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি "চাষার কাজ" আর পরাধীন আপিসের চাকরিগুলি "ভদ্রলোকের কাজ" এই সংস্কার আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধমূল। এজন্য একদিকে বহুবিধ শ্রমসাধ্য স্বাধীন জীবিকার পথ ভদ্রলোকের পক্ষে একেবারে রুদ্ধ। অন্যদিকে অসংখ্য ভদ্রলোক চাকরিক্লিষ্ট ভীরু দুর্ব্বলমনা হইয়া, স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন ভাব হইতে আজীবন বঞ্চিত হইয়াছেন। আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় বহুতর কার্য্য অশিক্ষিত অভদ্র লোকের হস্তগত। ভদ্রমণ্ডলী কর্ম্মসূত্রে যখন তাহাদের ব্যবহারের সংস্পর্শে গিয়া পড়েন, তখন প্রায় প্রতিকার্য্যে তাঁহাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অশিক্ষিত শ্রেণীর নিকট হইতে অনেকস্থলে ভদ্রবাক্য, সভ্য ব্যবহার পাওয়া যায় না; কেন-না, তাহারা তাহা জানে না। এরূপ অবস্থায় যদি ঐসকল শ্রেণীকে মূর্খতাশূন্য করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহাদের কৃতকর্ম্মের ভাব এবং আকার নিশ্চয়ই অন্যরূপ হইবে। তখন দেখা যাইবে, কোনো কর্ম্মই 'ছোট কাজ' নয়, কোনো কাজই 'চাষার কাজ' নয়। বস্তুত কর্ম্ম কেন ছোট হইবে? ছোট ভাবে যে কাজই করা হইবে তাহাই নীচ কাজ হইবে। তাহা হইলে দেশে বহুল পরিমাণে নিম্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষা যদি প্রথমাবস্থায় বাধ্যতামূলক না হয়, তবে কোনো কালেই তাহার প্রসার হইবে না। অনেকে বলেন, "সমস্ত লোক লেখাপড়া শিখিলে মজুরের কাজ অর্থাৎ শ্রমসাধ্য কাজগুলি করিবে কে?" একথার উত্তর য়ুরোপ ও আমেরিকা দিয়াছে। কেন না, সেখানকার মজুরগণও লেখাপড়া জানে, তাহারাও শিক্ষিত।

"দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হইলে যে যাহার কার্য্য করিতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবে না। এখন ধোবার পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া জাতীয় ব্যবসা করিতে লজ্জিত হয়; সে দেখে যে তাহার সহতীর্থ সমকক্ষ অথবা অল্পমেধা কোনো ব্রাহ্মণ ছাত্র চাকরি করিয়া সম্মানিত হইতেছে,

অথচ ধোবা লেখাপড়া শিখিয়াও ঘৃণিত। তাহার স্বজাতীর মধ্যে সেই শিক্ষিত অতএব সে কেন অপরের ঘৃণিত রজক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিবে। কিন্তু যখন সমস্ত ধোবাই বা অধিকাংশ ধোবাই লেখাপড়া শিখিবে; তখন সে অনায়াসে স্বজাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত দেখিয়া জাতীয় ব্যবসা করিতে ক্ষুণ্ণ হইবে না, বরং তাহার ব্যবসায়ে উন্নতিবিধান করিতে তাহার পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে।" (বিজ্ঞান)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বর্গীয় গোখলে মহাশয় যে আন্দোলন উত্থিত করিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহার অভাবে কে আর সেই অসমাপ্ত কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন, অথবা তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রভাবে এখন সেই অভাববোধ দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে। ফলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আর দ্বিতীয় পথ নাই। সর্ব্বসাধারণ লোক শিক্ষিত না হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম-সংস্কার হইবে না। কর্ম্মগুলি ভাল না হইলে সমাজের বেদনা দূর হইবে না। আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"বাঙ্গালী গর্ব্ব করে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, অর্থে ভারতবর্ষের সমগ্র জাতি অপেক্ষা বাঙালী অধিকতর উন্নত। যদি বাঙালীর অর্থবল অধিক, যদি বাঙালীর বিদ্যা বুদ্ধি অধিক, তবে কেন বাঙালী স্বয়ং চেষ্টা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমতঃ অবৈতনিক এবং পরে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করিতেছেন না? যদি শীঘ্র এদেশেও মহীশুরের ন্যায় বিধি প্রচলিত না হয়, তাহা হইলে বাঙালী অতি শীঘ্রই অন্য অনেক ভারতীয় জাতি অপেক্ষা বহু পশ্চাতে পিছাইয়া যাইবে। আমাদিগের সাবধান হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" [বিজ্ঞান]

পরীক্ষার হিসাব—প্রবেশিকা—১৮৫৭ খৃঃ ২৮৮ জন, ১৯১৫ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশন ১২৬১৭ জন। ইণ্টার মিডিয়েট, ১৮৬১ খৃঃ ১৬৩ জন, ১৯১৫ খৃঃ ৬৯০৬ জন। বি-এ, ১৮৫৮ খৃঃ ১৩ জন, ১৯১৫খৃঃ ৩৪৯৯ জন। এম-এ, ১৮৬১ খৃঃ ১ জন, ১৯১৫ খৃঃ ৭১৮ জন। ৫০ বৎসরে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার ফল---এবার স্ত্রীশিক্ষার ফল দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আহ্লাদিত হইয়াছি। বুঝা যাইতেছে যে, দিন-দিনই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এবার নিম্নলিখিত বাঙালী ছাত্রীগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বি-এস-সি—শ্রীমতী সুরীতি মিত্র, কৃতিত্বের সহিত (with distinction) উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ভারতে ইনিই প্রথম বি-এস্-সি মহিলা।

বি-এ—ইংরেজী সাহিত্যে ২য় বিভাগে অনার, শ্রীমতী সুনীতি মজুমদার, চারুলতা দাস, সুজাতা বসু, সীতা চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে অনার (৪র্থ) শ্রীমতী তটিনী গুপ্ত। গণিতে প্রথম বিভাগে অনার (২য়) শ্রীমতী পরিমল হাজরা। কৃতিত্বের সহিত পাস—শ্রীমতী সুশীলা খিলনানী, নলিনী সরকার, জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ। পাস—শ্রীমতী ইন্দুমতী দত্ত, সুধাংশু হাজরা, গার্গী মণ্ডল, সরলা নন্দী, বেলা রায়, মালতী রায়।

বি-টি—প্রথম বিভাগ—২ জন, পাশ—৮ জন।

আই-এ—প্রথম বিভাগে ১১, দ্বিতীয় বিভাগে ৯, তৃতীয় বিভাগে ৩ জন।

ম্যাট্রিকুলেশন—যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্রাহ্ম বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—প্রথম বিভাগ—১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগ—৭ জন।

মহিলাবৃত্তি—নিম্নলিখিত ব্রাহ্ম বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন,—পশ্চিম বঙ্গ—শ্রীমতী নবনী গুপ্ত (বেথুন ইস্কুল) ২০৲, নলিনী দাস (ব্রাহ্ম বালিকা ইস্কুল, ১৫৲, উষাবালা সেন (ব্রাহ্ম বালিকা ইস্কুল) ১০৲, বীণা দাস (ব্রাহ্ম বালিকা ইস্কুল) বি,টি,কে, বৃত্তি ১০৲, তরঙ্গিনী সেন ঐ ঐ ১০৲। পূর্ব্ববঙ্গ—শ্রীমতী স্বপনা মজুমদার (দার্জ্জিলিং) ২০৲, ললিতা বসু (ঢাকা) ২০৲, সুবালা রায় (ময়মনসিংহ) ২০৲। শ্রীমতী নবনী গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গে ও শ্রীমতী স্বপনা মজুমদার পূর্ব্ববঙ্গে বালিকাগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্রাহ্মবালিকগণ আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন;—শ্রীমতী সুজাতা দাস (বেথুন) ২০৲, শ্রীমতী নলিনী সেন (ডায়ওসিসেন) ২৫৲।

ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য য়ুরোপীয় মহিলার দান—ক্যাণ্টের অন্তর্গত হ্যাভেরল্যাণ্ডের মিস্ এথেল এভারেষ্ট ভারতবাসীরই দ্বারা ভারতবাসীদিগকে ভারতীয় প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য ১৪ হাজার পাউণ্ড (২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা) দান করিয়াছেন। এইরূপ বিশেষ দান য়ুরোপ এবং এসিয়ার প্রতি হৃদয়গত সখ্য-বন্ধনে সহায়তা করিবে।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী—সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন, বৎসরাধিক কাল হইল আমাদের দেশে 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি সদনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে। এতদিন আমরা এ-সম্বন্ধে কিছু বলি নাই—এই মণ্ডলীর কার্য্য কারী শক্তির প্রতি আমরা আশানেত্রে চাহিয়াছিলাম।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর, অনারেবল ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি খ্যাতনামা স্বদেশ-হিতৈষীগণ এই মণ্ডলীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। দ্বিজেন্দ্রবাবু মণ্ডলীর সম্পাদক। এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য অতি উচ্চ; নানা উপায়ে নর-সেবাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সমিতি এক বৎসরের মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে নীরবে যতটুকু কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের সাহায্যদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং ইতিমধ্যে ঢাকা, বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি স্থানে এবং বর্দ্ধমানে ইহার শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই মণ্ডলীর আর একটি কর্ম্ম-চেষ্টা দেখিয়া আমরা আর এক নব আশায় আশান্বিত হইয়াছি। পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আপাতত জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি, চাংড়িপোতা ও কোদালিয়া এই তিনটি গ্রাম লইয়া গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ হরিনাভি গ্রামে একটি শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই মণ্ডলী যেরূপ আদর্শে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য পল্লীর অধিবাসী গণও যদি এই মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া নিজ নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও গৃহ শিল্প এবং সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হন, তবে অল্পকাল মধ্যে এক মহাশক্তির বিকাশ দেখিবার আশা করা যায়।

সাহিত্য পঞ্জিকা—নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি। সমাদ্দার মহাশয়ের প্রস্তাবটি শুভ এবং সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,
মোরাদপুর, ২০শে ফাল্গুন, ১৩২২।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইংরাজিতে যেরূপ "Literary year Book" আছে আমাদের সেরূপ কিছুই নাই। এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের এই "সাহিত্য-পঞ্জিকা" চারিভাগে বিভক্ত হইবে। (১) বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম, ঠিকানা, পুস্তকের নাম, পুস্তক উপন্যাস, কি ইতিহাস, অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের সংস্করণ ইত্যাদি, (২) এই বৎসরের সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধের সারাংশ (৩) বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সকল পত্রিকাদির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (৪) বঙ্গের পাঠাগারাদির তালিকা। খরচ বাদ দিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মোরাদপুরস্থ পাঠাগারের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে, এক-তৃতীয়াংশ বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ও অন্যাংশ সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত

হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনে (বঙ্গীয়, উত্তর বঙ্গীয় ও অন্যান্য) যাঁহারা সভাপতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন তাঁহাদের ছবি প্রদত্ত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনগুলিরও ছবি দেওয়া হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ছবি দিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে ছবি প্রস্তুতের ব্যয়, আর্টপেপারের মূল্য ও ছবি ছাপিবার খরচ দিতে হইবে।

পুস্তক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে। "সাহিত্য-পঞ্জিকা" ডবলক্রাউন ১৬ পেজী আকারের হইবে এবং প্রতি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ১০৲ করিয়া লওয়া হইবে। পুস্তক ২৫০০ করিয়া ভাল কাগজে ছাপা হইয়া প্রতি-বৎসর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে এবং মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইবে। আমরা এই নূতন ধরণের পুস্তক প্রকাশের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করি-তেছি। মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি-এ, মহাশয় মাসিক পত্রের উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধাদির সারসঙ্কলন করিতেছেন। মাসিকের সম্পাদকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ মাসিক আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে আমরা সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব। অন্যান্য সংবাদপত্রাদির সম্পাদকগণ দয়া করিয়া নিজ নিজ পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পত্র লিখিবার সময় রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র দিবেন।

বিনীত নিবেদক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার,

অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

বিধাতা মানুষকে অনেক আশীর্ব্বাদের বিষয়, বস্তু ও শক্তি দান করেন। আমরা তাহার সদ্ব্যবহার যতটুকু করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের কল্যাণ হয়। কিন্তু আমরা স্বভাবত দুর্ব্বল, কার্য্যত আমাদের অনেক ভ্রম ত্রুটি ঘটে। ভগবান ন্যায়বান্, তাঁহার নিকট কোনো অসত্যের প্রশ্রয় পায় না। এইজন্য ব্যক্তিগত জীবনে বা সমাজগত জীবনে যথাসময়ে এক একটি প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান-চেষ্টা আসে। ইহারই নাম কালের পরিবর্ত্তন।

গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর কার্য্য এপর্য্যন্ত একভাবে চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ইহার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। মিউনিসিপালিটীর কার্য্য

সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা 'প্রসন্নভবনে' মিউনিসিপাল করদাতাগণের একটি স্থায়ী সভা গঠনের জন্য দুই দফা ঐ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শেষ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী হইতে মিউনিসিপাল বিধির কোন্ নিয়মানুযায়ী করদাতাগণের প্রতি করধার্য্য করা হয়, তাহা জানিবার জন্য মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হউক। এই সভার কার্য্যফল জানিবার জন্য এবং সাধারণকে জানাইবার জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী, পানীয় জলের জন্য একটি পুষ্করিণী (Reserve tank) খনন করার প্রস্তাব স্থির করেন। কোন্ গ্রামে কোন্ স্থানে এই পুষ্করিণী হইলে আপাতত অধিকাংশের সুবিধা হইতে পারে ইহা লইয়া একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। গৈপুর গোবরডাঙ্গা এবং খাঁটুরা প্রত্যেক গ্রাম-বাসিগণ নিজ নিজ গ্রামে যাহাতে হয় এমন ইচ্ছা না করিয়াছিলেন এমন নয়; এই আন্দোলনের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াও উপযুক্ত নির্ব্বাচন স্থির করিতে চেষ্টা করেন। ফলে নাকি এখনো স্থির নিশ্চয় হয় নাই পুষ্করিণী কোন্ গ্রামে বা কোথায় হইবে। আমরা বলি বস্তুত পানীয় জলের অভাব সকল গ্রামের সকল পাড়ায়, সুতরাং একটি পুষ্করিণীতে কতটুকু অভাব মিটিবে? বরং একটি পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে যদি ইঁদারা করা হয় তবে ঐ পরিমাণ টাকায় ২।৩টি ইঁদারা হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ইঁদারায় এদেশে ভালো জল হয় না; কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নয়। ষ্টেশনের ইঁদারায় ভালো জল হইয়াছে। যদি মাটি পরীক্ষা করিয়া ইঁদারা খনন করা হয়, তবে জল ভালোই হইতে পারে। পানীয় জলের পক্ষে ইঁদারার জল যত ভালো হইবার আশা করা যায়, অধিক ব্যয় করিয়া পুষ্করিণীতে সেরূপ আশা করা যায় না। ইঁদারার জল উঠাইবার প্রণালীও এখন অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে। অধিকন্তু ইঁদারার জল গাড়ি করিয়া সরবরাহ করিলে আরো সুবিধা হইতে পারিবে। বরাহনগর প্রভৃতি অনেক মিউনিসিপালিটী গাড়ি করিয়া পল্লীমধ্যে জলসরবরাহ করে, তাহার ব্যয় করদাতাগণ দিয়া থাকেন।

গোবরডাঙ্গার প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, সম্প্রতি মিরাট হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া প্রাক্‌টিস করিতেছেন। আমরা ভগবানের নিকট শ্রীমান্

বিমলেন্দ্রকুমারের সাফল্য কামনা করি, তিনি যেন দেশের সেবা করিয়া তাঁহার শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

কুশদহ-বাসী কত ছাত্র কোথা হইতে কে কোন্ বিষয়ে এবারকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা একযোগে জানা যায় না। কিন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ সকলের জন্যই আমরা শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছি। আর যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে কেবল তাহাই প্রকাশ করা হইল ;—

বি-এ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র, গৈপুর, রিপণকলেজ, ইংলিসে আনার (দ্বিতীয় বিভাগ)। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা জমিদার-বাটী, রিপণকলেজ—পাস কোর্সে।

বি-এস-সি—চারুচন্দ্র ঘোষ, খাঁটুরা, প্রেসিডেন্সী, দ্বিতীয় বিভাগে। যুড়ানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৈপুর, সেণ্টজিবিয়ার, কৃতিত্বের সহিত।

আই-এ—নলিনীরঞ্জন দে, গৈপুর, সি-এম-এস কলেজ, ২য় বিভাগে। কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গৈপুর মেট্রোপলিটান কঃ,—২য় বিভাগে।

আই-এস-সি—গোপালচন্দ্র চৌধুরী, গৈপুর, মেট্রোপলিটান কঃ ১ম, বিভাগে।

ম্যাট্রিকুলেশন,—১ম বিভাগে চণ্ডীচরণ দাস গোবরডাঙ্গা হাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেড়গুম, স্কটিসচার্চ। ২য় বিভাগ—কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৈপুর, বনগ্রাম হাই। কামিনীরঞ্জন দে, গৈপুর, সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট ইস্কুল। ভূপেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, হেমকরের লেন, আর্য্যস্কুল।

গোবরডাঙ্গা ইস্কুল হইতে প্রেরিত ৪টি ছাত্রের মধ্যে ১টি এবং বনগ্রাম ইস্কুল হইতে ৯টির মধ্যে ৮টি পাস হইয়াছে। গোবরডাঙ্গা ইস্কুলের জন্য আমরা দুঃখিত। বনগ্রাম ইস্কুলের পর পর উন্নতিতে আমরা সুখী, কেন-না বনগ্রাম ইস্কুলের হেডমাষ্টার আমাদের গৈপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ।

খাঁটুরা-নিবাসী স্বর্গীয় ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় কথক মহাশয়ের পুত্র বালীগঞ্জ-প্রবাসী, সংস্কৃত কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে প্রায়

দুই বৎসর ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি হইতে D.S.C উপাধি লাভ করিয়া গত (১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৩০শে) মে নিরাপদে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রমথবাবুর পরিচয় আমরা পূর্ব্বেও দিয়াছি. তবু যদি কুশদহর পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ না জানিতে পারেন, তাই আবার বলিতেছি; ইনি গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজি-বাটীর ৺কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, মইনপুরীর উকীল স্বর্গীয় ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, এবং কলিকাতা "রামমোহন লাইব্রেরীর" প্রধান সংস্থাপক। ভগবানের কৃপায় প্রমথবাবু আবার দেশের সেবায় যেন আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন।

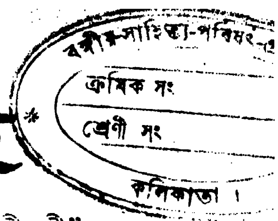
আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম-এ মহাশয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। ইনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। জগজ্জননী মা শান্তিদায়িনী তাঁহার কন্যার আত্মাকে তাঁহার শান্তি-ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং মাতৃহীন সন্তানগণের মাতা হইয়া পরিবারস্থ সকলের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

---

২৪ পরগণার অন্তর্গত ধানকুড়িয়ার প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভের উপযুক্ত পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভের সম্প্রতি আর একটি সৎকর্ম্ম দেখিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। ইনি দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সুন্দর একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর-কৃপায় দেবেন্দ্র বাবুর সর্ব্বতোমুখী হিতসাধন-চেষ্টা দিন-দিন আরো পূর্ণতা লাভ করুক।

বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত কলসুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল-প্রমুখ গ্রামবাসিগণের বহুদিনব্যাপী একটি শুভ চেষ্টার ফল এতদিনে সফল হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মছলন্দপুর ষ্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তাটি এবার পাকা হইতেছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে
মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায়?

অষ্টম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৩ | তৃতীয় সংখ্যা

সঙ্গীত

মুলতান—একতালা।

(বাউল)

দেখ্‌রে হৃদয়-ঘরে কি মজার সংবাদের তার। (ক্ষেপা মন আমার)
করে ভিতরে তার গতিবিধি স্বর্গধামের সমাচার।
প্রেম-বিজলিযোগে, ধ্যানসমাধিভোগে,
আসে তত্ত্বকথা কত সেথা শুভ সংযোগে ;
আহা! কোথায় গোলক, কোথায় ভূলোক,
পলকে হয় একাকার। (প্রেম যোগ বলে)
কথা শোন্‌রে অপেয়ে, একটু বসে স্থির হ'য়ে,
বিবেক-কানে স্বর্গপানে মনটি ফিরায়ে ;
ঐ শোন্ নীরবে সুরবে হরি ডাক্‌ছেন তোরে বারে বার।
(প্রেমধামে যেতে)
ঐ প্রেমের দরবার, চল দেখিরে একবার,
ভক্তমাঝে ভগবান্ কেমন চমৎকার ;
প্রেমদাসে বলে সাধুদলে মিশে যারে তুই এবার।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

পদার্থ ও শক্তি এবং মানবজীবনের কর্ত্তব্য

(শেষাংশ)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ব-সংসারের সর্ব্বত্র পদার্থ ও শক্তি, স্থূল ও সূক্ষ্মের বিভিন্নাবস্থায় সক্রিয়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; এবং সমস্ত পদার্থ ও শক্তি বিশ্বের ক্রমোন্নতিশীল শক্তির অধীনে যথানিয়মে কার্য্য করিতেছে। মানব বিশ্বের একাংশ বলিয়া, তাহার মধ্যেও স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। এই সমস্ত ক্রিয়ার চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মের সহিত মিলন। পাপী হউক, পুণ্যাত্মা হউক, ধনী নির্ধন জ্ঞানী মূর্খ সকল মানুষই পরিণামে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেই। পাপী জন্মের পর জন্মপরিগ্রহ করিয়া, যাতনার পর যাতনা পাইয়া যে বিমল জ্ঞানানন্দ লাভ করিবে, পুণ্যাত্মা অল্পজন্মে অল্প যাতনার পর তাহা প্রাপ্ত হইবে। একমাত্র সেই পূর্ণজ্ঞানই মানুষকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিদান করে।

মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরের বিরাট দান—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সদসৎবিচার-ক্ষমতা। এই দুইটি অমূল্য শক্তির সদ্ব্যবহারের বলে মানুষ ইহলোকেই দেবত্বের অধিকারী হইতে পারে। যে হতভাগ্য সংসার-বাণিজ্যে এই অমূল্যধনের অপব্যবহার করে, সে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই দুইটি শক্তির প্রয়োগ বিশ্ব-শক্তির অনুকূল ; এজন্য মানুষকে উন্নতির উচ্চতর স্তরে আনয়ন করে ; কিন্তু উহাদিগের অযথা-ব্যবহার বিশ্ব-শক্তির প্রতিকূল বলিয়া মানুষের বহু কষ্ট ও যাতনা ঘটিয়া থাকে। প্রতিকূলতার দ্বারা বিশ্বোন্নতিশক্তির কোনো ক্ষতি করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে ; কারণ যথাসময়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া বিশ্বশক্তি মানুষকে পরাস্ত করিয়া উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যাইবেই।

মানুষ যে স্থূলদেহ লইয়া বহির্জগতে কার্য্য করে, তাহা একহিসাবে প্রাণী-দেহেরই ক্রমোন্নতির ফল। সাধারণ প্রাণীদেহের ধর্ম্মও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং সাধারণ জীবদেহ যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, ইহাও তাহাই চায়। শুধু এই দেহের দাবি শুনিলেই উন্নতির বিকাশ হয় না—নরত্ব এবং দেবত্ব ফুটিয়া উঠে না। যাহার বলে মানুষ সমগ্র প্রাণীজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, যাহার গুণে নিখিল জীবমণ্ডল মানুষের ক্ষমতাধীন হইয়াছে, সেই অমূল্যধন—সদসদজ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি। যাহার প্রভাবে মানুষ স্থূল দেহের প্রবৃত্তি সংযত করিয়া আপন মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়া থাকে। জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির বশে সতত কর্ম্ম করিতে করিতে মানসিক বলের অভ্যাস

বা সংস্কার জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ অভ্যাস বা সংস্কার জন্মিলে স্বভাবত সদিচ্ছা ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। সতত সদ্ভাবে চিন্তা ও সৎকার্য্য করিতে করিতে তাদৃশ চিন্তা ও কার্য্য করিবার অভ্যাস আনন্দে পরিণত হয়। ঐরূপ অবস্থায় মানুষের দেবভাব বিকশিত হইয়া উঠে।

চিন্তা বা কার্য্য সকলের মধ্যে কোন্‌গুলি সৎ, কোন্‌গুলি অসৎ তাহা নির্দ্ধারণ কেবলমাত্র নিয়মবিধির দ্বারাই স্থির হয় না। উদ্দেশ্য এবং কার্য্য মিলিয়া সৎ ও অসৎ ব্যবহৃত হয়। একই কার্য্য ঘটনাবিশেষে সৎ ঘটনাবিশেষে অসৎ হইতে পারে। একজন দস্যু নিরীহ পথিককে অসহায় পাইয়া তাহার প্রাণ বধ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইতে উদ্যত হইয়াছে। একজন সাহসী বলবান পরোপকারী ব্যক্তি পান্থকে দস্যুকবল হইতে রক্ষা-প্রয়াসী হইলে দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পথিকও নিজেকে রক্ষা করিতে যাইয়া দস্যুকে আঘাত করিল, সেই আঘাতে দস্যু মরিল। নরহত্যা সাধারণত দোষাবহ হইলেও এস্থলে তদ্রূপ দোষজনক নহে। কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী দ্বারাই কেবল সৎ ও অসতের বিচার হয় না। উদ্দেশ্য দ্বারাই সৎ ও অসতের বিচার সত্য হয়।

কার্য্যমাত্রই আমাদের কর্ত্তব্য নহে। উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্যই কার্য্যের অনুষ্ঠান। সদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার চেষ্টায় যে কার্য্য করা হয় তাহাই কর্ত্তব্য। বিশ্বের সজীব ও নির্জীব তাবৎ পদার্থনিচয়কে উন্নতির পথে চালিত করাই বিশ্বের অন্তর্নিহিত বিরাট উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের অনুকূলে আমাদের ক্ষুদ্রতর উদ্দেশ্য সংসাধিত করাই আমাদের উচিত। বিশ্বের বিরাট দেহমধ্যে আমরা যেরূপ একাংশ হইয়া আছি, তদ্রূপ সমস্ত পদার্থই রহিয়াছে। দেহের একস্থানের স্বাস্থ্যবিকৃতি ঘটিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে তাহা সমগ্রদেহে ছড়াইয়া পড়ে। তজ্জন্য যেরূপ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পাদনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য, তদ্রূপ সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গলার্থে যে এক অখণ্ড শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহার অনুকূলে আমাদের ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সংসারে যেখানে শক্তির অভাব হয় সেইখানেই তদনুরূপ কর্ত্তব্যেরও উৎপত্তি হয়। যাহার কর্ত্তব্য-বোধ-শক্তি ও দায়ীত্ব-জ্ঞান অধিক, তাহারই কর্ত্তব্য করিবার সামর্থ্য জন্মে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

সজীব ও নির্জ্জীব, সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই, মানুষের শক্তি ও দায়ীত্ব অধিক হইয়াছে। জ্ঞান হইতেই মানুষের শ্রেষ্ঠ-

শক্তি লাভ হয়। উদ্দেশ্য এক হইলেও তাহার উন্নতির অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মূল বিধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-নীতি রাজ-নীতি সমাজ-নীতি পশুপক্ষীর প্রতি ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বিবিধ শাসন ও অনুশাসন প্রণীত হইয়াছে।

মানুষের প্রধানত কর্ত্তব্য তিনটি। প্রথম ঈশ্বরের প্রতি, দ্বিতীয় মনুষ্যের প্রতি, তৃতীয় ইতরপ্রাণীর প্রতি। প্রথম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না বলিয়া এই কর্ত্তব্য স্বীকারও করেন না। তাঁহাদের মতে, বিশ্বসংসারের পরমাণু সকল ও শক্তি নিচয় স্বয়ংভূ—কেহই তাহাদের স্রষ্টা নাই; উহাদিগের এক যৌগিক, সমসাময়িক, আকস্মিক ক্রিয়ার ফলে বিশ্বচরাচর এবং তন্মধ্যস্থ তাবৎ পদার্থ ও প্রাণী উদ্ভূত হইয়া ক্রমবিকাশের পথে চলিতেছে। কিন্তু তাঁহারা ইহা ও স্বীকার করেন যে, যেমন প্রাণী-দেহের বিভিন্ন কোষগুলির নিজ নিজ স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকিলেও তাহারা সমগ্র দেহের রক্ষণ-পোষণাদিরূপ উন্নতিকর ক্রিয়ার সাহায্য করে, তদ্রূপ বিশ্বের সকল প্রাণীই সমগ্র প্রাণীমণ্ডলের ক্রমোন্নতির অনুকূল ক্রিয়া করিয়া থাকে। একমাত্র এইরূপ ক্রিয়াই তাঁহাদের মতে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তরালে এক অখণ্ড শক্তিকে কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াও, সেই শক্তির মূল কারণ অজ্ঞেয় বলিয়া এই দৃশ্যমান সৃষ্টির প্রতি কর্ত্তব্যকেই স্বীকার করেন। সুতরাং নিরীশ্বরবাদীগণের মতে প্রথম কর্ত্তব্য অস্বীকৃত হইলেও, শেষ দুই প্রকার কর্ত্তব্য তাঁহারা স্বীকার করেন। নিরীশ্বরবাদিগণের মধ্যে আবার দুইপ্রকার মতাবলম্বী আছেন। প্রথম মতাবলম্বীগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ ইহজন্মের অবসানেই সব শেষ হইয়া যায় না, কর্ম্ম-কামনা-বশে মানুষ, জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হয়, এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষয়ে মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এই মহানির্ব্বাণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মানুষের সুখ দুঃখ ও হাসি-কান্না। তাঁহাদের মতে কর্ম্ম অনাদি, কবে কোন্ সময়ে কিপ্রকারে আদি কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা জানা অসম্ভব। প্রতিজন্মে যেমন একদিকে কতকগুলি কর্ম্ম ভোগ দ্বারা নিবৃত্ত হইতেছে, তেমন আবার অপরদিকে নূতন নূতন কর্ম্ম নূতন নূতন বন্ধন-রূপে সৃষ্ট হইতেছে। আত্মসুখেচ্ছা-প্রণোদিত স্বার্থপরতন্ত্র অসৎবাসনা-বশবর্ত্তী কর্ম্ম দুঃখের কারণ এবং সৎকর্ম্ম সুখের কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্ম কামনা ভোগদ্বারাই নিবৃত্ত করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা নিবৃত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত অব্যয় বীজরূপে বর্ত্তমান থাকে। আবার, ভোগদ্বারা কতক কর্ম্ম

নিবৃত্তিলাভ করিলেও নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। আবার নূতন নূতন কর্ম্ম নূতন নূতন জন্মের হেতু হইয়া থাকে। এইরূপে ঘড়ির দোলন (Pendulum) এর মতো মানুষ অবিরামগতিতে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতে বাধ্য হয়। একটি মাত্র উপায় আছে যদ্দ্বারা কর্ম্মের এই দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায়। আত্মসুখেচ্ছা-বর্জ্জিত, পরার্থপরতা-মূলক কর্ম্মদ্বারা সমুদয় কর্ম্ম-বন্ধন বিনষ্ট হয়। একারণ প্রথমত বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাদৃশভাবে কার্য্য করা অভ্যাস হইয়া উঠিলে, নূতন কর্ম্মসঞ্চয় অসম্ভব হয়, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মেরও ক্ষয় হইতে থাকে। ঐরূপ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিতে পারা মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। ঈদৃশ কর্ত্তব্যা-নুষ্ঠানের অনুকূল কর্ম্মকেও কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহানির্ব্বাণদ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত চৈতন্য, বিশ্বের বিরাট চৈতন্য-সাগরে মিলিত হয়। এই মিলনেই নির্ম্মল আনন্দের অভ্যুদয় হয়। এ আনন্দের শেষ নাই, সীমা নাই, অবধি নাই। সসীম অসীমে মিলিয়া অসীমত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা-প্রাপ্তির পর হইতে আর দুঃখ ক্লেশ কিছুই থাকে না। এই মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে মানেন না বটে, কিন্তু অনন্তব্যাপী চৈতন্য-শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না।

নিরীশ্বরবাদীগণের মধ্যে দ্বিতীয় মতাবলম্বীগণ জন্মান্তর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, এই জন্মের অবসানেই মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ধ্বংস হয় এবং দেহের উপকরণরূপী জীবকোষসকলের মধ্যে কতকগুলি সন্তান-দেহে এবং মৃত্যুর পর, অবশিষ্ট জীবকোষসকল অপর কোনো জীবদেহে সঞ্চারিত হয়। ক্রমবিকাশের ফলে সামান্য জীবদেহ হইতে যখন মানবদেহে পরিণত হয়, তখন আপনা হইতেই মন ও বুদ্ধি আদি মানসিক ক্ষমতা সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। চেষ্টা শিক্ষা ও অভ্যাসের বলে মানুষ আপন দেহ ও মনের হিত বা অহিতসাধন করিতে পারে। পিতামাতা আপন আপন দেহ ও মন যেরূপ উন্নত করিতে পারেন, সেইরূপ উন্নতদেহ ও মন সন্তানে সংক্রামিত করিতেও পারেন। সুতরাং যাহাতে সকলেরই দেহ ও মন উন্নত হয় এবং সন্তানগণের দেহ ও মন উৎকৃষ্টভাবে গঠিত হয়, তাদৃশ উপায় অবলম্বন করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন যে, যেসকল শক্তির বশে ক্রমবিকাশ চলিতেছে তাহারা অন্ধ, তাহাদের কেহ স্রষ্টা নাই বলিয়া মূলে কোনো উদ্দেশ্যও নাই। প্রাকৃতিক অসভ্যাবস্থায় মানুষ

যখন নিজ সুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত, তখন মানুষে মানুষে স্বার্থ-সংঘর্ষে দ্বন্দ্ব ঘটিত। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট উপস্থিত হয় দেখিয়া প্রথমে কতকগুলি মনুষ্য পরস্পরের মধ্যে স্ব-স্ব ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতার কিয়দংশ খর্ব্ব করিয়া, কতকগুলি সুবিধাজনক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ক্রমশ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। এইসমস্ত সমাজ স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার্থে দেশ কাল ও অবস্থার উপযোগী নিয়মবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক লোকেরই এই সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আবার সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণকল্পে কার্য্য করা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সুতরাং মানুষমাত্রেরই এরূপভাবে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যেন তদ্দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত, সমাজগত, সমগ্রমনুষ্যজাতিগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, এই উভয়বিধ নিরীশ্বরবাদীগণই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিচার করিলেও মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একরূপই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের মতেই পরহিতার্থে কর্ম্ম মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর আছেন কিনা এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই বিষয় লইয়া আবহমান কাল জগতের মনীষীগণ, জীবনব্যাপী চিন্তা বিচার ও গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। যেসকল মহাত্মাগণের দৃষ্টি, পার্থিব পদার্থ ও শক্তির স্থূল ক্রিয়ার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া চরাচর বিশ্বের মূলকারণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল প্রথিতনামা মহর্ষিগণ চিরকাল জলদগম্ভীরস্বরে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অস্তিত্বরূপ মহা সত্য ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। আমরাও সহজ জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন-সাহায্যে জানিতে পারি যে, প্রত্যেক পদার্থেরই স্রষ্টা, প্রত্যেক বিধিরই বিধাতা এবং প্রত্যেক কার্য্যেরই কর্ত্তা আছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় সৃষ্টির প্রণয়ন করার একটি মূল উদ্দেশ্যও আছে। যাঁহার সৃষ্টি এত বিশাল, যাঁহার বিধি এত সুন্দর, যাঁহার উদ্দেশ্য এত গভীর, তিনি কতই মহান—তিনি সকলের প্রভু বলিয়া আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া ডাকি। তিনি দয়াময়। তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, বিরাম নাই। তাঁহার করুণা বিশ্বের সর্ব্বত্র অবিরত অফুরন্ত প্রবাহে ছুটিতেছে। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার অসীম কৃপায় মাতৃ-বক্ষে

পীযুষ সঞ্চার করিয়া দেন। তৃষিতের বারিসংস্থানের জন্য মেঘাকারে দূর-দূরান্তরে জল লইয়া যান। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বিষয়ে, তাঁহার অসীম দয়া, অপার জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কোটী কোটী জীবের আবাস-ভূমি, অনন্ত পদার্থ শক্তির অনন্ত মিলন ও ক্রীড়ার ক্ষেত্র, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত বিশ্বই সেই করুণাময়ের আলেখ্য—ইহাই তাঁহার পরিচয় পত্র। আলেখ্য যেরূপ চিত্রিত ব্যক্তির সমুদয় গুণ ও লক্ষণ প্রকাশ করিতে অক্ষম, কিয়দংশমাত্র ব্যক্ত করিতে পারে, তদ্রূপ এই বিশ্ব-ছবি পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তির ও গুণের অতি ক্ষীণ আভাসমাত্র, গোষ্পদ-চিহ্নস্থিত জলে পতিত সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্রচিত্তে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা তাঁহার অনন্তসত্ত্বার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদের পক্ষে ধন্যকর। যাঁহার করুণায় আমরা নরদেহ লাভ করিয়াছি, বুদ্ধি মন ও বিচারশক্তি পাইয়াছি, যাঁহার বিধানে আমাদের অভাব সকল পূর্ণ হইতেছে, এবং আমরা অন্তে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়েগিয়া অনন্তশান্তি ও আনন্দ পাইবার জন্য উন্নতির পথে অব্যাহত ভাবে চলিতেছি—সেই দয়ানিধান পরমেশ্বরের শ্রীচরণে সতত ভক্তিযুক্ত মতি রাখিয়া, সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাঁহার মতো আপনার আমাদের আর কেহ নাই।

মানুষের অনুষ্ঠেয় জৈবিক কর্ত্তব্যের মধ্যে কতকগুলি "অন্যোন্য সম্বন্ধি" অর্থাৎ relative এবং অপর কতকগুলি "নান্যোন্য সম্বন্ধি" অর্থাৎ absolute বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কোনো সচ্ছক্তিলাভ করিলে তাহার সদ্ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই "নান্যোন্য সম্বন্ধি" কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে শক্তির ক্রমোৎকর্ষও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহার উপকার করিব, সে আমার উপকার করুক বা নাই করুক তাহা না ভাবিয়া শুধু উপকার করিবার ইচ্ছায় উপকার করাই "নান্যোন্য সম্বন্ধি" কর্ত্তব্য সম্পাদন। এইরূপ নিষ্কাম পরহিতৈষণা-প্রণোদিত কর্ম্মই প্রকৃত "নান্যোন্য সম্বন্ধি" কর্ত্তব্য। ধনীর কর্ত্তব্য দীন দুঃখীর দুঃখ নিবারণ কল্পে অর্থের সদ্ব্যয় করা; জ্ঞানীর কর্ত্তব্য মূর্খ মূঢ় লোকের অজ্ঞতা দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানের অক্ষয় বীজ রোপণ করা; বলীর কর্ত্তব্য বলহীনকে রক্ষা করা ও অভয় দেওয়া। যদি ধনী, জ্ঞানী ও বলীর কৃতকার্য্যের মূলে কোনোরূপ প্রতিদান পাইবার ইচ্ছা নাও থাকে, তথাপি উপকৃতের কর্ত্তব্য, উপকার প্রাপ্তি চিরকাল স্মরণ করিয়া উপকারীর হিত-সাধনে সতত প্রস্তুত থাকা এবং অন্যেরও হিতানুষ্ঠান করা।

যদি উপকারের প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায়ও কোনো কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে উপকারী ও উপকৃতের কর্ত্তব্য পরস্পরের মধ্যে উপকার বিনিময় করা। এইরূপ উপকার বিনিময় ব্যাপদেশে যে কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় তাহা "অন্যোন্যসম্বন্ধি বা relative.

"কর্ত্তব্য" এই শব্দের অর্থ "যাহা করা উচিত" সুতরাং যাহা যুক্তিদ্বারা উপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় তাহাই কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুগণের মধ্যে যুক্তি ও বিচার শক্তির অভাব থাকায় বস্তুত তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব জ্ঞান নাই। সুতরাং আমাদিগেরই তাহাদের প্রতি "নাস্ত্যোন্য সম্বন্ধি" অর্থাৎ absolute কর্ত্তব্য আছে। তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা বা তাহাদিগকে যাতনা দেওয়া আমাদিগের উচিত নহে। তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে উপযুক্ত পদ্ধতি আশ্রয় করিতে হয়। অসৎব্যক্তিকে সৎপথে চালিত করা সাধু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শাস্তি বা ভৎর্সনায় প্রকৃতভাবে চরিত্র সংশোধন করা যায় না। দুষ্ট ব্যক্তিকে ঘৃণা করিলে, তাহার চরিত্র সংশোধন করা দূরে থাকুক, সে উত্তরোত্তর উৎকটতর দোষ করিতে থাকিবে, সেইজন্য সহানুভূতির সহিত তাহার মানস-পটে সদ্‌গুণ অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। কোপন-স্বভাব উদ্ধত বালক ক্রন্দনের সুর ধরিলে, তাহাকে অনেক সময়ে তিরস্কার বা প্রহার দ্বারা নিরস্ত করা সম্ভবপর হয় না; বরং তাহাতে তাহাকে অধিকতর উত্তেজিত করা হয়। এস্থলে ভালো খেলানাদি দিয়া তাহার চিত্ত অন্যদিকে চালিত করিতে পারিলে সে ক্রন্দনে নিরস্ত হইবে। পরে তাহার নিকট সর্ব্বদা শান্ত ও সৎ বালকগণের চিত্র ধরিলে এবং তাহার সম্মুখে শান্তভাব ও সদয় স্নেহপূর্ণ আচরণ দেখাইলে, সঙ্গ, শিক্ষা ও আদর্শের গুণে সে শীঘ্রই শান্তপ্রকৃতি হইয়া উঠিবে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, অগ্নিতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না; জলেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোনো মিশ্রিত স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, শিল্পী প্রথমত তাহাকে দ্রবে (acid)এ নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাহার খাদ ও মলিনতা দূর হয়, পুনরায় তাহাকে অগ্নির তাপে গলাইয়া বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়; খাদ দেখিয়া শিল্পী নিরাশ হয় না। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা অসৎ মানুষের ভিতরে প্রচ্ছন্ন মহৎভাব আছে জানিতে পারিয়া ভালোবাসা ও সহানুভূতির দ্রবে নিক্ষেপ করিয়া তাহার অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন ও স্বভাব বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া থাকেন।

অতি কঠিন প্রস্তরও অবিরত জলপ্রপাতে ক্রমশ গলিয়া যায়, প্রকৃত নিষ্কাম ভালোবাসার সংস্পর্শে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া থাকে। ভালোবাসার ক্ষমতা অনন্ত। বিশ্বে যত প্রকার কল্যাণকর শক্তি আছে, তন্মধ্যে ভালোবাসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভালোবাসার বলেই বিশ্ব ও বিশ্বস্থিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ ও প্রাণীসকল সৃজিত হইয়াছে ; এই ভালোবাসার বলেই তাহারা উন্নতির পথে চলিয়াছে এবং এই ভালোবাসার বলেই অন্তে অনন্তে মিলিত হইবে। এই ভালোবাসাই সন্তানের প্রতি বাৎসল্যরূপে, ভাই-ভগিনীর মধ্যে প্রীতিরূপে, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধারূপে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রেমরূপে,—আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব প্রতিবেশী স্বদেশবাসী মনুষ্যজাতি ও জগৎবাসী পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্ব-প্রেমিক মহাত্মাগণের প্রেম প্রবাহ পূততোয়া মন্দাকিনীর ন্যায় সতত অনাবিল ও অফুরন্তভাবে নিত্যবহমান ; তাহার মধ্যে যেই আসে, সে যেমনই হউক, ভাসিয়া যাইবেই। ইতিহাস এইসকল মহাপুরুষের পবিত্র চরিত্র-গাথা উচ্চকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছে। ইঁহারা নামের কাঙাল ছিলেন না, ভালোবাসা পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন না—নিষ্কাম পবিত্র ভালোবাসা বিলাইবার জন্য সতত উৎসুক ও ব্যগ্র ছিলেন। ইঁহারা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কারণ, আপন আপন ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থ, ঐশ্বর্য্য, আত্মাভিমান, আভিজাত্য-গৌরব, পদমর্য্যাদা ও সুখ-সমৃদ্ধি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমানুরাগে জগতের হিতসাধনে নিরত হইয়াছিলেন। প্রেমের অবতার বুদ্ধদেব, জগতের সন্তপ্ত জীবগণের কাতর আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া, স্বীয় যৌবরাজ্য, সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা, সদ্যোজাত ফুল্লকুসুম-সুন্দর পুত্র, স্নেহ-প্রবণ পিতা, বিশ্বস্ত অনুরক্ত কুটুম্ব, স্বজন সুহৃদ, ভৃত্য ও অনুচরগণকে পরিত্যাগ করিয়া জীবের মঙ্গল-কল্পে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহাসত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তারপর কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে কিন্তু আজো সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রায় ⅓ অংশ লোক এই মহাসত্যের বরেণ্য প্রচারককে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি-সহকারে পূজা করিয়া আসিতেছেন। আজ পাশ্চাত্য সভ্য জাতি সমূহ যে মহাপুরুষের পবিত্র নামে আপনাদের ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, যেই মহাত্মা যিশুখৃষ্ট প্রেমের উপাসক ছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে অশেষবিধ শারীরিক যাতনা দিয়া নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেও, তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার নিকট প্রেম মহাসত্যরূপে এবং জগদীশ্বর প্রেমময় পিতা রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। প্রেমের পরীক্ষায় তাঁহার ভৌতিক দেহ

নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি মরিয়াও অমর হইয়াছেন।

আমাদের বাংলা দেশে যখন অধর্ম্মের স্রোত, পল্লী গ্রাম ও নগর কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন, মহাত্মা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের বন্যা ছুটাইয়া অধর্ম্ম পূতি বিদূরিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদর্শে গড়া সাঙ্গপাঙ্গগণের মধ্যেও এমনই প্রেমের উৎস ছুটিয়াছিল যে, তাঁহারা জগাই মাধাই প্রভৃতির অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত নিষ্কাম প্রেমের এমনই উন্মাদনা যে, তৎপ্রভাবে নিতান্ত অসাধুও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠে।

এইরূপ সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির ইতিহাসে মহাপুরুষগণের মধ্যে বিশ্বপ্রেমের মহামহিমাময় উজ্জ্বল চিত্র লক্ষিত হয়।

নিষ্কাম প্রেমের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্যসাধন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ঃ—সমগ্র পদার্থ ও শক্তি-তত্ত্ব এবং মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য-তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিতে এক জীবনে কুলায় না। এই মহা-ব্রতে রত থাকিলে কালে অমূল্য জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়। পদার্থ অনন্ত, শক্তি অনন্ত এবং তাহাদের সম্বন্ধও অনন্ত—কল্পনাতীত। যিনি পদার্থ ও শক্তি রচনা করিয়াছেন সেই দয়াময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে, যেন এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারই করুণা-বলে আমাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠে এবং আমরা স্ব-স্ব কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জ্ঞান ও শান্তিলাভ করিতে পারি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

সংস্কারে কালের প্রভাব

দেশে সংস্কারের ধুম পড়িয়াছে। দেশেই বা কেন—দেশবিদেশে ইহারই হাওয়া বহিতেছে। আবার এই য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবসানে ভূমণ্ডলের মানচিত্র খানি কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে এই যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ধাক্কা চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজসমূহে লাগিবে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্রই ভিন্ন প্রকার সংস্কারকার্য্যের

প্রবর্ত্তন হইবে। অন্যান্য জাতি তাহাতে কি ভাবে যোগদান করিবে কে জানে, কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র। মহাসমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জের ন্যায় ভারত বক্ষে আমরা ভাসিতেছি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র দ্বীপই স্বীয় জাতি, আচার, ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কারের বেড়াজালে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং অন্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছে। আজকাল কোন কোন সমাজহিতৈষীর মুখে শুনা যায়, "সে দিন আর নাই, এখন ভাইকে ভাই চিনিয়াছে, প্রাণে প্রাণ মিশিয়াছে, মান অভিমান ভাসাইয়া দিয়া বড় ছোটকে আলিঙ্গন করিতেছে—দেশে একজাতি একপ্রাণ গড়িয়া উঠিতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ মেলাস্থলে, স্নানপর্ব্বে, দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে। সাক্ষ্য আছে ফুটবল টীমে, শববহনেও বলা যাইতে পারে। আমরা কিন্তু চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া সহসা বিশ্বাসটাকে মনের মধ্যে জমাইতে পারি না, এবং কোন কিছুর স্থায়িত্ব না দেখিয়া তাহার উপর ভরসাও বড় রাখি না। এই হেতু আমাদের ধারণা বহুদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মতটা যে বদলায় সেটা অনেকের মতে দোষের, কিন্তু এ স্বভাবটা অপরিহার্য্য। গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে অনেকবার আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া কতকগুলি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। সে গুলি এক নিঃশ্বাসে বলা কঠিন, কিন্তু একে একে সময়ে সময়ে বলা যাইবে।

সমাজের সর্ব্বত্রই যে একটা সাড়া পড়িয়াছে, সভা সমিতি বক্তৃতা আর লেখার চালনায় যে তাহা জানা যাইতেছে, তাহাই নহে, প্রত্যেকের মনের মধ্যে আন্দোলনের একটা ঝড় বহিতেছে। এখন পরস্পর পরস্পরের সাধু ব্যবহারে ও সততায় সন্দেহ করিতেছেন। স্বার্থসংরক্ষণনীতি এক তন্ত্রের লোককে জোট বাঁধিতে বাধ্য করিতেছে এবং তন্ত্রনায়কগণ স্ব স্ব স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া অপর সকলকে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিতেছেন, ফলে দলাদলির ভাব নবীভূত হইয়া উঠিতেছে। ইহা সাহিত্যের ভাষায় 'নব-জাগরণ।' কিন্তু ইহাকে আমরা ঠিক জাগরণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিনা। আমাদের ধারণা ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই। আমরা সুনিদ্রার পর পরিষ্কারভাবে জাগি নাই। আমাদের কেহ স্বপ্নে জাগিয়াছেন, কেহ জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নের রাজ্য এখনও আমরা ছাড়াইয়া উঠি নাই। সংসার ও সমাজের বাস্তবস্পর্শে আসেন নাই এমন নব্য যুবক—যাঁহারা সাগরপারের জীবন্ত জাগ্রত সাহিত্যে অনুপ্রাণিত, যাঁহারা প্রতীচ্যের সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কল্পনারাজ্যের মোহন সঙ্গীতে বিমুগ্ধ, তাঁহাদের হৃদয়ের স্পন্দন, শোণিতের প্রবাহ, প্রাণের আবেগ,

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মশাসিত সমাজ ও সংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম গতিতে তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। আজকাল দেশবাসীর সেবায়, নারীর সম্ভ্রমরক্ষায়, দুঃস্থের সাহায্যে, জলমগ্নের উদ্ধারে, বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সখ্যবন্ধনে অথবা ভিন্নজাতির শববহনে তাঁহাদেরই দেখিতে পাই—তাঁহারা প্রায় সকলেই যুবক। এ সকল দেখিয়াও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুকটা দশহাত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে আমরা প্রকৃতই হৃদয়হীন! কিন্তু দাঁড়ান্, একটু অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে, একটু চোখ বুজিয়া ভাবিতে দিন! আমাদের ছেলেরা প্রৌঢ় বা অতীতযৌবন বাপ মায়ের কাছে ঘরের আবহাওয়ায় যে ভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে, যৌবনে পদার্পণ করিয়া স্কুল কলেজের আবহাওয়ায় ঠিক তেমনটি থাকে না। সাধারণতঃ এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক ভাব শিথিল হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার গুণে তাহাদের হৃদয় সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং অন্যায় দেখিলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সেই যুবাই সংসারে প্রবেশ করিয়া, সমাজের তালিম পাইতে পাইতে প্রৌঢ় বয়সে স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় নূতন মানুষ গড়িয়া উঠে! এ দেশে শিক্ষিত সমাজে ইহাই সাধারণ, অন্যথা ব্যতিক্রম মাত্র। সে দিন যে যুবক তাঁহাদের কলেজ বোর্ডিংকে জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত করিবার আগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, যিনি মাঞ্চুদিগের লম্বিতবেণী ও দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘশিখার উল্লেখ করিয়া কতই না উপহাস করিয়াছিলেন, যিনি আন্তর্জাতিক বিবাহবিরোধীর প্রতিবাদে অগ্নিশর্ম্মা এবং আভিজাত্য গর্ব্বিত বা কৌলিন্য অভিমানীর নিন্দায় শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দেখুন! তাঁহার যৌবনের সে আশা, ভারতে একজাতি একপ্রাণ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্ন বিদায় লইয়াছে—তাঁহারই মস্তকে হয়তো এখন এক দীর্ঘশিখা শোভা পাইতেছে। তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিভ্রান্তমস্তিষ্ক যুবকদলের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইতেছেন! তিনি এখন আসনশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, শোণিত-শুদ্ধি, আহারশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, সমাজশুদ্ধি প্রভৃতি শুদ্ধি-তত্ত্বে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এখন তিনি আপনাকে সেকেলে বলিয়া পরিচয় দিতে বেশ সুখানুভব করেন, এবং সেকালের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য মেহনৎও করিয়া থাকেন। এখন যাহা কিছু নূতন তাহাই তাঁহার চক্ষুশূল, বাবুজী "ব্রাবু" ভয়ের আতঙ্কে এখন আড়ষ্ট! পূর্ব্বের ম্লেচ্ছভাব, ম্লেচ্ছাচার পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেকেলে হওয়াই চাই। হওয়াটা যে দোষের এ কথা আমরা

বলিতেছি না কিন্তু শত শত ক্ষেত্রে যে এরূপ হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। আর এটা যে একটা ফ্যাসানে পরিণত হইতেছে তাহাও দেখিতেছি। সুতরাং যুবকগণের কীর্ত্তি একদিকে দেশের "যুবকগণেরই" আদর্শ বা অনুকরণীয় হইতেছে, এবং অপর দিকে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিবার ও ভবিষ্যবংশীয়দিগের গর্ব্ব করিবার উপকরণ স্বরূপে স্তুপীকৃত হইয়া উঠিতেছে মাত্র।

যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াও যাঁহারা পিছন ফিরিতে চাহেন না তাঁহারা অগ্রগতিশীল কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যৌবনের সহপাঠীদিগের এই পরিবর্ত্তন ও প্রতিক্রিয়ার ফল লক্ষ্য করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমাজের মঙ্গলের আশায় নিরাশ হইতেছেন তাঁহারা দেশ ও সমাজের ভাবনা ছাড়িয়া নিজের ভাবনা লইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের যৌবনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া এখন তাঁহারা দেশের বাস্তবস্পর্শে আসিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধানকার্য্য সংবাদ-পত্রে আন্দোলনাদির বিবরণ পাঠ ও দীরেসুস্থে তাহার সমালোচনা। তাঁহারা সকলকেই বিনামূল্যে উপদেশ দেন কিন্তু কাহারও উপদেশ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সভায়ও যান, বক্তৃতাও শুনেন, কিন্তু দলে মিশেন না, তাঁহারা সমাজে যান প্রার্থনা শুনেন, হরিসভায় যান চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া গৃহে ফিরেন, কিন্তু 'ভবী আর ভোলে না', তাঁহারা কোন দলই পুষ্ট করেন না! অথচ কি রক্ষণশীল কি অগ্রগতিশীল উভয়েই ইঁহাদিগের মতিগতি ফিরাইয়া দিয়াছেন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা মাঝে যেন ব্যবধান হইয়া আছেন; আর উন্নতিশীল সম্মুখে ধাবিত হইতেছেন, রক্ষণশীল পশ্চাতে চাহিয়া আছেন। অগ্রগতিশীলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, রক্ষণশীলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। উভয়েই জাগিয়াছেন, কিন্তু যাহার আশায় বসিয়া আছেন সেইটাই তাঁহাদের স্বপ্ন। সুতরাং উভয়েই জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। গতিশীলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কারণ, প্রকৃতই তাঁহাদের আশা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। যতদিন তাঁহারা দেশে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বা করাইতে না পারিবেন ততদিন তাঁহারা যে সময়ের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চাহেন তাহা হইবে না। কাল পরিবর্ত্তন ঘটাইবে সত্য, কিন্তু কি ভাবে ঘটাইবে, তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবে কিনা তাহা কে বলিবে? অশিক্ষিত জনসাধারণ সহজেই চিরন্তনের মোহে মুগ্ধ। রক্ষণশীলের স্বল্প প্রযত্নে তাহারা পুরাতনকেই বরণ করিয়া লইবে। সুতরাং অগ্রগতিশীলের জাগিয়া স্বপ্ন দেখাই সার হইবে।

রক্ষণশীল আবার দুই শ্রেণীর, এক শ্রেণীর মত—"আমাদের যাহা ছিল তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সনাতন এবং শাশ্বত," সুতরাং আধুনিক বিভ্রান্তপথ ত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্যের মোহ পরিহার করিয়া প্রাচীন মহাজনগণের পথেই চলিতে হইবে। তেত্রিশকোটি দেবতা, রঘুনন্দন, কৌলিকআচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হইবে, কিন্তু ঔষধার্থে সুরাপানবৎ জীবিকার্থে ম্লেচ্ছসংস্রব বা পশ্চাত্যসাহিত্য, ও পাশ্চত্যবিজ্ঞানের অনুশীলনে দোষ হইবে না। এককথায় তাঁহাদের ধর্ম্ম জাতিভেদ রক্ষায়, শোনিতশুদ্ধি এবং আহারশুদ্ধিতে বজায় থাকে। ইঁহাদের সংখ্যাই এতদিন পনের আনা ভাগ ছিল কিন্তু অধুনা রক্ষণশীলদিগের মধ্যেও একদল অতিনৈষ্ঠিক (puritan) দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা চাতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্টিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মের কেন্দ্রগুলিতে বিরাট সঙ্ঘ ও দীর্ঘ প্রস্তাব করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ফিরাইয়া আনিতে বা তাহাতে ফিরিয়া যাইতে যুক্তি করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। ইঁহারা বর্ত্তমানের আচার অনুষ্ঠান দেশের লোকের মতিগতি, নিম্নবর্ণের অবস্থা ও আচরণ, তাহাদের প্রতি উচ্চবর্ণের আজন্মসংস্কারগত দাবী প্রভৃতি আলোচনা করিয়া, অন্যের বর্ত্তমান ও আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চাতুর্ব্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন শূদ্র লইয়া। শূদ্র প্রকৃত পক্ষে কাহারা—তাহার নির্ণয়, নির্ব্বাচন ও স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে তাহাদের বাধ্য করণ কি উপায়ে সম্ভব হইবে? দেশময় অজ্ঞানতার যে নিবীড় অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, তাহাতে অধিকাংশ শূদ্রকে শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ হইতে পারে; এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও জল স্পর্শ কাহারও বা ছায়াস্পর্শ না করিয়া ও অন্য তিনবর্ণের পক্ষে সকলেরই নিকট হইতে সেবা ও ভক্তি আদায় হইতে পারে; সমাজের শাসন, নরকের ভয়, ব্রহ্মশাপ ও অক্ষয়স্বর্গের লোভ তৎপক্ষে অব্যর্থ উপায়ও হইতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও এই বিংশশতাব্দীর শূদ্র স্বোপার্জ্জিত ধনে অস্বামিত্ব স্বীকার করিবে বলিয়া কখনই মনে হয় না। তাহার পর, জপ হোম শাস্ত্রপাঠাদি দ্বিজোচিত কর্ম্মে নিরত হইলে সেই শূদ্রকে কোন্ রাজা বধ করিয়া রাজ্যকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন?*

* "বধ্যো রাজ্ঞো স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ। ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্॥"—স্মৃতিঃ।

বর্ণাশ্রমের সকল লক্ষণাক্রান্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণাদি এখন কোথায়? তাহা সাধারণের ত জানিবার উপায় নাই আছেন নিশ্চয়ই, না হইলে, উপকরণের একান্তাভাবে আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে কি প্রকারে? যদি থাকেন তাহা হইলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগীদিগের মধ্যেই থাকা অবশ্য সম্ভব। কিন্তু তাঁহারা বিদ্যমান থাকিতে, সেই তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণের বংশধরগণ আজিও বর্ত্তমান থাকিতে, সেই অভ্রান্ত স্মার্ত্তগণ প্রবর্ত্তিত নির্দ্দোষ সমাজ এমন অবস্থায় দাঁড়াইল কেন, যাহার জন্য এই উদ্‌যোগের প্রয়োজন হইল? কাহার দোষে এরূপ হইল? ঋষি-বাক্য যদি অভ্রান্তই হয়, তাহা হইলে দোষ কাহারও নয়, ইহা কালেরই ধর্ম্ম। একপাদধর্ম্ম কলির ইহা যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ভবিষ্যপুরাণকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যুগধর্ম্মপালনে কি ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়? পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট কালগণনায় কলির ইহা সন্ধ্যা! বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন কর্ত্তা সেই প্রদোষের মুখে প্রভাতের হাসি ফুটাইতে চাহেন, তাহা কেমন করিয়া হইবে? কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া কলি বিদায় লইবেন কেন? তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। কথক ঠাকুরের গল্পটি এখানে মনে পড়ে,—রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার রাজ্যে অনাচারের হেতু নির্ণয়ার্থ বহু অনুসন্ধান করিয়া কলির দর্শন পান। কলিকে তখন রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তিনি মনস্থ করেন। কিন্তু 'নাছোড়বান্দা' কলি কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার শরণাগত হন। রাজা তখন মহা সমস্যায় পতিত হন। শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া রাজধর্ম্ম, কিন্তু একদিকে কলিকে আশ্রয় দিলে রাজ্য যায়, অন্যদিকে শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে রাজধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, আর তাহা হইলে, কলি সেই সূত্রে যদি স্বয়ংই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বসেন! আমাদের ধারণা কলি ইতিপূর্ব্বেই সভাসমিতিগুলিকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছেন। কারণ এ যুগে কলির পক্ষে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। শতছিদ্র সমাজ কলির একপ্রকার আশ্রয়স্থল হইয়াই আছে। তীক্ষ্ণধী সংস্কারকগণ যে তাহা বুঝিতেছেন না তাহা নহে, কিন্তু 'গরজ বড় বালাই'। তাঁহারা মনকে বুঝাইয়াও আশার আলোক দেখিতেছেন অথবা জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছেন। এখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই সভাসমিতিগুলি কলহের কেন্দ্র ও কুৎসা প্রচারের ক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে কলহের মীমাংসার জন্য যাঁহারা বর্ণাশ্রমের ধারও ধারেন না এখন তাঁহাদের নিকটও দাঁড়াইতে হইতেছে! কালের প্রভাব আর কাহাকে বলে?

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও ধর্ম্মপ্রচার

মানবহৃদয়ের উপর সাহিত্যের শক্তি অতি আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করে। সাহিত্য মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়; সাহিত্য মানুষকে উত্তেজিত করে, অভিভূত করে; সাহিত্য মানুষের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করে, সাহিত্য মানবমনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করে; মানুষ সাহিত্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখনই কোনো জাতির মধ্যে মহ: পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, যখনই কোনো জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং যখনই কোনো জাতি জগতে মহাসত্য প্রচার করিয়াছে, তখনই সেই জাতির সাহিত্য অদ্ভুত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; অদ্যাপি পৃথিবীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতেছেন। বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্য সৌন্দর্য্যে, রসে ও শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙালীর অপূর্ব্ব সম্পদ। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্যই বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির মধ্যে আমরা কি লক্ষ্য করিতেছি? আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের প্রকৃত গদ্য সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সাহিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত সত্য ও তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত বাণী সাহিত্যই বহন করিয়া নানা সম্প্রদায়ের লোকের কাছে লইয়া গিয়াছে। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রাজ-নারায়ণ বসু, মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দিগের সাধন ও চিন্তালব্ধ সত্য এবং কণ্ঠোচ্চারিত বাণী, সাহিত্যই ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের নিকট লইয়া গিয়াছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র, রাজানারায়ণ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপরবর্ত্তী সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, উপা-ধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের

খ্যাতনামা প্রচারকগণ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের সংস্পর্শে আসিয়াই বিস্তর লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এ কথা সত্য বটে; কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে, ইঁহাদের প্রচারিত সত্য ও কণ্ঠোচ্চারিত বাণী সাহিত্যের মধ্যেই সুরক্ষিত হইয়া আছে এবং সাহিত্যই দেশ-দেশান্তরে নানা সম্প্রদায়ের লোকের নিকট উহা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার বাংলা দেশের ধর্ম্ম-সাহিত্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই পরিপুষ্ট ও সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদিগকে এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ সঙ্গীতগুলি বাংলা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কালের ভীষণ আক্রমণেও সাহিত্যের এই গৌরব বিলুপ্ত হইবার নহে। সুতরাং আমরা উত্তম রূপেই বুঝিতে পারিতেছি, ধর্ম্ম-সমাজের মনীষী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যকেই গড়িয়া তোলেন, সেই সাহিত্যই তাঁহাদের সহায় হইয়া তাঁহাদিগের সাধন-লব্ধ সত্য ও মনের চিন্তাকে নানা দেশে নানা শ্রেণীর লোকের নিকট প্রচার করে এবং ঐ সাহিত্যই সত্য ও চিন্তাকে অমর করিয়া যুগযুগান্তর আপনার মধ্যে রক্ষা করে।

সাহিত্য মানুষের মনের উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে আরো দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দেশে হিন্দুধর্ম্মের যে পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূলে বাংলা সাহিত্য। সত্য বটে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—এই দুইজন বক্তা নানা স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া লোকের অন্তরে প্রাচীন ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র এবং কতকগুলি বাংলা গ্রন্থ ও নাটক যে সমস্ত দেশের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলনের একটা প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। যেমন পার্ব্বত্য নদীর স্রোত পাথরের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া, সেই পাথরকে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় করিয়া ফেলে, তেমনি যেন নব অভ্যুদিত হিন্দুধর্ম্মের প্রবলস্রোত ব্রাহ্মধর্ম্মের পাথরের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি আশ্চর্য্য ভাবে প্রচারিত হইতেছে এবং বাংলা দেশের বিস্তর পুরুষ ও মহিলার হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সঙ্গীত ও

গদ্য রচনার প্রভাব একশ্রেণীর সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকের উপর নিতান্ত অল্প নহে। আমরা যে দিক্ হইতেই চিন্তা করি না কেন, মানুষের হৃদয়ের উপর সাহিত্যের প্রভাব যে অত্যন্ত অধিক এবং এই সাহিত্য যে সত্যপ্রচারের ও ধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রচারার্থী ধর্ম্ম এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। এমন এক সময় ছিল, যখন দুই-চারি-জন শক্তিশালী সাধক নির্জ্জনে বসিয়া, কঠোর সাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন ও তৎসঙ্গে অলৌকিক শক্তিলাভ করিতে পারিলেই, ধর্ম্মার্থী লোকেরা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া, সাধনের উপায় জানিবার জন্য এবং কিছু শক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির কাছে ছুটিয়া যাইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোকের মতিগতির বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; মানুষের অলৌকিক শক্তির প্রতি লোকের তো বিশ্বাস নাই-ই, তাহা ছাড়া মানুষ ধর্ম্মোপদেশ লাভের নিমিত্ত নিভৃত গিরিগুহায় কোনো বিশেষ তপস্বীর নিকট যে ছুটিয়া যাইবে, তাহারো কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষের জীবনসংগ্রাম বড় কঠোর; কোনো পিপাসু ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য অতটা সময় দিবার এবং ক্লেশ সহিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুবিধা কোথায়? তবে এ কথাও সত্য যে, ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ন্যায় সাধক ও ভাবসম্পদ্‌শালী ভক্তের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধকেরা ধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া আমাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের নির্জ্জীব ও অবসন্ন প্রাণ সহজে জাগ্রত হইবে না। কিন্তু আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেবেন্দ্রনাথের ও কেশবচন্দ্রের আধ্যা-ত্মিক সম্পদ নিতান্ত সামান্য নহে; এই দুই ধার্ম্মিক পুরুষ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে, দেশের ইতিহাস ইঁহাদিগকে যে কত উচ্চস্থানে তুলিয়া ধরিত তাহা কল্পনা করা কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। আমরা যে সকল সময়ই তাঁহাদের ন্যায় প্রভূত শক্তিশালী ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমাজের মধ্যে দেখিতে পাইব, সে আশা দুরাশা মাত্র। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মধ্যে যেসকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই প্রাণপণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে। এক সময় ছিল, যখন শুধু ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকের নিকটই ধর্ম্মপ্রচার করা আবশ্যক হইত; কিন্তু এখন আমাদের ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই নরনারীর প্রাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা প্রয়োজন।

* * * * *

যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা অত্যন্ত প্রয়োজনই হয়, তবে বাংলাদেশে উহা প্রচারের জন্য বাংলাসাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজে শক্তিশালী সাহিত্যিকের সংখ্যা যে খুব বেশী, এ কথা বলিতে পারি না। সেই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্মসাধনের মতো আমাদের সাহিত্য-সাধনারও অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহাদের ভাব-সম্পদের অধিকারী হওয়াও প্রয়োজন, ভাষায়ও তাঁহাদের অধিকার থাকা আবশ্যক। নচেৎ মনের কথা মুখে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সত্য যতই প্রয়োজনীয় সামগ্রী হউক না কেন, উহাকে ভাষা ও ভাবের দ্বারা সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে মানুষ সহজে গ্রহণ করে না। ভাববিহীন তার্কিকের চেয়ে ভাবুক সাহিত্যিক ও কবি সত্যকে সহজে মানব-মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। ভারতবর্ষে অনেক দার্শনিকের অভ্যুদয় হইয়াছে কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের কবি সত্যকে ও ধর্ম্মকে সর্ব্ব-শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ে যেরূপ সহজে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন, এমন আর কেহই পারে নাই। কোনো কোনো ব্রাহ্ম বলেন, মুখে যাহার ভাষা ভালো করিয়া ফোটে না, এমন লোকও শুধু ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে মানুষকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের তো একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছেই। কিন্তু দেখিতেছি, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রচারকদিগের সাহিত্য ও ভাষার উপর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইঁহাদের ধর্ম্মজীবন ও সাহিত্য-সম্পদ উভয় মিলিত হইয়াই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বসকলকে নরনারীর আকর্ষণের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অতএব আমরা যদি উক্তরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহি, তবে সাহিত্যেরও সাধনা করিতে হইবে।

*　　*　　*　　*　　*

(তত্ত্বকৌমুদী, ১লা শ্রাবণ ।)　　শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দেবকুমার

১

রামকৃষ্ণপুর বঙ্গদেশের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। শৈবাল-আচ্ছাদিত দ্বিতল অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ দীঘি এবং সুদীর্ঘ পুরাতন তালবৃক্ষশ্রেণী প্রাচীনত্বের পরিচয় দিয়া

বহুদূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রায় বংশ নাবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এখানে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে এ স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া মনোনীত করেন। তখন ইহার দক্ষিণদিক দিয়া স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত হইত। এখন তাহা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

রায় বংশীয়েরা এই গ্রাম ও ইহার সন্নিহিত শস্যক্ষেত্র প্রথমে হরিহরপুরের জমিদারদিগের নিকট হইতে জমা লইয়াছিলেন। ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টীংসের সময়ে এবং পরবর্ত্তী কালে অনেক বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জমিদার বলিয়া খ্যাত হন। পূর্ব্বে তাঁহারাই প্রজাগণের হর্ত্তা-কর্ত্তা ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে ইঁহারাই তাহার বিচার করিতেন। শাস্তিটা প্রায় জরিমানা দ্বারাই হইত, অধিকন্তু পাদুকার আঘাতও অপরাধের গুরুত্ব প্রকাশ করিত। প্রজা অবাধ্য অথবা বিদ্রোহী হইলে লাঠিয়াল পাঠাইয়া ধরিয়া আনিতেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের লাঞ্ছনা করিতেন। ফলে তাঁহাদের ভয়ে চতুস্পার্শ্বস্থ সকলেই শঙ্কিত থাকিত।

কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ক্ষমতা পরে আর রহিল না। বংশবৃদ্ধি হওয়াতে ইঁহারা বহুপরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং সম্পত্তিও নানা অংশে বিভক্ত হইল। এদিকে ইঁহারা বিবাহাদির সুবিধার জন্য স্বশ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি ও শস্যক্ষেত্র যৌতুক দিয়া এই গ্রামে আনিয়াছিলেন; তাঁহারাও পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় অর্থে ও সামর্থ্যে রায় বংশের সমকক্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর রামকৃষ্ণপুর সুধু রায়দের গ্রাম বলা যায় না, ইহা একটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই গ্রামে আরও দুই জাতি বাস করে। তাহারা কায়স্থ ও নমশূদ্র। নমশূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের জমি চাষ করিত, গোরু রাখিত, নৌকা বাহিত এবং মোট বহিত। কাজের কোনোরূপ ক্রটী হইলে, বাবুরা তাহাদিগকে যদৃচ্ছা ভাষায় গালি দিতেন এবং সময় সময় প্রহার করিতেন। তাহারা অম্লান বদনে সে সকল সহ্য করিত। বাবুরা একে জমিদার তাহাতে ব্রাহ্মণ। নমশূদ্রদিগের সাহায্যে তাঁহাদের জ্বালানিকাষ্ঠ, শিশুদিগের দুগ্ধ—আহারের অন্ন পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইত; কিন্তু সেজন্য মনে-মনেও একটা কৃতজ্ঞতার ভাব হওয়াও দূরে থাক্ তাহাদের কোনো ক্রটী হইলে আর রক্ষা ছিল না। ব্রাহ্মণগণ যেমন বিশ্বাস করেন উহারা এইরূপ কার্য্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, নমশূদ্ররাও

সেইরূপ মনে করে ইহাই তাহাদের বিধিলিপি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, গ্রামের যে অংশে নমশূদ্রদিগের বাস ছিল, তাহা রায় বাবুদিগের সম্পত্তি নহে। হরিহরপুরের জমিদারের কর্ম্মচারী আসিয়া বৎসর-বৎসর তাহা-দিগের নিকট হইতে খাজনা লইয়া যায়।

গ্রামের অপর জাতি অল্প কয়েক ঘর কায়স্থ। তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণেরা হীন চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তাহাদের জল আচরণীয় ছিল। জল তোলা, বাসন মাজা এবং জমিদার বাবুদের অপরাপর সকল কাজ সাধারণত তাহারাই করিত। ইহাদের মধ্যে যাহারা সামন্য একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহারা গোমস্তা ও সরকারের কাজ করিত। জমিদার বাবুদিগের নিকট ইহারাও সতত গলবস্ত্র ও বিনীত থাকিত। ইহা ভিন্ন কয়েক ঘর ধোবা, দু' তিন ঘর নাপিতও সে গ্রামে বাস করিত। জমিদার বাবুরা ইহাদের কিছু কিছু জমি দিয়াছিলেন, তাহার খাজনা স্বরূপ তাহারা তাঁহাদের কাজ করিত।

জমিদার বংশীয়ের মধ্যে যাহারা প্রৌঢ় তাঁহারা বৈষয়িক কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। মকদ্দামা-মামলা, পূজা-পার্ব্বণ, দলাদলি, একটা-না-একটা কাজে তাঁহাদের সময় এক প্রকারে কাটিত, কিন্তু নব্য বাবুদের আর সময় কাটে না; সকাল বেলা এ-বাড়ি-ও-বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো, মধ্যাহ্নে তাসপাশা খেলা, বৈকালে গল্পগুজব করিয়াও সময় কাটে না। সৌভাগ্যের বিষয় যে, তামাক ব্যতীত এই গ্রামখানির মধ্যে আর কোনো নেশার আবিলতা তখন পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। আহারের জন্য বিশেষ চিন্তা নাই বলিয়াই যেন লেখাপড়া শিক্ষার দিকে ইঁহাদের আগ্রহ ছিল না, অনেকে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অতএব এই নব্যবাবুদের সময় কাটানো ভারবহ হইয়া পড়িল।

একদিন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "এস না আমরা সখের থিয়েটার করি। রোজ রোজ আর তাসপাশা ভালো লাগে না।"

এ প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই 'বাহবা' 'বাহবা' করিয়া উঠিলেন। এবং সকলে একবাক্যে বলিলেন, "বেশকথা ভাই, খুব ফুর্ত্তিতে থাকা যাবে।"

দ্রুতগতিতে থিয়েটারের জন্য সকল বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে পট আনিবার জন্য লোক গেল। নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাহারা ভালো গাহিতে ও বাজাইতে পারে তাহাদিগকে আনিবার জন্য সংবাদ গেল। প্রথমে কি অভিনয় হইবে—কে কোন্ পাঠ লইবে এই সকল স্থির হইতে লাগিল। তার মধ্যে একটি কথা উঠিল, রামলালের মতো কাহারো ভালো গলা ছিল না, কিন্তু রামলাল নম

শূদ্র, দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান, বয়স বারো বৎসরের অধিক হইবে না। তাহার চেহারাটি অতি সুন্দর, দেখিতে গৌরবর্ণ, কোঁকড়ানো চুলগুলি গ্রীবা ও কর্ণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর নির্জ্জন প্রান্তর দিয়া যখন সে গলা ছাড়িয়া গান করিতে করিতে যাইত, অথবা মধ্যাহ্নে গোরু চরাইতে চরাইতে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যখন সে গান করিত, তখন লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা শুনিত। মেয়েরা বলাবলি করিতেন, "ঐ রামা গান করিতেছে।" ইহাকে থিয়েটারের দলে লওয়া হইবে কি না এ বিষয়ে এক তর্ক উপস্থিত হইল।

একজন বলিলেন, "চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে আমরা থিয়েটার করব ? সে রাজ-কুমার সেজে আমাদিগকে যা' তা' বলবে তাই সহ্য করতে হবে ? শেষে হয়তো সে মাথায় উঠবে ; আমি এতে রাজী নই।" আর একজন কহিলেন, "না হে চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে মিশে কাজ নেই, আমরাতো আর পাবলিক্ থিয়েটার করে পয়সা নিতে যাচ্চিনে যে, রামা না হলে চলবে না। মিছে ছোট লোককে বাড়িয়ে দরকার কি ?"

কিন্তু প্রধান উদ্‌যোগী বলিলেন, "রামার মতো মিষ্টি উঁচু গলার একটা আকর্ষণ আছে। ওকে বাদ দিলে আমাদের গানের বড়ই অভাব হবে। যে কাজে হাত দেওয়া গেছে, তা ভালো করে করাই উচিত। না হলে লোকে হাসবে।" এই কথা শুনিয়া আর একজন বলিলেন, "ঠিক কথা, তোমরা এজন্য আর আপত্তি কোরো না ; আমরা আমোদের জন্য এটা করচি, তার মধ্যে কে কি সেজে কাকে কি বলচে তা দেখবার দরকার কি ? তবে যদি আর কোনো রকম বেয়াদবি করে, তার কি আমরা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারব না ?" শেষে রাম-লালকে লওয়াই স্থির হইল। তাহার মাকে ডাকিয়া আনিয়া বলা হইল,—"আমরা তোর ছেলেকে আমাদের দলে গান করবার জন্য নিচ্চি এজন্য তোকে মাসিক ২৲ টাকা করে দেওয়া যাবে।"

রামলালের মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "মা দুর্গা বাবুদের মঙ্গল করুন, আমার রামলালের উপর আপনারা একটু দয়া করবেন।"

রামলালের অভিনয় ও গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল। থিয়েটার-পার্টী হরিহরপুরে অভিনয় করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অভিনয় করিতে গেল। যেখানে যায় তাহারা সেইখানেই প্রশংসা পাইতে লাগিল।

কিন্তু রামলালের পক্ষে এ আমোদ তেমন সুখের হইল না। যতক্ষণ সে অভিনয় করিত ততক্ষণ তাহার অবস্থা ভুলিয়া থাকিত। পোষাক ছাড়িলেই

তাহার মনের শান্তিটুকু চলিয়া যাইত। বাবুরা কেহ তাহার সহিত ভালো ব্যবহার করিতেন না, "ছোটলোকের ছেলেকে আদর দিলে মাথায় উঠবে" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিরস্কার ও রূঢ় কথা ব্যতীত কেহ তাহাকে একটু মিষ্ট কথা বলিতেন না। অভিনয় ছাড়া তাহার কাজ ছিল তামাক সাজা ও ফাইফরমাস খাটা। একটু ক্রুটী হইলে আর রক্ষা ছিল না। কে বাবুদের বলিল, "গাঁজা খাইলে গলা ভালো হয়," এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ গঞ্জিকাসেবন ধরিলেন, কিন্তু অনেক তিরস্কার ও প্রহারেও রামলালকে কেহ গাঁজা ধরাইতে পারিলেন না।

এইরূপে কয়েক স্থানে অভিনয় করিয়া তাঁহারা নিকটবর্ত্তী সহরে অভিনয় করিতে গমন করিলেন।

২

সেই সহরে নবীনচন্দ্র বসু বাস করিতেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সেই জন্য লোকে তাঁহাকে মিষ্টার বোস বলিত। অতঃপর রামলালের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধ থাকায় এখানে তাঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বসু মহাশয় নিজে খৃষ্টান হইয়াছেন। স্বগ্রামে তাঁহার অনেক সম্পত্তি আছে, কোনো সাংসারিক উন্নতির আশায় তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস-পরিবর্ত্তন করেন নাই। গ্রামে একটি ইস্কুল ও হাঁসপাতালের অধিকাংশ ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিয়া থাকেন। অনেক দরিদ্র বালকের ইস্কুলের মাহিনাও তিনি দিয়া থাকেন। এবং অনেক নিঃস্ব বিধবাকে গোপনে মাসিক সাহায্যও করিয়া থাকেন।

খৃষ্টান হইয়া হিন্দুপ্রধান গ্রামে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া তিনি সহরে আসিয়া একটি বাড়ি করিয়াছেন। বহির্বাটী ইংরাজীন্যাসানে সজ্জিত, সম্মুখে একটি ফুলের বাগান, তাহাতে নানারকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাটীর এক পার্শ্বে একটি শাক-সব্জীর বাগানও আছে। গাছের প্রতি বসু মহাশয়ের বড় যত্ন।

বসু মহাশয়ের প্রকৃতি সাধারণ খৃষ্টান হইতে ভিন্ন। খৃষ্টানদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, যিশুকে যখন আমি ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন আমার আর মুক্তির কোনো ভয় নাই। প্রাচীন ইহুদিধর্ম্মের যত সংস্কার খৃষ্টানধর্ম্মের মধ্যে আসিয়াছে। বাইবেলে যিশুর-জীবনে যত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাই তাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। বসু মহাশয় এরূপ পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। তিনি যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা স্বীকার করিতেন আদর্শরূপে। যে পর্য্যন্ত যিশুর মতো জীবন না হইবে সে পর্য্যন্ত কেবল যিশুকে বিশ্বাস করিলে হইবে না, ইহাই তাঁহার অন্তরের

কথা ছিল। তিনি যিশুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং সকল কার্য্যে যিশুর মতো হইতে চেষ্টা করিতেন। যিশুর উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার গৃহের নানা স্থানে যেসকল 'মটো' ঝুলানো ছিল, তাঁহার প্রতিবেশী খৃষ্টানদিগের গৃহে সেরূপ দেখা যাইত না! তাঁহার প্রিয় মটোগুলির উল্লেখ করিলেই তাঁহার জীবনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। "ঈশ্বরকে সমগ্র হৃদয় ও মন দ্বারা এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় প্রীতি কর", "সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর ও তাঁহার ধর্ম্ম অনুসন্ধান কর, আর সকল তিনিই তোমাকে দিবেন", "তোমার রাজ্য আসুক", "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", "শত্রুকে ভালোবাস", "কুদৃষ্টি করিয়ো না," "প্রভু! তাহাদিগকে ক্ষমা কর." "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হও", এই বাক্য সকল ইংরাজি ও বাংলা অক্ষরে কার্পেটের উপর রেশম দিয়া লিখিয়া তাঁহার লাইব্রেরীতে, বসিবার ঘরে, শুইবার ঘরে, গৃহের নানা স্থানে ঝুলানো রহিয়াছে। তাঁহার একটি উপাসনার ঘর আছে, বড় সংগ্রামের মধ্যে পতিত হইলে জানু পাতিয়া বসিয়া সেখানে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন,—"হে গুরু, তোমার পথ ধরিতে আমাকে শিখাও।" তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারো সহিত বড় তর্ক করিতেন না, কেবল যিশু সাগরের তীরে পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রিয় উপদেশগুলি সকলকে পালন করিতে বলিতেন। যখন কেহ তাঁহার অপকার করিত অথবা মনে আঘাত করিত, তিনি মনে মনে বলিতেন, "গুরু, তোমার মাথায় যাহারা কাঁটার মকুট দিল, গায়ে থুথু দিল, তুমি তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলে, আর আমি ইহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না?"

তাঁহার ধারণা ছিল যে, যিশু চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন; অনেক লোককে তিনি যেমন সৎপথ দেখাইয়া পাপযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ চিকিৎসার গুণে রোগযন্ত্রণা হইতেও মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ উপায়ে তিনি এত সহজে রোগীদিগকে আরোগ্য করিতেন তাহা কেহ জানে না। তাই তিনি নিজেকে যিশুর শিষ্য মনে করিয়া নিজেও চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি গ্রামে একটি ক্ষুদ্র হাঁসপাতালের ব্যয় বহন করিতেন, কিন্তু নিজেও কঠোর অধ্যয়ন করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা যখন ব্যবসায় বলিয়া অবলম্বন করা যায় তখন তাহাতে অনেকগুলি বিপদ আসিতে পারে। চিকিৎসকের ন্যায় অতি

অল্প লোকই সাধারণের উপকার করিতে পারেন, আবার কোনো কোনো চিকিৎসকের ন্যায় নরঘাতী নারকীও অল্প দেখা যায়। যাহারা শক্তি থাকিতে দরিদ্রকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে না, যে রোগ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু অর্থের জন্য সেরোগ চিকিৎসা করিতে গিয়া যাহারা রোগীকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দ্যায়, তাহারা অতি ভীষণ লোক। বসু মহাশয় কাহারো রোগ একটু কঠিন দেখিলেই রোগীর আত্মীয়দিগকে বলিতেন, "তোমরা অন্য চিকিৎসক দেখাও, আমার সাহস হইতেছে না।" কিন্তু লোকে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও চরিত্রে এমনি বিশ্বাস করিত যে, শক্তি থাকিতেও কেহ সহজে অন্য ডাক্তার ডাকিতে চাহিত না।

তিনি কাহারো নিকট হইতে একপয়সাও লইতেন না। কি দিন কি রাত্রিতে তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি রোগীকে দেখিতে বিলম্ব করিতেন না। রাত্রিতে আসিলে কাহারো যদি অসুবিধা হয় এই জন্য শয়নঘরে একটি ঘণ্টার সহিত তার বাঁধিয়া তাহার অপর-প্রান্ত সদর দরজায় লাগাইয়া দিয়া ছিলেন। রাত্রিতে যে কেহ ডাকিতে আসিলে ঐ তার ধরিয়া টানিত তাহাতেই তিনি জানিতে পারিতেন। তাঁহার স্ত্রী এজন্য মধ্যে মধ্যে বড় বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় মন দিতেন না। প্রথম দিন ডাকিলে দ্বিতীয় দিন আর তাঁহাকে ডাকিতে হইত না, রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি নিজেই রোগীর নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইতেন। যে যথোচিতভাবে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিত না, তাহাকে নিজব্যয়ে সে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং গৃহে যাহার সেবা হইবার সুবিধা হইত না, তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসিতেন এবং আবশ্যক হইলে অপর ডাক্তারের দ্বারাও চিকিৎসা করাইতেন। এমন অনেক রাত্রি গিয়াছে, যখন তিনি সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেন। কাহারো সঙ্কটাপন্ন রোগ হইলে নিজে গিয়া সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন।

একবার তাঁহার এক বন্ধু কহিলেন, "আপনি গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন সে তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু বড় লোকেরা তো টাকা দিতে পারেন, আপনি তাহা দ্বারা আমাদের 'প্রচার ফণ্ডে' তো সাহায্য করতে পারেন।" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "যিশু বলিয়া গিয়াছেন, যে দুঃস্থ, রোগী, নিরাশ্রয়, সেই তোমার ভ্রাতা। ভাইকে চিকিৎসা করিয়া টাকা লইব। আমি কি এমন পাষণ্ড? ঈশ্বর আমার অন্নের অভাব রাখেন নাই।"

একবার একটি কুমারী কোনো গুরুতর অপরাধ করে ; খৃষ্টান সমাজ তাহাকে এবং তাহার পিতামাতাকে এক প্রকার সমাজচ্যুত করিল। অভাগিনী অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণামুক্ত হইবে সঙ্কল্প করিল। বসু মহাশয় তাহা শুনিতে পাইয়া তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভগ্নী, বড় অন্যায় কাজ করেছ। কিন্তু ভালো হও, ঈশ্বর যদি আমাদের মতো পাপীকে ক্ষমা করেন তোমাকেও ক্ষমা করবেন : তুমি আমার বাড়ি এস, ভাই কি বোনকে ছাড়তে পারে ?" রমণী কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কহিল, "যা বিচার করতে হয় আপনি করুন। আমি মরেও ঈশ্বরের নিকট যেতে ভয় পাচ্ছি।"

বসু মহাশয় কহিলেন, "ভগ্নী, আমরা পাপী, আমরা বিচার করবার কে ? যিশু পর্য্যন্ত বিচার করেন নাই, স্বর্গের ঈশ্বরই বিচার করবেন, কিন্তু তাঁর দয়া অসীম। তিনি কখনো কাউকে পরিত্যাগ করেন না। তুমি ভালো হও, তিনি সকলই ক্ষমা করবেন।" এই বলিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিলেন। সমাজের অনেকেই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তিনি কিন্তু এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "ভাই যিশুর শিক্ষা অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি বড় নয়, যিশুই পাপীর বিচার করেন নাই, আমরা বিচার করবার কে ?"

অবশেষে তাঁহার স্ত্রী যখন তাঁহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, তখন তিনি সেই নারীকে মান্দ্রাজে তাঁহার বন্ধু মিষ্টার আয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ আয়ার তাহাকে জানানা-মিশনে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া পরে জানানা মিশনের অনেক কাজ করিয়াছিল।

"তোমার স্বর্গরাজ্য আসুক" এই কথা বলিতে বলিতে মিষ্টার বসুর অনেক সময় চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িত। গৃহে এই মটো খানির দিকে যখন তাকাইতেন, তখন তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কোথাও বিবাদ বিসম্বাদ হইলে নিজে গিয়া মিটাইয়া দিতেন। যখন তাঁহার কানে আসিত যে, একজন অপরের ক্ষতি করিয়াছে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অথবা কেহ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছে, অর্থ ও বেশ-ভূষার গর্ব্ব করিতেছে, তখন তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। তিনি নীরবে কাঁদিতেন আর মনে মনে কহিতেন, "প্রভু, তোমার স্বর্গরাজ্য আর কতদূর! পৃথিবীতে কি স্বর্গ আসিবে না ?

এখানে ভাই ভাইকে ভাই বলিয়া এবং তোমাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিবে; কিন্তু মানুষ যে মানুষকে ঘৃণা করিতেছে! একে অপরকে শত্রু ভাবিতেছে! ঠিক তোমাকে তো কেহ স্বীকার করিল না।"

তিনি বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী, তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প বয়স্কা, ইংরাজী শিক্ষা ও চাল-চালনে বিশেষ শিক্ষিতা, এবং আপন বংশ-গৌরবে গর্ব্বিতা। তিনি বৈদ্য রায় বংশের কন্যা; তাঁহারা তিন পুরুষ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। মিসেস্ বোস গান বাজনা, পার্টি এবং বেশভূষার বিশেষ প্রিয়। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "মিষ্টার বোসের সব সেকেলে ধরণের।"

ইনি বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। তিনি যদিও স্ত্রীর এত আড়ম্বর ও বৃথা সজ্জার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু কোনো দিন এবিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বলিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার সকল কার্য্যের সহায় হইবেন, এই আশায় অপেক্ষা করিতেন। কে জানে যদি বসু মহাশয় দীর্ঘজীবী হইতেন তাহা হইলে হয় তো তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সকল কার্য্যের সহায় হইতেন।

৩

সাধারণত দেখা যায় খৃষ্টান হইলে তাঁহার আর যেন দেশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। মুসলমানগণ যেমন মনে করেন, তাঁহারা তুরস্ক বা আরবের অধিবাসী, খৃষ্টানদিগের মধ্যেও অনেকে যেন মনে করেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু বসু মহাশয় সে প্রকৃতির ছিলেন না, তিনি নিজেকে ভারতীয় খৃষ্টান বলিয়া অথবা বাঙালী বলিয়াই মনে করিতেন। ভারতের সংস্কার, ভারতর আমোদ—ভারতের যাহা কিছু ভালো বা নির্দ্দোষ তাহার সঙ্গে তিনি সহানুভূতি করিতেন। যখন শুনিলেন, রামকৃষ্ণপুরের বাবুরা সখের থিয়েটার করিতে সহরে আসিয়াছেন, তখন তিনি তাহা একদিন দেখিতে গেলেন।

রামলালের অভিনয় দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। রামলালের বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার কেমন একটু সহানুভূতির ভাব প্রাণে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন তাহার সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও তেমন সুবিধা হয় নাই। কেবল তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, আহা এমন সুন্দর ছেলেটি, এত ছোটবেলায় থিয়েটারের দলে মিশিয়া নিজের পরকাল খাইতেছে। তিনি তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন তিনি নদীতীরে বেড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময় সেই পথে রামলালকে যাইতে দেখিলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি ডাকিলেন। রামলাল নিকটে আসিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি না সেদিন থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছিলে ?" রামলাল কহিল, "আজ্ঞা হাঁ"। বসু মহাশয় একটা "কিন্তু" বলিয়া তারপর কহিলেন, তোমার কি লেখাপড়া শিখে ভালো হতে—বড় হতে ইচ্ছা করে না ? তুমি কি এই ভাবেই জীবন কাটাতে ভালোবাস ?"

রামলাল বিষণ্ণমুখে কহিল, আমরা বড় গরীব "আমার আর কেউ নেই, কেবল মা আছেন, আমাদের খাওয়া জোটে না, তা লেখা পড়া শিখবো কি করে, সেই জন্যে আমার মা আমাকে বাবুদের হাতে থিয়েটারের দলে দিয়েছেন। মাকে বাবুরা মাসে ৬ টাকা করে দেবেন, কিন্তু বাবুরা আমাকে মারেন আর গাল দেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রামলাল সাশ্রুনয়নে একবার বসু মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল।

"তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে যাতে তোমার ভালো হয় তার চেষ্টা করতে পারি। তুমি কি আমার বাড়ি থাকবে ?"

"আপনি যদি দয়া করে আমাকে লেখাপড়া শেখান তাহ'লে আমি আর বাবুদের কাছে থাকবো না !"

বসু মহাশয় "কহিলেন, কিন্তু এক কথা—আমি খৃষ্টান,আমার কাছে থাকতে তোমার এবং তোমার মায়ের কোনো আপত্তি হবে কি না ?"

রামলাল স্মিতমুখে কহিল, "তাতে কি, আপনি যেই হোন্ আপনি আমার পিতার তুল্য, আমি এখনই আপনার কাছে আসতে পারি।" এই বলিয়া সে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

বসু মহাশয় কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি না, কাল তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো। চল আমার বাড়ি তোমাকে দেখিয়ে দিই।"

এই বলিয়া তিনি একটু তফাৎ হইতে তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন।

রামলালকে পরদিন আসিতে বলার আর এক কারণ, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত এবিষয় কথা কহিবেন। বসু মহাশয় গৃহে আসিয়া মিসেস্ বোসকে ডাকিলেন। তিনি তখন পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। বসু মহাশয় কহিলেন, প্রমীলা, একটি বড় সুসংবাদ তোমাকে বলচি, থিয়েটারের দলের সেই ছেলেটির কথা তোমাকে বলেছিলুম, সে ছেলেটি আমাদের বাড়ি আসতে চায়।"

মিসেস্ বোস ত্রস্তভাবে বলিলেন, "তোমার যেমন বসে বসে আর কাজ নেই, চাঁড়ালের ছেলে, লাঙল ধরা অভ্যেস—তার আবার আমাদের এখানে থাকা সহ্য হবে ; মিছে হাঙ্গামা বাড়াও কেন ?"

মিষ্টার বসু একটু সহাস্যভাবে কহিলেন, "তুমি একবার তা'কে দেখ আমি তাকে কাল আসতে বলেছি ; আমার মনে হয়, তুমি তার গান শুনলে নিজেই রাখতে চাইবে।"

পরদিন যথাসময়ে রামলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বসুজায়া ও বসু মহাশয়কে সে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। রামলালের করুণ মুখখানি দেখিয়া মিসেস বোসের দয়া হইল।

বসু মহাশয় পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রামলাল কেমন সুন্দর গান গাইতে পারে তাহা বুঝি তুমি জান না। রামলাল, তুমি সেই গানটি তোমার মাকে একবার শোনাও দেখি।"

রামলাল তাহার স্বরের ঝঙ্কারে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া সুন্দর তানলয় যোগে গানটি গাহিল। মিসেস্ বোস গান শুনিয়া বড় সুখী হইলেন। মেম সাহেবের ইস্কুলে পড়িয়া তিনি বেশীর ভাগ ইংরেজীসুরে গান শুনিয়াছেন, কিন্তু বাংলায় যে এমন মধুর সুর আছে তাহা যেন পূর্ব্বে তাহার জানা ছিল না। যা হোক্ তিনি রামলালকে রাখিতে সহজেই রাজী হইলেন।

বসু মহাশয় চাকরকে ডাকিয়া রামলালের ঘর ঠিক করিতে বলিলেন, আর বলিয়া দিলেন, রামলালকে স্নান করাইয়া ভালো কাপড় পরাইয়া লইয়া আসে, এবং তাহাকে যেন সম্মান করিয়া কথা বলে।

বসু মহাশয় তখন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি জানি তুমি তার অবস্থা নিজের চোখে দেখলেই রাখতে অস্বীকার করবে না ; আমি তোমার মূল্য জানি বলেই তো তোমাকে এত ভলোবাসি।"

মিসেস্ বোস উৎসাহের সহিত কহিলেন, "একে যখন রাখলে, আমাদের মতো করে রাখতে হবে। কালই নাপিত ডেকে ওর লম্বা চুলগুলা কেটে ফেলবো। আমি নিজেই ওকে 'বাইবেল' পড়াবার ভার নেব।"

"তা তোমার যা ইচ্ছে কোরো। কিন্তু আমি ওর একটি নূতন নাম দিতে চাই, এবং সে নামের সঙ্গে জাতির কোনো সম্বন্ধ থাকবে না।"

"কি নাম দিতে চাও ? কেন Robert কি William এরূপ একটা কিছু নাম দাও না।"

"ও তো আর এখনো খৃষ্টান হয় নি যে, খৃষ্টান নাম দেবো, আর আমাদের দেশে কি নাম নেই যে, বিদেশ থেকে ধার করতে যাব। খৃষ্টান হয়েছি বলে কি দেশের সবই ছাড়তে হবে?"

"তবে কি নাম দিতে চাও?"

"আমার কথা শুন্‌লে তুমি হাসবে! বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা শ্লোক আছে. 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ', কালে এই বালকও একজন ঈশ্বর-ভক্ত হবে সেই উদ্দেশ্যে একে 'দ্বিজবর' বা এইরূপ একটা নাম দিতে চাই।"

মিসেস বোস হাসিয়া কহিলেন, "দ্বিজবর আবার মানুষের নাম থাকে! যা ভালো শোনায় এমন একটা নাম দাও।"

"তাই তো কি নাম দি। আচ্ছা, শ্রেষ্ঠ মানুষকে 'দেবতা' বলে, এর নাম "দেবকুমার" রাখা যাক্! এক অর্থে দেবকুমার ব্রাহ্মণের পুত্র।

"এ বরং পদে আছে। তাই হোক্ একে দেবকুমার বলেই ডাকবো।"

কিছুক্ষণ পরে স্নাত নববস্ত্রপরিহিত রামলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নূতন নামকরণের কথা বসু মহাশয় তাহাকে জানাইলেন। আমরাও এখন হইতে রামলালকে নূতন নামে অভিহিত করিব।

সকলে এক টেবিলে আহারে বসিলেন। বসুজায়া দেবকুমারকে এটা ওটা দিতে চাকরকে বলিতে লাগিলেন; বসু মহাশয় আহার করিতে করিতে বলিলেন "আচ্ছা, দেবকুমার, তোমার মা এ বন্দোবস্তে রাজী হবেন?"

"মা আমাকে বড় ভালোবাসেন, তিনি গরীব মানুষ, আমার ভালো দেখলেই কিছুতেই তিনি 'না' করবেন না।"

"তাঁকে রাজী করবার ভার তোমার হাতে। তোমার মাকে তোমার কিছু সাহায্য করা উচিত। মাসে মাসে তুমি নিজের হাতে তাঁকে পাঁচটি করে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো। টাকা আমি দেবো।"

দেবকুমার এ কথায় কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার নীরব দৃষ্টি কি প্রকাশ করিল কে জানে। মনে মনে সে ভাবিল, ইঁহারা দেবতা! এই রূপে তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইল।

এদিকে থিয়েটারের দলে রামলালের খোঁজ পড়িয়া গেল, ক্রমে চারিদিকে একটা আন্দোলন উঠিল।

অবশেষে অনুসন্ধান পাইয়া কয়েক জন দলবাঁধিয়া বসু মহাশয়ের বাড়িতে আসিলেন। রামলালকে তাঁহারা ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রথমে নরমভাবে বসু

মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু রামলাল নিজেই যাইতে অস্বীকৃত, কাজেই বসু মহাশয় রামলালের পক্ষ লইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল অন্য রকম হইল। শেষে তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া মিষ্টার বোসের নামে বালক চুরির অভিযোগ আনিবেন বলিয়া শাসাইয়া গেলেন।

রামলালের মা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া সহরে আসিল। কিন্তু দেবকুমারের মুখে সকল কথা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে সকল অবস্থা দেখিয়া বসু মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। দেবকুমার তার মায়ের হাতে ৫৲ টি টাকা দিয়া বলিল 'প্রতি মাসে এইরূপ পাঠিয়ে দেবো।'

ইহার পরে বসু মহাশয়কে আর কেহ এ সম্বন্ধে বিরক্ত করে নাই।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

বরষায়

—ঃ০ঃ—

বরষা এসেছে অই বরষা নেমেছে অই,
রুদ্ধ গেহ-বাতায়ন—গৃহের আলোক কই?
দিগন্ত আঁধার করি নামিয়াছে কাল ঘন,
ভুবনে ভরিছে অই মৃদু মন্দ গরজন।
তটিনী দুকূল ভরি কল্লোলে বহিয়ে যায়,
ঘননীল বন-মাঝে উতলা কলাপী গায়;
শ্যাম কিশলয় পরে পড়ে বারি ঝর ঝর;
শিহরিত উপবনে ঝরে যূথিকার স্তর!
আর্দ্র পাখী শাখী-পরে করুণ বিলাপ গায়;
"কে ছিলরে কি ছিলরে" আজি আর নাহি হায়!
নিঝুম দীরঘ দিবা আষাঢ়ের অন্ধকার;
মেঘে পথরেখা ঢাকা পারে না চলিতে আর;
চাহে না কাটিতে বেলা স্মৃতিফুলে গাঁথি মালা;
কোথা কোন্ যক্ষ-বধূ যাপিতেছে দীর্ঘ বেলা!

কোন্ অলকার সৌধে চমকি চপলা চায়,
কোথা কোন্ বিরহীর তপ্তশ্বাসে বহে বায় !
কোন্ সিপ্রা-বারি-সিক্ত মন্দির-সোপান-তলে
রক্তিম লাক্ষার রাগ-বিগলিত ধারা জলে !
ঘনরোলে বর্ষে বারি আসে সন্ধ্যা ঘনাইয়ে ;
মন্দিরে আরতি শঙ্খ বাজিছে মন্থর হয়ে।
অতীতের স্বপ্ন-ঘোরে ছেয়ে আসে সারা মন ;
কবে ফুরাইয়ে গেছে গোকুলের সে স্বপন !
বৃন্দাবন-বাসিনীর নীল চেলাঞ্চল-ছায়,
কালিন্দী বহিয়াছিল কি বিরহ বহ্নি' হায় !
শিহরে কদম্ব তরু নীল মেঘে নভভরা,
গোকুল কাঁদিছে পড়ি নীলমণি হয়ে হারা !
কত স্মৃতি জাগে মনে অতীত ও বর্ত্তমান
ছিল যারা নাহি তারা আজি সব অবসান !
আশা ও নিরাশা দুই বরষা বাতাসে মিশি,
কোন্ অলকার পানে কত কাল গেছে ভাসি,
নাহি অশ্রু নাহি হর্ষ এযে গো সাগর স্থির,
জীবন মরণাচ্ছন্ন মহারাত্রি সুগভীর !
বর্ষকের অভিশাপে যক্ষের কি হা-হুতাশ—
এযে চির নির্ব্বাসন নাহি যুগ নাহি মাস !
কোন্ মেঘ যাবে চলি সেই অলকার পানে
কে আনিবে শুভবার্ত্তা কোন্ মধু সুলগনে ;
নামিবে পুষ্পক রথ মৃত্যুর কনক পথে
আষাঢ় পড়িবে ঝরি মিলনের অশ্রু সাথে !
দীর্ঘ অভিশাপ সাঙ্গ—নব জীবনের রবি
শ্রাবণ-রজনী শেষে আঁকিবে কি শুভ ছবি ?

শ্রীসুকুমারী দেবী।

সৎপ্রসঙ্গ

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের লক্ষণ ;—এবারেও আমরা সৎপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোনো উত্তর বা প্রশ্ন পাই নাই। গতবারে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিষয় একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারায় তাহার আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং এবারে ঐ বিষয়ে আরো একটু পরিস্কারভাবে আলোচনার আবশ্যকতা মনে করিতেছি। যদি এ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ কেহ কিছু বলিতে চান তাহা লিখিয়া পাঠাইলে আগামী বারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারিবে।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কতই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখা যাইতেছে ; সুতরাং ধর্ম্মকে এক একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা জন-সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। বস্তুত সাম্প্রদায়িক আকারে প্রকাশিত, ধর্ম্মের এমন একটা দিকও আছে। কিন্তু মূলে ধর্ম্মের সত্যাঙ্গ যাহা তাহা চিরদিন অসাম্প্রদায়িক। দেশে কালে প্রকাশিত অঙ্গ যাহা তাহাই সাম্প্রদায়িক। অথচ জগতে এমন কোন্ বিষয় বা কি বস্তু আছে যাহা দেশকালে প্রকাশিত নয়। কিন্তু দেশকালে প্রকাশিত হইয়াও যে সত্য দেশকালের অধীন নহে—যে সত্য হইতে দেশকাল বাদ দিলেও তাহা অবিকৃত থাকে, তাহাকেই নিত্য সত্য বা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

যেমন "সদা সত্য কথা বলিবে" এই সত্য কোনো না কোনো সময়ে মানুষের দ্বারাই—মানুষের মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা চিরকালের-চিরদিনের জন্য। এই সত্য দেশকালের অধীন নহে। আবার যেমন মহাপুরুষ মহাম্মদের দ্বারায় 'কোরাণ' প্রকাশিত। কোরাণেও নিত্য-সত্য বাক্য থাকিলেও কোরাণ নামক গ্রন্থখানি দেশকালের অধীন, সুতরাং 'কোরাণ পাঠ না করিলে ধর্ম্ম হইতে পারে না' এই সত্যটি দেশকালে বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই সত্যটি সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কোনো দেশ বা কোনো জাতির জন্য, সেই জাতি ভিন্ন পৃথিবীর আরো কোনো কোনো জাতির জন্য নহে, তবে তাহাকেও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে হইবে, কিন্তু এই লক্ষণ ব্যতীত তাহার মধ্যেও এমন আরো কোনো লক্ষণ আছে, যেটী বাদ দিলে সেধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়া পড়ে—যেমন কোনো এক মহাপুরুষকে লইয়া যে ধর্ম্ম পরিচিত ; তাঁহাকে বাদ দিলে

সে ধর্ম্মের আর অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ জাতি, মহাপুরুষ, নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে আবদ্ধ যে সকল ধর্ম্ম তাহাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা যায়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, দেশ কাল মহাপুরুষ বা কোনো একখানি শাস্ত্রে আবদ্ধ নহে এমন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে কি না, এবং তাহার সম্পূর্ণ লক্ষণ কি ?

উত্তর,—যে ধর্ম্মে কোনো জাতির জন্য দ্বার রুদ্ধ নাই ; শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সত্য তাহা সকল শাস্ত্র হইতেই গ্রহণীয় ; সাধু ভক্ত মহাজনগণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াও যেখানে একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত আদর্শ গুরু এবং পরিত্রাতা। একমাত্র ঈশ্বরই যেখানে উপাস্য—যিনি ঈশ্বর তিনি সকলেরই ঈশ্বর, তিনি নিত্য সত্য—চিরদিন চিরকাল তাঁহার একইরূপ বা একই স্বরূপ, সত্যই তাঁহার স্বরূপ। কোনো সময়ে কোনো কারণে তাঁহার কোনো রূপ কল্পনা বা আকার গঠিত করিবার প্রয়োজন হয় না। চিরদিন তাঁহাকে অবিকৃত-সত্যরূপেই দর্শন লাভ করিতে হয়। যেমন কেহ তাঁহাকে গঠন করিতেও পারেনা, তেমনি তিনিই সমুদয় গঠন করিয়াছেন, এখনো আমরা তাঁহারই হাতে গঠিত হইতেছি এবং হইব। আমরা তাঁহাকে গঠন করিয়া আমাদের মনের মতো—আমাদের কল্পনানুযায়ী করিয়া উপাস্যরূপে স্থির করিয়া লইব তাহা হয় না। যে ক্ষেত্রে হয় সেখানে ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। সংক্ষেপে সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইহাই লক্ষণ বলা যায়। এইরূপ মণ্ডলী যে দেশে যে কালে হোউক তাহাই অসাম্প্রদায়িক মণ্ডলী।

আমাদের মনে হয় চারিদিকে জনসাধারণ ধর্ম্মের জন্য সৎসাহস এবং স্বার্থত্যাগ করিতে সক্ষম না হইয়াই মনকে কোনো রকমে স্তোক দিয়া কল্পিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে নামমাত্র বিশ্বাস রাখিতে যাইয়া মূলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্মজীবন হারাইয়া সাংসারিক আশক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন।

বিবিধ

হরিনাভি হিতসাধন মণ্ডলী—বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাভি গ্রামে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর একটি শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। হরিনাভি, কোদালিয়া ও চাংড়িপোতা, এই তিন খানি গ্রাম মণ্ডলীর কর্ম্মক্ষেত্র। গত বারে নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর উদ্বোধিনী সভার বিবরণ "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান, লোকশিক্ষার বিস্তার এবং ম্যালে-

রিয়া, কলেরা প্রভৃতি লোকক্ষয়কর সাংঘাতিক রোগসমূহের নিবারণার্থ মণ্ডলীর সদস্যগণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। "পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধে এবারে মণ্ডলীর প্রাথমিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। যে সমুদয় কার্য্যপদ্ধতির অবলম্বনে মণ্ডীর কর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অন্যান্য গ্রামের অধিবাসিগণ যদি তদনুরূপ কার্য্যপদ্ধতির অবলম্বনে পল্লীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ হইতে প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া রোগের এবং ঘোর দারিদ্রতার উচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে। দেশের এই দুর্দ্দিনে যাঁহরা লোক-সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহ ও সামর্থ প্রদান করুন।

পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতি—বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কোদালিয়া প্রসন্নবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্-বি, মহাশয়ের নেতৃত্বে হরিনাভি হিতসাধন মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পর, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। * *

বিশুদ্ধ পানীয় জল—সভার কর্ম্মক্ষেত্র, হরিনাভি, কোদালিয়া ও চাংড়িপোতা গ্রামত্রয়ে লোকে নিদারুণ জলকষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া সভার সদস্যমণ্ডলী স্থির করেন যে বর্ত্তমানক্ষেত্রে গ্রামবাসিগণের জলকষ্টের অপনোদন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিরূপ কার্য্যপ্রণালীর অবলম্বনে এবং স্বল্পব্যয়ে এই অভাব মোচন সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্বক সভা স্থির করেন যে, গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে ভূগর্ভে "Tube well" "নলকূপ" প্রোথিত করিলে বহুল পরিমাণে সভার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে। পল্লীর জনসাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ যে, তাহারা পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে "Tube well" বা "নলকূপ" প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সমধিক, কারণ টিউব ওয়েলের জল কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই! সভা গ্রামবাসীদিগকে "টিউব ওয়েল" প্রতিষ্ঠার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এই শ্রেণীর কূপ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তদ্ভিন্ন সাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থলে টিউব ওয়েলের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক বলিয়া স্থির করেন। * * *

শিক্ষাবিস্তার—অতঃপর লোক-শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভা স্থির করেন যে, লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে তাহার শরীর

বা স্বাস্থ্যরক্ষার যেমন প্রয়োজন সেইরূপ তাহার স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্য শিক্ষারও সেইরূপ প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা যুগপৎ প্রবর্ত্তিত না করিলে. কোনটাই সুফলপ্রসূ হইবে না। পল্লীর কৃষক, শ্রমজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর নিরক্ষর লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার মোটামুটি নিয়মগুলি যাহাতে শিখিতে ও বুঝিতে পারে; যাহাতে তাহারা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া লিখিতে ও পড়িতে এবং সাধারণ হিসাবপত্র রাখিতে পারে, মোটের উপর পল্লীর একটি লোকও যাহাতে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত না থাকে তজ্জন্য গ্রামমধ্যে কয়েকটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। * * *

স্ত্রীশিক্ষা—সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তারকল্পে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন যে সর্ব্বথা আবশ্যক, শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মণ্ডলীর সদস্যগণ, এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত কমিটীর উপর গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের ভার অর্পণ করেন।

পরিশেষে সভা গ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরা নিবারণার্থ দুইখানি উপদেশ পত্র প্রত্যেক গৃহস্থকে বিতরণ করিবার ও উহার মর্ম্ম গৃহস্থকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। (স্বাস্থ্য সমাচার—আষাঢ়)

রেলওয়ে ও পানীয় জল—ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। স্বাভাবতই এখানে লোক বহুবার এবং বহুপরিমাণে জল পান করিয়া থাকে। জল বিশুদ্ধ অর্থাৎ পানোপযোগী বিশুদ্ধ না হইলে যে কতরূপ পীড়া হইতে পারে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন্ বলিয়া মনে হয় না। প্রধান প্রধান রেলওয়ে কোম্পানির বড় বড় ষ্টেশনে কলের জলের বন্দোবস্ত থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ষ্টেশনেই নিকটস্থ কূপ বা পুষ্করিণীর জল পানি পড়ে বিলি করিয়া থাকে। এই বিলি করিবার বন্দোবস্ত কিরূপ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। একটা অপরিষ্কার লোটায় করিয়া জল দেওয়া হয়। জল থাকে একটা অপরিষ্কার বালতিতে। ঘটিটি সময়ে সময়ে ধূলি ও জঞ্জাল পূর্ণ প্ল্যাটফরমের উপর রাখা হয় এবং সেই ঘটিই টবের জলে ডুবাইয়া জল বিলি করা হয়। জলে প্রায়ই একরূপ গন্ধ থাকে। তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীর এই দুরবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণেরও বিশেষ সুবিধা নাই। তাহাদিগকেও এই জল পান করিতে হয়। শুনিয়াছি আমেরিকা ও ইউরোপে ডাইনিং কার, রেষ্টরেণ্ট কার ইত্যাদি প্রায় প্রতি গাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহাতে পানীয় জলের ট্যাপ

(কল) থাকে। আমাদের দেশে দুই একটি বিশেষ গাড়ী ব্যতীত এরূপ কার থাকে না অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পানীয় জলেরও বন্দোবস্ত থাকে না ; কাজেই রেলওয়ে যাত্রীর জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক। ভারতবাসী তীর্থ-যাত্রা ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম উপলক্ষে এক সঙ্গে বহু লোক বহু দূর পরিভ্রমণ করে। দূরত্বের হিসাবে তাহাদের কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পানীয় জলের সুচারু ব্যবস্থা থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আবার যে জলাশয় হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয় তাহার অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রধান প্রধান ষ্টেশনে যেখানে পানীয় জলের ট্যাপ নাই, সেখানে প্রায় ষ্টেশনেই কুপ থাকে। এইরূপ বড় বড় তীর্থ ষ্টেশনেও কুপের বন্দোবস্ত আছে। এই কুপের পার্শ্বে শত সহস্র যাত্রী স্নান করে, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করে, জলের যাবতীয় ব্যবস্থা ও কার্য্য কূপ পার্শ্বেই সম্পাদিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কূপের জল কিরূপে পানীয় থাকিতে পারে ? যদি পুষ্করিণী থাকে, তবে কথাই নাই। তাহাতে শৌচ প্রস্রাব সমস্তই সম্পাদিত হয়। এই দুষিত জল ব্যবহার করিয়া কত যাত্রী পীড়িত হয়, তাহার কে সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছে ? জলে কত ব্যাকৃটিরিয়া থাকিলেও তাহা পানীয় হইতে পারে, তাহার একটা আদর্শ স্থির করা উচিত। যাহাতে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যাকৃটিরিয়া না থাকে এবং অন্যান্য বিপজ্জনক রোগের উদ্ভিজ্জ বীজাণু না থাকে, তাহার রীতিমত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এবং গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। (বিজ্ঞান—মে)

বাধ্যতামূলক শিক্ষা—১লা জুলাই হইতে মহীশূর রাজ্যের ২টি কেন্দ্রে 'বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষার' আইনজারী করা হইয়াছে। ঐ সকল কেন্দ্রের যে সকল অভিভাবক বা পিতা ৭ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে নিয়োগ করিবেন তাহাদিগকে আইন অনুযায়ী দণ্ডভোগ করিতে হইবে। মহীশূর রাজ্যের শিক্ষানুরাগ ভারতের সর্ব্বত্র অনু-করণীয়। (এডুঃ গেঃ)

মাতৃ-নিকেতন—অসহায় বালক বালিকা ও নিরাশ্রয়া অবলাদিগের আশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আশ্রয় স্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত শতাধিক বালক-বালিকা ও বয়স্কা আশ্রয় পাইয়াছে, দীনজননী অন্নদাতা এই দীন হীনদিগের সহায় ও একমাত্র আশ্রয়-সম্বল। তাঁহার প্রেরণায় এই দীনহীনদিগের প্রতি দয়া করিয়া যিনি যাহা প্রদান করিবেন তাহা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে

গৃহীত হইবে। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।—বিনীত নিবেদক শ্রীশশীভূষণ মল্লিক ; মাতৃ-নিকেতন খিলগ্রাম, পোঃ রমনা, ঢাকা।

সর্পাঘাতে তুলসী—তুলসী সকল হিন্দুর বাড়িতেই সযত্নে রোপিত। ইহা সর্প বিষের ঔষধ। বিষবৈদ্যেরা বলেন ইহার মূল গৃহে রাখিলে সর্প ভয় থাকে না। গদাই নামক জনৈক উড়িয়া মালি গত ২৯এ মে বেলা ৮টার সময় গাছ তলায় পতিত একটি আম খায়। আধ ঘণ্টা পর হইতে তাহার শরীরে বিষ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমশ তাহার সর্ব্বশরীর অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং "বাঁচিবার আশা নাই" ডাক্তারেরা এই মত প্রকাশ করায়, হৃদয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বিষবৈদ্য (ওঝা) শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ তুলসী পাতার রস রোগীর সর্ব্বশরীরে মাখাইয়া দিলেন এবং মুখের মধ্যে, কর্ণে নাভিকুণ্ডে যতটা ধরে পূর্ণ করিয়া দিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে রোগী অল্প নড়িল এবং মুখের তুলসী রস একটু গলাধঃকরণ হইল। দুই ঘণ্টা পরে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল, তখন তাহার অসহ্য গাত্রদাহ। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। (বাঙ্গালী)

সমালোচনায় প্রতিবাদ—শ্রাবণের "অর্চ্চনা" "কুশদহ"র সমালোচনা করিয়াছেন। ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন যখন সমালোচনা করিয়াছেন তখন সহযোগীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তবে আমরা জানি কুশদহর প্রতি সহযোগী একটু বিরূপ আছেন। কারণ "মতো" "কোনো" "কী"র তিনি বা তাঁহারা বড় বিরোধী। তাই দেখিতেছি তাঁহারা যেন "ঘায়ের মাছি"র মত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্বেষ বুদ্ধিটাই ভালো না। তাহাতে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাই সাফ্ বলিয়াছেন "আংটির মূল্য গল্পটি অপহৃত অর্থাৎ সমাজপতি মহাশয়ের 'বাঘের নখ' নামক বিখ্যাত গল্পটি অবলম্বনে লিখিত।" অপহৃত মানেই অবলম্বনে লিখিত! সমালোচক যদি ধৈর্য্য সহকারে গল্পটি সমস্ত পড়িতেন তাহা হইলে তাহার এ ভ্রম হইত না। গল্পের শেষভাগে হাজার টাকা পুরস্কার একটা কথা আছে, বাঘের নখ গল্পের মধ্যেও একটা পুরস্কারের কথা আছে, ইহাতেই তিনি মনে করিয়াছেন অপহৃত। অথচ উভয় গল্পের প্লট্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা এবং সহসা "অপহৃত" বলা অতি অন্যায় ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ! সহযোগী এ ভ্রম স্বীকার করিবেন কি ? তারপর অনেকদিন হইতে অর্চ্চনার সহিত কুশদহর বিনিময় চলিতেছে। কুশদহ ১৩১৯ সাল হইতে

সচিত্র হইয়াছে। গত বৈশাখ সংখ্যায়ও ছবি ছিল তাহা কি সহযোগী 'চক্ষুরুন্মিলন' করিয়া দেখেন নাই? কোনো এক সংখ্যায় ছবি না থাকিলেই কি সচিত্র নামের অযোগ্য হইয়া যায়? যার জন্য এত বিদ্রূপ! কভারের উপর ব্লকখানিও কি একেবারে ধর্ত্তব্য নহে। তারপর উদ্ধৃত মাত্রেই কি প্রবন্ধের দৈন্যতা বুঝায়! উদ্ধৃতের কি আবশ্যকতা, এবং তার ভালো দিক কিছু নাই! ভাই. সাহিত্যের বিচারাসনে বসিয়া তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য আর তাহার বাহিরে যাহা তাহা সব মিথ্যা? বেশ, মত ভেদের কথা যাহা তাহা বলো, কিন্তু গালাগালি কর কেন? তাহা না করিলে বুঝি পসার বাড়ে না—আসর জমে না? যাহাদের প্রতি কটু কথা বলিতে তোমাদের ভদ্র রসনায় বাধে না কিন্তু তাহাতে ভদ্রলোকে তোমাদিগকে কি মনে করেন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? অহং বুদ্ধিটা একটু খর্ব্ব আর রসনাকে একটু সংযত করিলে ভালো হয় না কি?

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা

রিক্তা—এখানি কবিতা-পুস্তক। লেখক আমাদের পরিচিত যুবক শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার কোনো কোনো কবিতা পূর্ব্বে কুশদহে মুদ্রিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় রিক্তার "পরিচয় পত্রে" লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"এই যুবকটি আমার পরিচিত। ইনি কলেজে পড়েন অবকাশ সময়ে কবিতা লেখেন" * * *

পুস্তকখানিতে অনেকগুলি কবিতা আছে। প্রায় সকলগুলিরই ভাষা ও ভাব মার্জ্জিত এবং সংযত। আজ কাল যুবকদিগের কত কাঁচা লেখা কবিতাও মুদ্রিত হইয়া যাইতেছে,—বোধ হয় সুধী-সাহিত্যিকগণ এইজন্য 'কবিতা পুস্তক' নাম শুনিলে ভয় পান। এখানি সে শ্রেণীর নহে। কবিতাগুলি উপেক্ষণীয় নহে, পড়িবার জিনিষ ইহাতে আছে—একটু বিশেষত্বও আছে। একবার পড়িলেই তাহা জানা যায়। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র নাগ, টাউনক্লাব খুলনা। কাগজ, ছাপা উত্তম, মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আজ কাল পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতি কথার একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়াছে। অনেকেই এই বিষয় ভাবিতেছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর দ্বারা যেন কিছু কাজ হইবার আশা হইতেছে। হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামের সংবাদ আমরা গত-

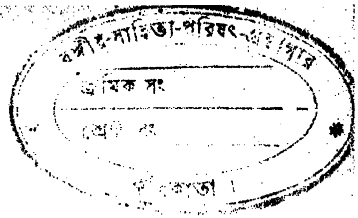
বার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী আরো একটু অগ্রসর হইয়াছে, এবারেও আমরা বিবিধ বিষয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ করিলাম। শুনা যাইতেছে শান্তিপুরেও ঐরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তাই মনে হইতেছে আমাদের কুশদহর মধ্যে কি একটিও শক্তিশালী জীবন্ত মানুষ নাই? আর কত দিন "ভারত সুধু ঘুমায়ে রয়" কুশদহ সম্বন্ধে এই গান আমরা গাইব?

গতবারে পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে ইঁদারার কথা যাহা আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা সকলে অবগত আছেন। তারপর আমরা দেখিলাম, হরিনাভি হিতসাধন মণ্ডলী পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহার মধ্যে পানীয় জলের জন্য তাঁহারা "tube well (নলকূপ) দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মনে করিতেছেন। শুনিতে পাই "নলকূপ" অধিকদিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু উহাতে যেরূপ সল্পব্যয়, যদি এক একটি দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলে তাহাতেও ইঁদারা অপেক্ষা সুবিধা। ফলত প্রতিগ্রামে নলকূপ অনেকগুলি হইতে পারে। আমরা এপ্রস্তাবগুলি সাধারণের এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণের বিচারার্থেই উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু জানি "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" ই হইবে।

আমরা শুনিতেছি কিছুদিন হইতে খাঁটুরা হয়দারপুর গ্রামে একটি 'হরিসভা' হইয়াছে। নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং বক্তৃতার দ্বারায় সভার কার্য্য হইয়া থাকে। মধ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মিত্র মহাশয়কে লইয়া গিয়া তাঁহার দ্বারায় বক্তৃতা করানো হইয়াছিল। আমরা অনেক পূর্ব্ব হইতে এই দেশের ধর্ম্মভাব পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি; এখানে বহুদিন পূর্ব্বে একসময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন প্রবলভাবে হইয়াছিল, তাহার ফলে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির এবং একটি ব্রাহ্ম-মণ্ডলী প্রস্তুত হয়। তারপর দেশময় যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন গোবরডাঙ্গায় "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" হয়। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি বক্তাগণ গিয়া তাহাতে বক্তৃতা উপদেশ দান করেন। তারপর হয়দারপুর গ্রামে ৺হরিবংশ রক্ষিতের উদযোগে একটি 'হরিসভা' হয়। এছাড়া বাগে খাঁটুরা অঞ্চলে কতগুলি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবে মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনাদি হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়া কোনোটিই স্থায়ী বা জীবনপ্রদ হয় নাই। বেশী দিন যে চলে না তাহার কারণ উহার মধ্যে জীবন্ত প্রভাব বা কোনো ধর্ম্মাগ্নি থাকে না, তাই অল্পদিনেই নিভিয়া যায়। অস্বাস্থ্যতার জন্য কোনো ব্রাহ্ম ওখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে না পারায় এখন স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের কাজও ভাল চলে না। বর্ত্তমান "হরিসভা"টি স্থায়ী হইয়া সত্য সত্য দু'একটি ধর্ম্ম জীবন গড়িবে এ আশা করা যায় কি?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে

মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, হইতে প্রকাশিত।



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায় ?

অষ্টম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৩ { চতুর্থ সংখ্যা

সঙ্গীত

—o—

(ঝিঁঝিট-খয়রা, কীর্ত্তনেরসুর)

বিশ্বাসী হও ওরে মন, সকল অভাব যাবে দূরে।
হয় আশার বায়ু প্রবাহিত সদা বিশ্বাসীর অন্তরে।
যার অন্তরে থাকে বিশ্বাস, সে কি কভু হয়রে নিরাশ,
লম্ফ দিয়ে উঠে সে-যে অভাব (দেখিলে পরে।)
জাননা বিশ্বাসের বলে, অটল পর্ব্বত টলে,
অনায়াসে শিলা ভাসে, গভীর সাগর-নীরে।
যে হয় বিশ্বাসী-সন্তান, মানেনা কোন ব্যবধান,
সে-যে প্রাণের ভিতর প্রাণের পিতায় সদাই দরশন করে।
বিশ্বাস হলে সঞ্চার, রহেনা পাপ (অহঙ্কার,)
(পুণ্য)-বায়ু বহে প্রাণে, নব-জীবন তাহার করে।

(বিধান-সঙ্গীত)

বিশ্বরূপ দর্শন

—•—

যিনি পরব্রহ্ম তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং, অদ্বৈতং অর্থাৎ তিনি সত্য, অনন্ত, এক অখণ্ড জ্ঞান। পরব্রহ্ম যদি এক অখণ্ড সত্য জ্ঞানেই থাকিতেন, তবে সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। তিনি কেবল আপনাতে আপনি থাকিতেন, তাঁহার প্রকাশের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। অসীম আকাশ চিরঘন অন্ধকারে আবৃত থাকিত। কিন্তু তিনি ত কেবল সত্য জ্ঞান অনন্ত অখণ্ড দেবতা নহেন, তিনি ইহার উপরে আরো কিছু। উক্ত সত্য জ্ঞান অনন্তত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্ববাচক। এ সকল কথায় ইহাই বুঝায় যে, তিনি আছেন। তিনি কিরূপে আছেন? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে উপনিষদের ঋষিগণ বলিয়াছেন, তিনি আনন্দ রূপে আছেন। বর্ত্তমান সময়ের ভাষায় উপনিষদের অস্ফুট ভাব এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে,—তিনি মঙ্গল রূপে: প্রেম রূপে, সৌন্দর্য্য রূপে আছেন। এই তিন ভাবের প্রকাশের মধ্যেই আনন্দধারা প্রবাহিত।

তাঁহার কোনরূপ নাই, অথচ এই বিশ্ব তাঁহার সৌন্দর্য্য; তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, অথচ প্রত্যেক সজীব মূর্ত্তির মধ্যে তিনিই প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

"রূপসাগরে ডুব দিয়াছি, অরূপ রতন আশা করি।"
ঘাটে ঘাটে ফির্‌ব না আর, ভাসায়ে আমার জীর্ণ তরি।"

* * *

"প্রতিমা গড়িয়ে কে পূজিবে তোমায়, নিখিল ভুবন তোমার প্রতিমা।
রূপ রসে গন্ধে বিকশিত তুমি, মন্দির তোমার অসীম নীলিমা।
অগণন গ্রহ তারা শশী রবি, ভূধর সাগর গহন অটবী
নদনদী বন কুসুমকানন, সবার মাঝারে তব মাধুরিমা,
তোমার প্রতিমা প্রতি ঘরে ঘরে, দয়া করুণা স্নেহের মাঝারে,
জনক জননী ভাই ভগিনী, সবার মুখে বিরাজিছ মা।"

এই দুইটি সঙ্গীতের মধ্যে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গভীর অর্থ আছে। অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানময় পরব্রহ্ম এক এবং বহু। তিনি বিষয়ী, সমুদয় ব্যক্ত প্রকৃতি বিষয়। অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানের দুইটি দিক, একটি দিক বিষয়ী, আর একটি দিকে বিষয়। জড় এবং চৈতন্য বলিয়া সাধারণ ভাবে যাহা কথিত হইতেছে, তাহার মূলে একই চৈতন্য বিরাজিত। এক অখণ্ড চৈতন্য, সমুদয় রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত। একখানি কাগজের

যেমন দুইটি দিক, দুইটি পৃষ্ঠা থাকে, তেমনি একই জ্ঞানের বিষয়ী ও বিষয় দুইটি পৃষ্ঠামাত্র। বিষয় বিষয়ী রূপে এক অখণ্ড চৈতন্যই প্রকাশিত; এটি যেমন অভ্রান্ত সত্য, তেমনি যেখানে সসীম, সেইখানেই অসীম এটিও অভ্রান্ত সত্য। কেবল অভ্রান্ত নহে, সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। অসীমকে ছাড়িয়া আমরা সসীমকে দেখিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, কল্পনাও করিতে পারি না। জ্ঞানচক্ষু একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকে দর্শন করিতে গিয়া অসীমকে দর্শন করিয়া থাকে। তাহাই সত্য দর্শন। অসীমকে ছাড়িয়া সসীমকে দেখা স্থূলদর্শী ব্যক্তির দেখা। একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র দেখিতেছি। পাতার চারিদিকে অসীম আকাশ; কূল নাই, চির অসীম দেশ। আবার পাতাকে যতই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করি, কিছুতেই শেষ হইবে না। সুতরাং সে দিক দিয়াও অনন্ত ধরা পড়িতেছেন; অতএব অনন্ত ও সান্ত পরস্পর নিত্য যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অনন্ত ও সান্তকে একীভুত ভাবে দর্শন করাই লীলা দর্শন। অসীমের মধ্যে সসীমকে দর্শন করিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন হয়। বিশ্বরূপে সসীমের মাঝে তিনিই সত্য সুন্দর রূপে প্রকাশিত।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।"

"জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব, জ্ঞেয় ভিন্নও জ্ঞাতার অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিপরীত দিক্ প্রকাশক দুই কেন্দ্র—কিন্তু অভিন্ন রূপে যুক্ত। এক নিরপেক্ষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞাও জ্ঞেয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই প্রজ্ঞাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"* জ্ঞাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই জ্ঞেয় বিষয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্যই প্রকাশ সৌন্দর্য্যময়। জনৈক পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক বলেন, "সহজ জ্ঞান দ্বারা মনাতিরিক্ত বাহ্য সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব জানা যায়। জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি মূলতঃ সুন্দর। সৌন্দর্য্য, বস্তুর নিজস্ব নহে, দৃশ্য জগৎ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ও চিহ্ন বলিয়া সুন্দর। যে পরিমাণে ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি বহির্জগতে কাজ করে, সেই পরিমাণে উহা সুন্দর। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক,—উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ণত্বের উপরেই বৃক্ষের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতা স্রষ্টার জ্ঞান প্রকাশক। সুতরাং বৃক্ষের সৌন্দর্য্য মূলতঃ ভগবানের শক্তির প্রকাশ

* বাবু অভয়চরণ গুহ প্রণীত "সৌন্দর্য্য তত্ত্ব।" (৯ পৃষ্ঠা)

মাত্র। বৃক্ষের নিজের কোন সৌন্দর্য্য নাই।"* সেই বিশ্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। বহুকাল পূর্ব্বে কঠোপনিষদও এই কথা বলিয়াছে ;—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সেই স্বপ্রকাশ ভগবানের প্রকাশেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভৃতি তেজোভাতির প্রভা ভগবানেরই প্রভা।

পরমেশ্বর একাধারে সর্ব্বময়, সর্ব্বগত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বজ্ঞ। সকলের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ। আবার এই প্রকাশের অতীত হইয়াও তিনি আছেন, এবং প্রকাশকে তিনি জানিতেছেন। পরমেশ্বর একই সময়ে ব্যক্ত, অব্যক্ত, সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাতীত হইয়া আছেন। তিনি যেমন সকল রূপে, প্রকাশিত, তেমনি রূপের অতীত, তিনি যেমন সকল গুণে প্রকাশিত, তেমনি গুণের অতীত, তিনি যেমন সকল রসে প্রকাশিত তেমনি রসের অতীত হইয়াও আছেন। সসীমের মধ্যেই আমরা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি অনুভব করিয়া থাকি। এই সসীম তাঁহার রূপভাতি, আবার এই সসীমের অতীত হইয়াও তিনি আছেন। এই দৃশ্য জগৎ অদৃশ্য চিন্ময়ের মহিমাময় মূর্ত্তি বিশেষ। এই জন্য সাধক প্রাণ গাহিয়া উঠিল,—

"কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।"

রবিকর-দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখরতা, নিশীথের স্নিগ্ধতা, প্রবল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ সাগরের ভীষণতা, বীণাবাদিনী তটিনীর মৃদুল গতি, বজ্রের কঠোর শব্দ এবং বিহঙ্গের মধুর তান, অগ্নি ও শীতলতা প্রভৃতি সকলের মধ্য দিয়া সেই রসস্বরূপের রস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অখণ্ডরূপে—ব্যষ্টিরূপে, বিরাটকে দর্শন—সর্ব্বত্র তাঁহার রূপ দর্শনের নামই বিশ্বরূপ দর্শন।

গীতার বিশ্বরূপ দর্শন

গীতার ১১ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা আছে। গীতাকার উপাখ্যানের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—"পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩। "হে প্রভো, যদি আমি সেই রূপ দেখিতে পারি

* ইংরাজ দার্শনিক রিডের "সৌন্দর্য্য তত্ত্ব"।

এরূপ মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর তুমি আমারে সেই অব্যয় আত্মা দেখাও।" ৪। "ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ, আমার অলৌকিক, নানাবিধ, নানাবর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ অবলোকন কর।" ৫। "হে ভারত দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র অশ্বিদ্বয়,ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ দেখ; অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর। ৬। "এই স্বীয় চক্ষু দ্বারা কিন্তু তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না, অতএব তোমারে দিব্য চক্ষু দিতেছি; আবার অসাধারণ অঘটন ঘটনা সামর্থ্য দেখ। ৮। "সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন, মহা যোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরে পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন।" ৯। "অনেক মুখনেত্র বিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দশন বিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক আভরণ বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্র বিশিষ্ট।" ১০। "দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধ দ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট। ১১। "আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশী হইতে পারে। ১২। "তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানাভাগে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একত্র অবলোকন করিলেন। ১৩।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন,—"হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! অনেক বাহু উদর বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু তোমার না অন্ত, না মধ্য, না আদি দেখিতেছি।" ১৬। "উৎপত্তিস্থিতি বিনাশ রহিত অমিত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য নেত্র, দীপ্তাগ্নিমুখ, এবং স্বীয় তেজে এই সমুদয় বিশ্বসন্তাপক তোমারে দেখিতেছি।" ১৯। "হে মহাত্মন, স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অনন্ত এবং সমুদয় দিক্ একমাত্র তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে দেখিতেছি।" ২০।

"হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহু বাহু উরু ও চরণ বিশিষ্ট, বহু উদর বিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ঙ্কর মহৎ রূপ দেখিয়া সমুদয় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি।" ২৩। "হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, অনেক বর্ণ, বিকৃত মুখ ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্র তোমারে দেখিয়া অতি ভীত চিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।" ২৪। "হে দেবেশ, বিকৃত দন্তবিশিষ্ট, কালাগ্নি তুল্য তোমার মুখ সমূহ দেখিয়া আমি দিঙনির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও।" ২৫।

ভূপালগণ সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ আমাদের প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ানক ভয়ঙ্কর মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে চূর্ণিত মস্তকবিশিষ্ট কেহ কেহ দন্ত সন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে, দৃষ্ট হইতেছে।" ২৭। "যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে।" ২৯। "জ্বলন্ত বদন সকল দ্বারা লোক সকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণ রূপে ভক্ষণ করিতেছে। হে বিষ্ণো, তোমার তেজ দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া তাপ দিতেছ।" ৩০।

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া খণ্ডকেই দর্শন করিলেন, কিন্তু লীলাময় রসস্বরূপকে দর্শন করিলেন না। তিনি দেখিলেন, অলৌকিক আভরণ ও অস্ত্রবিশিষ্ট পুরুষদিগকে; তিনি অনেক উদর নেত্রবিশিষ্ট শক্তিরূপ দেখিলেন; তিনি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইলেন। তিনি বিকৃত মুখ, ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, ভূপালগণ, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ভয়ঙ্কর মুখ সকলে পতিত হইতেছে। অর্জ্জুনের এই দর্শনকে আংশিক দর্শন বা খণ্ড দর্শন বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিশ্বরূপ দর্শন নহে। জ্ঞানে অখণ্ডত্ব, ভাবে বিশ্বজনীনতা, বিশ্বে বৈচিত্র, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য দর্শন না করিলে বিশ্বরূপ দর্শনের বাধা উপস্থিত হয়। কিরূপ বাধা উপস্থিত হয়, সে বিষয়ে স্থূল স্থূল কয়েকটি কথা নিবেদিত হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরের পিতৃত্ব—মানবের ভ্রাতৃত্ব দর্শনের সাধনা আছে। পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়াছে যীশুর জীবনে। যীশু অবতার রূপে পূজিত। ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব দর্শন বিশ্বরূপের অংশ দর্শন মাত্র। অপর দিকে পূর্ণাবতার বিশ্বরূপ দর্শনের সম্পূর্ণ অন্তরায় বিশেষ। মুসলমান ধর্ম্মে অবতার নাই; কিন্তু পীর পয়গম্বর আছেন। এধর্ম্ম সাধনায় ঐশ্বর্য্যরূপী ঈশ্বর—শক্তিশালী ঈশ্বরকে দর্শন করা হয়। ইহাও বিশ্বরূপের এক একটি অংশ মাত্র। এদেশের বৈষ্ণব সাধকগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের মধ্যে ভগবানকে দেখিবার সাধনা করেন। এসকল ভাবও বিশ্বরূপের অংশবিশেষ। পৌরাণিক বিশ্বরূপ দর্শনের ভাব গীতা-প্রণেতা বর্ণন করিয়াছেন। তাহা ইতি-পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে প্রেমরূপী, সৌন্দর্য্যরূপী, আনন্দরূপী ভগবানের আবির্ভাব দর্শনের ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই। ভগবানের অখণ্ডত্ব এবং প্রলয়ের ভীষণতাই বিশেষরূপে বর্ণিত

হইয়াছে। এবিষয়ে উপনিষদ্ যে আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই পরিপূর্ণ আদর্শ। বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে দুইটি তত্ত্ব, একটি অখণ্ডরূপে ব্রহ্মকে দর্শন করা, আর একটি সকল রসের আধাররূপে দেখা। তিনি কল্যাণরূপে—প্রেমরূপে—সৌন্দর্য্যরূপে এবং আনন্দরূপে প্রকাশিত। এই কয়টি ভাব একটি কথায় উপনিষদ প্রকাশ করিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রস স্বরূপ। সমুদয় ঘাত প্রতিঘাত, রৌদ্র বৃষ্টি, আলোক আঁধার, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত। কিছু দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করা, শ্রবণ করিতে গিয়া তাঁহারই বাণী শ্রবণ করা, স্পর্শ করিতে গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করা, আঘ্রাণ করিতে গিয়া তাঁহার সৌরভ গ্রহণ করা, আস্বাদন করিতে গিয়া সেই রস স্বরূপকে আস্বাদন করাই বিশ্বরূপ দর্শন।

পুরুষরূপী ভগবান

কিন্তু এই বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে একটি সঙ্কট স্থল আছে। সেটি এই, বিশ্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া পুরুষরূপী জীবন দেবতাকে বিস্মৃত হওয়া। উপনিষদে অনন্তের দিক—অখণ্ডের দিক—পূর্ণের দিক যেমন সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পুরুষরূপী ভগবানের দিক ঠিক তেমন স্পষ্টভাবে দেখান হয় নাই। পুরুষরূপী ভগবানের সহিত মানবের যে আনন্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার বিকাশেই ভক্তি-ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। পুরাণ সমূহ ব্যক্তিরূপী ভগবানকে দেখাইতে গিয়া পূর্ণাবতারের সৃষ্টি করিয়াছেন। (অর্থাৎ উত্তম পুরুষে ভগবান কল্পনা করিয়াছেন) পূর্ণাবতার কখনও জ্ঞানরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত চিন্ময় দেবতাকে পুরাণকারগণ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ-স্বামী চিন্ময় ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ণনা করিলেও সাকার দেবতার পূজা-বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বিশিষ্টাদৈতবাদ' সাকারবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষ পুরুষরূপী চিন্ময় ভগবানের পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয় এভাবটি যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি পুরুষরূপী, নিরাকার চিন্ময় লীলাময় ভগবান, এভাবটি তেমনি প্রস্ফুটিত হয় নাই। এই শেষোক্ত ভাবটিকে প্রস্ফুটিত করাই ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সাধন।

পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্বের মূল কোথায়? অনন্তত্বেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব। যিনি অনন্ত, অখণ্ড, তিনিই পরম ব্যক্তি। তিনি যেমন শক্তিময়, জ্ঞানময়, তেমনি

ইচ্ছাময়। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, যাহা কিছু হইতেছে, সকলের মূলে তাঁহারই ইচ্ছা। অসীম মহা ব্যোমে নূতন নূতন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টিতে যেমন তাঁহার হস্ত পরিচালিত হইতেছে, সামান্য বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র পত্রের প্রকম্পনের মধ্যে তাঁহার হস্ত তেমনি বিকম্পিত। তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহার বাহিরে কিছুই ঘটে না; ঘটিতে পারে না। তাঁহার মধ্যেই পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আমরা অন্তরে তাঁহার যে প্রকাশ অনুভব করিয়া থাকি, সে প্রকাশে তাঁহার ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়। "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।" বাস্তবিক তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া দর্শন করিতে থাকি যে, সেই পরম ব্যক্তির মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্ব। তিনি পুরুষ বলিয়াই আমরাও পুরুষ। সেই এক ব্যক্তির মধ্যে কোটি কোটি অনন্ত ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইতেছে। আমাদের অগণিত ব্যক্তিত্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সেই পরম ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিত্বে বিধৃত রহিয়াছি বলিয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। নতুবা আমরা ধূলির ন্যায় উড়িয়া যাইতাম। জীবাত্মা পরমাত্মা দুই ব্যক্তি। এই দুইজন পরস্পর যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। উপনিষদ্ অতীব-সুন্দররূপে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বেতর এবং মুণ্ডকে বর্ণিত হইয়াছে;—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা-সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপপলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽ ভিচাকশীতি।"

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

ব্যক্তিত্ব বলিলেই মানবের ব্যক্তিত্ব বুঝায়। আমাদের ব্যক্তিত্ব যেরূপ পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব সেরূপ নহে। আমাদের ব্যক্তিত্ব অন্য নিরপেক্ষ নহে। আমাদের পরস্পরের পার্থক্যের মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব এরূপ ভেদযুক্ত ব্যক্তিত্ব নহে। তিনি এক দিকে সকলের সঙ্গে অভেদরূপে যুক্ত আছেন, অপর দিকে সকলকে জানিতেছেন; একদিকে তিনি এক অখণ্ড জ্ঞান রূপে বিরাজিত, অপর দিকে তিনি জ্ঞানী; এক দিকে প্রেম, অপর দিকে প্রেমিক; এক দিকে তিনি আনন্দ, অপর দিকে তিনি আনন্দ সুধা পান করিতেছেন। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কেবল জ্ঞান, জ্ঞানী নহেন, কেবল প্রেম; প্রেমিক নহেন, তাঁহারা পুরুষরূপী ব্রহ্মকে অস্বীকার করেন। পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্বের মূলে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ দুইই আছে। তিনি আপনাকে

বিশ্বময় রূপে দেখিতেছেন, আবার বিশ্ব ও মানবের সঙ্গে যে তাঁহার চিরন্তন পার্থক্য আছে তাহাও উপলব্ধি করিতেছেন। এই উপলব্ধির মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা পুরুষভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। আমাদের ব্যক্তিত্বের মূলও এই স্থানে। আমরা অভেদের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই বলিয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের মধ্যে পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব, এই ভেদাভেদের মধ্যেই জড় ও চেতনের পার্থক্য, এই ভেদাভেদের মধ্যেই ইহ পরলোক এবং আমাদের অমর উন্নতিশীল জীবন স্থাপিত।

বিশ্বরূপের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিরূপ এবং ব্যক্তিরূপের মধ্যে তাঁহার বিশ্বরূপ। অন্তরতর বাসী প্রভু আমার সর্ব্বত্র। "জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল।" অন্তরে বাহিরে সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষকে দর্শন করা—তাঁহাকে সর্ব্বরূপে দর্শন করিয়া প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাই সাধনার চরম সার্থকতা। যিনি বিশ্বরূপী, তিনি প্রাণরূপী এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। বিশ্বরূপের মধ্যেই ব্যক্তিরূপ। এই ব্যক্তি বা পুরুষ রূপের দিকেই মানব-প্রাণের ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্বরূপের মধ্যে পুরুষরূপী লীলাময় জীবন দেবতাকে দেখিবার জন্য মানব প্রাণ হইতে প্রার্থনা উঠিতেছে;—

"তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে, এস গন্ধে বরণে গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে, এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দু-নয়নে।
এস নির্ম্মল উজ্জল কান্ত, এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এসহে বিচিত্র বিধানে;
এস দুখে সুখে এস মর্ম্মে, এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে॥"

(তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ই শ্রাবণ।) শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

দেবকুমার

৪

বসু মহাশয় দেবকুমারকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, এবং সময়মত নিজেই তাহার পড়াশুনা দেখিতেন। আবশ্যক হইলে সে মিসেস বোসের নিকট হইতেও পড়া জানিয়া লইত। বিশেষ কাজ না থাকিলে বসু মহাশয় দেবকুমারকে

লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। বেড়াইবার সময় নানা বিষয়ে কথা কহিতেন। কিসে সৎ হওয়া যায়, কিসে ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া যায়, সেই সকল কথা বলিতেন। দেবকুমার যে কেবল ঐ উপদেশগুলি শুনিত তাহা নহে, তাহার ধর্ম্ম-পিতার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিত। একটা প্রচলিত কথা আছে—"শত উপদেশ আর একটি দৃষ্টান্ত"। বাস্তবিক যে উপদেশের সঙ্গে জীবন-গত দৃষ্টান্তের শিক্ষা পায় সে বড় সৌভাগ্যবান্। শিক্ষার সঙ্গে চরিত্রগঠনের বিষয়গুলি সে স্পষ্ট দে'খতে পায়। তাই শিক্ষার সহিত দেবকুমারের জীবনও গঠিত হইতে লাগিল।

দেবকুমার খুব মনযোগ দিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। নৌকা চালনায় অথবা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত নমশূদ্র জাতীয় বালকদিগকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহারা অপর জাতীয় বালকের মতো মেধাবী নয়। কিন্তু তাহার মধ্যে দেবকুমারের বিশেষ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। সেই জন্য সে সহজেই সমস্ত পড়া আয়ত্ত করিতে পারিত এবং শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই প্রথমস্থান অধিকার করিত।

খৃষ্টান সমাজের কেহ কেহ বসু মহাশয়কে কহিতেন, "আপনি যখন এ বালকের সমস্ত ভার নিয়েছেন তখন একে ব্যাপ্‌টাইজড হতে বলেন না কেন?"

বসু মহাশয় উত্তর করিতেন, "দেবকুমার খৃষ্টধর্ম্মের কি বোঝে? নিজে ইচ্ছে করে যখন খৃষ্টান হতে চাইবে তখন ব্যাপটাইজড্ হবে।"

একদিন বিকালবেলা বসু মহাশয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে দেবকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা খৃষ্টানদের যেন দেশের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয় কেন?"

"সে আমাদের দোষ। যিশু যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সকল দেশ ও সকল কালের জন্য। ঐরূপ অনেক কথা আমাদের দেশে বুদ্ধদেবও বলে গেছেন। সকল অবস্থা এবং সংস্কারের মধ্যে তাঁহার উপদেশ পালন করতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করি যে খৃষ্টান হলেই যেন আমরা য়ুরোপীয় হোলাম।"

"আচ্ছা বাবা, আমি কি খৃষ্টান হলে আপনি সুখী হন?" বসু মহাশয় স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খৃষ্টান নাম নিলে কি হয়? কত লোকে খৃষ্টান হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টান বললে লজ্জা হয়; যিশুর মতো যে জীবন যাপন করতে চায় সে-ই প্রকৃত খৃষ্টান। আমি চাই যে তুমি যিশুর মতো উদার, পবিত্র, প্রেমিক, ঈশ্বর-ভক্ত হও।"

দেবকুমার উৎসাহের সহিত কহিল, "আমি সেইরূপ হতে চেষ্টা করব। তাহলে আপনি সুখী হবেন?"

"বাবা, আমি সেই আশায় তোমার নাম 'দেবকুমার' রেখেছি। আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা যে তুমি ভালো হও, এর অধিক আর কিছুতেই তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে না"। এই বলিয়া বসু মহাশয় সস্নেহে দেবকুমারের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন।

৫

মিষ্টার আয়ারের মান্দ্রাজে দোতলা বড় বাড়ি। জুড়ীগাড়ি, দারবান খানসামা প্রভৃতিতে বাড়ি জমকালো। উপরে ড্রয়িংরুম নানা আসবাবে সজ্জিত। নীচে ডাইনিংহল, এবং অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলি যথাযোগ্য ভাবে সুব্যবস্থিত।

কিন্তু এত সাজসরঞ্জামের মধ্যে তিনি আর তাঁহার পালিত ভ্রাতুষ্পুত্রী মাত্র। মিসেস আয়ার বহুদিন পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীই কন্যাস্থানীয়া। তাঁহার এখনো বিবাহ হয় নাই; তিনি এই গৃহের কর্ত্রী।

মিষ্টার আয়ার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী-ব্যাঙ্কের কার্য্যকারী ডিরেক্টার, ও পূর্ব্বঘাট জীবনবীমা কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ। লোকে তাঁহাকে বিশিষ্ট ধনী সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে করে। তিনি ব্রাহ্মণ—এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজে গর্ব্ব করিয়া থাকেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং চালচলনে অনেকটা সাহেবী ধরণের। লোকে তাঁহাকে সৎকার্য্যে উৎসাহী, সকল সাধারণ কার্য্যে অগ্রণী বলিয়া জানে। কিন্তু আবার অনেকে বলে যে, এমন ভণ্ড কৌশলী চতুর প্রায় দেখা যায় না।

প্রাতঃকালে মিষ্টার আয়ার ও তাঁহার কন্যা উপরে একটি ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে কথা কহিতেছেন। মিস আয়ার কথা তুলিলেন, বাবা, আমার যে পরে কি দশা হবে তাই সময়ে সময়ে ভাবনা হয়। তুমি যে পর্য্যন্ত আছ সে পর্য্যন্ত আমি পরম সুখে আছি। পরে যে আমাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে।

মিষ্টার আয়ার বিস্ময়ের সহিত সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন কেন? আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে উইল করে দিয়ে যাব, আমার উত্তরাধিকারিণী তুমিই।

মিস আয়ার। কিন্তু তুমি যে সকল কাজে হাত দিয়েছ যদি তার একটি ফেল হয়, তা হলেই তো আমি একবারে ডুববো।

মিষ্টার আয়ার। সে সম্বন্ধে তোমার ভাবতে হবে না, আমি এর মধ্যে আমার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বেনামী করে ফেলেছি। রেজিষ্টারকে একথা গোপন রাখবার জন্য রাজি করেছি। ফেল হলেও আমার অস্থাবর সম্পত্তির কিছু ক্ষতি হবে না।

চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া তিনি আবার কহিলেন, ব্যাঙ্কের প্রকৃত হিসাবপত্র সব আমার নিজের কাছে থাকে। আমি নিজে দু'একটা অংশ রেখে ক্রমে সব

অপরকে বিক্রয় করে দিচ্ছি। যদি কখনো ব্যাঙ্ক ফেল হয়, আমার অংশে বড় বেশী পড়বে না। এখন বেশ ভালো ভাবেই কাজ চলচে, আমার ওপর সকলেরই বিশ্বাস আছে; তবে যত বিধবা আর মুদেলিয়ারের নাবালক পুত্রেরও অনেক টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা আছে। ক্রমে এই ব্যাঙ্ক হতে আমি অনেক টাকা নিতে পারব। যদি ব্যাঙ্ক ফেলই হয় আমি যে কতকগুলি মিথ্যে লোকের নামে ধার লিখে রেখেছি, তা আর কে দেখতে আসবে?

মিস্ আয়ার। তবে আবার জীবনবীমা-কোম্পানী কেন করলে?

মিষ্টার আয়ার। জীবনবীমা কোম্পানীর মতো এমন সুবিধার ব্যবসা আর কি আছে। মাসে মাসে অজস্র টাকা আসচে। যদি কখনো কেহ মরে, তখন একটু মুস্কিলে পড়তে হয় বটে। মিষ্টার আয়ার একটু থামিয়া আবার ত্রস্তভাবে "তুমি এ কাজে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পার?" বলিয়া মিস্ আয়ারের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিস আয়ার। কি রকম সাহায্য?

মিষ্টার আয়ার। আমি এখন এমন একজন লোক চাই যার কাছ থেকে জীবনবীমা কোম্পানীর জন্য অনেক টাকা নিতে পারি। আর যে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা গচ্ছিত রাখতেও পারে। তা হলে এসব কাজ বিনা গোলমালে অনেক দিন চলবে। বীণাপুরমের রাজা তোমার সঙ্গে তো খুব মিশতে চায়, তাকে একটু ফাঁদে ফেলতে পার না?

মিস আয়ার। সে বেশী কিছু কষ্টকর নয়। রাজাটি যেমন বোকা তাকে আমি অনায়াসে বশ করতে পারব। কিন্তু আমার Reputation (মর্য্যাদা) যে একেবারে থাকবে না। লোকে আমাকে বড় নিন্দা করবে।

মিষ্টার আয়ার। সে সম্বন্ধে তোমার কোনো ভয় নেই। জেলে যাইবার ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারবে না। আর তুমি নিজে একটা সাধারণ কোনো কাজের ভার লও। তা হলে লোকে তোমার নিন্দা করা দূরে থাক্ বরং প্রশংসা করবে। লোকগুলা নিতান্ত অপদার্থ। ধনী হাজার দোষ করলেও তারা তাদের তোষামোদ করে।

মিস্ আয়ার। কি কাজের ভার নেবো? আচ্ছা, বিধবাদের জন্য একটা ইস্কুল করলে হয় না? কিছু বৃত্তি দিলে অনেক ছাত্রী পাওয়া যাবে। লোকেরও সহানুভূতি হবে।

মিষ্টার আয়ার। বেশ, সে বিষয়ে পরে বিবেচনা করা যাবে। এমন সময়

ভৃত্য আসিয়া মিষ্টার আয়ারের হাতে একখানি কার্ড দিল। 'মান্দ্রাজ পবিত্রতা সংরক্ষিণী সভা'র সম্পাদক আয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ড্রইংরুমে বসাইতে বলিলে, ভৃত্য চলিয়া গেল। তখন মিষ্টার আয়ার বলিলেন, "এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত। শুনেছি এদের বার্ষিক সভা হবে, তাই আমাকে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে এসেছে, তোমাকেও যাতে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করে, আমি তা করব।"

মিস আয়ার। না বাবা আমি বক্তৃতা করতে পারব না। তুমি আর তাকে কিছু বোলো না।

মিষ্টার আয়ার। তোমার ভয় কি? আমি লিখে দেবো, তুমি তাই মুখস্থ করে পড়বে।

মিষ্টার আয়ার নীচে আসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সজোরে করমর্দ্দন করিলেন। তারপর কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

সম্পাদক। একটু বিশেষ কাজে আমি আপনার নিকট এসেছি। আমাদের বার্ষিক অধিবেশন আগামী সপ্তাহে; আপনাকে এ অধিবেশনে সভাপতি হতে হবে।

মিষ্টার আয়ার। এ আন্দোলনের সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের মধ্যেও এইরূপ সভা ছিল। কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা অভাব দেখছি। আপনারা এ আন্দোলনে মহিলাদের একেবারে বাদ দিয়েছেন। একাজে মহিলাদের সাহায্য আবশ্যক। মিস আয়ারের এসব কাজে খুব উৎসাহ। আপনি যদি বলেন, আমি তাঁকে এ সভায় কিছু বলতে অনুরোধ করতে পারি।

সম্পাদক। আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কখনো কথা হয়নি। তবে আপনি যদি ভালো মনে করেন তা হতে পারে। তাঁর নাম আমরা বক্তার লিষ্ট মধ্যে দেবো।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সম্পাদক মহাশয় বিদায় হইলেন।

৬

দেবকুমার বসু মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া প্রায় ৭ বৎসর উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার এ সৌভাগ্য আর অধিক দিন রহিল না। বসু মহাশয় অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। যত দূর চিকিৎসা হইবার তাহা হইতেছে, কিন্তু কোনোই ফল হইতেছে না। দেবকুমার আহার-নিদ্রা ভুলিয়া

গিয়া তাঁহার সেবায় ব্যস্ত রহিয়াছে, এবং তাহার একমাত্র পরম সুহৃদ ও বন্ধুর এই অবস্থা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বসু মহাশয় স্থির শান্ত; তাঁহার কোনো উদ্বেগ নাই। যতদিন পৃথিবীতে রহিয়াছেন, যাহা সত্য এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা করিতে ক্রটী করেন নাই। এখন পরলোকে যাইতে তাঁহার কোনো উদ্বেগ নাই।

পাদরি মহাশয় প্রায়ই সংবাদ লইতে আসিতেন। তিনিও বুঝিলেন যে, জীবনের আর আশা নাই। একদিন তিনি বসু মহাশয়ের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ভাবিলেন এখন ইঁহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। দেবকুমারও শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াছিল।

পাদরি মহাশয় কহিলেন,—"মিষ্টার বোস্, আপনার নিকট আপনার অবস্থা আর গোপন করা উচিত নয়। আপনার এখন হতে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।"

বসু মহাশয়। আমি আমার অবস্থা বুঝতে পার্‌ছি। আমি অনেকদিন হতে পরলোকের জন্য প্রস্তুত আছি।

পাদরি। তবে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশুর প্রতি আপনার বিশ্বাস প্রকাশ করুন এবং আপনার পাপের জন্য তাঁর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করুন।

বসু মহাশয়। দেখুন, মৃত্যুকালে আর আমি কপট আচরণ করতে পারি না। যিশুকে আমি চিরদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসন দিয়েছি। তিনি আমাকে যে পথ দেখিয়েছেন, আমি প্রাণপণে সেই পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেছি। কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়লে তিনি কি করতেন আমি নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করে সেইরূপ করতে চেষ্টা করেছি। সকল সংগ্রামকালে আমার মনে হয়েছে তিনি আমার সঙ্গে আছেন। আমি যখন চলতে পারিনে, যিশু তখন উৎসাহ দেন, যখন ভালো কাজ করি তখন তিনি আশীর্ব্বাদ করেন। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে আর কেহ উদ্ধার করতে পারবেন না। যিশু যে জীবন দ্বারা পিতার প্রিয় হয়েছিলেন, আমি সেইরূপ তাঁর প্রিয় হতে চেষ্টা করেছি। ধীরে ধীরে বসু মহাশয় এই কথা কয়টি বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পাদরি মহাশয় তাঁহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, সে কি, আপনি কি পিতা ও পুত্রকে এক ভাবেন না? যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা স্বীকার করেন না? আর বেশী সময় নাই, আপনি বিশ্বাস করুন; আপনি অনন্ত নরকের পথে যাচ্ছেন।

বসু মহাশয় আর বেশী কথা বলিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাদরি মহাশয়ের কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই ধীরে ধীরে বলিলেন,—আপনি জানেন, ধর্ম্মবিষয়ে আমি কাহারো সহিত বিশেষ তর্ক করতাম না। তার কারণ আজ আপনাকে বলছি। দেখুন, মানুষের মধ্যে যিশুকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ঈশ্বর যিশু হতে কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ। যিশুর উন্নত জীবনে পবিত্র ঈশ্বরের আভাস পাই, কিন্তু যিশুই ঈশ্বরকে চেয়ে ছিলেন। মানুষ একা একা ধর্ম্মসাধন করতে পারে না এবং আপনাদের সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে বলেই আমি নিজেকে খৃষ্টান বলি। আপনারা যখন যিশুর নিকট প্রার্থনা করেন আমার তাতে যোগ দিতে কোনো বাধা হয় না, কেন না আমার গুরু, আদর্শ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিশুকে আমি অনেক সময়েই আমার প্রাণের নিকট অনুভব করি। আর তিনি জীবিত থাকলে প্রিয় শিষ্যের সম্বন্ধে তিনি যেমন করতেন, ধর্ম্মবন্ধুরূপে তাঁকে আমি সেই ভাবেই পেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু প্রকৃত প্রার্থনা আমি ঈশ্বরের নিকট করি।

পাদরি। এ অবস্থায় আপনাকে খৃষ্টান বলতে পারি না। আপনি যিশুকে ঈশ্বর বলেন না, এবং তাঁকে ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করেন না, আমি আপনার পরকালের বিষয় চিন্তা করে বড় দুঃখিত হচ্ছি।

বসু মহাশয়। আমাকে খৃষ্টান না বলুন, কিন্তু যিশুই আমার গুরু, বন্ধু, পথপ্রদর্শক। যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করলেই যে খৃষ্টান হয় একথা আমি কোনো দিন বিশ্বাস করি না। তিনি যে আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই আদর্শ জীবনে প্রতিপালন করলেই মুক্তি হয়। কিন্তু কেবল বিশ্বাসে হয় না। আমি সমস্ত জীবন দিয়ে তাই করতে চেষ্টা করেছি। এখন অন্তর্যামী ঈশ্বর তার বিচার করবেন। যিশুকে যিনি মৃত্যুকালে ত্যাগ করেন নাই, আমাকেও তিনি ত্যাগ করবেন না। তাঁর দয়া অসীম, আমি তারই উপর নির্ভর করে আছি।

পাদরী মহাশয় নিজের পুঁথিগত বিদ্যায় আর কুলাইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে দিনকার মতো বিদায় লইলেন।

পরদিন পাদরি মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "মিষ্টার বোস্, আমি খুব চিন্তা করে দেখ্‌লাম আপনার কথার মধ্যে খুব সত্য আছে। আপনার জীবন দেখে মনে হয়, আপনি যদি উদ্ধার না পান, তবে আমরাও পাব না। অবশ্য আপনার সঙ্গে সকল বিষয়েই এক মত না হতে পারি কিন্তু আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার মতো জীবন হয়।" এই বলিয়া তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা

করিতে লাগিলেন। "হে পিতা! এই বিশ্বাসীর মতো জীবন আমায় দাও। আমরা শুধু তোমার কথা বলে গেলাম, তোমার সন্তানের জীবনের যে আদর্শ দেখালে তা সাধন করলাম না। ইঁহাকে তোমার নিকট স্থান দাও, যিশু তোমার নিকটে আছেন, ইঁহাকে তাঁহারই পার্শ্বে স্থান দাও।"

বসু মহাশয় ও দেবকুমার চক্ষু মুদিয়া এই প্রার্থনায় যোগ দিলেন। পাদরি মহাশয় বসু মহাশয়ের করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, আপনি আগে যাচ্ছেন, আমরা একদিন আপনার পশ্চাতে যাব। তখন আর দেশের ব্যবধান থাকবে না।

ইহার তিন দিন পরে বসু মহাশয়ের আত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মিসেস বোস ক্রন্দন করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবকুমার কাঁদিবার অবসর পাইল না, তাহাকেই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইল।

যথাসময়ে বসু মহাশয়ের পরিত্যক্ত দেহ বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা সমাধি স্থানে নীত হইল। পাদরি মহাশয় নিজে পৌরহিত্য করিলেন এবং 'শবাধার' ধীরে ধীরে মৃত্তিকার মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইল।

দেবকুমার এতক্ষণ কর্ত্তব্য অনুরোধে আত্মসংযম করিয়া ছিল; কিন্তু সে আর সহ্য করিতে পারিল না। যে মুখ হইতে কত সদুপদেশ শুনিয়াছে, যে চক্ষু কত সস্নেহে তাহার দিকে তাকাইয়াছে; যে হাত ধরিয়া সে কতদিন বেড়াইয়াছে আর ভাবিয়াছে যে সংসারে এই তাহার আশ্রয়। এখন তাহা চিরদিনের জন্য মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইতেছে। সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। বন্ধুগণ তাহাকে ধরিয়া গাড়িতে তুলিয়া গৃহে আনয়ন করিল।

গৃহে আসিয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। ঘরের এক পার্শ্বে সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, আবার তাহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া যখন হৃদয়ের ভার কিছু লঘু হইল তখন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, পিতা পরলোকে থাকিয়াও তাহার কল্যাণচিন্তা করিতেছেন। সে যে ভালো হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং তিনি তাহাতে কত সুখী হইবেন বলিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল! দেবকুমার মনে মনে বলিল, পিতা, তুমি পরলোকে থাকিলেও আমি প্রাণপণে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

জাপানে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রার কথা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি জাপানের টোকিয়ো ইম্পিরিয়াল ইয়ুনিভারসিটিতে এবং ওসাকা টেনোজিহলে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শুনিয়া চীন ও জাপান মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার অনুবাদ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

ভারতবর্ষের বাণী—সাধারণ সভায় আমাকে যখন বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়, তখন আমার মনে স্বভাবতঃই প্রবল অনিচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমি কবিতা রচনায় ব্যয় করিয়াছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কবিত্বরূপী পক্ষী একান্ত লজ্জাশীল, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতেই আপনার নীড় রচনা করিতে ভালবাসে। কিন্তু আমি যখন বুঝিলাম যে আপনাদের রাজ্যে আগন্তুক এই অতিথিটির প্রতি দয়া-প্রকাশ করিয়া আপনারা আমাকে সভায় আহ্বান করিয়াছেন, তখন এই অনুরোধে সম্মতি প্রকাশই আমি শোভন বলিয়া মনে করিয়াছি।

জাপানের বিশেষত্ব

সমস্ত এসিয়াবাসীদিগের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার চিন্তাই আমার মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হইতেছে। আমাদের কর্ণে বারংবার এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে যে, এসিয়া এখনো সেই প্রাচীন যুগেরই মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়া মহাদেশ মৃতের সমাধিমন্দিরের ঐশ্বর্য্যই বিকাশ করিয়া থাকেন। পশ্চাতের দিকে এই মহাদেশ আপনার মুখ এমনভাবে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন যে, উন্নতির পথে এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য ইহার নাই। আমারা এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ।

যখন অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন আমরা এসিয়ার অধিবাসীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত ভাবিতাম, হাঁ সত্য সত্যই আমরা চিরদিনের মত মরিয়াই আছি।

আমি জানি ভারতবর্ষের শিক্ষিতদের মধ্যে একদল এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা বৃথা অহঙ্কারের দ্বারা এই অভিযোগ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অহঙ্কারও মুখোসপরা লজ্জা, ইহারও আপনার প্রতি কিছুমাত্র আস্থা নাই।

জাপানের অভ্যুত্থান

এই সময়ে জাপানের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বহু শতাব্দীর জড়ত্ব ছুড়িয়া ফেলিয়া জাপান জাগিয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষিপ্রবেগে দৌড়িয়া সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমানের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানের এই জাগরণে আমাদের যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি যে, কোন একটা দেশের অধিবাসীকে চিরকাল মরিয়া থাকিতে হইবে না।

আমাদের বিস্মৃতি

আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, এই এসিয়া মহাদেশে বৃহৎ শক্তিশালী অনেক রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মহাদেশে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যে অসামান্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর বৃহৎ ধর্ম্মসমূহের মাতৃভূমি এই মহাদেশ। সুতরাং এই মহাদেশের ভূমি ও জলবায়ুর মধ্যে এমন কিছু থাকিতেই পারে না যাহা মানব মনের শক্তিনাশ করিয়া উহাকে নিচেষ্ট ও নিবীর্য্য করিয়া ফেলে। পশ্চিমদেশ যখন গাঢ় অন্ধকারে নিদ্রিত ছিল তখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পূর্ব্বদেশই সভ্যতার বর্ত্তিকা ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন স্মৃতি কোন-ক্রমেই মানসিক জড়তা ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন হইতে পারে না। * * * *

নবজীবন

জীবনসঙ্গীতের ছন্দে উত্থান ও পতন আছে! সঙ্গীত খাদে নামিয়া আবার নববলেই উচ্চগ্রামে উঠিয়া থাকে। কর্ম্ম-সংগ্রামের আগুনে জীবন তাহার সমস্ত কাঠ খড় পোড়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এই অমিতব্যয় সুদীর্ঘকাল চলিতেই পারে না। এইরূপ অবস্থার পরে নিশ্চেষ্টতার যুগ আইসে। তখন ব্যয়ের শক্তি ফুরাইয়া যায়। নূতন তেজ সঞ্চয়ের জন্যই সকল প্রকারেই কর্ম্মোদ্যম থাকে না।

জাপানের জাগরণ

এক শুভ প্রাতে সমস্ত পৃথিবী চাহিয়া দেখিল, জাপান এক রাত্রির মধ্যেই তাহার প্রাচীন অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিজয়ীর ন্যায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অল্প সময় মধ্যে ইহা ঘটিল যে এই জাগরণকে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের মত অনায়াস বলিয়া মনে হইল, ইহা ইমারত নির্ম্মাণের মত মন্থর কর্ম্ম বলিয়া অনুভূত হয় নাই। যে মুহূর্ত্তে জাপান জাগিয়া উঠিল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ পরিণতি, নবীনতা এবং অসীম প্রচ্ছন্নশক্তি প্রত্যক্ষ করা গেল। অনেকের মনে এইরূপ ভয় হইয়াছিল যে এই উত্থান একটা ঐতিহাসিক খেয়াল-মাত্র, এই জাগরণ শিশুর খেলা, ইহা সাবানের ফেনার মত অস্থায়ী-শূন্য।

জাপান প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার অভ্যুদয় ক্ষণস্থায়ী বিস্ময়ের বিষয় নহে, প্রবল ঢেউয়ে ধুইয়া অথবা বিলুপ্ত হইবার জন্য অন্ধকারের গর্ভ হইতে তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়ান নাই।

জাপান কি ?

আসল সত্য কথা এই যে জাপান নূতন ও প্রাচীন দুইই। জাপান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচ্য সভ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই সভ্যতা মানুষকে আত্মার ভিতর সম্পদ ও শক্তির সন্ধানকরিতে বলিয়া থাকে। এই সভ্যতা মানুষকে এমন আত্মপ্রতিষ্ঠা দান করিয়া থাকে যে, কোন ক্ষতি কোন বিপদেই তাহাকে টলাইতে পারে না, কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়াই মানুষ আত্মদান করিতে পারে। এই সভ্যতার বলে মানুষ যে দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা সে সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই দৃষ্টি লাভ করিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে সমস্ত বিশ্ব প্রাণে ভরিয়া রহিয়াছে, আত্মা সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। আমরা অনুভব করিয়াছি যে এই বিশ্ব ঘটনাচক্রের বিরাট-দানব চালিত কল নহে, অথবা কোন সুদূর স্বর্গবাসী পরমেশ্বর এই বিশ্বের চালাক নহেন।

এক কথায় বলিতে হইলে বলিব, সেই অতীত কালের প্রাচ্য সভ্যতার মধ্য হইতে জাপান সহজ-শোভনরূপে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন। যে অতলের গর্ভ হইতেই তিনি জাগিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহার অচল প্রতিষ্ঠা।

জাপান প্রাচীন প্রাচ্য মহাদেশের দুহিতা হইয়াও অকুতোভয়ে বর্ত্তমান-যুগের সকল সম্পদ তাহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া, মনের জড়তা পরিহার করিয়া তিনি তাহার তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপে তিনি বর্ত্তমান সময়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তিনি বিস্ময়কর আগ্রহের সহিত আধুনিক সভ্যতার সমস্ত ঝুঁকি বরণ করিয়া লইয়াছেন।

জাপানের দৃষ্টান্ত

জাপানের এই দৃষ্টান্ত সমস্ত এসিয়াবাসীকে অভয় ও উৎসাহ দান করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, প্রাণ ও শক্তি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছে। কেবল উহার উপরে সঞ্চিত ধুলিরাজি উড়াইয়া দিতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছি, মৃতদের মধ্যে আশ্রয় লইলে মৃত্যুই অনিবার্য্য এবং সাহস করিয়া জীবনের যাবতীয় ঝুঁকি পুরাপুরি স্বীকার করিয়া লইলেই জীবন লাভ হইবে।

জাপানের শিক্ষা

জাপান আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন, যে আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সেই যুগের মূলমন্ত্র আমাদিগকে শিখিতেই

হইবে। জাপান তাহার এই বাণী সমস্ত এসিয়ায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পুরাতন সজীব বীজ নূতন যুগের মাটিতে বপন করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত মত

আমি কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, পশ্চিমের অনুকরণ করিয়া জাপানের যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে পারিয়াছেন। জীবন অনুকরণ করার মত জিনিষ নহে, শক্তিও চিরকালের নিমিত্ত সঞ্চার করা যায় না। অনুকরণ দুর্ব্বলতারই একটা হেতু। আমাদের প্রকৃতির সহিত ইহার বিরোধ আছে, ইহা সর্ব্বদাই আমাদিগকে বাধা দিয়া থাকে। অনুকরণ ঠিক একটা মরার হাড়গুলিকে অন্য আর একটা মরার চামড়ার পোষাকে সজ্জিত করা। এইরূপ সাজাইলে হাড়ের সহিত চামড়ার বিরোধ কোন কালেই মিটিতে পারে না।

আসল সত্য এই যে, বিজ্ঞান আর মানব-প্রকৃতি এক জিনিষ নহে। জড়-জগতের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি জানিয়া মানবের প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় না। জ্ঞান অন্য জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি ধার করিয়া লইবার জিনিষ নহে।

নূতন জ্ঞান যখন আইসে, তখন আমরা তাহা কেবল শিখি তাহা নহে, অনুকরণও করি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও শিক্ষার সহিত আমরা উক্ত দাতা শিক্ষকদিগেরও অনুকরণ করিবার নিমিত্ত দুঃসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি! কিন্তু সেই শিক্ষকগণ আমাদিগের ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনের মধ্যে জন্মলাভ করেন নাই। এইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে যাইয়া আমরা তাহাদিগের বাহিরের হাবভাব ও ভাবভঙ্গীর নকল করিয়াছি। সেই গুলি উক্ত শিক্ষকদিগের ঐতিহাসিক প্রকাশ বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু যে ভাবগুলি বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক নহে, বৈজ্ঞানিক, সেই সকল ভাব এক জাতির নিকট হইতে আর এক জাতি শিখিয়া লইলে কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

বাল্য স্মৃতি

বাল্যে যখন কল্পনার বলে আমি জাপানের কথা চিন্তা করিতাম, তখন আমার মনে পড়িত, আমাদের দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, উচ্চ অধিত্যকা এবং চীন দেশের বিস্তৃত নদীসমূহ অতিক্রম করিয়া সমুদ্র তীরে উপনীত হইতেন। ঐ সকল ভিক্ষু নৈসর্গিক বাধা, ভাষার ও আচারের বৈষম্য গ্রাহ্য করেন নাই। মানবের ভ্রাতৃত্বে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহাদের সেই জীবন্ত বিশ্বাস কার্য্যে অভিব্যক্ত হইত। তাঁহারা

যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকলের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস এমন অটল ছিল যে, সেই বিশ্বাসবলেই বাহিরের সকল বিপত্তি উড়িয়া যাইত। এই সকল বিশ্বাসী ভিক্ষুদের মুখে যাঁহারা নবধর্ম্মের বাণী শুনিতেন, তাঁহারাই জাপানে আগমন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে ধর্ম্ম এখানে প্রতীষ্ঠা পাইল।

তুলনা

সেই পুরাকালে ধর্ম্মযাত্রীদের দুরতিক্রম্য বিপৎসঙ্কুল যাত্রার সহিত আমি আমার আধুনিক আরামপূর্ণ অনায়াস যাত্রার তুলনা না করিয়া পারি না। সেকালে যে যাত্রায় বহু বৎসর লাগিত এখন তাহা এক মাসেরও কম সময়ে সম্পন্ন হইতেছে। আধুনিক সভ্যতা বিবিধ কলকারখানার সাহায্যে মানুষকে যতই আরাম ও আনন্দ দান করুক না কেন, এই সভ্যতাই অন্য দিকে মানুষের ভিতরকার মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এই সভ্যতা জীবনকে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে, যে ইহার স্বচ্ছ সরলতা আর নাই। বস্তু এখন যেমন প্রত্যক্ষ, মানুষ তেমন নহে।

সত্যযুগের মানুষ

মানুষ আপনাকে বাহিরেই প্রকাশ করিতেছে। তাহার ঐশ্বর্য্য আসবাবে, তাহার শক্তি দলসংগঠনে, তাহার বীরত্বপূর্ণ অসমসাহসিক কার্য্যে, তাহার মানসিক শক্তি জড়বিজ্ঞানে প্রকাশ করিতেছে। আধুনিক সভ্যতা তাহার বিরাট অবাস্তব মূর্ত্তি প্রতিমুহূর্ত্তেই বদলাইতেছে। যে মানুষ ভিতরে থাকিয়া এই সকল করিতেছে সে অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছে। সেই পুরাকালে বলিষ্ঠ সরলতার যুগে খাঁটি মানুষের সমীপবর্ত্তী হইবার পথ সুগম ছিল। বর্ত্তমান যুগে দেশদেশান্তরে যাতায়াতের সুযোগ যতই বাড়িতেছে। বাস্তব ততই অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

বর্ত্তমান সভ্যতা ও জাপান

আধুনিক সভ্যতার এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে জাপান পতিত হইয়াছেন। আমার মত নব আগন্তুকও এই দেশে পদার্পণ করিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ দেখুন, আমার সম্মুখে আধুনিক সভ্যতার মন্দির বিদ্যমান, তথাকার পিত্তল মূর্ত্তি সমূহের পদতলে সকলে অশেষ অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু ইহা জাপানের নহে। * * * *

আপনাদের হৃদয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য আমাকে বর্ত্তমান সময়ের এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ পথের যে বাধা অতিক্রম

করিয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন বর্ত্তমান বাধা তাহা হইতেও দুরূহ। তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতির বাধা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমাকে মানবপ্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। এখন মানুষের সহিত মানুষের দেশের ব্যবধান নাই, ব্যবধান সময়ের। যাহা হউক আমি নিরুদ্যম হইব না। এই দেশে যে সত্য নিহিত আছে আমি তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিব। তাহা এই দেশের মানবহৃদয়েই নিহিত আছে, সময় তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

আমি আপনাদের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে জানাইতেছি যে বাহিরের যে সকল বস্তু আপনাদিগের অন্তর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সেই সকল দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইব না। আমি কবির ন্যায় সহানুভূতি ও প্রেমের দ্বারা আপনাদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণের পরিচয় লইব এবং যে দেশ অতীতকালে আপনাদিকে তাহার কল নহে, যুদ্ধের উপকরণ নহে, শ্রেষ্ঠ দান পাঠাইয়াছিলেন সেই দেশে আপনাদের ভালবাসাই বহন করিয়া লইয়া যাইব। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

শেষ কর্ম্ম

আমি দেহ প্রাণে মিলে মিশে ছিলাম কিছু কাল,
সেথায় আপন স্বরূপ লুকিয়ে রেখে ঘেরে মায়াজাল।
একদিন এ-জাল কেটে পালায় পাখী সবাই জানে সত্যি,
তাই চলেনাকো কোন ওজর একটুও আপত্তি।
অতি শুভক্ষণে পরম-তত্ত্ব জানলে ভাল ক'রে,
আর থাকে না যে মায়ার ধাঁ-ধাঁ আমিত্বের ঘোরে।
আহা! প্রভুর ডাকে প্রথম যাত্রায় সেই পথে যে চলে,
লভে শান্তি ভরা 'দাসের' জীবন সেই আশীষের ফলে।
কিবা জীবন-জ্যোতিঃ বিমল প্রীতি ফুলে ফলে ভরা,
সে-যে জীবে শিবে মিলন সাধন ক'রে স্বর্গ ধরা।
যখন দিনের শেষে বিদায় ঘণ্টা বাজে গভীর তানে,
তখন পরপারের শান্ত মধুর স্নিগ্ধ কিরণ আনে।
আর সব কর্ম্ম সাঙ্গ হ'লে একটি কর্ম্ম থাকে,
তখন শেষ কর্ম্মটি প্রাণত্যাগ প্রাণনাথের ডাকে।

বিবিধ।

—০—

হিন্দু-হোটেল—বঙ্গদেশে দুই প্রকার সাধারণ-ভোজনাগার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম ভাতের হোটেল, ২য় মাংসের হোটেল। ভাতের হোটেল বঙ্গের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে, মহকুমার নগরে এবং সহরে ভাতের হোটেলই সাধারণের অন্ন-স্থান। সহর ব্যতীত অন্যত্র যাবতীয় ভাতের হোটেলে খাদ্যের সহিত পর্য্যুষিত অন্ন-ব্যঞ্জন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। রন্ধন-প্রণালী সর্ব্বত্রই সমান। বাজারে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, যে তৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভেজাল, তাহাই হোটেলের খাদ্য-সম্ভারের উপাদান। ঘৃত বলিয়া একটি খাদ্য হোটেলের সীমায় উপস্থিত হয় না।

এরূপ হোটেলগুলি দুইটি জীবের অধীনে পরিচালিত হয়। একজন "ঝি" নাম্নী পরিচারিকা এবং অপর "ঠাকুর" নামক পাচক। ইহাদের পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক, তাহা লিখিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। মানবের ইন্দ্রিয়-ঘটিত যাবতীয় বীভৎস রোগের এই দুইটি জীব পরম আশ্রয়স্থল; ইহারা অতিশয় অপরিচ্ছন্ন। হোটেল গুলি দুর্গন্ধ স্থানে গৃহতল সর্ব্বদা আর্দ্র; ভোজন-পাত্রের চতুর্দ্দিকে কর্দ্দমলিপ্ত, পাকশালা অন্ধকার-পূর্ণ এবং তৈলপাইক ও মুষিকের প্রিয় আবাস। এইরূপ স্থলেই ভদ্র, অভদ্র, মধ্যবিত্ত দরিদ্র সকলেই ভোজন করেন। বিদেশে চাকুরী করিতে আসিয়া বা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া কোথায় তাঁহারা দুইটি অন্নের জন্য গমন করিবেন। কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কোনওরূপে দুইটি অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া জীবন কাটাইয়া দেন।

তৎপরে মাংসের হোটেল,—ইহা বড় বড় সহরেই অবস্থিত। মাংস ছাগের কি কুক্কুরের তাহা কে জানে? আস্বাদ ভয়ঙ্কর উগ্র। লঙ্কা ও পিয়াজের তীব্র গন্ধে খাদ্যের সমস্ত দোষ আচ্ছন্ন। কাজেই গলিত মাংস কি পর্য্যুষিত মাংস তাহা কাহার সাধ্য নির্ণয় করিতে পারে। এরূপ খাদ্যে স্বাস্থ্য হানি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

যাহা হউক কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই সমস্ত হোটেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সেদিন শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয় এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে করপোরেশনের চেয়ারম্যান উত্তর দিয়াছেন যে, ৯৭টি ভোজনাগারের পয়ঃপ্রণালীর পথ পরিষ্কারকরণ, খাদ্যাদি রক্ষার আধার নির্ম্মাণকরণ মেজে সিমেণ্টকরণ, গৃহ প্রাচীর চুণকামকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি করা হইয়াছে;

আরও ২৯৭টি ভোজনাগারের নাম সরকারী বহিতে লেখান হইয়াছে; স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ হোটেল পরিদর্শন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন; ইত্যাদি। এই সমস্ত হোটেলে যাঁহারা অন্ন গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যদি সমবেত হইয়া হোটেলের সত্তাধিকারীকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করিতে বাধ্য করেন, এবং সে উন্নতি বিধান করিতে অসম্মত হইলে তাহা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে অচিরাৎ আনয়ন করেন, তাহা হইলে হোটেল সংস্কার হইতে কতদিন আবশ্যক হয়? এরূপ হইলে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য করিবারও সুবিধা হইতে পারে। (বিজ্ঞান)

ম্যালেরিয়া—আমরা বলিয়া থাকি যে, মশকের অত্যাচারে বঙ্গদেশ জীর্ণ—মশক ম্যালেরিয়ার বাহন। আমেরিকা এক সময়ে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইতেছিল, ইটালী ম্যালেরিয়ার জন্ম-ভূমি-স্বরূপ ছিল। আজ সেখানে আর ম্যালেরিয়া নাই। তাঁহাদের দেশের রাজা বিধিব্যবস্থা প্রচারিত করিয়া ম্যালেরিয়া নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু রাজা বা শাসনকর্ত্তা এই দুর্দ্ধর্ষ ব্যাধি বিদূরিত করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন, প্রজাগণ তাহার সহস্রগুণ অধিক করিয়াছেন। রোগ প্রতিকারে রাজা অপেক্ষা প্রজার কার্য্য বেশী। * * * শিক্ষিত ও ধনাঢ্য বাঙ্গালীর জাগিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া যদি দেশ হইতে কখনও বিদূরিত হয়, তবে তাঁহাদের চেষ্টাতেই সম্ভব। নতুবা নহে। (বিজ্ঞান)

মাটীর বাসগৃহ—অধ্যাপক গেডস্ সহর রচনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি ভারতের নানা স্থানে সহর রচনা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া ভারতীয় অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিতেছেন। তিনি বলেন, এ দেশের লোক সাধারণতঃ মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া ঘর নির্ম্মাণ করে। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ হিসাবে মৃত্তিকা খুবই ভাল, শুকাইলে দেওয়ালও ভাল হয়। ইটের বা পাথরের প্রাচীর দেওয়া বাড়ীর তুলনায় মাটীর দেওয়ালী ঘর ঠাণ্ডা এবং সস্তা। উষ্ণপ্রধান দরিদ্র দেশে এই দুই গুণের জন্য মাটীর দেওয়ালের বহুল ব্যবহার স্বাভাবিক। (বসুমতী)

দীর্ঘ পরমায়ু—ডাক্তার ভার্জিল ডেভিস ১০৭ জন দীর্ঘজীবি স্ত্রী ও পুরুষ দেখিয়াছেন। দীর্ঘজীবিদিগের প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কতকগুলি তাঁহার পরিদর্শন ফল উদ্ধৃত করিতেছি। দীর্ঘজীবিগণ প্রায় আজীবন উন্মুক্ত বাতাসে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা সুরা, তাম্রকূট, এবং চা কাফি পানে আসক্ত ছিলেন না।

তাঁহারা যাহা ইচ্ছা ভক্ষণ করেন নাই, রসাল আস্বাদে প্রলুব্ধ হন নাই, অধিক বা আদৌ মাংস খান নাই, তাঁহারা মীত-ভোজী। তাঁহারা জীবনে অল্পই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই—এমন কি ধনবানগণও সমস্ত জীবন শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা নানাবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখেন। দীর্ঘজীবিগণের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ৩ হইতে ৫টি। ডাক্তার ভার্জিল বলেন অ-বিবাহিত নরনারী প্রায় দীর্ঘজীবি হয় না। সমস্ত দীর্ঘজীবি মাত্রেই স্থূলকায় নহে। দীর্ঘজীবি মাত্রেই সুনিদ্রা উপভোগ করেন। তাঁহারা রজনীর প্রথম ভাগেই শয্যায় গমন করেন এবং অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন। যাহারা অস্বাভিক আলোকে অধিক রাত্রি জাগিয়া কার্য্য করে তাহারা দীর্ঘায়ু হয় না। দীর্ঘায়ু ব্যক্তি মাত্রেই মিষ্টভাষী, সদালাপী, সর্ব্বদা প্রফুল্ল। বিপদের কারণ আসিলে শীঘ্রই তাহা ভুলিতে চেষ্টা করেন। সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ততা দীর্ঘায়ূ লাভের একটি সুপ্রসস্ত উপায়। (বিজ্ঞান)

জুতা—ইংলণ্ডে চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে জুতার দাম বাড়িয়াছে। যে ইংলণ্ড বিলাসিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইতেছিল, সেই ইংলণ্ড যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অনেক বিলাসিতা ত্যাগ করিতেছে, আহার ও পরিচ্ছদের ব্যয়ও কমাইতেছে। সম্প্রতি বালকবালিকাদের জুতা ব্যবহার বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। জুতা ব্যবহার না করিলে পা শীতাতপ সহিষ্ণু হয়। ভিজা জুতা ব্যবহারে বালকদের সর্দ্দি কাশী হয়, এই সকল অজুহাত দেখাইয়া জুতা ত্যাগের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করা হইতেছে। আমাদের দেশের প্রায় পৌনেষোলআনা লোক জুতা পরে না। স্কটলণ্ডের কোন বালক বালিকাও জুতা পরে না। ইহাতে তাহাদের পদদ্বয় বেশ সক্ষম হইয়া থাকে। জুতা পরিলেই পদের আকার বিকৃতি হইয়া যায়। আমাদের ভদ্রলোকের ছেলেদের জুতা পরা বন্ধ করিয়া দিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল হইবে, পাও সুন্দর হইবে। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ জুতা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফল ভাল হইয়াছে। (সঞ্জীবনী)

সদৃষ্টান্ত—হাজারীবাগ-প্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগীর কন্যা ইন্দুমতী যখন ইংরাজী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার বিবাহ হয়। তারপর একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিলেই তিনি বিধবা হন। অতঃপর তিনি শিক্ষিত পিতামাতার যত্নে পুনরায় পড়া শুনায় মনোনিবেশ করিয়া ১৯১১ খৃঃ প্রবেশিকা, ১৯১৪ খৃঃ আই-এ এবং বর্ত্তমান বৎসরে বি-এ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিস-চার্চ্চে এম-এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। এদেশে অল্প বয়স্কা বিধবা কন্যার জননীগণ কি গভীর ক্লেশানুভব করেন তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু এইরূপ উচ্চাভিলাষ থাকিলে, দুঃখের মধ্যেও শান্তিলাভ করা একেবারে অসম্ভব হয় না এবং তদ্বারা জনসমাজের অনেক হিতসাধিত হইতে পারে।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিভবন রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে তাঁহার স্মৃতি ভবন প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন হইয়াছিল, উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটি কমিটি হইয়াছে। মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল তাহার সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বারকেশ্বর নদীতে নৌকা যোগে রাধানগরে পাঁচ লক্ষ ইট পোড়াইবার উপযোগী কয়লা পাঠাইবেন। সম্পাদক মহাশয় স্মৃতি ভবনের দরজা, জানালা বরগা প্রভৃতির জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতেছেন। এযাবৎ এই স্মৃতি ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

(১) এক মহিলা—প্রথম কিস্তির দান ৫০০০৲ (২) সিরগুজার মহারাজ ৫০০৲ (৩) বামড়ার রাজাসাহেব ৫০০৲ (৪) বাবু ভূপেন্দ্র বসু ৫০০৲ (৫) মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল ২৫০৲ (৬) বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ১০০৲, (৭) মিঃ দ্বিজেন্দ্র পালের পত্নী ২৫০৲, (৮) মৌলবী জোবেদালি মোল্লা ১০০৲, (৯) শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস ১০০৲, (১০) শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১০০৲, (১১) বাবু অমূল্যনাথ বিশ্বাস ১০০৲ (১২) মিঃ এ,কে, রায় ১০০৲ (১৩) মিঃ কেদারনাথ সর্ব্বাধিকারী ৫০৲ (১৪) মিঃ নীলমণি চৌধুরী ২৫০৲।

এই শুভকার্য্যের উদ্‌যোক্তা এবং দাতাদিগকে আমরা সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ করি। (সঞ্জীবনী)

সৎপ্রসঙ্গ

—০—

সমাজ বা মণ্ডলী-গত সাধন ;—গতবারে অসাম্প্রদায়ীক ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এবার সমাজ বা মণ্ডলী-গত সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

আসঙ্গলিপ্সা জীব মাত্রেরই স্বভাব। মনুষ্য ব্যতীত ইতরপ্রাণীদিগের মধ্যেও এই স্বভাব অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। 'সম্ভবত মানবের দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হইবার ইহাই মূল কারণ'। অতএব এই সহজ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

যদি মূলে সকল বিষয়েই মানুষের দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজন থাকে তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও না থাকিবে কেন? সহসা মনে হয় ধর্ম্ম একা-একা সাধনের বিষয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যোগ-প্রধান ধর্ম্মে এই সংস্কার অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। বস্তুত ইহার একটা সত্যের দিকও আছে। ধর্ম্ম যে প্রকার মানবের একান্ত আন্তরিক বিষয় তাহা গূঢ়রূপে অন্তরাত্মার মধ্যে নিতান্ত নিভৃতে সাধন প্রয়োজন। সেইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন ভারতের একান্তে যোগ-নিরত সাধকগণ ব্রহ্মজ্ঞানের অতি উচ্চতত্ত্ব সকল লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিন্তু সম্যকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, সেই প্রাচীন কালেও সমবেত ভাবে ধর্ম্মসাধনারও ব্যবস্থা ছিল। তাহার পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া যায়। কোথাও দেখা যায়, নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ সমবেত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কোন ঋষি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, সকলে তাহা শ্রবণ করিতেছেন; অথবা কোন ঋষি অন্য আর এক ঋষির নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। কোন ঋষি পুত্রকে কোন রাজর্ষির নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। ইত্যাদি। এই সকল বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, সেই সময়েও তাঁহারা এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় এবং চিন্তারযোগ রক্ষা করিতেন। ফলতঃ মানুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গরহিত হইয়া ধর্ম্মসাধন বা সত্যলাভে সক্ষম হইয়াছে কোথাও দেখা যায় না। একাকী সাধন, সাধনার একটি দিক মাত্র। তাই সর্ব্বকালে সকল দেশেই ঐ একাকী সাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বস্তুত একাকী সাধন ব্যতীত মানবজীবনে ধর্ম্ম কখনই গভীরতা লাভ করে নাই। কিন্তু এই নির্জ্জন সাধন-প্রিয় সাধকের সংখ্যা সকলসমাজে সকলদেশে এবং সকলকালেই অল্প দেখা যায়।

নির্জ্জন-সাধনশীল সাধকগণ, যে সকল গভীরসত্য এবং উন্নত-চরিত্র লাভ করেন, তাহাই আবার তাঁহারা সমাজ-গত সাধকগণের নিকট প্রকাশ করেন। তদ্দ্বারা ক্রমে ঐ সকল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সাধকগণ উচ্চভাব উচ্চচিন্তার অধিকারি হইয়া উঠেন। অতএব সকল দিক দিয়াই দেখা যায় যে, ধর্ম্ম, সমাজগত বা মণ্ডলী-গত সাধনারও একান্ত প্রয়োজন, নতুবা মানবসমাজ সাধন পথে কখনই অগ্রসর হইতে পারে না। এমন কি যাঁহারা নিতান্ত সঙ্গ-রহিত উদাসীন সন্ন্যাসী তাঁহারাও পন্থী অনুসারে দলেরনামে পরিচিত। তদ্ভিন্ন মানুষ একা কি করিতে পারে? কতটুকু তাহার শক্তি? কিন্তু সেই মানুষ মণ্ডলীযোগে কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র বহুর যোগে সহজেই শক্তিলাভ করে।

যাঁহারা নির্জ্জন সাধন প্রিয়, আপাতত মনে হয় তাঁহারা কেবল একাকী নির্জ্জনসাধনেই বুঝি উন্নতিলাভ করেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তাঁহারা যদি সাধনলব্ধ জ্ঞান, বিশ্বাস সহযোগী সাধকের নিকট প্রকাশ করিতে বা, তাঁহাদের সঙ্গে ভাবে ভাব মিশাইয়া সাধন করিতে সুযোগ না পাইতেন, তবে তাঁহাদের নিজের ভ্রমাংশ বুঝিতে পারা এবং সত্যের প্রকাশ সহজ হইত না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় উভয় দিকেরই একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। নতুবা কোনটাই সার্থক হয় না। কিন্তু এই দলগত বা সমাজগত সাধনার একটা বিপদের দিকও আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা দলের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যোগ রক্ষা করিয়াও নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা আবশ্যক, নতুবা দলে বদ্ধ অন্ধ-বিশ্বাসী হইলেই বিপদ।

তারপর দেখা যায় যখনই কোন ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন হইয়াছে, তখন তাহা সেই দেশের আব্‌হাওয়ার ভিতরই প্রকাশিত হইয়াছে; আর একদিকে দেখা যায়, যখন মানুষ কোন নূতন-তত্ত্ব লাভ করিয়াছে তখনই তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে,—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সূত্রে অন্যদেশে অন্যকালে প্রকাশিত সত্যের, অন্য কোন স্বরূপের প্রতি তাহার সহানুভূতির অভাব হইয়াছে। নিজেদের ভিতর প্রকাশিত সত্য খুব উচ্চাঙ্গের হইতে পারে, এবং সেই সত্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ইহাও স্বাভাবিক কিন্তু সত্যের কোন প্রকাশকেই অবজ্ঞা করিলেই নিজের মধ্যে প্রকাশিত সত্যও ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া যায়। এই খানেই ধর্ম্মের মধ্যে সংকীর্ণতা স্থান প্রাপ্ত হয়। এই সংকীর্ণতা হইতেই ধর্ম্মে সাম্প্রদায়ীকতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার শেষ ফল এই হইয়াছে যে, উদারভাব সে ধর্ম্মের মধ্যে আর স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। নিষ্ঠা এবং উদারতা এই দুইটি ভাব আপাতত পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানের স্থান উজ্জ্বল থাকিলে, নিষ্ঠা এবং উদারতা সামঞ্জস্য লাভ করে। কিন্তু এতদিন জগতের গতি যে প্রকার চলিতে ছিল, বর্ত্তমান যুগে সে গতির মুখ ফিরিয়া গিয়াছে। যেদিন হইতে পৃথিবীর এক বিভাগ অন্য বিভাগের সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছে—যেদিন এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইয়াছে—কেবল তাহাই নহে, একটি বিশেষ বিধানে এক দৃঢ় বন্ধনের ভিতর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে সাম্প্রদায়ীকধর্ম্মের দুর্গগুলি চূর্ণ হইতে বসিয়াছে। মনে হয় এখন জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকলের মনে এক অসাম্প্রদায়ীক ধর্ম্মের ভাবই জাগিয়া

উঠিতেছে। তাই সাম্প্রদায়ীক ধর্ম্মে অনাস্থা হেতুই এখন মূলেই মানুষের ধর্ম্ম-আস্থা চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং একদিকে ধর্ম্মে ঔদাসীন্য, অপর দিকে বাহ্যাসক্তিতে মানব-মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এক অসাম্প্রদায়ীক ধর্ম্মই গড়িবে। পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতনের গঠন ত অল্প সময়ের কাজ নহে। কিন্তু মহাপুরুষগণের দৃষ্টি সেই সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। তাই মহাত্মা খ্রীষ্ট বলিলেন, "ঐ স্বর্গ রাজ্য আসিতেছে।" সেও ত দু'হাজার বৎসর হইয়া গেল।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

চারঘাট—কুশদহের মধ্যে চারঘাট একটি অন্যতম পল্লীগ্রাম। ইছাপুর ও চৌবেড়িয়ার (চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ) ন্যায় চারঘাটগ্রামটি একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এই চারঘাটের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের খুড়তুতো ভাই কচুরায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ বিজয়ী হইয়া প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্ব দিবসে মানসিংহ এই চারঘাটের পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

চারটি ঘাট, এই কথাটি হইতে চারঘাট এই নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গবিজেতা, প্রণেতা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই স্থানকে সে সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, এই জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তিনি প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে এবং সন্ধ্যায় এই স্থানের চারি ঘাটে চারি বার সন্ধ্যা করিতেন। সেই সময় হইতে ইহার চারিঘাট নাম হয়—পরে চারঘাট নাম হইয়াছে। আজিও এই চারটি ঘাট বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বদিকের ঘাট অর্থাৎ ধোবাপাড়ার ঘাট, মধ্যমপাড়ার ঘাট, জেলিয়াপাড়ার ঘাট ও হেঁড়িয়ার ঘাট। এই সন্ন্যাসীর সময় হইতে মানসিংহের আগমনকাল পর্য্যন্ত চারঘাটের বিবরণ তমসাচ্ছন্ন।

পরে কুশদহের অন্যান্য স্থান হইতে যখন এই জঙ্গলময় স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দ্বারা পরিষ্কৃত ও বাসেরউপযুক্ত হইতে লাগিল তখন এই স্থান লোক লোচনের গোচরীভূত হইতে লাগিল।

আমরা দেখিতে পাই সংসারে কেবল পতন নাই; যাহার পতন হইয়াছে তাহার এককালে উত্থান ছিল অথবা উত্থান হইবে। এই উত্থান-পতনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই; ইহা প্রবল পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। বনে যেমন একটি সুগন্ধিফুল ফুটিয়া সমস্ত বনকে আমোদিত করে, সেইরূপ কোন নিষ্প্রভ গ্রাম একটি পুরুষকার দ্বারা প্রভা-বিশিষ্ট হয়। চারঘাট গ্রামটি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হইলেও বহুদিন ঐ নিষ্প্রভ অবস্থায় ছিল; তৎপরে 'হরে শুঁড়ির* (হরি সাহা) মৃত্যুর পর ঠাকুরবর নামক কোন ব্রাহ্মণতনয় সাধন পথের পথিক হইয়া অমানুষী কার্য্যসকল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার সমাধিস্থানে একটি সুদৃশ্য মন্দির চারঘাটের চৌধুরীবংশের কোন মহাত্মা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঠাকুরবর, কুশদহের পীরের মধ্যে অন্যতমপীর।† হরেশুড়ি ও ঠাকুরবর সাহেবের সময়ের পর হইতে চারঘাটের কোন বিশেষ ঘটনা জানা যায় না, পরে চৌধুরীবংশের স্বর্গীয় বিরাজমোহন চৌধুরীর দ্বারা চারঘাটের একটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল। খাঁটুরা-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যখন প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ করেন, তখন কুশদহের মধ্যে একটু আন্দোলন হইয়াছিল; সেই সময়ে বিরাজমোহন চৌধুরী "বিধবা বিবাহ" পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। যে থিয়েটার-সম্প্রদায় এক্ষণে কুশদহের প্রায় প্রতি ভদ্রপল্লীতে দেখা যায়, তাহার বীজ প্রথমে এই চারঘাটে চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা উপ্ত হয়। সেই থিয়েটারের বিষময়ফলে একটি মোকর্দ্দমা সংঘটি হয়, তাহাতে একটি ব্রাহ্মণপরিবার হৃত-সর্ব্বস্ব হন।

এই চৌধুরীবংশ ইছাপুরের চৌধুরীবংশের একটি শাখা মাত্র।

চৌধুরীবংশের পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ পরে মুখোপাধ্যায় বংশ উল্লেখযোগ্য।

বিরাজমোহন চৌধুরী মহাশয় যেরূপ পরোপকারী ও জন-হিতৈষী ছিলেন, এক্ষণে ডাক্তার সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইরূপ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী। যে দুইটি বিষয় ভদ্রগ্রামের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—বিদ্যালয় ও পোষ্টাপিস ইহার একটিও চারঘাটে নাই। গ্রামবাসীর ঐকান্তিকী চেষ্টা ব্যতীত ইহা হইতে পারে না।

ঠাকুরবর সাহেবের মন্দিরটি ইষ্টক-নির্ম্মিত হওয়ায় অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ এখানে ইষ্টকালয় করিতে সাহসী হয় নাই; পরে চৌধুরীবংশের এক জন ইষ্টকালয় করেন; তাহার পর তাঁহার বংশে অমঙ্গল হওয়ায় কুসংস্কার আরো বদ্ধমূল

* 'হরে শুড়ি' সম্বোধন অবজ্ঞের জাতি-সংস্কারের পরিচায়ক। (কুঃ সঃ)

† ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা কুশদহ বৃত্তান্তে, পীর মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ায় দুই একখানি ইষ্টকালয় দেখা যাইতেছে।

এই চারঘাটের নিকট পূর্ব্বদিকে কলিকাতা বসু-মল্লিক বাবুদের জমিদারীর মধ্যে দেওড়া নামক স্থানে প্রতিবৎসর মা'ঘী-পূর্ণিমায় একটি মেলা হয়। জমিদার মহাশয়ের সুপারিণ্টেডেণ্ট মহাশয়ের যত্নে ক্রমে মেলাটি কুশদহের মধ্যে প্রধান-মেলায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য রক্ষা—আমরা অধিকাংশ সময় শুনিয়া আসিতেছি, "দেশ গেল, অস্বাস্থ্যকর দেশে বাসকরা দুস্কর হইয়া উঠিয়াছে, বৎসর বৎসর যে হিসাবে লোকক্ষয় হইতেছে তাহাতে আর কত দিনই বা দেশ টিকিবে। দেশের অভাব, যমুনা-সংস্কার, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, জঙ্গল পরিস্কার, ইত্যাদি। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্যের কিসে উন্নতি হইতে পারে" সকলের মনে মুখে এই কথাই আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু কই, কখন শুনিতে পাওয়া যায় না যে, কিসে আমাদের আন্তরিক-স্বাস্থ্যের সংস্কার হইতে পারে। মানুষের অন্তকরণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে কি কেবল বাহ্যদেশ আর আবহাওয়া সংস্কারেই মানুষ সুস্থ্য থাকিতে পারে? মানুষের যে একটি আন্তরিকস্বাস্থ্য আছে তাহা কে না স্বীকার করেন, আর সেই স্বাস্থ্য ভালরাখা যে অনেকটা নিজেরই কর্ত্তব্য এবং আয়ত্তাধীন তাহাই বা কে না বোঝেন, যদি বোঝেন তবে তার কোন প্রতি-কারের চেষ্টা করেন না কেন? কেহ কি একথার উত্তর আমাদিগকে দিবেন? কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা বাহ্যসংস্কার চাই না।

আমরা বাহিরের সংস্কারও চাই, কিন্তু সে জন্য আমাদের নিজেকেই বেশী উদ্যোগী হইতে হইবে। যতদিন না হইব ততদিন কিছুই হইবে না। আমরা কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিলে তখন গবর্ণমেণ্টে সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারিব। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে এই আদর্শে কার্য্য আরম্ভ হইতেছে। আমাদের কুশদহ ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। সকলে অন্তঃবাহ্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সঙ্কল্পিত হউন।

বিবাহ—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২০শে শ্রাবণ, গৈপুর নিবাসী—রাচি প্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অলোকনাথের এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতার

পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে! এই বিবাহ, পাত্র পাত্রীর উপযুক্ত বয়সে এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ অলোকনাথ ইতিপূর্ব্বে লণ্ডনে একটি বিশেষ বিষয়ে রাসায়নিক (কেমিষ্ট্রী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সাকৃচি টাটার লৌহ-ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করিতেছেন। বসু মহাশয় সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যে প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কুশদহবাসি শিক্ষিতশ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুধাবন যোগ্য।

উপাধিলাভ—গোবরডাঙ্গা নিবাসী সুলেখক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কুশদহর পাঠকপাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত। প্রথম হইতে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তাঁহার রচনাগুলি কুশদহে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আরো কতকগুলি উৎকৃষ্ট তাঁহার রচনা 'স্বাস্থ্য সমাচার' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সাহিত্য সেবায় আরো উৎসাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় কাশীর 'বেদোদ্বোধিনী সভা'র পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "সাহিত্য-বিশারদ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং সুরেন্দ্র বাবুর এই সম্মানলাভ আমাদের দেশেরই গৌরবের কারণ মনে করিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি।

আনুষ্ঠানিক দান

গৃহ-সংসারে শুভানুষ্ঠাদিতে সময়ে সময়ে সকলেই যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। "পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক বলেন," "এই উপলক্ষে কুশদহবাসি কুশদহ পত্রিকার জন্য যদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধরিয়া লয়েন, তাহাতে দেশের কাগজখানির অনেক উপকার হইতে পারে।" গত বৎসর হইতে তিনিই এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব এখন আমাদের প্রার্থনায় পরিণত হইয়াছে। শুভানুষ্ঠান কালে আমাদের প্রার্থনাটি সকলের স্মরণে আসিবে কি? আনুষ্ঠানিক দান প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের ভাগিনেয়—
শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের বিবাহোপলক্ষে ... ... ২৲
শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ের পুত্র—
শ্রীমান্ হরপ্রসাদ মিত্রের বিবাহোপলক্ষে ... ... ১৲

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

᳚কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ক মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায়?

অষ্টম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩২৩ { পঞ্চম সংখ্যা

সঙ্গীত

—:০:—

(মত্ততা)

(বাহার—খ্যামটা)

মা তোর সেই প্রেম একবিন্দু যদি আমি পাই।
যে প্রেমে মত্ত হ'য়েছিলেন নিতাই গৌর গোঁসাই।
তাহ'লে প্রেমে গ'লে, আনন্দে ঢ'লে ঢ'লে,
হেসে খেলে হরি ব'লে নিত্যধামে চ'লে যাই।
শিশু বালকের মত, হাসি গাই নিয়ত,
বিজ্ঞ সুসভ্য হ'তে নাই চাই ;—
লোকে যে যা বলে যাক্ ব'লে সে সব হেসে উড়াই।
ও মুখে মধুর হাসি, দেখিতে ভালবাসি
হাসিতে হাসিতে হাতে স্বর্গ পাই ;—
তোমার রূপে গুণে মোহিত হ'য়ে হেসে হেসে মরে যাই।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

———

নিষ্ফলতার আশীর্ব্বাদ

সফলতার বা কৃতকার্য্যতার জয়গান জগৎ চিরদিনই করিয়া আসিতেছে। স্বভাবতঃ মানুষ কৃতকার্য্যতাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিয়া আসিতেছে, এবং ন্যায়তঃ তাহাই করা উচিত। কৃতকার্য্যতার পশ্চাতে যে দারুণ পরিশ্রম, স্থির সহিষ্ণুতা, একান্ত অনুরাগ ও অপরিসীম অধ্যবসায় রহিয়াছে, তাহা চিরদিনই মানবপ্রাণের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেই করিবে। শ্রদ্ধা ও প্রশংসা প্রত্যেক কৃতকার্য্য মানবের ন্যায্য প্রাপ্য এবং এই শ্রদ্ধা অর্পণ করা ও প্রশংসা গান করা জনসাধারণের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ন্যায্য অধিকার। মনুষ্যত্বের পূজা মানব চিরদিনই করিয়া আসিতেছে এবং চিরদিনই করিবে; বরং মানব যতই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছিবে ততই এই মনুষ্যত্বের পূজা গভীর হইতে গভীরতরভাবে করিতে শিখিবে! কিন্তু কথা এই যে, কৃতকার্য্যতা মনুষ্যত্বের একটি প্রধানতম প্রকাশ হইলেও উহাই একটিমাত্র ও কেবলমাত্র প্রকাশ নহে। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ এই ভুলটিই করিয়া থাকি এবং তাহা করাও বিশেষ অস্বাভাবিক নহে; কারণ আমরা কেবল বাহিরের দিকই দেখি এবং যাহা দেখি তাহার উপরেই বিচার করি। আমাদের মন সহজেই বাহিরের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়, আমাদের ভাব সহজেই বাহিরের উপস্থিত উত্তেজনায় আকৃষ্ট হয়, পূজার অর্ঘ্য ভাবের আবেশে আমরা কৃতকার্য্য পুরুষের পদতলে অতি সহজেই অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। এইরূপ করায় আমাদের দৃষ্টি কার্য্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র কার্য্যের ফলাফলের উপর আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং আমরাও কেবলমাত্র বাহিরের ফলাফল দেখিয়া শ্রদ্ধা বা ঘৃণা, প্রশংসা বা নিন্দা করিতে শিখি। একটি কার্য্যের সফলতার পশ্চাতে যে কত শত নরনারীর দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল প্রয়াস, অবিশ্রাম উদ্যম, নীরব আত্মত্যাগ রহিয়াছে তাহা মুহূর্ত্তের উপস্থিত উত্তেজনায় আমরা কিছুতেই বুঝিতে বা মনে করিতে পারি না। জনসাধারণের সম্মুখে যে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকেই বড় বলিয়া সহজেই মানিয়া লই।

ইহা অতি সত্য কথা যে, জগতে এমন কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা কেবলমাত্র নিজের আত্মার প্রেরণায়, নিজের প্রাণের একাগ্রতায়, নিজের অসীম কষ্টসহিষ্ণুতায় এবং অবশেষে সানন্দচিত্তে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া

গিয়াছেন। ইঁহারা দেশ ও কালের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে না পারিলেও, দেশ ও কালকে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদেরও পশ্চাতে যে অন্য শত শত প্রাণের গভীর প্রার্থনা বা প্রেরণা ছিল না, বা ইঁহাদের পরে যে তাঁহাদের প্রাণের অগ্নি অন্য শত শত প্রাণে আসিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে সফল করিতে সাহায্য করে নাই তাহা নহে। Christ ক্রুশ কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যে স্বর্গরাজ্যের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কত শত নীরব Christ যে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জনে নীরবে হৃষ্টচিত্তে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যকে ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা কে গণনা করিবে? মানব-আত্মা এমনি একটি যোগে যুক্ত, আমরা সকলে এমনি এক মহাপ্রাণের সংযোগে এমন এক মহাসত্তার আবরণের মধ্যে, এমন এক বিশাল বিশ্বব্যাপী স্নেহময় বক্ষের মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছি যে, একে ছাড়িয়া অন্যের এক মুহূর্ত্তও থাকিবার বা কার্য্য করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অতি বড় সাধু মহাত্মাও অতি বড় পাপীকেও ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা করিলে তাঁহারই সমূহ ক্ষতি, তাঁহারই প্রাণ দরিদ্র হইয়া পড়িবে, তাঁহারই আত্মা নীরস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

আমি এইসব সাধু মহাত্মাদিগকে "অনন্তের স্মৃতি-স্তম্ভ" Landmarks of Eternity বলিয়া মনে করি। এরূপ আত্মা জগতে অতি বিরল। আমরা যে জগতে বাস করি, যে লোকসমাজে ও কর্ম্মের স্রোতের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্ত্ত জীবন অতিবাহিত করি, সে জগতে আমাদের চারিপার্শ্বে প্রতি মুহূর্ত্তে সফল চেষ্টার অপেক্ষা নিষ্ফল প্রয়াসের সংখ্যাই বেশী দেখিতে পাই। মানব অহরহ নিষ্ফল প্রয়াসের দুরন্ত সংগ্রামে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে; ও দিনের পর দিন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুরূহ ও আশু-নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার সহজ ও সফল চেষ্টার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও ধীরে ধীরে তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে মহৎকে ছাড়িয়া ও ক্ষুদ্রকে আশ্রয় করিয়া ও ক্ষুদ্রে আকৃষ্ট হইয়া মানব তাহার অনন্তমুখীন আত্মার অনন্তশক্তি ও সামর্থ্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছে ও ন্যায্য শক্তির চালনা হইতে বিরত হইয়া তাহা হারাইয়া ফেলিতেছে; এবং তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এইরূপ করিয়া যদি মানব চির দিনই চলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার উন্নতির আর কোনও আশা থাকিত না। সুখের ও আশার বিষয় এই

যে, আমাদের জীবনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে নাই। আমরা আমাদের ইচ্ছামত অবাধে চলিতে পারি না, অন্য এক শক্তি আসিয়া আমাদিগকে বাধা দিতেছে ও আমাদের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতেছে।

আমি অদৃষ্টবাদী নহি। সকলই অদৃষ্টের বা ঘটনাচক্রের খেলা এবং আমরা তাহাদের হাতে ক্রীড়ার পুতুল মাত্র, আমাদের কিছুই করিবার উপায় নাই বা শক্তি নাই, একথা আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। আমি নিশ্চেষ্টবাদীও নহি। ঈশ্বরের হাতে আমাদের জীবন, তিনিত মঙ্গলময়, প্রেমময়, করুণাময়, তিনি আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন বা করিবেন তাহাত আমাদের শুভজনক হইতেছে ও হইবেই, অতএব আমাদের আর এত চেষ্টা এত সংগ্রামের আবশ্যক কি? তাঁহারই উপর সকল ভার দিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, এ কথা একটি মহাসত্যের অতীব বিকৃত ব্যাখ্যা। আমি কবি Browmingএর মত বিশ্বাস করি;

God thought on me his child
Ordained a life for me, arrayed.
Its circumstances, every one
To the minutest ; ay, God said
This head, this hand should rest upon
Thus..................................
And having thus created me
Thus rooted me, he bade me grow.
Guiltless for ever like a tree.
That buds and blooms..........
Me, made because that love had need
Of something arrevocably
Pledged its content to be.

জগদীশ্বর তাঁহার এই সন্তানের—আমার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন, আমার জন্য একটি জীবন ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, জীবনের প্রত্যেক ঘটনা—এমন কি অতিশয় ক্ষুদ্রতম ঘটনাটি পর্য্যন্ত গুছাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন! এমনি করিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়া, এমনি করিয়া আমাকে নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া, তিনি আমাকে বৃক্ষের মত চির পবিত্র হইয়া বাড়িয়া উঠিতে ও ফলফুলে সুশোভিত হইতে আজ্ঞা

করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চির প্রবাহিত প্রেমের একমাত্র পাত্রের আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই আমরা প্রত্যেকে অংশীরূপে নহে কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার চিরপ্রবাহিত প্রেমের একমাত্র পাত্র। জগতভরা আলো ও সৌন্দর্য্য, মানব হৃদয়ের বুকভরা বন্ধুত্ব, প্রীতি ও ভালবাসা এবং সেই চিরপ্রেমময় পরমেশ্বরের চিরপ্রবাহিত প্রেম, দয়া ও করুণা পৃথক ভাবে ও মিলিতভাবে সত্য সত্যই আমাদের প্রত্যেকের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা যে তাঁহারই বক্ষের মধ্যে রহিয়াছি। মাতৃবক্ষে শিশু নির্ভয় হয়, নিশ্চিন্ত হয়, শান্ত হয়, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয় কি? বরং মাতৃবক্ষে যাইয়াই শিশুর শত সহস্র ক্ষুদ্র আনন্দ ও ক্ষুদ্র শক্তির আস্ফালন বিকশিত হইয়া উঠে। নির্ভীকতা শান্তি ও নিশ্চেষ্টতা এক জিনিষ নহে; নির্ভীকতা শান্তির মধ্যেই প্রকৃত চেষ্টা জন্মগ্রহণ করে; এবং কেবল মাত্র উহার মধ্যেই অক্ষুন্ন ও সজীব থাকিতে পারে! সুতরাং সাধু উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা বা সংগ্রাম করা অবিশ্বাসির বা অভক্তের কাজ নহে। জগতের মহৎ পরিবর্ত্তন সকল সাধু ও ভক্তদিগের দুরন্ত সংগ্রাম ও অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্ম নহে—পাপ; ঈশ্বরে ভক্তি নহে, ঈশ্বর-শক্তিতে ও প্রেমে অবিশ্বাস। আজ চেষ্টা ও কর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান ধীরে ধীরে মানব প্রাণ উপলব্ধি করিতেছে এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge যাহা সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"We are rising to the conviction that we are a part of nature and so a part of God; that the whole creation the one and the many and All one is working together towards some great end; and that now, after ages of developement, we have at length become conscious portion of the Great Scheme and can co-operated in it with knowledge and with joy." .

"আমরা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে আমরা প্রকৃতির ও সেই মত ঈশ্বরেরি অংশ; সমস্ত জড় সৃষ্টি ও আমরা সকলে সেই এক ঈশ্বরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিতেছি। সেই মহান্ দেবতার সৃষ্টিকার্য্যে আমরা তাঁহার সহযোগী সহকর্ম্মী।" কি মহা অধিকার! ঈশ্বর করুন এই জ্ঞান আমরা সত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমি এইবার সফল চেষ্টা ও নিষ্ফল প্রয়াস সম্বন্ধে কবি Robert Browning হইতে দুইটি চিত্র উপহার দিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

Andrea Del Sarto একজন নির্দ্দোষ চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি বহুমূল্যে বিক্রয় হইত। তাঁহার মস্তিষ্ক যাহা ধারণা করিত, তাঁহার হস্ত চিত্রফলকে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিতে পারিত। তাঁহার কল্পনা তাঁহার হস্তের ক্ষমতাকে কখনও অতিক্রম করিতে পারিত না; অথবা তাঁহার কল্পনাশক্তি তাঁহার হস্তের শক্তির অতীতে ছুটিতে পারিত না। তাঁহার এই আশ্চর্য্য শক্তির সংবাদ চারিধারে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইতালির দূর সুদূর পল্লীগুলিও তাঁহার যশসৌরভেপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলিতে মুগ্ধ হইয়া এক সুন্দরী মহিলা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্থ যশ মান এ সকলের কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। Andrea Del Sarto তাঁহার স্ত্রীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যকে পূজা করিতেন এবং তাঁহার প্রাণের মধ্যে তাঁহার সীমাবদ্ধ ধারণা ও কল্পনার জন্য, যে দুঃসহ যাতনা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু তাঁহার এ পূজা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তিনি Andrea Del Sartoর মধ্যে অনন্তের আভাস ও মুক্ত আনন্দের আশা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী-গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর কল্পনা সীমাবদ্ধ, তাঁহার হস্তের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। বদ্ধ বায়ুতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এমনি অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার সময় মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া Andrea Del Sart হঠাৎ তাঁহার সম্পূর্ণ চিত্রবিদ্যার মধ্যে হীন দারিদ্র্য ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন;—

I do what many dream of all their lives.
Dream ? strive to do, agonise to do
And fail in doig.......................
There burns a truer light of God in them
In their vexed, beating stuffed and stopped-up brain
Heart or whatever else than gos on to prompt
This lowpulsed forthright craftmans hand of mine
Their works dropground word, but themselves, I Know
Reach many a time a heaven that is shut to me
Enter and take their place there sure enough
Though they come back and can not tell the world
My works are never heaven but I sit here.

"অন্যে যাহা স্বপ্নে দেখে,—শুধু স্বপ্নে দেখে না ;—প্রাণান্ত করিয়া করিতে চেষ্টা করে ও করিতে না পারিয়া অসহ্য যাতনা পায় অথচ করিতেও পারে না ; আমি তাহাই করিতে পারি অথচ যে শক্তি আমার এই ক্ষুদ্র কর্ম্মের উপযোগী হাতখানাকে সমস্ত নির্দ্দোষভাবে চিত্রে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ করে তাহা অপেক্ষা তাহাদের এই বিক্ষুব্ধ বিতাড়িত, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের শক্তির মধ্যে বহুল পরিমাণে স্বর্গের সত্য নিহিত আছে। তাহাদের চিত্রগুলি মাটিতে, পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহারা অনেক সময় স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়, স্বর্গে প্রবেশলাভ করে, তাহাদের নিজ নিজ স্থান স্থিরভাবে গ্রহণ করে—যদিও তাহারা ফিরিয়া আসিয়া লোক-সম্মুখে সে স্বর্গের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারে না ! হায় ! এ স্বর্গ আমার নিকট চিরদিনের জন্য বন্ধ ! আমার নির্দ্দোষ চিত্রগুলি স্বর্গের উপযুক্ত, কিন্তু আমি চিরদিনই মাটিতে পড়িয়া আছি।"

পূর্ণতা ও ক্ষয় জগতের অনিবার্য্য নিয়ম। যে মুহূর্ত্তে কোনও দ্রব্য পূর্ণতা লাভ করে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ক্ষয় আরম্ভ হয়। পূর্ণতা অর্থে সীমাপ্রাপ্তি, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ন্যায্য সীমাপ্রাপ্তির পর একই স্থান অধিকার করিয়া থাকা সম্ভব নহে। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যগুলিকে তাহাদের ন্যায্য সম্পূর্ণতা দান করিয়াই তাহাদের স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া অন্যের জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করিতেছে। কেবল অসম্পূর্ণ যাহা, অনন্ত উন্নতির অধীন যাহা, তাহাই জগতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই অসম্পূর্ণতা যে আমাদের কত বড় সুযোগ, কত বড় আশীর্ব্বাদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইহাই যে আমাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ও মুক্ত পথ, তাহা আমরা সহজে ধরিতে পারি না। চারিপাশের অসম্পূর্ণতার মধ্যে বাস করিয়া প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণতা লাভের জন্য দুরন্ত সংগ্রাম ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা আমাদের যে কি দুর্লভ অধিকার তাহা যখনি বোধ করিতে পারি তখনি আর আমাদের দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য ক্ষোভ থাকে না। তখন Andrew Del Sartoর মত বলিতে পারি ;—

We are in God's hand
How strange now, looks the life He makes us lead !
So free we seem, so fettered fast we are
I feell He laid the fetter : let it lie.

"আমরা ঈশ্বরের হাতেই রহিয়াছি, এখন আমাদের জীবন কি নূতন ভাবেই

দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগকে কতই স্বাধীন দেখায় অথচ আমরা কত বন্ধনেই আবদ্ধ। আমি বেশ বোধ করিতেছি এ বন্ধন তিনিই বাঁধিয়াছেন; তবে থাকুক এই বন্ধন।

তাঁহার এই বন্ধন আমাদেরই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র। তিনি এমনি করিয়া বাঁধিয়া দিয়া নিয়ত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন আর আমরা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ধরিবার আশায় উঠিয়া-পড়িয়া ছুটিয়াছি কিন্তু কখনও ধরিতে পারিতেছি না। পারিতেছি না বলিয়াই ছুটিতেছি, এবং ছুটিতেছি বলিয়াই আজ আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতেছি। আমরা যদি সম্পূর্ণ হইতাম বা আমাদের ধরার চেষ্টা যদি সফল হইত, তাহা হইলে আমরা পশুই থাকিতাম।

এইবার দ্বিতীয় চিত্রটির কথা বলি। England এর এক সুদূর পল্লীগ্রামে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল। পাঠশালায় সমস্ত বালকগুলির শিক্ষার ভার লইয়া একজন মাত্র শিক্ষক সেই পাঠশালার সংলগ্ন কুটীরে বাস করিতেন। কুটীর খানি অতি জীর্ণ অতি ক্ষুদ্র এবং কুটীরবাসীর অর্থসমাগমও অতি সামান্য, কোনও মতে দিন চলিয়া যাইত অথচ কুটীরবাসী কখনো অভাব বা দারিদ্র্য বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে যাইয়া যখন তিনি অনন্ত জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন তখন তাঁহার সমস্ত প্রাণ মন এই জ্ঞানের সন্ধানে ও জ্ঞানের চর্চ্চায় অর্পণ করিলেন। তিনি নানা বিষয়ে যতই সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার পিপাসা বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রম কঠিন হইতে লাগিল। জ্ঞান অনন্ত কিন্তু জীবন অনন্ত নহে। ক্রমেই তাঁহার দেহ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, জরা ও বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল, তথাপি তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিরাম হইল না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিলেন, "আর কেন, তুমিত অনেক শিখিয়াছ, এইবার তোমার উপার্জ্জিত জ্ঞান প্রচার কর, অর্থ ও যশ লাভ কর, শেষের কয়দিন সুখ ও শান্তি সম্ভোগ কর, সময় চলিয়া যাইতেছে, এখন ভোগ কর, তাহা না হইলে আর কখনও ভোগ করিতে পাইবে না। তিনি উত্তর করিলেন—

Whit is time ? Leave Now for dogs and apes Man has for ever.

"সময়! সময় কাহাকে বল? বর্ত্তমানের সুখসম্ভোগ পশুর জন্য, মানব-আত্মার সম্ভোগের জন্য অনন্ত কাল রহিয়াছে।" তিনি কিছুই করিলেন না, জরা ও বার্দ্ধক্য লইয়া, ঘোর অভাব ও দরিদ্রতার মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায়

উৎসাহে ও আনন্দে তাঁহার দুরন্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম চলিতে লাগিল। একদিন তাঁহার অনন্ত জ্ঞানপিপাসু আত্মা তাঁহার জীর্ণ কুটীর ও ভগ্নদেহ ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণের দেবতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। তাঁহার কয়েকজন মাত্র ছাত্র তাঁহার দেহ লইয়া গোর দিতে চলিলেন। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দূরে প্রভাতের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু প্রভাত-আকাশের তারকারাশির স্নিগ্ধ জ্যোতি তাঁহাদের মস্তকে ও দেহে আসিয়া পড়িতেছিল। উন্নত মস্তকে স্ফীতবক্ষে গান গাহিতে গাহিতে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষকের দেহ লইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পাহাড়ে উঠিতেছিলেন। ঐ যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিখর যেখানে সর্ব্বদাই শুভ্র মেঘরাশি ও বজ্রের খেলা চলিয়াছে, যেখানে মুক্ত বায়ু সর্ব্বদাই দ্রুতবেগে বহিতেছে, যেখানে স্থর্য্যের অবারিত কিরণরাশি প্রখররূপে ফুটিয়া পড়িতেছে, যেখানে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি অগণন তারকারাশির স্নিগ্ধ জ্যোতি অবাধে বর্ষিত হইতেছে; ঐ ঐ মুক্ত উচ্চ শিখরে তাঁহার মৃত দেহকে প্রোথিত করিতে হইবে। সুখপ্রিয় শান্তিপ্রিয় সংগ্রামভীরু নিস্তেজ, নির্জীব নরনারীগণ নিম্নে থাকুক, কিন্তু এ অনন্তপিপাসু বীরের দেহ শক্তিপুঞ্জের মুক্ত ক্রীড়ার মধ্যে রাখিয়া দাও।"

Here Here is the place, where meteors shoot and clouds form
　　　　Lightenings are loosened
Stars come and go ! let joy break with the storm
　　　　Please let the dew send !
Lofty designs must close in like effects :
　　　　Loftely lying
Leave him--still loftier than the world suspects.
　　　　Living and Dying.

এই তাঁহার স্থান, এইখানে—যেখানে গ্রহ উপগ্রহ ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে মেঘরাশির সৃষ্টি হইতেছে, যেখানে তারকারাশির গমনাগমন হইতেছে, এইখানে তাঁহার দেহ রাখ। রুদ্র ঝটিকার মধ্য হইতে আনন্দ ঝরিয়া পড়ুক, নির্ম্মল শিশিররাশির মধ্য হইতে শান্তি নামিয়া আসুক। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার শেষ এই-রূপ উচ্চভাবেই হওয়া উচিত, তাঁহার দেহ এই উচ্চ স্থানেই রাখ। জীবনে ও মরণে ইনি যে কত মহৎ ছিলেন, তাহা জগৎ ধরিতেই পারে নাই।

That low man seeks a little thing to do
Sees it and does it
This high man, with a great thing to pursue.,
Dies ere he kwows it ;
That low man goes on adding one to one.
His hundred is soon hit,
This high man aiming at a million
Misses an unit.
That, has the world here—should he need the next
Let the world mind him
This, throws himself on God and unperplest
Seeking shall find Him.

"ঐ ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার লোকটি একটি ছোট কাজ করিতে চেষ্টা করে, দেখে এবং করিয়া ফেলে। ঐ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লোকটি একটি মহৎ উদ্দেশ্যের পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং তাঁহার প্রাণের ব্যাকুল অভাব সম্পূর্ণরূপে ধরিবার পূর্ব্বেই এজগৎ হইতে চলিয়া যায়।

ঐ ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার লোকটি একটির সহিত আর একটি মুদ্রা যোগ করিয়া শীঘ্রই তাহার একশত পূর্ণ করিয়া ফেলে। ঐ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লোকটি কোটী মুদ্রার প্রয়াসী হইয়া একটি মুদ্রাও সঞ্চয় করিতে পারে না।

ঐ ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার লোকটি এ জীবনের ও এখানকার সুখ,ও ঐশ্বর্য্য চায়, সে যদি কখনও পরজীবন চায় তবে এজীবন তাহার ভার লউক। ঐ উচ্চ আকাঙ্ক্ষর লোকটি নিঃসন্দেহে অনন্ত পিপাসা লইয়া অনন্ত দেবতার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দেয় ও তাহার প্রাণের দেবতাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর করুন এমনি করিয়া আমাদের সকলের জীবনে মহৎ উদ্দেশ্যে নিষ্ফল প্রয়াসের শক্তি জাগিয়া উঠুক ও এমনি ব্যাকুল অনন্ত পিপাসা-জনিত জীবন-ভরা নীরব পরিশ্রম চেষ্টা এবং ঈশ্বরে প্রকৃত নির্ভর দ্বারা আমাদের নিষ্ফল প্রয়াসের সার্থকতা আসুক।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যুদ্ধ ও ভ্রাতৃভাব

বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মণীর বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যুদ্ধই জগতের উন্নতির কারণ; এজন্য সমগ্র ইউরোপ 'যুদ্ধং দেহি' নিনাদে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লোকক্ষয়, জাহাজ ডুবি, নরহত্যা, অর্থক্ষয় যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। জয় পরাজয়ের লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত স্থির নিশ্চয় হয় নাই। যুদ্ধ এবং ভ্রাতৃভাব, ইহার কোন্ আদর্শ জগতে জয়যুক্ত হইবে, মানব-সাধারণ সে জ্ঞান বিশ্বাসে এখনো একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। একদল বলেন, প্রেম অপ্রেম, দ্বন্দ্ব মিলন, জয় পরাজয়, উত্থান ও পতনের খেলা জগতে চিরদিনই চলিবে। আর একদল বলেন, প্রেম এবং দ্রোহ, অমৃত এবং গরল, ইহার মধ্যে বিষাক্ত নিজেই ক্ষয়শীল, সুতরাং অপ্রেম বৃদ্ধি হইবে একথা সত্য নহে, ইতিহাসও এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। ভ্রাতৃপ্রেমেই মানব-সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ভ্রাতৃদ্রোহ ক্রমে মানব-সমাজ হইতে চলিয়া যাইবেই।

বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীতের দৃষ্টান্তে—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমরা দেখিতে পাই, পঞ্চপাণ্ডব বনবাস অজ্ঞাত বাস শেষ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্য চাহিলেন, দুর্য্যোধন বলিলেন, "বিনাযুদ্ধে সূচ্যাগ্র ভূমিও দিবনা। কথিত আছে, শান্তিপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির বিনাযুদ্ধে পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাও দিতে সম্মত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের দৌত, বৌমপুরোহিতের চেষ্টা সকল ব্যর্থ হইল। তখন শান্ত পরম ধার্ম্মিক পাণ্ডব সহোদরগণের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত উপায় রহিল না। পাণ্ডবেরা, কাপুরুষ নহে, এক ভীমার্জ্জুন তখনকার সকল বীরগণের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং যুদ্ধে তাঁহারা কাতর নহেন। তথাপি অর্জ্জুন, পিতামহ পিতৃব্য আত্মীয় গুরু প্রভৃতিকে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিবনা; যাঁহাদের লইয়া রাজ্য তাঁহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়া কি করিব? এইরূপ ত্রৈলোক্যাধিপত্য অপেক্ষা আমার ভিক্ষা শ্রেয়।" এই বলিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীব দূরে ফেলিয়া দিলেন। অর্জ্জুনের এই শশ্মান-বৈরাগ্য দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ ও নিষ্কামধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন পুনরায় কার্ম্মুক ধরিলেন। তাহার ফলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী (প্রায় ৪০ লক্ষ্য) সৈন্য সেনাপতি সারথী অশ্ব হস্তী সকল নিপাতীত

হইল। জগতের শ্রেষ্ঠভূমি ভারত বীরশূন্য হইল। কুরু পাণ্ডব নির্ব্বংশ হইল, একমাত্র অভিমন্যুর পুত্র জাত-দুর্ব্বল বালক পরীক্ষিত বংশের নিদর্শন স্বরূপ রহিলেন। যুদ্ধের পরিণাম ফল এই হইল।

অন্য দৃষ্টান্ত রামায়ণ; ভ্রাতৃদ্রোহের নহে কিন্তু ভ্রাতৃভাবের আদর্শ। রামায়ণের চারি ভ্রাতা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন এক দেহ এক প্রাণ। রাম বনগমন করিবেন, পিতৃ-সত্য পালন করিতে, লক্ষ্মণ কহিলেন, "দাদা আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমি তোমাকে ছাড়িয়া এ অত্যাচারময় অযোধ্যা নগরীতে থাকিতে পারিব না" এই বলিয়া রাজপুত্র রাজ্য-সম্ভোগ, নবোঢ়া পত্নী-প্রেম, ধন মান, ঐশ্বর্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

মাতুলালয় হইতে ভরত আসিয়া শ্রবণ করিলেন, তাঁহারই মাতার আব্দারে রাম বনগামী হইয়াছেন, লক্ষ্মণ তৎসহকারে গমন করিয়াছেন। ভরতের ভ্রাতৃবৎসল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, "কিসের রাজ্য—কিসের সম্পদ ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব; রাম বিনা প্রাণ বাঁচেনা।" এই বলিয়া সপারিষদ ভরতও বনগমন করিলেন। রামের পদধারণ করিয়া বলিলেন, "দাদা আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি রামহীন রাজ্য লইয়া কি করিব? আপনি বনবাসে গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

রাম কত বুঝাইয়া বলিলেন, "পিত্রাদেশ অমোঘ, পিতৃসত্য পালন আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, সুতরাং বনগমনই আমার পক্ষে বিধির বিধান। ভাই তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজ্য রক্ষা কর, আমি বনবাস শেষ করিয়া আবার রাজ্যভার গ্রহণ করিব।" ভরত বলিলেন, "দাদা যদি চতুর্দ্দশবৎসরের একদিনও আপনার আসিতে বিলম্ব হয়, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" কোন্ ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য সংসারে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন।? আমরা অনেক সময় সাময়িক উত্তেজনায় প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সংসারের প্রলোভনে তাহা ভুলিয়া যাই।

চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ দেখিয়া ভরত অনন্যমনে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অগ্নি কুণ্ড সুসজ্জিত, রামচন্দ্র আগমণ না করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। যথাসময়ে রাম আগমন করিলেন, ভরতের কি আনন্দ! রামের রাজ্য রামকে পুনঃ প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পৃথিবীতে এরূপ মহোচ্চ আদর্শ আর কোথায়? আজও সেই রামচন্দ্রের বংশ চিতোরের সিংহাসনে ও রাজপুতনায় রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সেনাপত্য গ্রহণ করিয়া জর্ম্মণ যুদ্ধে গমন করিয়াছেন।

রামায়ণ মহাভারতে অতীতকালের অলৌকিক কত অস্বাভিক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তদপেক্ষা অনেক নিকটবর্ত্তী কালের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত সম্রাট সাহ জাহানের চারি পুত্র,—দারা, মোরাদ, আওরেংজেব ও সুজা। রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্নে যেমন ভ্রাতৃপ্রেমের, সাহ জাহানের চারি পুত্রে তেমনই ভ্রাতৃ-দ্রোহের বিষময় ফলে বিশাল সাম্রাজ্য—প্রবল প্রতাপ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হায়, কোথায় চলিয়া গেল। ভ্রাতৃহিংসা মৃত্যুর কারণ, ভ্রাতৃপ্রেম মঙ্গলের নিদান।

আজ ভারত উৎকর্ণ, ইউরোপের রণতরঙ্গে,—যাহা নিবারণের জন্য উইলিয়ম ষ্টেড্, কাউণ্ট টলষ্টয়, জার আলেকজান্দার প্রভৃতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের মহাপুরুষ ঊনবিংশশতাব্দীতে বলিয়া গেলেন, "ইউরোপ, শোণিত ক্ষয়কর ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, নববিধানের নিশান তোমাদের শান্তি ও ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দিক, তোমার তরবারি অতীব সুকৌশলে কোষ নিবদ্ধ কর।"

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইউরোপের শান্তি সংস্থাপনের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সে জন্য বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে জগতে 'শান্তি সংস্থাপক' নাম পাইয়াছেন। তাঁহার শুভ-সঙ্কল্পে জর্ম্মণী যোগদান করেন নাই, মনে হয়, তাহারই ফলে এই সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃদ্রোহ সমস্ত ইউরোপকে গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করিয়াছে। সংশয়-চিত্তে সভয়ে পৃথিবী বলিতেছে, কবে ভ্রাতৃদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইবে।

ইউরোপের রক্ত-কর্দ্দমিত শশ্মানে আবার ভারতের শাক্যসিংহ, অশোক প্রচার করিবেন, প্রাণী হিংসা করিও না, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" আবার ভারতের ঋষিগণ বেদ বেদান্ত উপনিষদের নির্ম্মল জ্ঞান প্রচার করিয়া বলিবেন, "অনিত্য সংসারের জন্য কাটাকাটি করিয়া মরিও না।" সেদিন নিশ্চয়ই আসিবে। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র হইতেই 'ধর্ম্ম-সমন্বয়' ঘোষিত হইয়াছে; নব্যভারতে নবীন-সাধকবংশ অভ্যুদিত হইয়াছেন। ভ্রাতৃভাবের মহামন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আবার ভারতকেই সেই মহাসত্য এবং বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতেই হইবে। জগদীশ্বর জগতের সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত করুন। অদ্বিতীয় পিতার পিতৃত্ব, মানবের অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউক। মহর্ষি ঈশার বাণী সফল হউক। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য আসুক।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত (ডাক্তার)

———

দেবকুমার

৭

মিষ্টার বসু মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে সর্ব্বসমক্ষে পড়া হইল। তিনি তাঁহার গ্রামের সম্পত্তি হাঁসপাতাল ও স্কুলের জন্য দিয়া গিয়াছেন। নগদ পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজের মধ্যে বিশহাজার তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ হাজার দেবকুমারকে দিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্ত্রীকে তাঁহার গৃহও দিয়া গিয়াছেন। উইলে তিনি বলিয়াছেন, দেবকুমার অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে, কেবল তাহার সংসারের সাহায্যের জন্য আমি এই যৎসামান্য দিয়া গেলাম। স্ত্রীকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন দেবকুমারের পরামর্শ অনুসারে চলেন।

যাঁহারা মিসেস্ বোসকে সান্ত্বনা দিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ উইলিয়ম্ স্যারমন একজন বিশেষ সহানুভূতিকারী। ইনি শর্ম্মার পরিবর্ত্তে Surman লেখেন, কখনও প্যাণ্টকোর্ট ছাড়েন না, এবং আদবকায়দাতে কেহ তাঁহার কোন খুঁত ধরিতে পারিত না। ইনি অবিবাহিত; বিশহাজার টাকার কথা শুনিয়া মিসেস বোসের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অতিশয় জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে মিসেস্ বোসের সহিত মিঃ স্যারমনের বিবাহ হইবে একথা আর চাপা রহিল না।

দেবকুমার একথা শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। কোথায় বসু মহাশয় দেবতা, আর এই চপল, অসার অপদার্থ। সে অবশেষে একদিন মিসেস্ বোসের নিকট একথা উত্থাপন করিয়া বলিল,—

"মা, লোক বলচে মিঃ স্যারমন তোমাকে বিবাহ করতে চান তা কি ঠিক?"

মিসেস্ বোস, ত্রস্তভাবে কহিলেন, "হাঁ হাঁ, সেকথা তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি। আমাদের শীঘ্রই Engagment হবে। শোকের কাল অতীত হলেই যত শীঘ্র হয় বিবাহ হবে।"

দেবকুমারের মনে আজ আর সঙ্কোচ ভাব নাই, সে খুলিয়া বলিবে বলিয়াই কথাটা উত্থাপন করিয়াছে। একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "মা, তুমি এতে কি করে রাজী হলে? বাবা ছিলেন দেবতা তাঁহার স্ত্রী হয়ে তুমি এমন অসার লোককে কি করে বিবাহ করবে স্বীকার করলে। বাবার মত যদি ধার্ম্মিক সৎ ও উদার কাউকে বিবাহ করতে, আমি আপত্তি করতাম না। কোথায় তিনি আর কোথায় এই মিষ্টার স্যারমন।

মিঃ বোঃ। তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েচে। তুমি ভাব যে মিষ্টার বোস আমাকে তোমার পরামর্শ নিতে বলে গেছেন বলে তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা! আমি আমার প্রাইভেট ম্যাটার নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করি না। চিরকাল তুমি আমার সুখে বাধা দিয়েছ। আমি একখানা ভাল কাপড় কিনতে চাইলে, মিষ্টার বোসকে অপব্যয়ের কথা বলে বারণ করেছ, একখানা ভাল আসবাব কিনতে তুমি দাও নি; তুমি আমার বন্ধু নও আমার শত্রু। আমি জানি আমার সুখ তোমার সহ্য হবে না।

দেব কু। মা, শেষে তোমার মুখে আমাকে এই কথা শুন্‌তে হ'ল? তোমারা ছাড়া আমার আর কে আত্মীয় ছিল। যাক্ আমি যদি তোমার সুখের কণ্টক হই, আমি আর এখানে থাকব না। কিন্তু মা, আমার জন্য নয়, তোমার জন্য বলচি, তুমি বিবাহের পূর্ব্বে একবার ভাল করে চিন্তা করে দেখবে। বাবার কথা যতই আমার মনে পড়চে, ততই তোমার এ কাজে আমি অসহ্য যাতনা বোধ করচি।

মিসেস্ বোস আর কোন কথা না বলিয়া মুখ ভার করিয়া সে ঘর হইতে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, সত্য মিষ্টার বোস, খুব সৎ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু মিঃ স্যারমনই বা এমন কি মন্দ। আমি কি তাঁর মত লোক না পেলে চিরকালই বিধবা থাকব।

দেবকুমার একবার ভাবিল যে মিঃ বোসের প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা লইব না, কিন্তু তাহার মনে হইল যে, তাহাতে মিষ্টার স্যারমনেরই সুবিধা হইবে। এবং মিষ্টার বোস জীবিত থাকিতে এ দান গ্রহণ না করিলে তিনি যেমন দুঃখিত হইতেন, এখনও ফিরাইয়া দিলে তিনি তেমনই দুঃখিত হইবেন।

সেই দিনই দেবকুমার মান্দ্রাজে মিষ্টার আয়ারকে কোন কাজের জন্য পত্র লিখিল। যথাসময়ে উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যাঙ্কের জন্য একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারির প্রয়োজন আছে। আপনাকে সে কাজে পাইলে আমি অতি সুখী হইব। আপনার কথা আমি পূর্ব্বে মিষ্টার বোসের নিকট জানিয়াছি। আপনি যতশীঘ্র পারেন আসুন। মিসেস্ বোসকে আমার নমস্কার জানাইবেন।

দেবকুমার এই পত্র পাইয়া মিসেস্ বোসের নিকট বিদায় লইয়া মান্দ্রাজ রওনা হইল।

৮

দেবকুমার কলিকাতায় আসিয়া তাহার কোন খৃষ্টান বন্ধুর গৃহে উঠিল।

তখন ইষ্টকোষ্ট রেলওয়ে হয় নাই। মান্দ্রাজ যাইতে হইলে সমুদ্র পথে জাহাজে ব্যতীত যাইবার অন্য উপায় ছিল না। কলিকাতায় কয়েকটি কাজছিল, সেই জন্য কয়েকদিন থাকিয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

একদিন চৌরঙ্গীর রাস্তায় যাইতে যাইতে দেখিলেন, একখানি টম্‌টম্‌ গাড়ী লইয়া ঘোড়াটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে! একটু দূর হইতে দেখিলেন যে, একটি বাঙ্গালী ও একটি ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ে গাড়িতে আছেন। ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে; ভদ্রলোকটি অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘোড়া থামাইতে পারিতেছেন না। দেবকুমার মুহূর্ত্তের মধ্যে সব বুঝিয়া লইলেন, এবং ঘোড়ার লাগাম হটাৎ সজোরে ধরিয়া ফেলিলেন। ঘোড়া বাধা পাইল বটে কিন্তু সহজে থামিল না। দেবকুমার ঘোড়ার সহিত সামান্য দৌড়িয়া খুব শক্ত করিয়া লাগাম চাপিয়া ধরিলেন। ঘোড়া যাইতে না পারিয়া সম্মুখের দুই পা তুলিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দেবকুমার জোর করিয়া তখনও পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে সহিস্ পিছনদিক হইতে আসিয়া অপরদিকের লাগাম ধরিয়া ফেলিল। দুইদিকের জোরে ঘোড়া থামিল। ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া কন্যার হাত ধরিয়া নামাইলেন।

ইতিমধ্যে গাড়ীর কাছে আরো কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু ভদ্রলোকটি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া দেবকুমারের হাত ধরিলেন, এবং তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা তুমি আজ আমাদের যে বিপদ হতে রক্ষা করলে তা জীবনে ভুলতে পারব না।"

দেবকুমার কহিলেন, "আমি বেশী কিছু করি নাই, যা কর্ত্তব্য তাই করেছি।"

পুনরায় ভদ্রলোকটি কহিলেন। "যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে একবার আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি গেলে বড়ই সুখী হব।" –

দেব কুঃ। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, তা না হলে আপনার সহিত যেতে পারতাম।

ভদ্র। এমন কি কাজ—না হয় কাল করিও আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়চি না, একবার চল বাবা।"

তাঁহার কন্যা যদিও অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি পিতার প্রার্থনার অনুমোদন করিল। দেবকুমার ইঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। সহিসকে গাড়ী

ঘোড়া আনিতে আজ্ঞা দিয়া তাঁহারা একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাকে এই ভদ্রলোকটির পরিচয় দিই।

ইনি রামকৃষ্ণপুরের জমিদার রায়বংশীয়, নাম বাবু চারুচন্দ্র রায়। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য গ্রাম হইতে বাহির হইয়াছিলেন। এখন ইনি সবজজ। সম্প্রতি বিশ্রামের জন্য একবৎসরের ছুটী লইয়া কলিকাতায় রহিয়াছেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে এক বিধবা ভগিনী এবং তাঁহার স্নেহের একমাত্র কন্যা নিরুপমা। নিরুপমাকে ৫ বৎসরের রাখিয়া তাহার মা পরলোকে গিয়াছেন। সেই অবধি রায় মহাশয়ের বিধবা ভগিনী নিরুপমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। সেও পিসিমাকে মা বলিয়াই অনুভব করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রায় মহাশয় তাঁহার কন্যাটিকে বড়ই স্নেহ করেন, এখন নিরুই তাঁহার জীবনের অবলম্বন বলিলেই হয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি সূত্রে নানাস্থানে বদলি হইয়াছেন এবং নিরুপমাকে কখন কাছছাড়া করেন নাই, কিন্তু তাহার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হইতে দেন নাই। তিনি ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ইংরাজি লেখাপড়া, সেলাই, ড্রইং ইত্যাদি বেশ করিয়া শিখাইয়াছেন; নিজেই বাংলা শিক্ষার ভার লইয়াছেন। তা ছাড়া নিরুপমাকে বেশ গান করিতে ও হারমোনিয়ম, পিওনো বাজাইতে শিখায়াছেন।

রায় মহাশয় নিজে বিশেষ শিক্ষিত। তিনি বাল্যবিবাহ একেবারে পছন্দ করেন না। বিশেষত বিবাহ দিলে মেয়েটি কাছছাড়া হইবে এবং পরের নিকট গিয়া যদি কষ্ট পায় তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার ভগিনীও তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিতেন, "দাদা, নিরুকে অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পারবেন না, আমার দুর্দ্দশা দেখতে পাচ্ছেনত ?"

রায় মহাশয় ভগিনীর মাথায় হাত দিয়া স্নেহভরে বলিতেন, "না, করুণা, তোমার অমতে আমি কি নিরুর বিবাহ দিতে পারি, নিরুত তোমারই।" ইহা বলিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। তিনি যে বিধবা একথা তাঁহাকে বুঝিতে দিতেন না।

গৃহে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় আছে। যাহাতে তাঁহার কন্যার পাঠের প্রতি উৎসাহ হয় তাহার জন্য নানা বিষয়ের ভাল ভাল গ্রন্থ, অনেক সুন্দর সচিত্র বাঁধান বই ও মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র রাখিয়াছেন। সময়ে সময়ে ভগিনী ও কন্যাকে লইয়া চারু বাবু দেশ ও বিদেশের নানা কথা আলোচনা করিতেন। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় তিনি তাঁহার কন্যা ও ভগিনীর মন প্রসারিত করিয়া

জগতের কত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এবং জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদের ভ্রম কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন।

রায় মহাশয়ের ভগিনী করুণাময়ী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তাঁহার উপদেশ সকল দেবতার আদেশ বলিয়া মনে করিতেন।

গৃহে আসিয়া নিরুপমা ছুটিয়া তাহার পিসিমার নিকট গিয়া বলিল, "পিসিমা, আজ আমরা বড় বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছি ;—ঘোড়াটা এমন ক্ষেপে গেল যে, বাবা তাকে কিছুতেই থামাতে পারলেন না। শেষটা একটি বাবু এসে থপ্ করে ঘোড়ার লাগাম ধরে অনেক কষ্টে থামিয়ে দিলেন। তা না হলে আমরা আজ মারা যেতাম। বাবা তাঁকে সঙ্গে করে এনেছেন।

তিনি এই কথা শুনিয়া তাহাকে ক্রোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "দাদাকে এত বলি যে দুষ্ট ঘোড়াটাকে বিক্রী করে দাও। তিনি বলেন, না, আমি ওকে চালাতে পারব। না, ও ঘোড়া আর রাখা হবে না।"

ইতি মধ্যে রায় মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "করুণা তোমাকে একটি লোক দেখাব, চিনতে পার কিনা পরীক্ষা করব। আমাদের জন্য চা করতে বল।"

করুণাময়ী। দাদা তোমাকে এত বলি ঘোড়াটা বিক্রী করে দাও, তা তুমি করনা। কিন্তু এ ঘোড়া আর রাখা হবেনা। কালই বিক্রী করে দাও। শেষটা কোন্ দিন তোমরা প্রাণ হারাবে।

রায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে নিরুর কোন আঘাত লাগে নাই। যাই বাবুটি একলা বসে আছে, চায়ের বন্দোবস্ত করে তোমরা বাহিরে এস।

৯

ভগিনী, কন্যা ও দেবকুমারকে লইয়া রায় মহাশয় চা পান করিতে বসিলেন। রায় মহাশয় পরিচয় দিলে দেবকুমার করুণাময়ীকে প্রণাম করিলেন। করুণাময়ী চা খান না, সকলকে চা ও খাবার পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

রায়। করুণা, ইঁহাকে ভাল করে দেখ দেখি চিনতে পার কিনা ?

করুণাময়ী দেবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, কই, মনে পড়চে না। কিন্তু যেই হও বাবা, তুমি আজ আমাদের বড় উপকার করেচ।

দেবকু। এমন আর বেশী কি করেছি। ইহাতে আপনাদের সহিত পরিচিত হওয়াতেই বড় সুখী হ'লাম।

রায় মহাশয় ভগিনীকে কহিলেন, করুণা, আমি অনেক দিন দেশ ছাড়া, আমি

প্রথমে ইঁহাকে চিনতে পারিনি, মনে করেছিলাম তুমি হয়তো চিন্‌তে পারবে। কিন্তু তুমিও পারলেনা। সেই যে ভাল গান করতে পারত নমশূদ্রদের ছেলে রামলাল,—যে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে বলে গ্রামে গুজব উঠেছিল; আমি তখন ছুটিতে একবার তোমাদের নিয়ে রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে এসেছিলাম, তোমার মনে পড়চে না? ইনি সেই রামলাল।”

বলা বাহুল্য বসু মহাশয়ের গৃহে জাতিভেদের আধিপত্য ছিলনা, তিনি সেইজন্য তাঁহার ভগিনীর নিকট দেবকুমারের প্রকৃত পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

করুণাময়ী দেবকুমারের দিকে চাহিয়া প্রফুল্লভাবে কহিলেন, “তা হলেত তুমি আমাদের দেশের, তুমিত আমাদের আত্মীয়। তা বাবা, তুমি কি খৃষ্টান হয়েচ?”

দেবকু। না, মা, আমি খৃষ্টান হইনি। মিষ্টার বসু, যিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেছিলেন, তিনিও আমাকে কোনদিন খৃষ্টান হতে বলেননি। তিনি কেবল বলতেন, ভাল হও, যিশুর মত চরিত্র হোক।

নিরুপমা মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা বলিতেছিল, সে এখন বলিল, “কেন আপনি খৃষ্টান হবেন? আমরাও ত খৃষ্টান না হয়ে যিশুর প্রতি শ্রদ্ধা করি। তবে আমাদের মধ্যে পিসিমা একটু লোক দেখান রকমের ঠাকুর দেবতা মানেন।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরুপমা সহাস্য দৃষ্টিতে পিসিমার দিকে তাকাইল।

করুণাময়ী, নিরুপমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোরা মানিস না বটে, কিন্তু সমাজে থাকতে গেলে একটু লোক দেখান মানতে হয়। তোর বিয়ে হয়ে যাক্, তারপর আর আমি কিছু মানব না।”

নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া নিরুপমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। দেবকুমারের সম্মুখ হইতে উঠিয়াও যাইতে পারে না; এমন সময় রায় মহাশয় কথা পাড়িলেন বলিয়া আর কোন গোল হইল না।

রায়। আমি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস করি না; হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন, মানুষ স্বপ্ন দেখে আত্মার কল্পনা করে। ভূত প্রেতে পর্য্যন্ত বিশ্বাস কল্পনার ফল। কল্পনায় মন্দিরে দেবতা মূর্ত্তি-গড়িয়ে পূজা, এ সব কিছুতেই জগতের অন্তরালে অজ্ঞেয় শক্তিকে ধরতে পারা যায় না; তবে মানুষ যদি কোন কিছুর পূজা করে উপকার পায় আমি তাতে বাধা দিতে চাই না; কিন্তু আমি মনে করি এ সব বৃথা আড়ম্বর অপেক্ষা আত্মোন্নতি ও জগতের উন্নতি করা অনেক ভাল।

দেবকু। হার্বাট স্পেন্সার ধর্ম্মের যে মূল কারণ দেখিয়েচেন, তা যে তিনি ভাল করে প্রমাণ করতে পেরেচেন মনে হয় না। ম্যাক্সমূলার বলেচেন, অনন্তের জ্ঞান ও অনন্তকে ধারণা করবার যে প্রয়াস—ইহাই ধর্ম্মের মূল কারণ। আবার প্লোয়ার ম্যাকার বলেন, আমাদের ক্ষুদ্রতা বোধ ও এক পূর্ণ শক্তিতে নির্ভরের ভাব হইতেই ধর্ম্মের আরম্ভ। তাঁদের কথা ছাড়া আমার মনে হয় ধর্ম্মের উৎপত্তির অন্যরূপ কারণ আছে। যখন হতে মানবের বুদ্ধি শক্তির বিকাশ হয়েচে, তখন থেকে মানবসমাজে কয়েকটি বিষয় মীমাংসার চেষ্টা চলছে। মানুষ যখন এই পৃথিবীর দিকে চিন্তাশীল অন্তরে তাকায়, তখন এর উৎপত্তি ও স্রষ্টার কথা চিন্তা না করে পারে না। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হ'লে, জীবনের পরিণাম ও পরলোকের সম্বন্ধে চিন্তা সহজেই মনের মধ্যে আসে। জগতের স্রষ্টা যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি কিরূপ এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, এইরূপ প্রশ্ন মানব-মনে চিরদিনই হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন রকমে উত্তর দিয়েছে, এবং সেই উত্তরগুলিই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। এর মধ্যে কোন্ গুলি সত্য এবং স্বাভাবিক, তাহাও মানবেরই বিচার সাপেক্ষ।

রায়। এটিত বেশ কথা। এভাবে আমি পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করি নি। আচ্ছা দেবকুমার বাবু, এটি কি তোমার নিজের মত, না আর কোথা থেকে সংগ্রহ করা।

দেব কু। প্রথমে আমি এইরূপ মীমাংসা করেছিলাম। তারপর গাইজো দেখি ঠিক এই কথাই বলেছেন।

রায়! এ বিষয় ভাল করে চিন্তা করা আবশ্যক। তবে প্রকৃত কথা কি জান, স্পেন্সারের জড়বাদের সহিত প্রাণ সায় দেয় না ; জগতে ধর্ম্ম নামক পদার্থটা যদি ঘোর কুসংস্কার জড়িত না হয়ে আমাদের প্রাণের স্বাভাবিক ভাব হয়, তাহলে যেন প্রাণ আশ্বস্ত হয়। স্পেন্সারের যুক্তিগুলি আমি খণ্ডন করতে পারিনে বলেই তাঁর কথা মানতে হয়।

দেব কু। আপনি যুক্তির কথা বলচেন ? আমি কিন্তু যুক্তির কথায় কখনও হৃদয়ের কথা অবিশ্বাস করিনা। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা যুক্তি তর্কের দ্বারা অতি অল্পই মীমাংসা করা যায়।

রায়। আমার নিরুও সেই কথা বলে। আমি একজন সংশয়-বাদী, কিন্তু আমার মেয়ে ঘোর ঈশ্বর-বিশ্বাসী। আমার তর্কযুক্তি তাহার সরল বিশ্বাসের কাছে স্থান পায় না। তার মায়েরও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল। আমার নিজের

মতের সহিত না মিললেও ঐ সব ভাব আমার ভাল লাগে, আমি নিজেকে এজন্য বড় proud মনে করি।

করুণাময়ী ও নিরুপমা এতক্ষণ নীরবে ঐ আলোচনা শুনিতে ছিলেন কিন্তু এখন আর কোন তর্ক বিচার নাই দেখিয়া করুণাময়ী অন্যকথা কহিবার জন্য বলিলেন ; "দাদা তোমাদের এ বিষয়ে আর একদিন কথা হবে। তারপর দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিত দেখছি অনেক দিন দেশ ছাড়া, এখন একবার দেশ দেখতে ইচ্ছা হয় না ?"

দেবকুমার উদাসভাবে বলিল "আর দেশে কি করতে যাব ? আমার একমাত্র মা ছিলেন, তিনিও মারা গেছেন। আর দেশে গেলে চণ্ডাল বলে কেহ ত ছায়া মাড়াবে না।"

নিরুপমা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"আমাদের সমাজের ইহা বড় অন্যায়। আমরা কিন্তু ওসব মানিনা।"

দেবকুমার এইবার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাদের এখানে আমার ঠিক নিজের বাড়ীর মতো মনে হচ্ছে। আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের সহিত পরিচিত হোলাম।"

রায়। সৌভাগ্য উভয়ত। আচ্ছা দেবকুমার বাবু, তোমার সেই থিয়েটারের বাবুদের সংবাদ জান্‌তে ইচ্ছা হয় না ?

দেবকু। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কিন্তু বিশেষ আর কিছু জানতে পারিনি।

রায়। আমোদের পথে গিয়ে এখন সে দলের প্রায় সকলেই অধঃপাতে গিয়েচে। তুমি সে দল ছেড়ে ভালই করেছিলে।

দেবকু। আমার প্রতি তাঁরা সে সময় বড় অসদ্ব্যবহার্ করেছিলেন ; কিন্তু আমার পক্ষে সেইটাই মঙ্গলের কারণ হয়েছিল। তবে তাঁদের পরিণাম ভাবলে আমার দুঃখ হয়। এ বড় আশ্চর্য্য যে, ইংলণ্ডে অভিনয় করে লোকে কত প্রশংসা পায়, আর আমাদের দেশে অভিনয় করে কেন লোকের অধঃপতন হয়।

রায়। আমাদের দেশের কদর্য্য-অভিনেত্রী সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলির কথা ছাড়া আরও কয়েকটি কারণ আছে। ইলণ্ডে হেনরি আরভিং অথবা মিসেস্ সিডনস্ প্রভৃতি সেক্সপীয়ারের নায়কনায়িকাদিগের চরিত্র চিন্তা করে—আয়ত্ত ক'রে, অনেকটা সেইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে অভিনয় করেন। তানাহ'লে তাঁরা সেরূপ অভিনয় করতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক অশিক্ষিত

চরিত্রহীন লোকেও অভিনয় করে থাকে। চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকেরা ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গৌরাঙ্গ, সাজে সুতরাং তারা যখন উচ্চচরিত্রের অভিনয় করে তখন তা কখনই স্বাভাবিক হয় না, কেবল মুখস্থ ভাব আর অঙ্গভঙ্গী করে। তারপর আমাদের অধিকাংশ নাটকগুলিও সেইরূপ বিশ্রী। সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য লেখকরা যে রকমের নাটক লেখেন, আর সেই সব যে ভাবে অভিনয় করে, তা শুনে লোকে কেবল অসতের দিকেই যায়।

দেবকু। সে কথা ঠিক। হেনরি আরডিং বা মিসেস সিডনসের মত নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র ও মহৎ অভিনেতা বা অভিনেত্রী আমাদের দেশে নাই বললেই হয়। আরডিং বলেন, সেক্সপীয়ারকে প্রচার করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। এমনকি সাধারণ থিয়েটারগুলিও এই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলে যে, শ্রমক্লিষ্ট লোকদিগকে বিবিধ নির্দ্দোষ হাসির দ্বারা শ্রম ও চিন্তার ভার কিছু লাঘব করে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকমও নেই।

এইরূপে সে দিনকার কথা বার্ত্তা শেষ হইল। দেবকুমার বিদায় লইবার জন্য সকলকে নমস্কার করিলেন। রায় মহাশয় ও করুণাময়ী দেবকুমারকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শেষ করুণাময়ী বলিলেন, "বাবা যে কয়দিন কলিকাতায় থাক, এক একবার আমাদের সহিত দেখা করে যাবে, না এলে আমরা বড় দুঃখীত হবো।" নিরুপমা একবার দেবকুমারের প্রতি চাহিয়া কিছু বলিবে মনে করিয়াও বলিতে পারিল না, সুধু নমস্কার করিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। (বি-এ)

সদাচার

শরীর রক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সদাচারী হওয়া প্রয়োজন।

পরমারাধ্য, লোকহিতেচ্ছু ঋষিগণ স্বাস্থ্যরক্ষণোদ্দেশে যে সকল সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পুরাকালের তত্তাবতের অনুবর্ত্তী হইয়া লোকে যেরূপ স্বচ্ছন্দে, সুস্থ শরীরে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, অধুনা বৈদেশিক-দিগের অনুকরণে পুষ্ট নব্য সভ্যতায় আলোকিত কয়জন সেরূপ সুস্থ শরীরে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন ? * এমন লোক নাই, এমন পরিবার নাই যে নীরোগ হইয়া সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যেখানে যাইবে যাহার সহিত আলাপ করিবে, শুনিবে কেবল রোগ যাতনার কথা। এই রোগ যাতনায় আমরা দরিদ্র হইতেছি, স্বাস্থ্য হারাইতেছি, অকালে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছি এবং জীবলীলা শেষ করিতেছি।

পুরাকালে হিন্দু ঋষিগণের সদাচারে যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল † বোধ হয় পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিরই সেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না এবং কোন জাতি এখনও এবিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্যই হিন্দু সকল জাতি অপেক্ষা, কি স্বাস্থ্য, কি আত্মোন্নতি, কি কীর্ত্তি সকল বিষয়েই উন্নত ছিল।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সদাচার আরম্ভ হয়, তৎপরে শৌচে, স্নানে, আহারে নিশাযোগে পত্নীর শয্যায় আমাদের সদাচার পালন করিতে হয়। সদাচারী না হইলে মানুষ ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। হিন্দু, হও, মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, আর বৌদ্ধই হও, মানুষ হইতে হইলেই সদাচারী হইতে হইবে। জীব ধর্ম্ম পালনে সদাচারী না হইলে তাহাকে মানুষ বলা যায় না। অশন, বসন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান শ্রম, প্রভৃতি সকল বিষয়েই সদাচারী না হইলে, কে কোথায় সুস্থ থাকিতে পারে ? সদাচার না থাকিলেই যথেচ্ছাচার ঘটে ! যথেচ্ছাচারীর শরীর কে কবে কোথায় রোগশূন্য দেখিয়াছেন ? ফল কথা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের মূল সদাচার।

"আচারো ভূতি জননঃ আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥

(কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ - আচার ঐশ্বর্য্য জনক, আচার কীর্ত্তি ও আয়ুবর্দ্ধক এবং যাবতীয় অলক্ষণ বিনাশ করে।

"নরো হিতাহার—বিহারসেবী, সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্ আপ্তোপসেবী ভবত্য রোগঃ ॥"

(চরক)

* নব্য সভ্যতার আলোকেই বাঙালী স্বাস্থ্য হীনতার বিষয় বুঝিতে পারিতেছে। (কুঃ সঃ)

† সকল কালেই যাঁহারা ঋষি, তাঁহারা স্বাস্থ্য তত্ত্বে কেবল অভিজ্ঞ নহেন, স্বাস্থ্য সাধনও করেন। (কুঃ সঃ)

অর্থাৎ—হিতাহার-বিহারসেবী, ভবিষ্যদ্দর্শী, বিষয়ে অনাসক্ত, দাতা, সম ও সত্যপর, ক্ষমাবান, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি নীরোগ অবস্থায় দেহ ধারণে সমর্থ।

"নানৃতং ব্রুয়াৎ, নান্যস্বমাদদীত,
নান্যস্ত্রিয়মভিলসেৎ, নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং
রোয়চেৎ, ন কুর্য্যাৎ পাপং ন পাপেষ্বপি
পাপী স্যাৎ নাস্য দোষান্ ব্রুয়াৎ,
নান্য রহস্য মাগময়েৎ ॥" (চরক)

অর্থ—মিথ্যা কথা কহিবে না, পরধন হরণ করিবে না, পরস্ত্রী ও অন্যের প্রিয়বস্তু অভিলাষ করিবে না, বৈর কামনা করিবে না, পাপকার্য্য করিবে না, অপকারীরও অপকার করিবে না। পরদোষ কহিবে না, পররহস্য প্রকাশ করিবে না। এই উপদেশের অনুসরণ সদাচারের অন্তর্ভুক্ত, কারণ ইহার সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুতরাং এই উপদেশের প্রতিকুলাচরণ স্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

এই সকল শাস্ত্রানুশীলন করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শরীর নীরোগ রাখাই সদাচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে—

নহ্যাচার বিহীনস্য সুখমত্র পরত্রচ।

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

সদাচার বিহীন ব্যক্তি ইহজগতে সুখী হইতে পারে না, অপিচ সে ব্যক্তি পরজগতেও সুফললাভ করে না।

এজগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সকলই সদ্ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ, আদর্শ গুণ সকলও যখন অযথা ব্যবহৃত হয়, অস্থানে প্রয়োগ করা যায়, তখন তাহা গুণের না হইয়া দোষের হইয়া থাকে। সদাচারী না হইলে স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না! স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে সদাচারী হওয়া প্রয়োজন। সদাচারী লোক প্রফুল্ল, যশস্বী, কীর্ত্তিমান, দীর্ঘজীবী ও নীরোগ।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই অসদাচারী। প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পান, ভোজন মৈথুন, শ্রম, নিদ্রা ও বিশ্রাম এই কয় বিষয়ে সদাচারী হওয়া অধিকতর প্রয়োজন।

কবিবর মিলটন পানভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"———If thou well observe.
The rule not too much, by temperance taught,

In what thou eat'st, and drink'st seeking from thenee
Due nourishment, not gluttonous delight,
Till many years over thy head return
So may'st thou live, till, like ripe fruit, thou drop
Into thy mother's lap, or be with ease
Gather'd, not harshly plucked, in death mature."

ভাবার্থ—যদি আহার ও পান বিষয়ে সদাচারী হও, যদি কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি না কর, যদি দেহ পুষ্টির জন্য পানাহার কর, যদি উভয় বিষয়ে লোভকে চরিতার্থ করিয়া অসার আনন্দ লাভের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পরিণত বয়সে মরিতে পারিবে, অপরিণত ফলের ন্যায় অসময়ে কেহ ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে না, বরং পাকা ফলের ন্যায় উপযুক্ত সময়ে আপনা আপনি পতিত হইবে।

(স্বাস্থ্য সমাচার)　　(ডাক্তার) শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

স্বাধীনতা লাভ

(ইংরাজী হইতে)

স্বাধীনতা-লাভ-তরে
চাহি না গরব-ভরে
উড়া'তে গগন-'পরে
　　জীর্ণ চির বিজয় নিশান।
ন্যায়ের সমর-তরে
সৃষ্টিনাশী কামানেরে
চাহি না জ্বালা'তে ওরে
　　(তার) তীব্র বহ্নি—রসনা লেহান!
এ যুদ্ধের তরবারি
মুদ্রিত অক্ষর-সারি,
মানবের মন তা'রি
　　যুদ্ধক্ষেত্র—বিস্তীর্ণ মহান্!
লভিয়াছ শত জয়,
আবারো লভিবে জয়,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়"—
　　সনাতন শাস্ত্রের বিধান।

আয়ুধের শক্তি-বলে
শ্রেষ্ঠ জয় কিনে নিলে ;
নষ্ট করে ভূমণ্ডলে
মানবের গরিষ্ঠ কল্পনা।
কভু কি সম্ভব ওরে
শোণিতের রক্তাক্ষরে
লেখা মনুসংহিতারে ?
—এরাজ্য যে ঈশ্বর-রচনা।
মানবের প্রাণে প্রাণে
সরল ভাষায় তানে
সতত স্বনে সে গানে
—চিরস্থির মোহিনী রাগিণী।
আদি হ'তে বার বার
সততার পুরস্কার,
সত্য যা' তা' অনিবার
জাগিয়েছে—জাগা'বে মেদিনী।
উন্নতি, সৌহার্দ্দ্য, জ্ঞান,
শান্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দান,—
এ সকলে অসম্মান—
উপহাস করে মূঢ় জন।
ইহাদের দৈববলে
নিকট ভবিষ্য-তলে
নিষ্ফলও গিয়াছে ফলে',
—তাই এর এত সম্বর্দ্ধন।
ভা'য়ের শোণিত-পাতে
বিধবার অশ্রুসাথে—
আমাদের কল্পনাতে
কলুষতা নাহি ঢালে যেন।
না ধারি অস্ত্রের ধার,
জিনিয়াছি বার বার,
তবে সেই জয় আর
বল দেখি লভিবে না কেন ?

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

বিবিধ

—०—

অনুকরণ,—আমাদের পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হইলে, নমস্কার, প্রণামাদির রীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। আমরা রাজানুকরণে হস্ত-কম্পন, (Shake hand) আরম্ভ করিয়াছি। এখন অনুকরণের স্রোত একটু ফিরিয়াছে, কিন্তু কমে নাই। হস্ত-কম্পনের দোষ এখন বিলাতি কোন কোন কাগজেও উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

প্রীতির অন্তরায়,—ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান উভয়েই এক রাজার অধীন। উভয়কেই এক আইন মানিয়া চলিতে হয়, উভয়ের দশা একই রকম। তবু হিন্দু মুসলমানে প্রীতি স্থাপন হইতে পারিতেছে না। ইহার এক প্রধান কারণ ভারতের ইতিহাস। ভারতবর্ষের যে কোন ইতিহাস খোল, তাহাতেই দেখিতে পাইবে,—সিরাজউদ্দৌলার মত নৃশংস পাপিষ্ঠ আর কেহ নাই। আরংজেব হিন্দু দেবদেবীর নাক কাণ কাটিয়াছে, কালা পাহাড় হিন্দু বিগ্রহ ভস্মীভূত করিয়াছে। বালক বালিকাগণ এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছে, আর সমগ্র মুসলমান জাতির উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে।

প্রাচীন কালে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, স্কুলপাঠ্যপুস্তক হইতে উহা মুছিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। নতুবা এদেশে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি অসম্ভব। হিন্দু কোন কালেই মুসলমানকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না, অথচ শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে এ দেশের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোক এদেশে দেখা দিয়াছে, তাহারা দেশের যাঁহারা শিরোমণি, যাঁহাদের যত্ন চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগে এদেশের অনেক কল্যাণ হইয়াছে, তাঁহাদের নামে চারিদিকে কুৎসা রটনা করিতেছে। বালক বালিকাগণ তাহা পাঠ করিয়া ভাবিতেছে, সত্য সত্যই বুঝি এদেশের প্রধান লোকেরা কেবল স্বার্থন্বেষণেই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। দেশের শ্রদ্ধেয় লোকদের প্রতি যদি সাধারণের অশ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে সে দেশের কখনও কুশল হইতে পারে না। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, অ-বিনয়, অ-ভক্তি দ্বারা কোন জাতি বড় হইতে পারে না। বড় হয় তাহারা, যাহারা বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রাণে সযত্নে পোষণ করে, অতএব এদেশের হিন্দু, মুসলমানে যদি প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে হয়, তবে পরনিন্দা পরচর্চ্চা বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। যাহাতে পরকুৎসা হয়, তাহা কাহারও পাঠ্য হওয়া উচিত নয়। (সঞ্জীবনী)

সেনাপতি ব্রাসিলফ,—রুষিয়ার যে অগ্রগামী সৈন্যগণ অষ্ট্রীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে সেনাপতি ব্রাসিলফ তাহাদের পরিচালক। এই সেনাপতির বয়স এখন ৬৪ বৎসর। কিন্তু তাঁহাকে ৪৫ বৎসরের যুবার মত দেখায়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রুষ-তুর্কী যুদ্ধে তিনি প্রথমে কাপ্তেন পরে মেজরের কার্য্য করিয়াছিলেন ইনি অতিশয় পরিশ্রমী, ইনি অল্প পরিমাণ আহার করিয়া থাকেন; ডিনারের ভোজটাকে তিনি বিপদ বলিয়া মনে করেন, সাধারণতঃ ২০ মিনিট মধ্যে তিনি ডিনার শেষ করেন। এক্ষণে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। (সঞ্জীবনী)

হেমেন্দ্রমোহন বসু,—যিনি এইচ, বসু নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গত ১২ই ভাদ্র সোমবার তিনি তাঁহার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। "তিনি ময়মনসিংহবাসী স্বর্গীয় সাধু হরমোহন বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র ও মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রায় পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে এই তরুণবয়স্ক বাঙ্গালীযুবকের ভাগ্যে পোষ্টাল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট পদলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুপারিশের অভাব ছিল না, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে ঐরূপ কোন পদে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু যুবকের মনে কি সঙ্কল্প জাগিল, তিনি চাকুরী করিতে অস্বীকার করিলেন! বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে রাস্তায় রাস্তায় 'এক পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ' বিক্রয় করিয়া ফিরিব, তবু চাকুরী করিব না!" এই যুবকই উত্তরকালে ব্যবসায়ক্ষেত্রে দেশবিশ্রুত এইচ, বসু নামে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পরিচিত প্রচলিত সহজ পথের প্রলোভন এড়াইয়া তিনি অজ্ঞাত-পরিণাম নূতন পথের পথিক হইয়াছিলেন। জীবনে তিনি যদি সাংসারিক সফলতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা এই দুর্জ্জয় সাহসেরই পুরস্কার। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত একনিষ্ঠ উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞাশক্তির সম্মিলনে মানুষ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে ইহাই তাঁহার জীবনের সাক্ষ্য।—সরলতা, চিরপ্রফুল্লতা ও দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। দান করিয়া তিনি আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। কত সহস্র টাকা যে দান করিয়াছেন, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই।"

কলিকাতার রঙ্গালয়,—কলিকাতার দেশী থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে এই আপত্তি অনেকবার করা হইয়াছে, যে সেখানে অভিনয় দেখিতে শুনিতে গিয়া অনেকের নৈতিক অবনতি হয়। যাঁহাদের নৈতিক শুচিতার প্রতি

বিশেষ দৃষ্টি আছে তাঁহারা ওরূপ জায়গায় অভিনয় দেখিতে যাইতেই পারেন না। এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধেও অবশ্য নানাকথা শুনা যায়; কারণ মানুষ আমোদের পথে বাধা সহ্য করিতে পারে না। আমরা এ সব কথার যুক্তি যুক্ততা এখন আলোচনা করিব না। অন্য একদিক দিয়া থিয়েটারগুলির বিচার করিব।

এক রকমের দিয়াশলাইয়ের কাঠী যেখানেই ঘস, জ্বলিয়া উঠিবে। হঠাৎ জ্বলিয়া যাইতে পারে বলিয়া উহা বিপজ্জনক; এইজন্য উহার ব্যবহার আজ কাল কম। তা ছাড়া উহা যাহারা প্রস্তুত করে তাহাদের এক রকম অতি ভীষণ ব্যাধি হয়, তাহাকে ইংরাজীতে "ফসী জ" (Phossy jaw) বলে। এই পীড়ায় চোয়ালের হাড়খানা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা যখন অধ্যাপক পেড্‌লারের নিকট রসায়ণ পড়িতাম, তখন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মানবহিতৈষী কাহারও যেখানে সেখানে জ্বলে, এরূপ দিয়াশলাই ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ উহা ক্রয় করিলে মানুষের "ফসী জ" নামক ভীষণ ব্যাধি উৎপাদনে সাহায্য করা হয়।

বঙ্গের পেসাদারী রঙ্গালয়ে যাহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাজ করে, সাধারণতঃ বলিতে গেলে তাহাদের নৈতিক অধঃপতনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। এ কথাত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সাধুশীলা কোন নারী এই সব রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হয় না, হইতে পারে না। তাহাদের নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য। সুতরাং এরূপ রঙ্গালয় যত বাড়িবে, অভিনেত্রীর কাজ করিবার জন্য ততই বেশী সংখ্যক ভ্রষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোকেরও দরকার হইবে। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, কলিকাতার থিয়েটারের অভিনেত্রী কি ভাল হইতে ও থাকিতে পারে না? তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করা যায় যে ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় কি? দেখা যায় এই যে অভিনেত্রীরা যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এবং যে অবস্থায় তাহারা কাজ করে, তাহাতে চরিত্র ভাল হওয়া ও থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহারা আমোদের জন্য থিয়েটারে যান, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে, পরোক্ষভাবে, নিজেদের সুখের জন্য, কতকগুলি স্ত্রীলোক কে অপবিত্র জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অভিনেত্রীদের নৈতিক দুর্গতিই একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে। তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যনাশ এবং আয়ুর হ্রাসও অবশ্যম্ভাবী। ইহার জন্যও থিয়েটারের দর্শকেরা পরোক্ষভাবে দায়ী। অধ্যাপক পেড্‌লার যেরূপ কারণে আমাদিগকে যেখানে সেখানে জ্বলনশীল দিয়াশলাই কিনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তার চেয়ে-

অনেক গুরুতর কারণে সর্ব্বসাধারণকে কলুষিত চরিত্রা অভিনেত্রীদের অভিনয় না দেখিতে অনুরোধ করি! (প্রবাসী)

জাপানে রবীন্দ্রনাথ, ওসাকা ও কোবের ভারতীয় অধিবাসিগণ সার্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দন দান কালে বলিয়াছেন,—

"আপনার পরম সাধু পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র হইতে আপনি হৃদয় ও মনের যে সমস্ত গুণলাভ করিয়াছেন আপনার সেই গুণগ্রাম এবং হৃদয়স্পর্শী কবিতাবলী কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের জন-মণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে এমন নহে, তদ্বারা মানবের আদর্শ উচ্চতা এবং লোক প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছে। * * আপনি মাতৃভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মানসিক শক্তিতে ভারতবাসী পৃথিবীর কোন জাতির পশ্চাতে পড়িয়া রহে নাই। * * আমরা আশাকরি যে আপনার এই দেশে আগমন দ্বারা জাপানের অধিবাসীরা ভারতীয় সভ্যতার অত্যুৎকৃষ্ট ভাবরাজি অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। (সঞ্জীবনী)

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সৎকার্য্য,—কলিকাতা মিউনিসিপালিটি আপাততঃ ২জন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও ৮ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিবেন। ধাত্রীগণ নিস্বঃ আসন্ন প্রসবাদের সাহায্য করিবেন। ইহাতে সাধারণ করদাতাগণের যে বিশেষ সুবিধা হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্ধেহ নাই। আশা করি অন্যান্য অর্থশালী মিউনিসিপালিটি এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইবেন। (স্বাস্থ্য সমাচার)

স্থানিয় বিষয় ও সংবাদ

ধর্ম্মপুর,—ধর্ম্মপুর গ্রামটি কুশদহের মধ্যে এক্ষণে একটি সামান্য ব্রাহ্মণ-প্রধান পল্লী। এক্ষণে সামান্য হইলেও পূর্ব্বে ইহা সামান্য ছিল না। জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায় ইহার স্থাপন কর্ত্তা। যখন ভারত-সম্রাট্ আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এবং প্রধান রাজস্ব সচিব টোডরমল্ল এই কুশদহে আসেন, তখন জলেশ্বর রাজের পতন অবস্থা। এই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মপুর গ্রামখানি স্থাপিত হয়। রাজা কাশীনাথ রায়ের পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান সভাসদগণের বাসস্থান এই গ্রামে ছিল বলিয়া ইহার "ধর্ম্মপুর" নাম করণ হইয়াছে। অথবা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা এই স্থান মুখরিত ছিল বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মপুর হইয়াছে। "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয় মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্। "পূর্ব্বে যে এই স্থানে বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল তাহা আজিও অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। রাজা কাশীনাথ রায়ের স্থাপিত 'শিব' আজিও 'জলেশ্বরের শিব' নামে অভিহিত এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে! মেলাটি ধর্ম্মপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে যশোহর যাইবার যে পাকা রাস্তা রহিয়াছে তাহারই ধারে রাজা কাশীনাথের অট্টালিকার স্তুপ দেখা যায়। যমুনা নদী হইতে কিছু দূরে এই স্থানটি থাকায় এখানে ২।১টি ভাল পুষ্করিণী দেখা যায়। এই সকল পুষ্করিণীর মধ্যে একটিও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু গ্রামের বৃক্ষাদি দেখিয়া ইহাকে প্রাচীন গ্রাম বলিয়া অনুমান করা যায়।

গ্রামের পতন অবস্থা হইবার সময়ে এ স্থান হইতে অনেকে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, এই জন্য পূর্ব্বের লোক সংখ্যা অপেক্ষা এক্ষণে লোক সংখ্যা অনেক পরিমাণ অল্প। ম্যালেরিয়া যেমন কুশদহের অন্যান্য গ্রামে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, ধর্ম্মপুরেও সেইরূপ। কুশদহের মধ্যে চারঘাটে যেমন প্রথম থিয়েটার খোলা হয়, ধর্ম্মপুরেও তেমনি প্রথমে যাত্রার দল স্থাপিত হয়। এই যাত্রার দল মধ্যে লোপ পাইয়াছিল, এক্ষণে আবার চলিতেছে।

ধর্ম্মপুরে সকল বর্ণের লোক অল্প বিস্তর বসতি করিতেছে। গোবরডাঙ্গা হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী! কয়েকটি কৃতবিদ্য লোক গ্রামে থাকিলেও গ্রামে কোন বিদ্যালয় নাই। একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, লোকের সহানুভূতির অভাবে উঠিয়া গেল।

এই গ্রামটি পূর্ব্বে নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল, এক্ষণে যশোহরের মধ্যে এবং বনগ্রাম মহকুমার অধীন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এই গ্রামের উন্নতি দেখাগিয়াছিল; তাহার পর হইতে ইহার পতন অবস্থা। জানিনা ধর্ম্মপুর আবার তাহার নাম সার্থক করিতে পারিবে কি না।*

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

এবার বর্ষার প্রথমে বৃষ্টি না হওয়ায় লোকে হাহাকার করিতেছিল। এখন আবার অতিবৃষ্টিতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। তারপর যেই জল শুকাইতে আরম্ভ হইবে, এদিকে তাহার পূর্ব্বেই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। বছর বছর জ্বর

* কুশদহের প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কুশদহের সম্পাদকের ঠিকানায় অথবা গোবরডাঙ্গা-ইছাপুর পোঃ অঃ ২৪ পরগণা এই ঠিকানায়, লেখকের নামে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

ভোগ করিয়া মানুষ যেন অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। এখন নিরুপায়ের উপায় 'শ্রীমধুসূদন' স্মরণ করিয়া—"যথা নিযুক্তস্মী তথা করোমি" বলিয়া মানুষ নিরাশার স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলিয়াছে, এ অবস্থায় সহরবাসী হইয়া আমাদের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রচার করা অরণ্যে রোদন মাত্র মনে হয়। অথচ কিছুই না লিখিলে পাঠকগণ অভিযোগ করেন।

একবার স্থানীয় জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার আমাদের নিকট বলেন; "প্রসব-কার্য্যে আমাদের যতদূর করা উচিত নয় তাহা এখানে মহিলা ডাক্তার অভাবে আমাদের করিতে হয়, গৃহস্থও দায়ে পড়িয়া সে অবস্থায় বাধ্য হন।" সেই হইতে কথাটী আমাদের মনে জাগিতেছে। বোধ হয় এ অভাব গ্রামবাসিও অনুভব করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী নিঃস্ব স্ত্রীলোকদিগের জন্য ৮ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে হয়, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী যদিও অর্থশালী নহে তথাপি এই গুরুতর অভাবটি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশুক। একজন মহিলা ডাক্তার অথবা অভিজ্ঞ ধাত্রীর যদি মিউনি-সিপালিটী অর্দ্ধেক এবং গ্রামবাসী অর্দ্ধেক বেতনের ভার গ্রহণ করেন, তবে এ অভাব দূর করা অসম্ভব নহে। মিউনিসিপালিটীর মেম্বরগণ চেষ্টা করিবেন কি?

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত কুশদহ নিবাসী "তাম্বুল-সমাজ" পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ পালের পরলোক গমণ সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। ইনি কলিকাতা আহিরিটোলা প্রবাসী, ব্যবসায়ী শ্রেণীর পরলোক গত রাজেন্দ্রনাথ পালের পুত্র। বাল্যকালে কলিকাতায় অবস্থান হেতু স্কুলের সামান্ত কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া যথাসময়ে ব্যবসায় কার্য্যে প্রবেশ করেন। ইতি মধ্যে কোন কোন সাহিত্যিক ব্যক্তির সঙ্গগুণে সংবাদ পত্রে একটু আদটু লেখা তাঁহার অভ্যাস হয়। তারপর যখন "তাম্বুলী সম্মিলনী" সমাজের নেতা স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল বি-এ, সমাজ সম্মিলনীর কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন রাজ-কৃষ্ণ বাবু তাঁহার সহকারী রূপে অনেক কার্য্য করেন। ভূতনাথ বাবু অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, রাজকৃষ্ণ বাবু তাম্বুলীসমাজের কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহা ঐ সমাজের ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে। "মহাজনবন্ধু" নামক মাসিক পত্রেরও তিনি বহুদিন সম্পাদন কার্য্য করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহার আত্মার সদগতি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনার জন্য ভগবানের শ্রীচরণে কামনা করি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে
মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায় আর সুখই বা কোথায়?

অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সঙ্গীত

—:০:—

(কীর্ত্তনাংশ)

"মা-ই সব ; "মা-ই সব," এই আমাদের মাতৃস্তব,
জানিনা আর সাধন ভজন।
মার ইচ্ছাতে জন্মিয়াছি, মার ইচ্ছাতে বেঁচে আছি,
মার ইচ্ছাই সবার জীবন।
(সৃষ্টি থাকেনা, থাকেনা, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা)
স্বর্গে যোগী ঋষিগণ, ঈশা মুসা মহাজন,
শ্রীগৌরাঙ্গ আদি করি সবে ;
ইচ্ছাময়ী মার গুণে, নিত্য নূতন বিধানে
ভাসিছেন সেই ইচ্ছা প্রভাবে।
(আর গতি নাই, গতি নাই,—অনন্ত-জীবন পথে)
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, পৃথিবীতে বড় ধর্ম্ম,
স্বর্গে নাই প্রবেশাধিকার ;
মায়ের ইচ্ছা পালন, বলিছেন দেবনন্দন,
সার ধর্ম্ম অন্য সব অসার।
(আর ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই,—ব্রহ্মধামে যেতে)

(বিধান-সঙ্গীত, ৬৮ পৃষ্ঠা)

জীবনের বিকাশ

জীবন বলিতে কি বুঝি? এই যে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত পঞ্চভূতাত্মক দেহ, যাহার উৎপত্তি দেশকালে, স্থিতি দেশকালে, ইহাকেই কি জীবন মনে করা যায়? দেহাত্ম-বুদ্ধি জীব জন্ম মৃত্যুর মধ্যে যে জীবনের বিকাশ দেখিতে পায়, তাহাকেই জীবন বলিয়া মনে করে। তদতীত জীবনের সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা বা ধারণা ক্ষীণ অস্পষ্ট। তাহারা মনে করে, পৃথিবীতে ধন, জন, সম্পদ, সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়াদি। সুতরাং ভোগবাসনায় উন্মত্ত মোহবদ্ধ জীবের ধারণা অদৃশ্য কোন সত্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। দেশকাল পরিচ্ছিন্ন গণ্ডীর বাহিরে জীবনের গতিস্থিতি আকাশকুসুমবৎ কল্পনা বা জল্পনা মাত্রই মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর ধূলি মাটীর অনিত্য জীবনই যদি সত্য জীবন হয়, তবে জীবনের মর্য্যাদা ও গৌরব কি? তবে এ জীবন কে প্রার্থনা করিবে? প্রাণতো নিত্য জিনিষ চায়। আজ যাহা আছে কাল যদি তাহা না থাকে, তবে বাস্তব প্রাণতো তাহা পাইবার জন্য লালায়িত হয় না। জীবনের একটা নিত্যত্ব-নিগূঢ় ভাব আছে বলিয়াই, জীবন তাহা স্বতই ইচ্ছা করে। তবে সে নিত্য জীবন কি, যাহা দেশকালে বদ্ধ নহে, ভোগসুখে রত নহে, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে সসীম নহে, কিন্তু তাহা নিত্য মুক্ত, নিত্য বর্দ্ধিত, নিত্য পরিস্ফুট, নিত্য নবজীবনে সঞ্জীবিত। সে জীবন ব্রহ্মসন্তান জীবন, অনন্ত করুণাময়ী জননীর সরল শিশুজীবন, সে জীবন মায়ের প্রেম পুণ্য বিশ্বাস ভক্তিতে উন্নতিশীল জীবন, সে জীবন অখণ্ড পরিবারবদ্ধ জীবন, সে জীবন শ্রীহরির পদাশ্রিত জীবন এবং তাঁহার ভক্ত বিশ্বাসী প্রেমিক সন্তানগণের দাসানুদাস জীবন, সে জীবন বিশ্বমানবের অঙ্গীভূত জীবন, সে জীবন নিত্য শান্ত, নিত্য কর্ম্মঠ, নিত্য বুদ্ধ।

জীবন সত্য বিকাশশীল—অনন্ত পূর্ণতার দিকে গতি শীল হইলেও মিথ্যাজালে জড়িত হইয়া জীবন বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু এই মিথ্যার ভিতরেও নিয়ত থাকা অসম্ভব। প্রাণ অলক্ষিতে এ সব পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য কাহার সন্ধানে ছুটিয়া যায়। প্রাণের নিত্য যোগ গূঢ়ভাবে যাঁহার সঙ্গে আছে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সত্যের সন্ধানে প্রাণ ব্যগ্র হইলেও প্রকৃত সত্যকে ধারণ করিতে প্রকৃত সত্যকে চিনিয়া লইতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। জীবনের কত সাধন, কত তপস্যা, কত বৈরাগ্য

কত জপ তপ, কত আত্ম-নিবেদনের পর সত্যকে আত্মস্থ করিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীতে, ভৃগু বরুণ সংবাদে মনুষ্যজীবনের ব্রহ্মানুসন্ধানের ধারা প্রকৃতরূপে বর্ণিত আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইতে পারে।

ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট বিনীতভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া নিবেদন করিলেন, আমাকে ব্রহ্ম কি বুঝাইয়া দিন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

পিতার বাক্য গ্রহণপূর্ব্বক ভৃগু গভীর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যথাবিধি চিন্তা, মনন ও সন্ধান করিতে লাগিলেন। যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীবিত রহে, এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনি কিরূপ? এই ভাবিতে ভাবিতে ভোগকামনাশীল, স্থূলদেহাভিমানী জীবের ন্যায় অন্নের মহিমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। শাস্ত্রাদিতেও অন্নের যথেষ্ট মহিমাবর্ণন দেখিলেন। তখন তিনি বিমূঢ় হইয়া বলিলেন,

"অন্নং ব্রহ্মেতি—অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি-জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অন্নই ব্রহ্ম, অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, অন্ন দ্বারা জীবিত রহে, অন্তে এই অন্নেতেই (স্থূল প্রপঞ্চে) প্রবেশ করে।

কিন্তু অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া ভৃগুর কিছুতেই তৃপ্তি হইল না, পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেন। বরুণ বলিলেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান।

পিতৃবাক্যানুসারে পুনঃ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দ্বারা তিনি প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। এই প্রাণ শব্দ নানা দেহস্থিত জীবনী-শক্তিস্বরূপ প্রাণ-বায়ু সমূহকে প্রতিপন্ন করে। ভৃগু দেখিলেন, এই প্রাণই তো সর্ব্বস্ব। শাস্ত্রাদিতেও প্রাণের স্তুতিবাদ আছে, সমুদয় নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে, চক্ষুরাদি নষ্ট হইলেও প্রাণের সত্তাতে জীবিত থাকা যায়। এইরূপে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,

"প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

প্রাণ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, প্রলয়-কালে প্রাণেতেই প্রবেশ করে। কিন্তু এই জ্ঞানলাভেও ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। পুনরায় পিতার নিকট গমন করিলেন। পিতা বলিলেন, "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর।" ভৃগু পুনরায় দৃঢ়ব্রত হইয়া ব্রহ্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন শাস্ত্রে আছে "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করিবেক। এই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, ইচ্ছা বাসনাদি ইহার অন্তর্গত, ইহা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, বুদ্ধিকে অনুসন্ধান ও নিশ্চয়ে নিয়োজিত করে। এই মনের অধীন হইয়াই জীব বিষয়সুখে আকৃষ্ট হয়, অভি-মানে অন্ধ হয়, শত শত আশায় তরঙ্গাকুলিত হয়। অতএব এই মনই সর্ব্বস্ব। এইরূপে তিনি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,—

"মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

মন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, মনেতে জীবিত রহে, অন্তে মনেতেই লয় হয়। কিন্তু তৃপ্তি পাইলেন না। পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞানপ্রার্থী হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা বলিলেন "তপস্যা কর"। তিনি তপস্যা করিয়া বিজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। বিজ্ঞান বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। অনুসন্ধান, সিদ্ধান্ত, নিশ্চয় প্রভৃতি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধিই মনের অভ্যন্তর পদার্থ। বুদ্ধিই মনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে। বিজ্ঞানই (বুদ্ধি) অন্ন, প্রাণ, মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। ভৃগু কহিলেন,—

"বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

বিজ্ঞান হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত রহে, প্রলয়কালে বিজ্ঞানেই প্রবেশ করে।

কিন্তু ইহাতেও ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। পুনরায় পিতার নিকট গেলেন। পিতা তপস্যা করিতে বলিলেন। এবার তপস্যা দ্বারা জানিতে পারিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ প্রাকৃতিক জীবানন্দ,—কিন্তু ভূমানন্দ নহে। দেহ (অন্ন), প্রাণ, মন, বুদ্ধি (বিজ্ঞান) এই সকলের অভ্যন্তরে জীবভোগ্য এক আনন্দ আছে। এই আনন্দই শ্রেষ্ঠ বস্তু। অতএব তিনি কহিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব

খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।” আনন্দ হইতেই জীবসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত রহে, প্রলয়কালে আনন্দেই গমন করে ও আনন্দেই প্রবেশ করে।

কিন্তু এখানেও ভৃগুর মন তৃপ্ত হইল না। তিনি যখন অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবানন্দ এই পঞ্চকোষ বর্জ্জন করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য আকুল হইলেন, তখন তিনি অপ্রাকৃতিক, সংসারাতীত আনন্দের সাক্ষাৎ সন্ধান পাইয়া বলিলেন,—

“রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” এই পরমাত্মা রসস্বরূপ, তৃপ্তির হেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। “যতো বা ইমানি ভূতানি……” এই তটস্থ লক্ষণে স্বাবলম্বযোগে ব্রহ্মনিরূপণে নিরত হইয়া তিনি কুটস্থ স্বরূপ লক্ষণে সর্ব্বাতীত নিরবলম্ব ব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে পাইয়া শান্ত ও তৃপ্ত হইলেন।

মহামতি ভৃগু চরমে সত্য লাভের যে শ্রেষ্ঠ পথ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধন। অনন্ত মুক্ত শ্রীভগবান্‌কে মুক্ত হইয়া না খুঁজিলে কে তাঁহাকে পায়? জীবনের বিকাশ তখনই আরম্ভ হয়, যখন এই সত্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে সত্যগ্রস্ত হইলেই জীবনের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ। উপনিষদের ঋষিগণ যে বলিলেন, “সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।” হে সৌম্য, এই যে প্রজা সকল (জীবগণ) ইহাদের মূল সৎ, অর্থাৎ সৎ হইতে উৎপত্তি, সৎ ইহাদের আশ্রয়, সৎ ইহাদের প্রতিষ্ঠা।” তাঁহারা আপনারা সন্মূল, সদায়তন, সৎপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, জীবগণকেও সন্মূল, সদায়তন, সৎপ্রতিষ্ঠ দেখিয়াছিলেন। এই সত্য দৃষ্টি লাভ না করিলে জীবন কিসের উপর দাঁড়াইবে? তিনি সত্য শিব সুন্দর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সে প্রকাশ কিসে? প্রেমে আনন্দে। যতই সত্য উপলব্ধি করা যায়, ততই প্রেম ও আনন্দ জন্মে। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরবলম্ব সত্যকে গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি পুনরায় সমস্ত সত্য করিয়া জীবনের সম্মুখে ধারণ করেন। তখন তাঁহারই প্রেমে সকলকে বুকে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়, এবং তাঁহারই আনন্দে বিশ্বসংসার মধুময় হইয়া উঠে। উদাসীনের নিকট একটা তৃণ অতি তুচ্ছ, তাহার নিকট তৃণের কোন প্রকাশ নাই, আনন্দ নাই; কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের প্রকাশ আছে, আনন্দ আছে; আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা তৃণকে দেখিলে, তৃণে সেই প্রকাশ ও

আনন্দ কত পরিপূর্ণ হইয়া আসে। তেমনি আমি মানুষকে ভালবাসিতে পারি না; কেন না তাহার প্রকাশ আমার নিকট ক্ষীণ; কিন্তু সত্যস্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেখিলে সেই মানুষের প্রকাশ কত সত্য। তখন তাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি। শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যুগাবতারগণের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট হইয়াছিল যে, তাঁহারা জীবের চিন্তায়, জীবের উদ্ধারের জন্য রাজ্য, ধন, জন, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সত্যে জীবনের বিকাশ আরম্ভ, প্রেমে আনন্দে পরিণত হয়, ইঁহাদের জীবনই তাহার সাক্ষী।

জীব সত্যস্থ—ব্রহ্মস্থ হইয়া যখন সংসারে পূর্ণ ব্রহ্মের ইচ্ছা পালনে ইচ্ছা যোগে যুক্ত হয়, তখন সকলই তাহার পরিত্রাণপথের সহায় হয়, কাহাকেও সে ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত পরিত্যাগ করিতে পারে না। তখন পৃথিবীতে যে সব. বন্ধনের কারণ ছিল, পাপের অনুকূল ছিল, এখন তাহারা জীবনকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিল। তখন এই ইন্দ্রিয়াদিও তাহার সেবার আয়োজন করে। তখন সত্যই প্রাণ ভক্তসঙ্গে গাহিয়া বলে, "আমার রিপু পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন।"

জনৈক মুসলমান তাপস তাহার প্রিয় শিষ্যের নবনির্ম্মিত গৃহে পদার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, এই গৃহকে যে দরজা জানালাদি দিয়া নির্ম্মিত করা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য কি?" শিষ্য বলিল, "গুরুদেব, এই সমস্ত বাতায়নপথে গৃহে রৌদ্র বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিবে, এই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" গুরুদেব বলিলেন, "ইহা গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য এই, এই সব বাতায়নপথে আজানের ধ্বনি আসিয়া নমাজের জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিবে।" বাস্তবিক, আমাদের এই যে ইন্দ্রিয়াদি, প্রকৃতপক্ষে ইহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভগবানের মহত্তত্ত্ব সকল আনয়ন করিয়া জীবনকে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারই মহিমা স্তুতিগানে নিয়োজিত করিবে, এই জন্যই প্রেমময় শ্রীভগবানের এই ব্যবস্থা। জীবন সত্যস্থ হইয়া বিকশিত হইতে আরম্ভ করিলে, সমস্তই বিকাশের পথে জীবনকে আরও অগ্রসর করিয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার সার এই যে, জীবন সত্য, তাহা নিত্য বিকাশশীল। তাহার আদর্শ দেশকালেবদ্ধ নহে, অনন্ত পূর্ণ শ্রীভগবান্‌ই তাহার লক্ষ্য। দেশকালে তাহার প্রকাশ হইলেও অনন্ত পূর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ না হইলে এই জীবনকে বদ্ধ করে। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম

শিব সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগযুক্ত হইলে জীবন সত্য হয়, প্রেম পুণ্য আনন্দে জীবন বিকশিত হয়। তখন সমস্ত গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। সকলের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ হয়, সত্য প্রেম পুণ্যের বন্ধন হয়। দেশ কালের পূর্ণতাও তখন প্রাণ মনকে অনন্ত পূর্ণতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তখন কোন বাধা আর থাকে না। জীবন সর্ব্বদা উৎসবময় হয়, আনন্দময় হয়। জীবন সত্য, তাহার বিকাশ এই প্রেমে, পুণ্যে আনন্দে পরিণত হয়।

* (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ভাদ্র) শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ।

পঞ্চুদা

(গল্প)

১

পঞ্চুর মাতা যখন মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন করুণ নয়নে শুষ্ক মৃণালের মত শীর্ণহাত দুইখানি তুলিয়া তাঁহার স্নেহের দুলাল একমাত্র পুত্র পঞ্চুকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া "ওগো তুমি থাকলে এর যেন কষ্ট না হয়" বলিয়া চির-কালের মত নয়নপল্লব নিমীলিত করিলেন, তখন পঞ্চুর বয়স মাত্র চারি বৎসর। পিতা নিবারণ বাবু নিরুদ্ধ-অশ্রুস্রোত বক্ষে চাপিয়া, পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি পুত্রকে নিবিড়ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু-সজল নেত্রে পুনঃপুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। যেন সদ্য শোকাকুলিত বেদনাময় হৃদয়, শিশু-দেহের স্নেহ-স্পর্শে শীতল করিবার আশায় তিনি এইরূপ করিতে লাগিলেন। পঞ্চু তখন শিশু, সংসারের শোক দুঃখে অনভিজ্ঞ, তাহার কোমল প্রাণে সে মোটেই অনুভব করিতে পারিল না যে, তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু পিতার ছল ছল করুণ-নয়নের দৃষ্টিতে শিশুর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা যেন তাহার সকল শোক সকল বেদনা মুছাইয়া দিবার জন্য তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। গভীর শোকের প্রথম আবেগ দূরীভূত হইল। কিন্তু নিবারণ বাবু একমাস পর্য্যন্ত কোর্টে যাইতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্ত উদাস হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা পুত্রকে কোলে, বুকে লইয়া বাতায়নের নিকটে বসিয়া সর্ব্বদা বাহিরেরদিকে তাকাইয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। পঞ্চু কাঁদিয়া উঠিলে তিনি যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকেন; পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার

চেষ্টা করেন। তাঁহার যেন আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। কেবল পুত্রের সুখ শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়াই যেন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। মাতৃহারা শিশুর সকল বেদনা দূরীভূত করিতেই তাঁহার মন প্রাণ একান্ত উন্মুখী হইয়া উঠিল।

অনেক সময় দেখা যায় যাহাদের দুঃখ শোকের কারণ একই বিষয়ীভূত; তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তাই বুঝি এই সদ্য মাতৃহারা স্নেহবঞ্চিত শিশু ও সদ্য বিরহকাতর পিতৃ-হৃদয় পরস্পরকে একান্ত নির্ভরতা ও সহানুভূতি দিয়া নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া সকল ব্যথা বেদনার অবসান করিতে চাহিতেছিল। নিবারণ বাবু যেন একাধারে তাহার পিতা ও মাতা হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর বিবাহ করিবেন না। তিনি পঞ্চুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। কাছারি হইতে আসিয়াই পঞ্চুকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতেন। বালকের ন্যায় তাহার সহিত খেলা করিতেন, তাঁহার স্নেহসিক্ত চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা তাহারই নিকট পড়িয়া থাকিত, তাঁহার ব্যথিত হৃদয় সর্ব্বদা এই শিশুকে সকল প্রকার ভয় দুঃখ হইতে রক্ষা করিত। তিনি তাঁহার মৃত পত্নীর একমাত্র স্মৃতি এই শিশুকে লইয়াই রক্ষা করিবেন, তিনি আর বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন; পঞ্চুর মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তাহার এক প্রধান কারণ।

২

তারপর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নিবারণ বাবু এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্নীর শোক ভুলিতে পারিলেন না। কিন্তু কাল আশ্চর্য্য চিকিৎসক। শোক পুরাতন হইলে থাকে না। নিবারণ বাবুরও রহিল না। তিনি মনে করিলেন যে গিয়াছে সে-ত আর ফিরিবে না। স্ত্রী না হইলে সংসার চালানও দুরূহ সুতরাং বিবাহ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। পঞ্চুও এখন একটু বড় হইয়াছে। যেই সঙ্কল্প অমনি তিনি বিবাহ করিলেন। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, শোকের প্রথম আঘাতে বুঝি এইরূপই হয়।

যাহা হউক নব পরিণীতা পত্নী সৌদামিনী গৃহে পদার্পণ করিয়া পঞ্চুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ও সতীনের ছেলে বৈ-ত নয়, আমার সহিত ওর কি সম্বন্ধ? পঞ্চুকে তিনি ক্রমে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি নিবারণ বাবুর কতখানি স্নেহ তাহা তিনি জানিতেন। তাই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না, পরে সৌদামিনীর গর্ভে

নিবারণ বাবুর আর একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'অরুণকুমার'।

অরুণকুমার তিন বৎসর হইতে না হইতেই পঞ্চুকে 'পঞ্চুদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পঞ্চু শৈশবকাল হইতে পিতা ভিন্ন আর কাহারও স্নেহ বা আদর পায় নাই। কাহাকেও তাহার সরল অনাবিল শিশু-হৃদয়ের স্নেহ দিবার সুযোগও হয় নাই। এতদিন পরে সে তাহার এই ছোট ভাইটিকে পাইয়া মনের আনন্দে খেলা করিত। বাগান হইতে ভাল ফুল পাড়িয়া দিত। প্রজাপতি ধরিয়া দিত। অরুণকে আদৌ কাছ ছাড়া করিত না। অরুণ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। কেন না সে—'পঞ্চুদা'র নিকট যতখানি আব্দার করিতে পারে—যতখানি আদর পায়, এমন বুঝি মায়ের নিকটও পায় না। কাজেই পঞ্চু একদণ্ড চোখের আড়াল হইলে পাঁচুদা পাঁচুদা বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইত। বাগানে অরুণকুমার পঞ্চুদার সহিত খেলা করিতেছে—হঠাৎ উচ্চ ডালে একটি সুন্দর ফুল দেখিতে পাইয়া বলিয়া বসিল, 'পঞ্চুদা' ফু'টা', পঞ্চু অমনি ছুটীয়া গিয়া দেখিল তাহাতে হাত পায় না। সে অমনি আকসী প্রস্তুত করিয়া ফুল পাড়িয়া তাহাকে দিল। একটি প্রজাপতি উড়িয়া ফুলে বসিল। অরুণকুমার বলিল "দাদা ঐ পাখী" পঞ্চু অমনি যে কোন উপায়ে গলদঘর্ম্ম হইয়াও সে তাহাকে ধরিয়া দিল। সে নিজের সুখ দুঃখের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিত না। তাহার ছোট ভাইটির আব্দার অভিযোগ শুনিতেই সে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সৌদামিনীর প্রাণে এ সকল ভাল লাগিত না। তাঁহার সংকীর্ণ হৃদয় সর্ব্বদাই ভাবিত ও সতীনের ছেলে ও সর্ব্বদা আমার অমঙ্গল কামনায় নিযুক্ত, ওর কাছে কাছে ছেলেটা সর্ব্বদাই থাকে, ও কখন কি করবে তার ত ঠিক নেই। ছেলেটা আবার এমনি 'জ্যাঠা' যে তারই কাছ না হলে থাকবে না। কেন রে বাপু সে তোর কে—যে তুই তার কাছ না হলে থাকবি না। এই জন্ম সৌদামিনী কারণে অকারণে বৃথা অরুণকুমারের গালে দু' একটা ঠোনা মারিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার দিনের অধিকাংশ সময় নভেল পড়িতেই অতিবাহিত হইত। ছেলে সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার নভেল পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইবে, তাই আবার ভাবিতেন, বেশই হয়েছে পঞ্চু সতীনের ছেলে হলেও সর্ব্বদা ছেলেটাকে রাখে। আমার বই পড়ার ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

সৌদামিনী এখন নিবারণ বাবুর সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তিনি এখন নিবারণ বাবুর সবদিক অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম প্রথম স্বামীর নিকট পঞ্চুর

সম্বন্ধে কিছুই বলিতে তাঁহার সাহস হইত না। এখন সামান্য একটু 'ছুতা' পাইলেই সেইটা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত করিয়া কর্ত্তার নিকট সংক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। নিবারণ বাবু সমস্ত শুনিতেন কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আর তাঁহার সাহস হইত না। তিনি প্রতিবাদচ্ছলে কখন কিছু বলিলে তাহার যে উত্তর পাইতেন তাহা শ্রবণ করিতে তিনি নিতান্ত গররাজি ছিলেন। সৌদামিনী শেষ এমন পর্য্যন্ত বলিতেন যে, "ডাইনী এমন ছেলে রেখে গেছে, ভাল খাবার না হলে হয় না, মাছের বড় চাকাটি না হলে খাওয়া হয় না। ডাইনীর পেটের ডাইনু ছেলে আর কি," এ সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া নিবারণ বাবুর আর তেমন কষ্ট বোধ হইত না। তিনি ভাবিতেন যে সৌদামিনী যাহা বলিতেছে তাহা বুঝি সত্য—পঞ্চু ভারি দুষ্ট।

যখন সৌদামিনী প্রথম গৃহে পদার্পণ করেন, তখন পঞ্চুর মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশু-হৃদয় তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাতৃ-স্নেহ সুখ উপভোগ করিতে চাহিল কিন্তু না-জানি কি অপরাধে স্নেহের পরিবর্ত্তে সে ঘৃণা লাভ করিল। তাহার স্তম্ভিত শিশু-হৃদয় কিছুতেই ইহার কারণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না; সৌদামিনীর বক্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার শিশু সুলভ কোমল হৃদয় সঙ্কুচিত—কম্পিত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিত। সৌদামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলেই সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। সে যেন কতই অপরাধ করিয়াছে—সে যেন সৌদামিনীর সংসারে কেহই নহে—সৌদামিনীর অনুগ্রহে প্রতিপালিত পালক মাত্র। কথায় বলে "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' পঞ্চুর সকল কার্য্যেই সৌদামিনী তাহার দোষ দেখিতে পাইতেন। তিনি তাহার একটু দোষ দেখিলেই সালঙ্কারে স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে ক্রটী করিতেন না। নিবারণ বাবুও সমস্ত শুনিয়া সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পঞ্চুকে প্রহার করিতেন; হায়! মাতৃহীন বালক ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিত না যে, কি মহা দোষে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। শুধু সে তাহার কম্পিত ও বেদনাপ্লুত হৃদয়ে তাহার পিতার বিরক্তি সূচক তিরস্কার বাক্য ও চিৎকারই শুনিতে পাইত। স্নেহময় পিতার এইরূপ ব্যবহার তাহার বালক সুলভ সরল হৃদয় বুঝিতে পারিত না যে, পিতা তাহার প্রতি স্নেহহীন হইয়াছেন। পিতা প্রহার করিলেও তিনি তাহার চক্ষে কখনও জল দেখিতে পান নাই। অভিমানী বালক নীরবে পিতার সেই কঠোর তিরস্কার [illegible]হার সহ্য করিত। নিবারণ বাবু কাছারি হইতে আসিলেই পঞ্চু 'বাবা'

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইত, কিন্তু আজকাল পিতার নিকট হইতে আপনাকে গোপনে রাখিতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যাইত। সে ভাবিত—সে-যা কিছু করে সকলই বুঝি দোষের। সেই জন্য সে অত্যন্ত সাবধানে সঙ্কুচিত ভাবে থাকিত। ভয়ে সঙ্কোচে সে আর পিতার নিকট অগ্রসর হইতে চাহিত না; হৃদয়হীনা বিমাতার কৌশলে প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন অভিমান ও বেদনায় তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিত। তখন তাহার পরলোকবাসিনী স্নেহময়ী মাতার স্নেহময় বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল অভিমান ও বেদনা প্রশমনের জন্য তাহার শিশু হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, বালক একাকী নির্জ্জনে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত! হায়! কেহ তাহার আব্দার অভিযোগ বুঝিত না। এমন কেহই নাই যে তাহার অভিমান ও বেদনা দূরীভূত করিয়া সান্ত্বনা দেয়। বালক একাকী ছল ছল নেত্রে বাতায়নপথে নীলগাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত। ধীরে ধীরে মৃদু সমীরণ আসিয়া তাহাকে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইয়া—তাহার আপাদ মস্তক স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-কোমল হস্ত স্পর্শের ন্যায় তাহার শরীর স্পর্শ করিত। বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে, বহু পক্ষীর মধুর কুজনে চারিদিক মুখরিত হইতেছে। কত প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া ফুলে বসিতেছে এ সকলের কিছুই আর তখন তাহার বেদনা-হত হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহার স্নেহ বঞ্চিত হৃদয় মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কখন কখন অরুণকুমার পঞ্চুদা পঞ্চুদা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া শিশু সুলভ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিত "পঞ্চুদা, তুমি কাঁদচ কেন? তোমার কি হ'য়েছে বল না! না বল্লে আমিও কাঁদব। পঞ্চুদা—পঞ্চুদা বল-না তোমার কি হ'য়েছে!"

হায়! শিশুর সরল হৃদয় যেন তাহার দাদার দুঃখ ক্রন্দন দূর করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। পঞ্চু চুপ করিয়া থাকিলে সে ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া লুটাইত। পঞ্চু নিজের বেদনা ভুলিয়া অরুণকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে যে কোন প্রকারে বুঝাইত, যে তাহার চোখের জলটা কিছু নয়। তবে সে শান্ত হইত।

একবার পঞ্চুকে তাহার মামার বাড়ীর লোক লইবার জন্য আসিল; পঞ্চু মামার বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু খোকার কথা ভাবিয়া মন একটুকুও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল যে এখনি

সে কোথা হইতে আসিয়া বুঝি 'পঞ্চুদা' পঞ্চুদা' করিয়া জড়াইয়া ধরে। ফলতঃ তাহাই হইল অরুণকুমার ধুলিমাখা দেহ লইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পঞ্চুর বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র অশ্রু বৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; "পঞ্চুদা কাপড় প'রে কোথায় যাবে?" "আমার মামার বাড়ী", "কেন?" "লইতে আসিয়াছে" "আমিও যাবো।" পঞ্চু চুপ করিয়া রহিল। অরুণকুমার তাহার মুখ ধরিয়া বলিল "বল-না পঞ্চুদা আমাকে নিয়ে যাবে?" "ছোট মা বক্‌বেন, বাবা যেতে দিবেন না" "না আমি কিছু শুন্‌ব না আ-মি যাব।" "না ভাই আর একদিন নিয়ে যাব" "না তুমি মিচিমিছি বল্‌ছ, না আমি আজই যাব" পঞ্চু মহা চিন্তায় পড়িল। তাহাকে লইয়া যাইতে তাহার আপত্তি না থাকিলেও বিমাতার কথা মনে পড়াতে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সৌদামিনী দূর হইতে এ সকল দেখিতেছিলেন, তাঁহারই গর্ভজাত পুত্রের পঞ্চুর প্রতি এরূপ আকর্ষণ দেখিয়া তাহার ভ্রু ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া জোর করিয়া অরুণকে পঞ্চুর কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন। "কোথা মরতে যাবি বল দিকিন্—মরবার কি আর যায়গা নেই?" বলিয়া তীব্র কটাক্ষে পঞ্চুকে কম্পিত করিয়া ঠাশ্‌ ঠাশ্‌ করিয়া খোকার গালে চড় বসাইয়া দিলেন; পঞ্চু আর দাঁড়াইতে পারিল না। মামার বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। অরুণ ক্রন্দনের স্বরে বলিতেছিল, "দাদা ও দাদা আমায় নিয়ে যাও। ও দাদা তুমি দাঁড়াও আমি যাই ও দাদা আ—" অরুণের ক্রন্দন শুনিয়া পঞ্চুরও পদদ্বয় চলিতে চাহিল না। সে একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিল অরুণ কাঁদিতেছে। সৌদামিনী চক্ষে সৌদামিনীরই মত জ্বালা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। খোকার করুণ ক্রন্দন তখনও যেন তাহার কাণে বাজিতেছিল। ও দাদা আমায় নিয়ে যাও ও দাদা দাঁড়াও আমি যাই। তাহার বুকের ভিতর যেন একটা বেদনা সুচীর মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। হায়! সে কি করিবে। তাহার সারা অন্তরটা হা-হাকার করিতে লাগিল।

৩

সাতদিন পরে পঞ্চু মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, পঞ্চু আসিতেই অরুণ, দাদা, দাদা বলিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সহস্র অনুযোগ করিতে লাগিল,—"দাদা আমার নিয়ে গেলে না কেন? তুমি এতদিন ছিলে কেন? আমার জন্ত কি নিয়ে এসেছ? ইত্যাদি ইত্যাদি" পঞ্চু যথাসম্ভব উত্তর দিতে লাগিল। নিবারণ বাবু উভয় পুত্রের জন্ত খাবারের পয়সা সৌদামিনীকে দিতেন; সৌদামিনী

খাবার আনাইয়া অরুণকেই দিতেন, পঞ্চুকে দিতে তাহার হাত আর উঠিত না; পঞ্চু তাহাতে কিছুই বলিত না। সে নীরবে সব অনাদর অপমান, সব দুঃখ কষ্ট, সব পীড়ন সহ্য করিয়া যাইত। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন ইহার জন্যই তাহার জন্ম।

সংসারে প্রকৃতরূপে ভালবাসিলে বা স্নেহ করিলে বুঝি তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। জ্ঞানহীন শিশু তাহার জল খাবারের অর্দ্ধেক দাদাকে না দিয়া আদৌ খাইতে চাহিত না, সে জানিত যে মায়ের সম্মুখে দিতে পারিবে না, তাই লুকাইয়া আনিয়া দিত; পঞ্চু এই শিশুর আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিত, 'তুই খা ভাই আমার খাওয়া হয়েছে'। অরুণ কান্নার সুরে বলিত "না দাদা, মিছি মিছি বলছ, তুমি খাওনি, তুমি খাও, না-হলে সব ফলে দেব'খন" "তাহলে ছোটমা বক্‌বে যেরে? তুই খা," "না তবে এই সব ফেলে দিলুম," পঞ্চু উপায়ন্তর না দেখিয়া কিঞ্চিৎ খাইত। পঞ্চু মামার বাড়ী যাইবার দিন হইতে অরুণ তাহার প্রত্যেক দিনের খাবারের অর্দ্ধেক রাখিয়া দিয়াছিল। আজও অত্যন্ত পুলকিত হইয়া চঞ্চল-নৃত্যভঙ্গী করিতে করিতে সেই খাবার আনিতে ছুটিয়া গেল। খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, 'দাদা তোমার খাবারের ভাগ নাও, আমি রেখে দিয়েছিলুম,' সৌদামিনীর ভয়ে—বিশেষতঃ তাহাকে যখন দেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই পঞ্চু সেরূপ চুরি করিয়া খাওয়া কিছুতেই পছন্দ করিত না, কিন্তু তাহার স্নেহের ছোট ভাইটির স্নেহসিক্ত ছল ছল নেত্রের করুণ-অনুরোধ সে-যে এড়াইতে পারে না। তার-যে সকল অভিমান অপমান মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। সব দিনের খাবার একত্র করিয়া সে মহা আনন্দিত হইয়া সবে দাদার নিকট আনিয়াছে, এমন সময় কাহার কর্কশ কণ্ঠে পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল। সৌদামিনী বিদ্যুৎবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া ঘাড় হেলাইয়া বলিল "পঞ্চা ছেলেকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বুঝি সব খাবার খাওয়া হয়? ডাইনীর 'পুত' ডাইন্ ও রাক্ষুসে পেট কিছুই কুলাবে না বলে কি ছেলের হাত থেকে খাবার কেড়ে গিল্‌বি? আচ্ছা আসুন তিনি", বলিয়া অরুণকে উত্তম মধ্যম দিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পঞ্চু একাকী অশ্রুসিক্ত চক্ষে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। প্রাণের গভীর বেদনায় সে কাতর হইলেও বাতায়ন প্রবাহিত অপরাহ্নের শীতল বায়ু স্পর্শে তাহার নিদ্রা আসিল। সে সেই খানেই লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সৌদামিনী অরুণকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় দেখিলেন তাহার হাত

কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে ছিঁড়্‌ল কি করে রে?' অরুণ কাঁদিতে লাগিল—তাহার মনেই পড়িল না যে বাগানে ছুটছুটী করিতে করিতে আছাড় খাইয়া সে পা ছিঁড়িয়াছে। সৌদামিনী ভাবিলেন এ নিশ্চয়ই পঞ্চার কাজ, "আচ্ছা আসুন তিনি কাছারী থেকে, রাক্ষুসে পেট ভেজে দেব, ছেলেকে এমন করে মারা শিখিয়ে দেবখ'ন;" এই বলিয়া ভুজঙ্গিনীর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে সৌদামিনী ঘরে গিয়া শুইয়া থাকিলেন। পঞ্চুকে প্রহারে জর্জ্জরিত দেখিবার ইচ্ছা হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন; আজ বিশেষ ঘটা করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

নিবারণ বাবু কাছারি হইতে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জন্য জল খাবার প্রভৃতি কিছুই আয়োজন নাই। কে কোথায় গিয়াছে তাহারও ঠিকানা নাই। তিনি সৌদামিনীর ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। পরিশেষে কাকুতি মিনতি করাতে গৃহাধিষ্ঠাত্রীর বুঝি কৃপা হইল, তিনি সজোরে কপাট খুলিয়া দিয়া আবার চুপ করিয়া শুইলেন। নিবারণ বাবু পালঙ্কের নিকট গিয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর ক্রন্দনের অনুনাসিক স্বরে এই শুনিতে পাইলেন যে, "ও দিন দিন ছেলের হাত থেকে খাবার কেড়ে খায়, আজ আমি জান্‌তে পেরে ওকে বল্‌তে ও আমাকে যা মুখে এল তাই বল্লে। আবার ছেলেকে মেরে তার পা ছিঁড়ে দিয়েছে।" নিবারণ বাবু তখন সন্ত কাছারি ফেরত—বিশেষতঃ সেদিন মক্কেলের অভাবে তাঁহার পকেটে একটির অধিক রৌপ্য চাক্তি উঠে নাই, সেইজন্য তাঁহার মেজাজটাও বেশ কড়া গোছের ছিল, আবার এদিকে প্রিয়তমা পত্নীকে অত সব সাধ্য সাধনা করিতে হইল, সেদিকে পঞ্চুর অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সুতরাং সকল দোষ গিয়া পঞ্চুর উপর পড়িল। শৈশবে যে পিতা, পুত্রের সামান্য কষ্ট দেখিলে সংসার অন্ধকার দেখিতেন এবং কাছারি হইতে আসিয়া কত খোঁজ খবর লইয়া আদর করিয়া কোলে করিতেন, আজ সেই পিতা পঞ্চুর কোন খোঁজ খবর ত লইতেনই না—বিশেষতঃ আজ আবার তাহার রক্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সংসারের নিয়মই বুঝি এই। তিনি জীবন্ত ক্রোধের ন্যায় পঞ্চুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, পুত্রের কান ধরিয়া তাহাকে খাট হইতে টানিয়া তুলিলেন। পঞ্চু চমকাইয়া উঠিল। "পঞ্চা তুই খোকাকে মেরেছিলি? তোর ছোট মাকে বকেছিলি?" বলিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সজোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। হায়! তাহার করুণ অশ্রু

নেত্রের নীরব ভাষা নির্দ্দয় ক্রোধান্ধ পিতায় করুণা সঞ্চার করিতে পারিল না। নিবারণ বাবু নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে প্রহার করিলেন। পঙ্কু কিছুই বলিল না, কেবল আজ শ্রাবণের ধারার মত ঝর ঝর করিয়া তাহার গভীর অভিমান ও বেদনা গলিত অশ্রু, পিতার পদ সিক্ত করিতে লাগিল। পঙ্কুর শরীর প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইল। নিবারণ বাবু অকথ্য ভাষায় পুত্রকে কতকগুলি গালি দিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঙ্কু ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। হায়! আজ যদি তাহার স্নেহময়ী মাতা থাকিতেন তাহা হইলে কি তাহাকে এইরূপ প্রহার সহ্য করিতে হইত? না আজ তাহাকে আপনারই বাড়ীতে নিতান্ত দীনহীনের মত সদা সঙ্কুচিতভাবে কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া কাল যাপন করিতে হইত? প্রহারের বেদনায় ও গভীর মনোবেদনায় জর্জ্জরিত পঙ্কুর জ্বর আসিল, বেচারা একাকী অন্ধকারে আপনাকে আপনি নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

৪

সন্ধ্যার সময়ে নিবারণ বাবু পঙ্কুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন পঙ্কু ঘুমাইতেছে; বালিশের পাশে মাথাটা এলাইয়া পড়িয়াছে—গণ্ডে শুষ্ক অশ্রুর চিহ্ন। বোধ হইল যেন সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিবারণ বাবুর মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিতেছিল? তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন তাহার গা গরম। উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার মুখ খানি, অশ্রুসিক্ত করুণ-স্তিমিত নয়ন দেখিয়া আজ তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা কাঁপাইয়া একটা ক্ষোভ ও অনুতাপের ঝটিকা বহিয়া গেল। তাঁহার নয়নের সম্মুখ হইতে যেন একটা মস্ত পুরু আবরণ সরিয়া গেল। বর্ত্তমানের ছবি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একেবারে অদৃশ্য হইল। কেবল অদূর অতীতের একটা সুখ-স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার মনের ভিতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পত্নীর মৃত্যু সময়ে সেই বিষাদ করুণ দৃষ্টি। হায়! সে তাহার স্নেহের দুলাল পঙ্কুকে তাঁহার হাতে অটল নির্ভরতার সহিত সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাহার কি যত্নই লইতেছেন! পুনরায় বিবাহ না করিবার সেই প্রতিজ্ঞা, পঙ্কুর প্রতি অগাধ স্নেহ, সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হায়! পঙ্কুর একটু দুঃখ যে তিনি দেখিতে পারিতেন না। পঙ্কু কাছে না থাকিলে যে তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন।

পঞ্চুর মা আজ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহার আজ এ দশা হইত। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কি এ-সব সহ্য করিতেন? নিবারণ বাবুর মনটা যেন হঠাৎ কেমন দমিয়া গেল। প্রাণের ভিতরটা হা-হাকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, হায়! তিনি পিতা হইয়া কোন প্রাণে মাতৃহীন বালককে এই প্রকার অল্প কারণে প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ কেন এমন পাষাণ হইয়া গেল? সৌদামিনীর প্ররোচনায় পঞ্চুর প্রতি স্নেহধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; আজ যেন শতধারে বহিয়া চলিল। পাষাণ গলিয়া যেন জল হইয়া গেল। তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি সকল ভুলিয়া গিয়া বহুদিন পরে আজ পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রের জ্বর তপ্ত গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

রাত্রে তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল পঞ্চুর মাতার সেই সকরুণ শেষ অনুরোধ "ওগো তুমি থাকলে ওর যেন অযত্ন না হয়" এই শব্দটি যেন গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইয়া আজ তাঁহার কাণের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ বাজিতে লাগিল। তিনি সে দিন আর আহার করিলেন না। পরদিন শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি পঞ্চুকে বিছানায় দেখিতে পাইলেন না। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। মাতৃহীন বালক বিমাতার অত্যাচারে—পিতার অবিচারে বেদনা-হত-হৃদয়ে বিশাল পৃথিবীর বক্ষে কোথায় আপনার নিজস্বকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগুপ্ত করিয়া ফেলিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

৫

একমাস কাটিয়া গেল। পঞ্চুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অরুণ একেবারে বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে! সে আর কথা বলিতে পারে না—বিশেষতঃ আজ সকাল হইতে সে আর কথা বলে না! চোখ মিলিয়াও চায় না। অনেকবার ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় নাই। শুধু একবার মাত্র অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বাবা এখনও পঞ্চুদা এলনা?" ডাক্তার বলিয়া গেলেন, অত্যধিক মানসিক আঘাতে এরূপ হইয়াছে। ইহার প্রতিকার ঔষধে শীঘ্র হইবে না। নিবারণ বাবু উদাস-নয়নে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সৌদামিনী কত ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা কুটীতে লাগিলেন। হায়! এই শিশুর ক্ষুদ্র জীবন দীপটুকু আজ বুঝি নিভিয়া যায়।

হঠাৎ বাহিরে ও কে ডাকিল "বাবা, বাবা খোকা কোথায়? বাবা তুমি

কোথায় ? খোকা খোকা !" বলিয়া কুঞ্চিত কেশরাশি মাথায় লইয়া এক বালক ভিতরে প্রবেশ করিল ! বুঝি কোন দেবতার দয়া হইল। "বাবা, বাবা, খোকার কি হয়েছে ? খোকা তুই এমন হলি কেন ভাই ? তোকে এমন অবস্থায় দেখবার আগে আমি কেন মরিনি ? খোকা খোকা একবার চা—একবার দ্যাখ তোর হৃদয়হীন হতভাগ্য পঙ্কুদা এসেছে।" বলিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অরুণকে কোলে তুলিয়া লইল। ঝর ঝর করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। অরুণ একবার চাহিল তারপর "পঙ্কুদা" "পঙ্কুদা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বুঝি তাহার দাদার স্পর্শে তাহার জীবনীশক্তি পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। নিবারণ বাবু ও সৌদামিনী উভয়েই উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। "ওরে পঙ্কু তুই কোথায় গেছলিরে ? কি দেখতে তুই এলি ? দেখ-রে তোর জন্যে তোর খোকার কি দশা হয়েছে। আর একটু পরে এলে তুই কি দেখতিস-রে।"

পঙ্কু নীরবে তাঁহাদের বক্ষ সিক্ত করিতেছিল। আহা ! এ দৃশ্য কি পবিত্র !

শ্রীসতিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

নিষ্ফলতার সার্থকতা

আমি গতবারে মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতির জন্য, মানব জীবনের প্রকৃত উপলব্ধির জন্য প্রতিনিয়ত মহৎ ও সাধু উদ্দেশ্যে নিষ্ফল প্রয়াসের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে দুইটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মানব-জীবনের একটি অতি গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। Andrea Del Sarto ধন মান যশ ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা বৃহৎ অট্টালিকা অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্না স্ত্রী—বাহির হইতে সংসার যাহাকে পরিপূর্ণ সুখ ও সম্পদ বলিয়া গণনা করে, তাহার মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে অতি দীন হীন দরিদ্র বোধ করিতে লাগিলেন এবং ধনমানহীন অক্ষম দুর্ব্বল ও দুরন্ত সংগ্রামে নিষ্পেষিত প্রাণের অনন্ত পিপাসার জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সকল সুখ ও সম্পদ পাইয়াও তাঁহার প্রাণের হাহাকার গেল না, এত সুখ ও সম্পদের মধ্যে ডুবিয়াও তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না ! আর জীর্ণ কুটীরে ঘোর অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে চিরজীবন বাস করিয়া ও সংসারের যশ মান সুখ, সম্পদ হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াও জরা ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে সেই দরিদ্র শিক্ষক অপার

অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতে করিতে পৃথিবীর জীবন শেষ করিয়া গেলেন। একজন সুখ ও সম্পদের মধ্যে অতৃপ্তি ও অন্যজন দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তৃপ্তি পাইলেন; আমাদের মত সাধারণ লোকের চক্ষে ইহা অতি রহস্যময় ব্যাপার, অতি বিপরীত ব্যবহার বলিয়াই মনে হয়। শৈশবকাল হইতে দৃশ্য বস্তুকেই সত্য বলিয়া চিনিতে ও জানিতে শিখিয়া ও চিরজীবন এই দৃশ্য বস্তুর আহরণ ও সঞ্চয়ের জন্য দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া এই স্থূল বস্তুর অতীত আর যে কোনও সত্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে তাহা আমরা এখনও স্থির নিশ্চয় রূপে বুঝিতে বা ধরিতে পারি নাই! আমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি তাহার শক্তিপুঞ্জের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহাদিগকে অধিকার করিয়া, তাহাদিগের উপর রাজত্ব করিয়া, অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করা, পতিত ভূমিকে সুন্দর গ্রাম ও নগরে পরিণত করা, শিক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তার করা, নরনারীর অবস্থা উন্নত করা,—দূর সুদূর দেশসকলকে নানাযোগে যুক্ত করিয়া এক মহামানব সমাজের সৃষ্টি করা, ইহা ত প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য ও অধিকার। প্রকৃত মনুষ্যত্বের ইহাই প্রথম সোপান। আমাদের পিতা মহান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সহযোগী সহকর্ম্মী হইয়া তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যে তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য ডাকিতেছেন। এ মহাঅধিকার হইতে কে বঞ্চিত হইবে? কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর, যে যত পার তাঁহার রাজ্যকে সুন্দর কর উন্নত কর। তাঁহার কাজে তোমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় কর। নিশ্চয় জানিও যতই তুমি তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যবহার করিবে—ব্যয় করিবে ততই তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। শক্তির সমুচিত ব্যবহার করিয়া কেহ কখনও তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই, শক্তির ব্যবহার না করিয়াই বা অপব্যবহার করিয়াই কেবল তাহা মানব হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানুষ কেবলমাত্র নিজের জড়তা অলসতার জন্য এ মহাঅধিকার হইতে, এ মহা আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বকে সুন্দর করিতে হইলে প্রথমে নিজের গৃহকে সুন্দর করিতে হয়, জগতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমে নিজের জীবনকে শৃঙ্খলিত ও নিয়মিত করিতে হয়, অন্যকে সাহায্য করিতে হইলে প্রথমে নিজে বল সঞ্চয় করিতে হয়। সুন্দর গৃহ, নিয়মিত ও পরিমিত আহার ব্যবহার, নির্ম্মল পরিচ্ছদ মন ও আত্মাকে যে কত সাহায্য করে তাহা বলা যায় না। গৃহকে সুন্দর করিতে যাইয়া, নিয়মিত করিতে যাইয়া মানব প্রতিদিন শক্তিপুঞ্জের সহিত সংগ্রাম করিয়া

ও তাহাদিগকে জয় করিয়া যে অর্থ, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতেছে তাহা কখনই অন্যায় বা পাপ নহে।

সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে মোদের পূর্ণ অধিকার।

কিন্তু নিশ্চয়ই, আমরা কি রাজপুত্রের মত সদর্পে সগর্ব্বে সসম্মানে ও সন্তুষ্টচিত্তে নিজের ন্যায্য অধিকার দখল করিতে চাই, না দীন ভিক্ষুকের ন্যায় সভয়ে ও শশঙ্কচিত্তে তাহার জন্য ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হই। রাজপুত্রের ন্যায় পিতার সহযোগী ও সহকর্ম্মী হইয়া তাঁহারই প্রদত্ত রাজ্য অধিকার করায় কখনও পাপ নাই, কিন্তু নিজের দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া ক্রীতদাসের মত দাতাকে ভুলিয়া কেবল তাঁহার দানের আশ্রয় লওয়ায় নিশ্চয় পাপ আছে। এবং পরমপিতার দানগ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের একটি ভ্রান্ত ও মহা অনিষ্টকর ধারণাই আমাদিগকে মহা সত্তার উপর অবিচলিত নির্ভর হইতে নিয়ত বিরত করিতেছে। সাধারণতঃ মনে হয়, প্রিয় পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ও সুখের জন্য দিনরাত যে লোক, দুরন্ত পরিশ্রম করিতেছে ও বহুল অর্থ উপার্জ্জনের দ্বারা সুখে সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, তাহার প্রাণে অনন্তের পিপাসা কেমন করিয়া থাকিতে পারে? সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় যে বাস করে, নির্ম্মল ও সুশোভন পরিচ্ছদ যে পরিধান করে, আনন্দমনে যে হাস্য পরিহাস করে, এক কথায় দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে দিবারাত্র যে বিহার করিতেছে, তাহার প্রাণে অপ্রত্যক্ষ মহাসত্তার উপর নির্ভর আসিবে কিরূপে? আমরা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, বাস্তব ও অবাস্তব রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিভাগ করিয়া ফেলিয়াছি। যদি সুন্দররূপে সুচারু রূপে গৃহকর্ম্ম করিতে চাও তাহা হইলে আর ধর্ম্ম অর্জ্জন করা হইবে না। এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন যদি করিতে চাও তাহা হইলে তোমার প্রিয়পরিজনের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তাহাদের কার্য্যকারিতা অর্জ্জনের সাহায্য করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে ও প্রাণের আনন্দ পাইতে পারিবে না। এইরূপে ধর্ম্মকে কর্ত্তব্যের ও স্বাভাবিক আনন্দের বিরোধী করিয়া তুলিয়া আমরা সংসার হইতে ধর্ম্মকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি বা তাহাকে ক্ষণিকের স্মরণীয় বস্তু করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। যিনি প্রাণের প্রাণ প্রাণের প্রিয়তম তাঁহাকে ভ্রান্ত ধারণাবশে সভয়ে ও সন্দেহে দূরে রাখিতেছি। কিন্তু অনন্তের সন্তান মানব তাহার অনন্ত পিতাকে কি আদৌ চাহিতেছে না? নিশ্চয়ই চাহিতেছে। কিন্তু সে যে তাহার প্রিয়

সংসারকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। যদি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে তবে বুক ভরিয়া এত স্নেহ, এত প্রেম, এত প্রীতি, এত সৌহার্দ্দ তিনি কেন দিলেন! মানব কাঁদিয়া ইহার উত্তর চাহিতেছে। তবে এই ভ্রান্ত ধারণাকে ভাঙ্গিয়া দাও—শত শত বৎসরের সঞ্চিত বংশপরম্পরার যে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে সবলে সমূলে উৎপাটিত কর, এবং আজ সানন্দমনে মুক্ত হৃদয়ে কবির সহিত গান কর,—

"জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি;
রয়েছ তুমি একথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে
আপনি করে তোমারি নাম ধ্বনিতে সব কাজে॥

এমনি করিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎকে ভালবাস, এমনি করিয়া দেহ মন প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁহার চিরসুন্দর, চিরমধুর, চির আনন্দময় সত্তা অনুভব কর। কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া, সত্যপথে চলিতে যাইয়া যে দুঃখ কষ্ট আসে, তাহাকে ভয় করিও না, তাহা পরমপিতার প্রেমের দান, স্থিরভাবে তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু তাই বলিয়া পিতার নিকট যাইবার পথ, তাঁহার আদেশ পালন করিবার এবং তাঁহাকে পাইবার উপায়, দুঃখময় কষ্টময় এ মহা মিথ্যা ধারণা কখনও মনে আনিওনা। মুক্ত সুস্থ সুতেজ বলিষ্ঠ আনন্দময় প্রাণ লইয়াও প্রাণের অনন্ত পিপাসা মিটাইবার জন্য কোন দুরন্ত চেষ্টা, কোন অবিশ্রাম অধ্যবসায়, কোন জীবনব্যাপী নিষ্ফল প্রয়াসকে ভয় হয় বা তাহা হইতে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করে। এবং দিনের পর দিন জীবনের শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া মানব যে অনন্তের সহিত যোগ হারাইতেছে না, এমন কথা বলি না; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে ভুল বিশ্বাস মানবকে সত্য পথ হইতে কতদূর বিচলিত করে—মানবজীবন কি পরিমাণে বিকৃত করিয়া তোলে। এ সম্বন্ধে আমি কবি Robert Browning হইতে একটি চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতাটির নাম Bishop Bhoughams Apology.

ইতালি সহরে সুন্দর ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় নানা সুখ ও সম্ভোগের মধ্যে

Blougham নামে এক ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন। সেই সহরেই অল্প আয় লইয়া, প্রতিদিনের দুরন্ত জীবনসংগ্রামের মধ্যে গিগাডাস নামে এক লেখক তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিয়া ভ্রান্ত ধারণা ও ঈর্ষা বশতঃ এই ধর্ম্মপ্রচারকের নামে নানা বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিতেন। Blougham সুশিক্ষিত স্থিরবুদ্ধি, ধর্ম্মভীরু, মিষ্টস্বভাব ও রহস্যপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই বিরুদ্ধবাদে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী Gigadibsকে একদিন আহারন্তে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। Gigadibs ও তাঁহার গৃহের ও আহারাদির ঐশ্বর্য্য দেখিবার কৌতূহলপরবশ হইয়া এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নানা সুখসেব্য আহারাদির পর আরামপ্রদ আসনে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। Bishop Blougham এর বিরুদ্ধে Gigadibs এর প্রথম অভিযোগ এই যে, Bishop Blougham জীবনের যে সব উচ্চ আদর্শের কথা প্রচার করিতেছিলেন ও নিজে সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা করিতে হইলে তাঁহার জীবনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া আদর্শের অনুযায়ী করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপ ধন ঐশ্বর্য্য সুখ, সম্পদের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ তাহার প্রাণের উচ্চ আদর্শকে কখনও রক্ষা করিতে বা সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি যখন তাহা করেন না তখন তাঁহার প্রচারিত উপদেশ বা তাঁহার জীবনের সাধনা কখনও সত্য হইতে পারে না। তাহার উত্তরে Bishop Blougham বলিলেন—

"The Common problem, yours, mine, every ones
Is not to fancy what were fair in life
Provided it could be,—but, finding first
What may be, then find how to make it fair
Up to our means—a very different thing
No abstract intellectual plan of life
Quite irre pective of life's plainest lawr
But one, a man, who is man & nothing more
May lead within a world which is Rome or London."

"তোমার, আমার, প্রতিজনের পক্ষে সাধারণ সমস্যা এই যে, আমাদের জীবনের অবস্থা কি রকম হইলে আমাদের জীবন সুন্দর ও সফল হইতে পারিত, তাহা কেবলমাত্র কল্পনা করা নহে কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জীবন যে অবস্থার মধ্যে

রাখিয়াছেন, সেই অবস্থার সুযোগ ও সুবিধা জানিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আমাদের শক্তি ও সাধ্যমত আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সফল করিয়া তুলিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ইহা মানবের দৈনিক জীবনের কল্পিত চিত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা জীবনের এমনি একটি নিয়ম, যাহা মানব দুর্ব্বল ভারাক্রান্ত নিষ্পেষিত মানব, Rome or London বা যে-কোন সহরের মধ্যে বাস করিয়াও পালন করিতে পারে।"

কি সত্য কথা! আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কি এই কল্পনা মিথ্যা অভিযোগ করিয়া কাটাইয়া দিতেছি না? প্রতি প্রভাতে আমরা নূতন জগতে, নূতন আলোকে, নূতন প্রাণ লইয়া নব নব শক্তি সহায় ও সুযোগের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছি, আর প্রতি সন্ধ্যায় ব্যর্থ দিনের মৃত কঙ্কাল বহন করিয়া নিস্তেজ, নির্জ্জীব, নীরস প্রাণ লইয়া অন্ধকারে বসিয়া মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপ করিয়া হীন, মলিন ও অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি। বিশ্বাসী কর্ম্মীগণ অবস্থার দিকে না তাকাইয়া কেবল লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া প্রাণপণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন—ফলে অবস্থা লক্ষ্যের অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অবস্থার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যকে অবস্থার অনুযায়ী করিতে যাইতেছি, ফলে অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না কিন্তু লক্ষ্য হারাইয়া যাইতেছে। ঈশ্বর অগণ্য নরনারীকে ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শরীর মন ও আত্মা দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে আনিয়াছেন। ইহা তাঁহারই সৃষ্টি—তাঁহারই অভিপ্রেত। জগতে এ বিচিত্রতার এ বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আছে। ছোট, বড়, দুর্ব্বল, বলবান, মূর্খ ও জ্ঞানী তাঁহার বিশ্বরাজ্যে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। আজ জগৎ জুড়িয়া যে মহা ঐক্যতানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সকলেরই বিভিন্নভাবে যোগ দিবার অংশ আছে। একে অপরের মত হইতে পারিলাম না বলিয়া মিথ্যা অভিমানে নীরব থাকিলে চলিবে না। তুমি যেমন তেমনি তোমার সংযোগ তিনি চান। প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও; তোমার যাহা আছে তাহা তাঁহাকে দিবার জন্য উপযুক্ত কর—প্রস্তুত কর। তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত পরিমাণ ত তিনি জানেন। অবস্থার ভ্রান্ত ধারণা লইয়া তাঁহার সহযোগী হইবার মহৎ অধিকার ও অপার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইওনা।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ্ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাইত প্রভু যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

ইহা কবিতা নহে, কল্পনা নহে; ইহা সত্য, অতি সত্য কথা। আজ জগতের দূর সুদূর স্থান হইতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীল ও কবি একই মহাসত্যে উপনীত হইয়া এই কথাই প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বর করুন, আমরা প্রত্যেকে আমাদের দৈনিক জীবনে ইহা সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দেবকুমার

১০

দেবকুমার চলিয়া গেলে নিরুপমা তাহার পিতাকে কহিলেন, "বাবা, আজ তুমি আমার কাছে তর্কে হারবে।"

চারুবাবু সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন 'কেন মা? কিসে তুমি হারাবে!"

নিরুপমা। তুমি বল যে লোকে সুখের জন্য সব কাজ করে। কিন্তু দেবকুমার বাবু যে নিজেকে বিপদে ফেলে আমাদের বাঁচালেন এ কাজ তিনি কোন সুখের জন্য করলেন?

চারুবাবু। আমি কি বলি যে সব কাজই মানুষ সুখের আশা করে ক'রে? তা-ত নয়। প্রথমে মানুষ যখন কাজ করেছিল, তখন সুখের আশা নিয়েই করেছিল। ক্রমে সে সুখের আশা মন হ'তে চলে গেছে। কিন্তু সেই কাজগুলি করবার ইচ্ছা হেরিডিটির (বংশানুক্রমে) ফলে রয়ে গেছে; তাই পূর্ব্বে যেগুলি সুখের ইচ্ছায় করত, এখন তা নিঃস্বার্থভাবে করতে পারে।

নিরুপমা। পরার্থপরতার মৌলিক ভাবটি মানুষের মনে না থাকলে কখন যে মানুষ নিজের জীবনকে বিপদে ফেলে কাজ কর্‌তে পারত, এ আমার বিশ্বাস হয়না। এতবড় কাজ কি কখনও সুখের আশায় কোনদিন মানুষে করতে পারে!

চারুবাবু। সে কথা যা'ক, আর কিসে আমাকে হারাবে?

নিরুপমা। তুমি যে বল হেরিডিটির (বংশানুগত সংস্কার) ফল কেহ এড়া'তে পারেনা; এইজন্য তুমি বল যে জাতিভেদ থাকবেই। কিন্তু দেবকুমার বাবু ত চণ্ডালের ছেলে, তাঁর চণ্ডালের মত সংস্কার ত একটুও দেখলাম না। অনেক ব্রাহ্মণের চেয়ে তাঁকে ভাল দেখলাম। এখানে তোমার Hereditory principal (বংশগত সংস্কার) কোথায়?

চারুবাবু। জাতিভেদ কি অত সহজে অস্বীকার করা যায়? দেবকুমারের সম্বন্ধে ত সকল কথা আমরা জানিনে। চণ্ডালের সংস্কার তার মধ্যে যে নাই, তা আমরা এখনও জানিনে। লোকে জাতি ভেদের সম্বন্ধে আর যে সব যুক্তি দিয়ে থাকে সে সকল কিন্তু আমার নিকট অতি অসার বলে মনে হয়। কেবল বংশগত সংস্কার আছে বলে, আমি জাতিভেদ মানি। ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, তার ব্রাহ্মণবংশের সদগুণ না থেকে যায় না। সেইরূপ চণ্ডালের ছেলে যতই ভাল হউক না কেন, তার বংশের দোষ কিছু না থেকে যায় না।

নিরূপমা। জন্মগত সংস্কার কি আগে হতেই ছিল, না জাতিভেদ সৃষ্টি হ'বার পরে হয়েছে?

চারুবাবু। যখন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়নি,—যেমন বৈদিক যুগে, তখন জাতিগত সংস্কার বলে কিছু ছিল না। তখন যত সব কুসংস্কার ছিল সব পরিবারগত। কিন্তু ক্রমে যখন জাতিভেদের সৃষ্টি হ'ল, তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কাজে অনেক সময়ে মানুষের প্রকৃতি গঠন করে। তাই যাঁরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা নিয়েছিলেন, তাঁহাদের ধার্ম্মিক, নিঃস্বার্থ ও সচ্চরিত্র হওয়াই স্বাভাবিক; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের সাহসী, রাগী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সরল

হয়েছে। আবার শূদ্রের.পরাধীন, জ্ঞানহীন, ক্ষুদ্রমনা অনেকটা নির্ব্বোধ হয়েছিল, অনেকটা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের সহিত তাদের তুলনা হয়। এসকল সংস্কার প্রতি জাতির মধ্যেই রয়েছে।

নিরুপমা। তুমি যে বললে জাতিভেদের অন্য যুক্তিগুলি নিতান্ত অসার, সেগুলো কি ?

চারুবাবু। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বলেন, ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ, হাত হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য আর পা হতে শূদ্র হয়েচে। ব্রহ্মাই যখন কল্পনা, তখন তার হাত, পা, মুখ, হতে লোক কি করে হবে ? তবে যাঁরা এতটা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও বলেন যে মূলেই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি করে মানব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান এখন যা বলচে, তাতে একথা কিছুতেই টেঁকে না, জানত, বানরই ক্রমে উন্নত হয়ে বহুযুগ পরে মানবদেহে পরিণত হয়েছে ; ঈশ্বর এক এক জাতিকে এক এক কাজ দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। কেউ কেউ বলেন, কার্য্যবিভাগের জন্য জাতিভেদের সৃষ্টি—আর সেইজন্যই জাতিভেদ থাকাও উচিত। কিন্তু এ কথাতেও জন্মগত জাতিভেদের কোন কারণ পাওয়া যায় না। কারণ যার যে ব্যবসা ইচ্ছে তা করলে, Divition of labour (কার্য্যবিভাগের) কোন বাধা হয় না। জাতিভেদ কেবল এক Principl of Heridity (বংশগত সংস্কার) দ্বারাই সমর্থন করা যায়। ব্রাহ্মণের ছেলের অনেকটা ব্রাহ্মণের মত চরিত্র হয় ; শূদ্রের ছেলের শূদ্রের মত সংস্কার হয়। যে যে জাতিতে জন্মেছে, তার সেইরূপ প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণে না থেকে যায় না। আমি এইজন্য জাতিভেদ মানি। খাওয়া-দাওয়া ছোঁয়া-ছুতে কিছু হয় না।

নিরুপমা। কিন্তু এক জাতির লোক অন্য জাতির গুণও অনেক সময়ে পেয়ে থাকে। বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন সে বংশে যুদ্ধই ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তিনি সকল ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ। যিশু সূত্রধরের পুত্র ; নানক বৈশ্যের সন্তান, কবীর জোলা। কিন্তু এঁরা বংশগত সংস্কার ছেড়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

চারুবাবু। দু একটা দৃষ্টান্তে কি শত শত লোকের দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করা যায় ? মানবসমাজের Heridityর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নিরুপমা। Heridityর বিরুদ্ধে যদি অনেক দৃষ্টান্ত পাও তা হলে কি বিশ্বাস করবে ?

চারুবাবু। তুমি আমাকে যখন সেরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাবে, তখন বিবেচনা করব।

১১

দেবকুমার যে কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলেন, চারুবাবুর গৃহে প্রতিদিনই যাইতেন। চারুবাবু তাঁহাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতে এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাকে যেন সংবাদ দিতে ত্রুটি না করেন ইহা বলিয়া দিলেন।

দেবকুমার যথাসময়ে জাহাজে উঠিলেন। এ কয়েক দিনেই তাঁহার জীবনে যেন একটা নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। বহুদিনের বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, এইরূপ তাঁহার মনে হইতে লাগিল। নিরুপমার স্বাভাবিক সরলতা, বিনয়, এবং সৌজন্য তাঁহার মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন একটি স্বাভাবিকতা তাঁহার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, যাহা তাঁহার পরিচিত অপর কোন নারীর মধ্যে পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই। নিরুপমাকে পত্নীরূপে পাইবার বাসনা যেন আপনা হইতেই মনের মধ্যে একবার আসিল, কিন্তু সে চিন্তা তখনই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, সে অতি নীচ জাতি; তাঁহার নিজের মিষ্টার বসু-প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা মাত্র সম্বল; ওরূপ ধনী, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সুন্দরী কন্যার তিনি নিতান্তই অযোগ্য। কিন্তু নিরুপমার চিন্তায় তাঁহার মনে একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তিজনিত মধুর ভাব আনিয়া দিল।

প্রথম সমুদ্র দর্শনে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ও জাহাজের তলদেশে আঘাত করিতেছে। চারিদিকে দূর দূরান্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। আকাশ যেন অবনত হইয়া সস্নেহে সমুদ্র চুম্বন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে প্রেমের যোগ দেখাইয়া দিতেছে। উপরে অনন্ত আকাশ ও সম্মুখে প্রান্তহীন সমুদ্র এবং তাহার পরে মন যখন দৃশ্য ছাড়িয়া দৃষ্টির অতীত আকাশে কোটি কোটি বিশ্বের কল্পনা করে, তখন মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক সহজেই নত হয়।

দেবকুমারবাবু যে কয়েক দিন জাহাজে ছিলেন, এইরূপ নির্জ্জনে অনেক সময় বসিয়া কাটাইতেন। জাহাজে তাঁহার একটি বন্ধু মিলিয়াছিল। ইনিও মান্দ্রাজ-যাত্রী জনৈক বাঙ্গালী। সময়ে সময়ে উভয়ে ডেকের উপর বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইতেন। একদিন তাঁহারা জাহাজের ডেকের উপর দুইখানি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; এমন সময়ে একজন ইংরেজ আসিয়া বলিল, "বাবু তোমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছ। এখন তোমরা অন্যত্র যাও আমি এখানে বসব।"

দেবকুমার কহিলেন, "কেন, তুমি অন্য চেয়ারে যাও। ডেকের উপর অনেক বসবার যায়গা আছে।"

ইংরাজ বলিল, "এ চেয়ারে নেটিবদের বসবার অধিকার নেই।"

এইরূপে বচসা হইয়া ক্রমে মারামারি উপস্থিত হইল। ডেকের উপরে পড়িয়া উভয়ে উভয়কে হারাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্ধু এই গোলমাল দেখিয়া কাপ্তেনকে সংবাদ দিতে গেলেন। কাপ্তেন আসিলে ইংরেজটি বলিল,—"এই নেটিব আমাকে অপমান করেছে। আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।"

কাপ্তেন একজন ফরাসী, এবং পূর্ব্বেই তিনি সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "নেটিব?—আমি এ জাহাজে নেটিব ও ইউরোপীয়ানের কোন বিভিন্নতা রাখি নে। তুমি যদি এত নেটিব-হেটার হও, অন্য জাহাজে গেলেই পারতে?" পরে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দেখুন যদি ইনি ফের অন্যায় ব্যবহার করেন, আমাকে জানালে আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

ইংরেজটি মার খাইয়া ও কাপ্তেনের নিকট তিরস্কৃত হইয়া বিষণ্ণবদনে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। দেবকুমার ও ভদ্রলোকটির পুনরায় কথা আরম্ভ হইল।

দেবকুমার। আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা হোত যে খৃষ্টান হই। কিন্তু এদের দেখে দেখে, আর ইচ্ছা করে না। একমাত্র হিন্দুসমাজেই যে জাতি-বিদ্বেষ আছে, তা নয়, ইংরেজদের মধ্যেও এই জাতিবিদ্বেষ প্রবল।

বন্ধু। তাইত, কোথায় যিশু বললেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস" এরা প্রতিবেশীকে কুকুরের মতও ভালবাসে না।

দেবকুমার। কিন্তু সব ইংরেজ এরূপ নয়। অনেকে গুণের আদর করেন। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বিজাতি-বিদ্বেষ এদের মধ্যেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। শূদ্রকে ঘৃণা করে, ব্রাহ্মণ জাতির যে দশা হয়েচে, মনে হয় কালে এদেরও সেই দশা হবে।

বন্ধু। আপনি কি বলেন যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি জাতিভেদের ফল।

দেবকুমার। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, কিন্তু আমি অনেকটা তাই মনে করি। আর্য্য ও অনার্য্য মিলে যদি প্রাচীন কালে একজাতি হোত, সে জাতি কত উন্নত ও শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু অনার্য্যদের অস্পৃশ্য ও দাস করে রাখাতে, অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর্য্যেরা অনার্য্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করতেন, ক্রমে তা তাঁদের মধ্যে এসে পড়ল। ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে, বৈশ্য শূদ্রকে, প্রতি উচ্চবর্ণ নীচবর্ণকে সেইভাবে ঘৃণা করতে লাগল।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা তা-ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। জাতি দুর্ব্বল ও সমাজ প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের যে অবস্থা হয়েছে, ইংরেজরাও যদি এই ভাবেই চলে, ভবিষ্যতে তাদেরও এই অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়।

বন্ধু। সেবার চট্টগ্রামের এক ষ্টীমারকোম্পানি ষ্টীমারে সাহেব প্যাসেঞ্জার ছিল বলে বাঙ্গালীকে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট দিলে না। বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, চলুন এখন নীচে যাওয়া যাক্।

১২

যথাসময়ে দেবকুমার মান্দ্রাজে পৌছিলেন। মিষ্টার আয়ার দেবকুমারকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, তাঁহাকে কি কাজ করিতে হইবে সেই সকল বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিঃ আয়ার কহিলেন—"আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, আর আমি আপনার পিতৃস্থানীয়ও বটে, যদি কখনও কিছু রূঢ় কথা বলি, সেগুলি পিতার তিরস্কার বলেই মনে করবেন। তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। কাজ সম্বন্ধে আপনি ব্যাঙ্কের চার্জ্জে রইলেন। কিন্তু কোন কাজ আমার সহিত পরামর্শ না করে করবেন না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক আমারই চার্জ্জে,—আমার হয়ে আপনি কতকগুলি কাজ করবেন মাত্র। আপনার দরকারী যে সব হিসাবপত্র তা আগনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি কখনও কিছু আবশ্যক হয় আমার নিকট হতে চেয়ে নেবেন। আপনি দেখবেন যে, আপনার অধীন কর্ম্মচারীরা কোনরূপ চুরি না করে। একঘণ্টা বাদে আমরা একসঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার ইচ্ছা যে, আপনি আমাদের বাড়িতেই থাকুন।"

দেবকুমার। এতে আমার নিজেরই সুবিধে। এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মিঃ আয়ার। আজকালকার ছেলেরা কিছু স্বাধীনভাবে থাকতে চান, সেইজন্য সহজে এ প্রস্তাব করতে সাহস হয় না। চলুন আপনাকে মিস্ আয়ারের সহিত পরিচয় করে দিই। পরে আমরা গাড়ি করে ব্যাঙ্কে যাব।

এই বলে' তাঁরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেবকুমারকে মিস্ আয়ারের সহিত পরিচয় করে দিলেন। যথাবিধি অভিভাষণের পর সকলেই উপবেশন করিলেন। মিষ্টার আয়ার কন্যাকে বললেন, "মিঃ বোসকে তুমি অভ্যর্থনা কর। আমি প্রস্তুত হয়ে আসি।" বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মিস্ আয়ার কহিলেন "আমি অনেক সাধারণ কাজে হাত দিয়েছি আপনাকে আমার অনেক সাহায্য করতে হবে।"

দেবকুমার। নিশ্চয়ই করব। আপনি সৎকাজে হাত দিয়েছেন, আমার যথাসাধ্য আমি আপনাকে সাহায্য করব।

এমন সময়ে মিষ্টার আয়ার কাপড় পরিয়া আসিলেন। মিস্ আয়ার কহিলেন, "বাবা মিষ্টার বোসকে আমি আমার কাজের কথা বলছিলাম, ইনি যতটা পারেন আমার সাহায্য করবেন বললেন।"

মিষ্টার আয়ার। তুমি এঁকে একটু বিশ্রাম করিতে দাও। তোমার কাজের কথা ক্রমে বলো।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে গাড়ী চড়িয়া ব্যাঙ্কে যাত্রা করিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে সম্মুখ দিয়া একজন লোক যাইতেছে দেখিয়া মিষ্টার আয়ার রূঢ়স্বরে তাহাকে তেলেগু ভাষায় কি বলিলেন। সে লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত যোড় করিয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। এইরূপ কথাবার্তার পর সে অন্যদিকে চলিয়া গেল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ লোকটি কে ? কি করেছিল ?"

আয়ার। ও পারিয়া, সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাই ধমক দিলাম।

দেবকুমার। আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে—মাপ করবেন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ায় দোষ কি ?

মিষ্টার আয়ার হাসিয়া বলিলেন, "আপনি এখানকার রীতি-নীতি কিছুই জানেন না। থাকতে থাকতে ক্রমে জানতে পাবেন। মান্দ্রাজে পারিয়া নামে একজাতি আছে, সকলেই তাদের ঘৃণা করে, কেহ তাদের স্পর্শ করে না,—ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। এদের আচার-ব্যবহার দেখলে বাস্তবিকই ঘৃণা হয়। এরা খুব মদ খায়, বড্ড অপরিস্কার থাকে। মান্দ্রাজে এরা সাধারণ রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না। এদের জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। সোজা হবে বলে ঐ লোকটা এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমি ধমক দিতেই অন্য রাস্তায় চলে গেল।"

দেবকুমার। এদেশে মানুষ মানুষকে এমন ঘৃণা করে! বাংলাদেশেও চণ্ডালদের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু এতদূর নয়।

মিঃ আয়ার। এখানে ঘৃণা করবার অনেক কারণ আছে। সহরের যত চুরি অধিকাংশ এদের দ্বারাই হয়। এরা মদ খায় এবং অতিশয় হীন অবস্থায় থাকে। কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকেরা এদের প্রতি খুব অত্যাচারও করেন।

দেবকুমার। শিক্ষিত লোকেরা এদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন না?

মিঃ আয়ার। হাঁ, চেষ্টা হয় বই কি। প্রতি বৎসর বক্তৃতা হয়, পারিয়াদের জাতিতে তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু বক্তৃতা পর্য্যন্ত হয় আর কিছু হয় না।

দেবকুমার। এরূপ অবস্থা বড়ই দুঃখজনক।

দেবকুমার মিঃ আয়ারকে আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যতদূর চেষ্টা করিতে পারেন তাহা করিবেন। যাহা হউক, এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ আয়ার তাঁহাকে ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানীর কাজ বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "আপনার নিকট দেখতে চাই সততা। পূর্ব্বে এই কাজে যিনি ছিলেন, তিনি হিসাবপত্রে গোলমাল করায় তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করতে হয়েচে। সৎ বলেই আমি আগ্রহ করে আপনাকে আনিয়েছি। আপনি একপ্রকার আমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কাজই করবেন। এর জন্য ১০৩৲ করে মাসে পাবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারের সহিত আপনার পরিচয় করে দেব। বীণাপুরমের রাজা একজন ডিরেক্টার। তিনি কেমন ভদ্র, আলাপ করলেই তা বুঝতে পারবেন।

১৩

পারিয়াদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ও তাহাদের বিবরণ শুনিয়া দেবকুমারের মনে তাহাদের উন্নত করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন হায় হায়! আমাদের দেশেও ত আমার প্রায় এই অবস্থা। ইহারাও ত মানুষ। শেয়াল কুকুর রাস্তায় চলিতে পারে, কিন্তু মানুষকে রাস্তায় চলিতে দিবে না। শেয়াল কুকুর হইতেও তাহারা অস্পৃশ্য!

তিনি সর্ব্বপ্রথমে তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যদিও সংস্কৃত বা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত কোন ভাষার সহিত এভাষার সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহা অতিশয় কঠিন, তথাপি তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ও লোকের সহিত কথা বলিয়া দুই মাসের মধ্যেই অনেকটা শিখিয়া ফেলিলেন।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। এখন পারিয়াদিগের মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে তিনি তাহাদিগকে দেখিতেন ও ঔষধ দিতেন। প্রথমে ইহাতে তিনি অত্যন্ত বাধা পাইয়াছিলেন। কেন-না অশিক্ষিত পারিয়াগণ প্রথমে কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহে নাই। তাহারা বলিত, "আমরা হিন্দু, কখনও

খৃষ্টানী ওষুধ খাই নে। ওষুধ খেলে দেবী আমাদের উপর অত্যন্ত রাগবেন, তাহা হলে আমরা রোগ হতে আর বাঁচব না!” তাহারা মনে করে যে দেবীর ক্রোধেই রোগ হয়, এবং রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কেবল দেবীকেই পূজা দিতে হয়। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে তিনি ঔষধ খাইতে সম্মত করিতে পারিয়াছিলেন।

দেবকুমার পারিয়াদিগের মধ্যে দেখিলেন যে তাহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহা মদ খাইয়া ব্যয় করিয়া ফেলে। ঘরে খড় নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, আহার অতি সামান্য এবং শুইবার বিছানা হয়ত কিছু নাই। কিন্তু মদে সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেবকুমার এক নূতন ভাবে তাহাদিগের মধ্যে কাজ করিতে লাগিলেন। পারিয়াদিগের প্রত্যেক বস্তীর এক একজন মণ্ডল আছে। তিনি প্রথমে একজন মণ্ডলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া মদ্যপানের অপকারিতা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মণ্ডল যখন মদত্যাগ করিতে সম্মত হইল, তখন তাহার বস্তীর সকল লোককে ডাকিয়া উভয়ে মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল হইল। মণ্ডলকে মদ ছাড়িতে দেখিয়া ও উহার অপকারিতা বুঝিয়া সকলেই মদ ছাড়িতে প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু এই মদ্যপান পরিত্যাগের ফল আরও আশ্চর্য্য! যাহাদের ভাঙ্গা ঘর ছিল তাহারা তাহা মেরামত করিল, যাহাদের খড়ের ঘর ছিল, তাহাদের টিনের ঘর হইল, এবং অপরে শীঘ্রই টিনের ঘর করিবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরিশ্রমপ্রিয় পারিয়া রমণীগণ প্রফুল্লচিত্তে গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহারা যখন অনেকে একত্র হইয়া গ্রীবার পশ্চাৎদিকে কবরী বন্ধন করিয়া অনাবৃত মস্তকে হাস্যপরিহাসের সহিত জল আনিতে যাইত, এবং কলসী জলপূর্ণ করিয়া মস্তকের উপর রাখিয়া সহাস্যমুখে গৃহে আসিত, তখনকার সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইত। তাহাদের বস্ত্র পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত হইল, গৃহ নূতন লোহিতবর্ণ মৃত্তিকালিপ্ত হইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বালক বালিকারা পর্য্যাপ্ত আহার পাইয়া আনন্দের সহিত শ্রেণীবদ্ধ গৃহশ্রেণীর মধ্যস্থিত অঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। এইরূপে এক পল্লীর দৃষ্টান্তে অপর পল্লী সংশোধিত হইতে লাগিল।

দেবকুমার ইহাদের জন্য কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া একদিন এক মণ্ডলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

মণ্ডল।—বাবু তোমার এ চেষ্টা বৃথা। তোমার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তোমার

স্কুলে পড়িবে কে? পায়রিঙ্গিরা স্কুল করে কয়েকজনকে খৃষ্টান করে নিয়েছে, সেইজন্য আর কেহ স্কুলে ছেলে দিতে চায় না।

দেবকুমার। পায়রিঙ্গী কারা?

মণ্ডল। তোমরা যাকে ফিরিঙ্গী বল, আমরা তাদের পায়রিঙ্গী বলি। ইংরেজেরা এদেশে পারিয়া বিবাহ করে যেসকল সন্তান হয়, আমরা তাদেরই-পায়রিঙ্গী বলি। তোমরা না-জেনে তাদিগকে বল ফিরিঙ্গী।

দেবকুমার। সেকথা যাক। তুমি ত আমাকে জান, আমি ত আর খৃষ্টান করতে চাই না। সেকথা কি তুমি সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না?

মণ্ডল। বাবু তুমি নিজেই বুঝে দেখ, আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি করবে, কে তাদের কাজ দেবে। যারা আমাদের ছায়া মাড়াতে চায় না সরকারী রাস্তা দিয়ে চলতে দেয় না, তারা কি আমাদের কোন কাজ করতে দেবে? আমাদের চোখ ফুটিয়ে কেবল অসন্তোষ বাড়াবে। এখন তোমরা মা'র,—শেয়াল কুকুরের মত তাড়াও—আমরা সব সহ্য করচি। কিন্তু তখন এ অবস্থা সহ্য করা বড়ই কষ্টকর হবে।

দেবকুমার এ কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কেবল বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! ইহাকেই কি হিন্দু সভ্যতা বলে? মানুষের উপর মানুষ কি এমন অত্যাচার করতে পারে? আমরা ইংরাজ-রাজের নিকট কত অধিকারই প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু মানবের সামান্য অধি-কারও আমরা দিতে চাহি না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আমরা কি অপদার্থ!

মণ্ডল আবার কহিল। "বাবু তোমরা আমাদের ঘৃণা কর বলেই আমাদের মেয়েদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। তাদের ঘরে রাখতে পারি নে।"

দেবকুমার। সে কি? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারচি নে।

মণ্ডল। ভদ্রলোকেরা প্রকাশ্যে তাদের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু যখন তারা কুলটা হয়, তখন গোপনে তাদের ঘরে আসতে ভদ্রলোক দ্বিধা বোধ করে না! যারা পূর্ব্বে ঘৃণা করত তারা এখন আদর করছে দেখে আমাদের ঘরের অনেক মেয়ে কুলটা হওয়াকেই গৌরব মনে করে। আমরা যে তোমাদের নিকট হ'তে দূরে থেকেও, নিরাপদে থাকতে পারি নে।

দেবকুমার। ভগবান তোমাদের উপর মুখ তুলে চাবেন। তোমারা ভাল হও, তোমাদের উন্নতিতে বাধা দেয় কার সাধ্য?

মণ্ডল। বাবু, দুঃখের কথা আর কি বলব? এই পারিয়া যখন খৃষ্টান হয়ে

পায়রিঙ্গী হয়, তাহার নাম একটা 'ম্যানুয়েল' 'স্যামুয়েল' রাখে, তখন তারা তাকে "আসুন, বসুন" বলে চেয়ার দেয়। কিন্তু যারা পৈতৃক ধর্ম্ম নিয়ে আছে তাদের ছায়াও মাড়ায় না। সেইজন্য আমরা হিন্দু থাকতে চেষ্টা করলে কি হবে! যারা একটু নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, তারাই খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এ সব ত ভদ্রলোকের দোষেই। কিন্তু আমরাও ভদ্রলোকের উপর এর প্রতিশোধ লই।

দেবকুমার। সে কি রকম? তোমরা কিসে প্রতিশোধ লও।

মণ্ডল। না বাবু, সেকথা তোমাকে এখন বলব না। যদি সময় হয় পরে বলব। তুমি আয়ারের বাড়ী থাক না?

দেবকুমার। হাঁ।

মণ্ডল। যাহা হউক, সেকথা পরে বুঝবে।

দেবকুমার। তা যেন হল। কিন্তু মণ্ডল, তুমি আমার স্কুলের বন্দোবস্ত করে দাও। তুমিও ত বললে, লেখাপড়া না শিখলে, নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত বুঝা যায় না। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তোমাদের নিজেদের কাজ কর্ম্ম ত ভাল করে করতে পারবে।

মণ্ডল। বাবু, তুমি বড় ভাল লোক। আমি চেষ্টা করব, দেখি কতদূর কি করতে পারি। তোমাকে আমি পরে সব বলব।

দেবকুমারের চেষ্টা ও মণ্ডলের সহায়তায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পারিয়া শিক্ষক ব্যতীত অপর কোন শিক্ষক কাজ করিতে স্বীকার করিল না বলিয়া একজন খৃষ্টান পারিয়া শিক্ষককে প্রথম বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হইল। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি যেন স্কুলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার না করেন। দ্বিতীয় স্কুলের জন্য একজন পারিয়া হিন্দু শিক্ষকই পাওয়া গিয়াছিল।

মিঃ আয়ারকে এসকল কথা বলিলে তিনি উৎসাহ দিলেন না, বরং অনুযোগ করিতে লাগিলেন। মিঃ আয়ার বলিলেন, "তুমি এতবড় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে পারিয়াদের সহিত বেশী মিশলে তোমার পদের ক্ষতি হবে। এছাড়া তুমি যদি ওদিকে এত সময় দাও তা হলে কাজ করবে কি রূপে? তুমি কিছু মনে করো না, আমি তোমার ভালর জন্যই বলচি।"

দেবকুমার। ' আমি কাজের কোন ক্ষতি করি নে। অবসর সময়ে এই কাজ করে থাকি। দেবকুমার একটু দৃঢ় ভাবেই বলিলেন, "এদের জন্য কোনরূপ চেষ্টা

করা কি অন্যায় ? দেখুন এদের এমনই দুর্ভাগ্য যে কেউ এদের সাহায্যও করতে চায় না। আমি বিদেশী বলে এদের মধ্যে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েচেন। স্কুলের জন্য কিছু চাঁদা আপনাকে দিতে হবে। অনেকে দিতে স্বীকৃত হয়েচে।”

মিঃ আয়ার একটু সুর বদলাইয়া বলিলেন,—“সকল সৎ কার্য্যেই আমার উৎসাহ আছে। চাঁদা অবশ্যই দেব। কিন্তু পারিয়া গুলো এমন হীন যে, ওদের উন্নতির কোন আশা আছে বলে আমার মনে হয় না। সেইজন্য তোমাকে এ বৃথা চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হতে বলছিলাম।” (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। (বি এ)

বিবিধ

বাঙ্গলী সৈন্যের অভ্যর্থনা। সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার পাইয়া বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। দেশের জন্য বাঙ্গালী জীবন বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ নহে ; বাঙ্গালীর যুবকসম্প্রদায় আহ্বানমাত্র সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

বিদায়-মহোৎসব সভায় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক সৈন্যসংগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“আমাদের আর সবে মাত্র ৭২ জনসৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু সৈন্য দলে আমরা তদপেক্ষা বেশিসংখ্যক যুবককে প্রথমত ভর্ত্তি করিব, কারণ ডাক্তারী পরীক্ষায় কেহ কেহ অযোগ্য প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু অধিকসংখ্যক যুবা পাইতে আমাদের কোন মুস্কিল হইবে না, এখনও আমরা মফঃস্বলের যুবাদিগকে তালিকা-ভুক্ত করি নাই। যাঁহারা সৈন্যদলভুক্ত হইতেছেন সেই সকল যুবাদিগের অনেকেই সমৃদ্ধ জনক জননীর পুত্র। সকলেই সুশিক্ষিত, কেহ কেহ মেডিকেল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, আবার কেহ কেহ উচ্চ বেতনের পদ-ত্যাগ করিয়া অত্যল্পবেতনগ্রাহী সৈনিকের ক্লেশ স্বীকার করিতে চলিলেন, রায় যদু-নাথ মজুমদার বাহাদুরের পুত্র হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন, তিনি পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া রণক্ষেত্রে যাইতেছেন। জমিদার মিঃ এস, রায় ইংলণ্ডে টেরিটরিয়েল সৈন্যদলে ছিলেন, সংপ্রতি তিনি তাঁহার পরিজনবর্গ, পত্নী ও নবজাত পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রথম দলে যোগ দিয়াছেন।

যে ভাব এই সকল যুবাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা অতি মহৎ। পার্থিব লাভ-ক্ষতি, মাহিয়ানা প্রভৃতি তুচ্ছ প্রশ্নের প্রতি তাঁহারা ভ্রুক্ষেপ করেন নাই।

বাঙ্গালী সৈন্য ও বাঙ্গালী নারী। আজ বাঙ্গালীর বহুকালের "আশার কথা," বহুকালের "মধুর স্বপন" সফল হইতে চলিয়াছে—বাঙ্গালীর সুদিন উপস্থিত। আজ বাংলার জননী তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হাস্যমুখে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া বাঙ্গালীর মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচাইতেছেন। আর বাঙ্গলী নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজার জন্য, সত্যের জন্য, দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছেন, এ সকল স্মরণ করিলেও মৃতপ্রাণ জাগিয়া উঠে। (সঞ্জীবনী)

বায়স্কোপ,—এদেশে বায়োস্কোপের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। না পাইবে কেন? যে বাঙ্গালী অর্থ এবং সুসংস্কার অভাবে গৃহপরিবারে শৃঙ্খলা স্থাপনে অক্ষম, সেই বাঙ্গালী অসার তরল—এমন কি কদর্য্য আমোদের জন্য অতি কষ্টের অর্থও স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিতেছে। সাধারণের রুচির অনুকূল কতকগুলি ইউরোপীয় চরিতের বীভৎস দৃশ্যই অধিকাংশ বায়োস্কোপে প্রদর্শিত হয়। এই দৃশ্য দর্শনে একদিকে যেমন লোকে মনে করিতেছে বুঝি ইংরাজ চরিত্রই এইরূপ; অপর দিকে ঐ সকল দৃশ্য পুনঃ পুনঃ দর্শনে অজ্ঞাতসারে জনসাধারণের মধ্যে এমন বিষাক্ত ভাব প্রবেশ করিতেছে যে, তদ্দ্বারা চরিত্রের পতনকে সহজ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যাহাতে এই স্রোত আবাধে বৃদ্ধি পাইতে না পারে। বায়োস্কোপের দ্বারা উভয় জাতির পক্ষেই অকল্যাণসাধন করিতেছে।

স্বপ্ন—রাজসাহী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র রংপুর-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ দের মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র জলে ডুবিয়া মারা যাইতেছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে পত্র লেখেন এবং পরে টেলিগ্রাম করেন যেন পুত্র পদ্মায় স্নান করিতে না যান। দুই তিন দিন পুর্ব্বে স্নেহময়ী মাতার ঐরূপ পত্র এবং টেলিগ্রাম পাইয়াও যুবকটি বন্ধুগণের অনুরোধে, গুরুজনের আজ্ঞার মূল্য সম্বন্ধে বিষম ভ্রম বশত ২৬শে জুলাই বুধবার পদ্মা নদীতে স্নান করিতে যায়। এবং প্রবল স্রোতে ভাসিয়াজলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যে ঘটনা আসিতেছিল মাতার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া তাহার ছায়া পড়িয়াছিল। (কমিং ইভেণ্টস কাষ্ট দেয়ার স্যাডোজ বিফোর) দেশীয় ভাবে বলা যায়—প্রীতির যোগে মাতারা অনেক সময়ে দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েন সর্ব্বজ্ঞের চরণে

প্রীতির কাতরতায় হৃদয় মিলনের ক্ষণে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সময়ে সময়ে আসিয়া পড়ে। (এডুকেশন গেজেট)

রেলগাড়ীতে ধূমপান ও আইন। ধূমপানের স্বাস্থ্য-হানিকর কুঅভ্যাস ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। রেলগাড়িতে উঠিয়াই অল্পবয়স্ক বালক হইতে অতিবৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনেক যাত্রীই ধূমপান করিতে সুরু করিয়া থাকে, ইহাতে অন্যান্য সহযাত্রীগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ধূমপায়ীরা সাধারণত যে পরিমাণে ধূমপান করে, রেলগাড়ীতে কোথাও যাইতে হইলে সেমাত্রা বিশেষ বাড়িয়া যায়। অনেকে যাত্রা সুখকর করার জন্য পূর্ব্ব হইতে সিগারেট, সিগার বা তামাক ইত্যাদি অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অপরের অসুবিধা ঘটাইয়া রেলগাড়ীতে ধূমপান যে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এবং এই আইন ভঙ্গ করিলে যে দণ্ড হইতে পারে এ কথা জানা না থাকাতে ধূমপায়ীরা সহযাত্রীদের কষ্টভোগ করাইতে দ্বিধা বোধ করে না। সহযাত্রীরাও অজ্ঞতাবশত, কষ্ট হইলেও কিছু বলিতে সাহস করেন না, মনে করেন যে ধূমপায়ীরাও যখন সমান অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়াছে, তখন আমাদের নিষেধ করিবার কি অধিকার আছে। অসুবিধা হইলে রেলগাড়ীতে যে কোন যাত্রীই অপর যাত্রীর ধূমপান বন্ধ করিয়া দিতে পারেন তাহা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে আইনের নিম্নলিখিত ধারা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

Any person smoking without the consent of his fellow passengers, in a compartment or in a carriage not specially provided for the purpose is liable to a fine which may extend to *Twenty Rupees*. Any person who persists in so smoking after being warned to desist may be removed by any Railway servant from any such carriage and from the premises of the Railway. (Sec. 110 of Ry. Act.)

"কোন যাত্রী অপর সহযাত্রীর অমতে রেলগাড়ীর মধ্যে (নির্দ্দিষ্ট গাড়ী ব্যতীত) ধূমপান করিলে, তাহার ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যদি কোন লোক নিষেধ করা সত্ত্বেও ধূমপান করিতে থাকে তাহা হইলে রেলের যে-কোন কর্ম্মচারী তাহাকে গাড়ী হইতে এমন কি ষ্টেশন হইতেও বাহির করিয়া দিতে পারিবে।"—ইহাই উক্ত আইনের মর্ম্ম।

বিভিন্ন রেলের Time Tableএর নিয়মাবলীর মধ্যেও এই বিধি লিখিত আছে। ধূমপায়ীরা যেন এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং অপর যাত্রীর অসুবিধা না

ঘটাইয়া রেলপথে ভ্রমণ করেন। কলিকাতার ট্রামেও সাম্‌নের দুই সারিতে ধূমপান নিষিদ্ধ, সেদিকেও ধূমপায়ীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। (স্বাস্থ্য সমাচার)

বাঙ্গালীর এত রোগ কেন—এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ মনে লাগিয়াছে। আমরা সেই প্রবন্ধের কতক অংশ প্রকাশ করিলাম—

"কেন এমন হইল? বঙ্গদেশে এত রোগের বৃদ্ধি হইল কেন? এই যে তোমার আশে পাশে এত লোক—উহাদের স্বাস্থ্য সম্পদের গর্ব্ব কোথায় গেল? বাঙ্গালীর শরীর এমন ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িল কেন? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এসিডিটি ও ডায়েবিটিসের প্রভাব কেন? ইহার উত্তরে তোমরা যাই বল না কেন, আমাদের মনে হয়—এ রোগ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ—দেশোচিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন।"

"এখন আফিস আদালত, দোকান পসার, হাট বাজার সমস্তই মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। সূর্য্যের দীপ্তি যত বৃদ্ধি পায়—লোকের শারীরিক পরিশ্রমও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে! কর্ম্মক্ষেত্রের তাড়নায় লোকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক না হইতেই আহার করিতে বাধ্য হয়। এই পূর্ব্বাহ্নে আহার—অম্ল ও অজীর্ণ রোগের কারণ নয় কি?

তারপর বিশুদ্ধ বায়ু। বাঙ্গালীর দেহে আর বিশুদ্ধ বায়ুর স্পর্শে আনন্দ-পুলক সঞ্চার করে না। মধ্যাহ্নের কিরণ-সন্তপ্ত প্রভাবের সময়—বাঙ্গালীকে জুতা, মোজা, গেঞ্জী, জামা, চোগা চাপকান পরিয়া আহারের অব্যবহিত পরেই—কর্ম্মভূমে প্রবেশ করিতে হয়। বস্ত্রস্তূপের গরমে দেহ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে! এ অবস্থায় পরিপাক যন্ত্রটা কতদূর উদ্বেল হইয়া পড়ে, তাহা আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাত্রের আহারেও ঐরূপ গোলযোগ! সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কুপিত পিত্তের প্রসাদে নৈশ আহার অম্লাজীর্ণ বিষে পরিণত হয়। তাই এখন বাঙ্গালীর দেহে—এত অজীর্ণ এত উদরাময়, এত গ্রহণী, অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধতার প্রাদুর্ভাব।" (মাসিক-সম্মিলনী)

খাদ্য-বিচার। প্রধানত যাহারা আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা চঞ্চল, হাস্যপ্রিয় উৎফুল্ল ও অব্যবস্থিত চরিত্রের হয়। দেড় পোয়া দুধ ও এক পোয়া খেজুর মিশাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যহ একই রকম খাদ্য আহার করিলে শরীরের ভাল রকম পুষ্টি হয় না। যাহাদিগের সহজে সর্দ্দি হয়

বা ঠাণ্ডা লাগে তাঁহাদিগের অধিক লবণ খাওয়া উচিত নহে। এক গ্লাস গরম দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজক ও বলকারক পদার্থ আর নাই। যাঁহারা অধিক আহার করেন তাঁহারা দীর্ঘজীবী হন না, পরিমিত আহার ও আহারের সময় খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। শাকসব্জীতে যে লবণ আছে তাহার জন্যই উহা উপকারী। সেজন্য তাহা জলে সিদ্ধ না করিয়া বাষ্পযোগে সিদ্ধ করিয়া আহার করিতে হয়। কলার মধ্যে অনেক শর্করা আছে বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। সাধারণ কলায় ৬ ভাগ মেদ ও ৮৯ ভাগ শর্করা আছে। (ঐ)

তোমার পথ

বাসনার দীপ নিভায়ে তোমার
ধেয়ানে রহিব আমি,
সে পথ আমায় দাও নাই জানি,
হে মোর জীবন-স্বামী!
বাসনা-প্রদীপ-পঞ্চ জ্বালায়ে
বাঁধিয়া গগনতল,
আরতি তোমার নহে নহে প্রভু,
সে যে আরতির ছল।
বিরাটের সনে রাখি আপনারে
যেন ভবে আমি থাকি,
দেওয়া ও নেওয়ার মাঝখানে প্রভু,
যেন তোমারই ডাকি।
তুমি যা দিয়েছ তাই যেন পাই
তার বেশী মোর নয়,
তোমায় স্মরিয়া যাহা পাই আমি
তার বাড়া দুখময়!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

সহযোগী অর্চ্চনা

সহযোগী "অর্চ্চনা" শ্রাবণ সংখ্যায় "কুশদহ"র প্রতিকূলে অন্যায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আষাঢ় সংখ্যা কুশদহে তাহার একটু প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সহযোগী পুনরায় আশ্বিন সংখ্যায় তাহার উপর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহার উপর আমাদের আর কিছু না বলাই উচিত ছিল, কেন না, আমরা জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে করিতাম, মানুষের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করিলেই বুঝি মানুষ তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখন কার্য্যতঃ দেখিতেছি, তাহা নয়; এই যে মানুষের সম্মুখে অহর্নিশি সত্য প্রকাশ হইতেছে মানুষের কর্ণে কোটীকণ্ঠে সত্য ঘোষিত হইতেছে, তবু-ত মানুষ সে সত্য গ্রহণ করে না; কারণ সত্যগ্রহণের উপযোগী অবস্থাও ক্ষমতা তাহার থাকা আবশ্যক। তাই মনে করিয়াছিলাম আর কাগজে-কলমে লিখিয়া কি হইবে? যদি কখনো সুযোগ ও সুবিধা পাই, দুটি কথা সহযোগী অর্চ্চনা সম্পাদকের পায় ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব—কিন্তু তাহা হইলে একটি অন্যায় হয় এই যে, পাঠক-পাঠিকাগণের মনে ভুল ধারণাটি রহিয়াই যায়। এইজন্য আবার সাদার উপর কালি দিয়া কিছু বলিতে হইল। তবে সকল কথা উল্লেখ করিবার স্থানাভাব; কেবল আসল কথাটাই বলিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ ইহার বিচার করিবেন।

সহযোগী বলিতেছেন, "আংটীর মূল্য" গল্পটি 'অপহৃত' কারণ সমাজপতি মহাশয়ের "বাঘের নখ" গল্পের সহিত উহার মিল আছে। মিল আছে সত্য;— তাহা হইলেই কি 'অপহৃত' হয়? এমন কি প্রায়ই হয় না? সুবিখ্যাত লেখকগণের অনেক লেখার সঙ্গে অন্যের অনেক লেখায় যে মিল হইয়া যায়, অথচ বাস্তবিক তাহা অনুকরণ বা 'অপহৃত' নয়। এস্থলে তাহার একটুও কিন্তু না করিয়া একেবারে সাফ্ 'অপহৃত' কথাটি ব্যবহার করা—আগেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা— ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের সম্বন্ধে সহযোগীর কিরূপ ধারণা! আমরা বলিতেছি, 'আংটীর মূল্য' গল্পের লেখক আমাদের বিশেষ পরিচিত-বন্ধু; আর আমরা জানি যে, বাস্তবিক তিনি "বাঘের নখ" গল্প অবলম্বন করিয়া অথবা উহার ভাব লইয়া "আংটীর মূল্য" গল্প লেখেন নাই। তবে দুই একস্থানে ভাষায় একটু আধটু মিল আছে বটে। আশ্বিনের প্রতিবাদে সহযোগী যেখানে মিল দেখিয়াছেন কেবলমাত্র সেই স্থানটুকু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের মনে আরো ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সহযোগীর ভ্রম মৌলিক ব্যক্তিত্বের উপর। কতদূর অহংকৃত হইয়া—আপনাকে কতখানি বড় করিলে তবে একজন

ভদ্রলোককে পরিস্কাররূপে "চোর" (অপহারক) বলা যায় ? ইহাতে কতদূর অপরাধ হয়,—"বিবেকী" না হইলে সে কথা কখনই বুঝিতে পারে না। এই শ্রেণীর জীবদিগকে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

এবার ই, বি, এস, রেলওয়ের সেণ্ট্রাল বিভাগে ট্রেণের সময়পরিবর্ত্তনে প্রাতে ৪-৪৮ মিনিটের ট্রেণখানি একেবারে উঠিয়া গিয়া আমাদের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। যদি গোবরডাঙ্গা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রাতেই বনগ্রামে বা ১০টা ১১টার সময় কোর্টে গিয়া কোন কাজ করিতে হয় তবে তার উপায় নাই। সুতরাং পূর্ব্বদিন গিয়া থাকিতে হইবে, এ-কি সহজ-সম্ভব ? তারপর ৯-১৭ মিনিটের খানিও বনগাঁ লোকাল হইয়া খুল্‌না যশোহর পৌছিতে কিছু অসুবিধা যে না হইয়াছে এমন নয়। ফলতঃ প্রাতে একেবারেই ট্রেন না থাকা খুব অসুবিধার বিষয় হইয়াছে। আশা করি এ অসুবিধার কথা বুঝিয়া রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র এ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার পরিমাণ অনুসারে টাকা নাই; সুতরাং প্রত্যেক ওয়ার্ডের কমিশনারগণ আপনার বাড়ী মজুর খাটাইতে হইলে যেমন যত্ন করেন তদ্রূপ খাটিয়া খুটিয়া রাস্তাগুলির কার্য্য করাইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে এবং কাজও ভাল হইতে পারে। এবার কোন কোন ওয়ার্ডে বিশেষত ২নং ওয়ার্ডে রাস্তার কার্য্য তদ্রূপ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

চন্দনপুর হইতে শ্রীযুক্ত হাজারীলাল মিশ্র লিখিয়াছেন, চন্দনপুর-নিবাসী পরলোকগত হরিপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিজয়গোপাল রায় (অমিশ্র অঙ্কে) এম, এস, সি, পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিজয়বাবুর জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল রায় গতবারে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জয় ও বিজয়বাবু চন্দনপুর-নিবাসী সাহিত্যিক কবি শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়ের কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয়। এই সংবাদটি চন্দনপুরের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,

ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায় ?

অষ্টম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৩ { সপ্তম সংখ্যা

আরতি

(খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি)

জয়মাতঃ জয়মাতঃ।—নিখিল জগত প্রসবিনী, অভয়ে, ভবভয়-বিনাশিনী, সঙ্কটবারিণী।

জগদ্ধাত্রী, ত্রাণকর্ত্রী, পাপহর্ত্রী, ক্ষেমঙ্করী; কৃপাময়ী, সর্ব্বারাধ্যে সুরেশ্বরী; মহাবিদ্যে—মা শঙ্করী।

ভবেশী ভবরাণী, ব্রহ্মসনাতনী, চিন্ময়ী জগত্তারিণী; মহালক্ষ্মী, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপিণী, দিব্যজ্ঞানপ্রণোদিনী; অন্নদে, বরদে, জ্ঞানময়ী, বাগ্বাদিনী; ঈশ্বরী, সচ্চিদানন্দরূপিণী; অন্তরযামিনী; ভকতবৎসলা, মহেশী, বিমলা, দেবী পরাৎপরা, দুঃখহরা, কূলদায়িনী।

কালরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, অনন্তগুণধারিণী; সর্ব্বজ্ঞে, তেজোময়ী, ন্যায়দণ্ড-বিধায়িনী; ভৈরবী, শূরাসুরবিমর্দ্দিনী, ভীষণা, রুদ্ররূপিণী।

মহাশক্তি, জয়! ভগবতী, তুমি প্রচণ্ডপ্রতাপশালিনী, রাজরাজেশ্বরী, অতুলবিভাবতী, বিপুলবীর্য্যধারিণী; অরূপা পরেশী, বিজ্ঞানঘনরূপিণী; দেবমাতা, বিশ্বজনবন্দিনী; রিপুকুল অন্তকারিণী; দানবদলনী, পতিতপাবনী, তব পদ ভয়ে, হুঙ্কারে, কাঁপে মেদিনী।

শুভদাত্রী, আদ্যাশক্তি, অনাদ্যে, অম্বিকে, অম্বে; দয়াময়ী, জগদীশ্বরী, জগদম্বে; কল্যাণী, শক্তিপ্রদায়িনী শিবে; করুণানয়না, প্রসন্নবদনা, তুমি মহাসতী গুণবতী, বিশ্বমোহিনী।

বরাভয়দায়িকে, ত্রিতাপনাশিকে, সুখদে, সর্ব্বার্থসাধিনী; দুর্গতিহারিকে, কালকলুষান্তিকে, চিদঘনানন্দবরণী; সন্তানপালিনী, জীবনতোষিণী, ওমা নিরুপমা, মনোরমা, মোক্ষদায়িনী।

ইচ্ছাময়ী, যোগেশ্বরী, শুদ্ধিমুক্তিবিধায়িনী; পুণ্যদে, মঙ্গলে, হিতকারিণী জননী; জ্যোতির্ম্ময়ী, দিব্যজ্যোতির্ব্বিকাশিনী; প্রাণদাত্রী, নিত্যানন্দপ্রবর্দ্ধিনী; সন্তাপহারিণী; অধমতারিণী, পতিতোদ্ধারিণী, তুমি নিরাকারা. সারাৎসারা, বহুরূপিণী।

নমোবিশ্বন্তরে, ভক্তচিত্তহরে, সুর-নর-হৃদিবিহারিণী; সুরূপা, সুলোচনা, প্রফুল্লবদনা, আনন্দময়ী, সুহাসিনী, দিব্যাঙ্গী, সুধাময়ী, প্রিয়ভাষিণী, বিনোদিনী; সুলাবণ্যা, সুন্দরী, জগন্মোহিনী; প্রেমদা, প্রেমোদিনী; প্রেমদাসে মাতঃ কর আশীর্ব্বাদ, তব শ্রীচরণে প্রণমি লুটায়ে ধরণী।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

(ব্রহ্মসঙ্গীত, ৩০৭ পৃঃ)

পূজার উপহার

পূজার অবকাশ কালটুকু কুশদহ সম্পাদক কি ভাবে কোথায় অতিবাহিত করিয়া আসেন তাহার পরিচয় প্রায় প্রতিবারেই প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে দেওয়া হয়। এবারেও দিব। তবে এবারে কিছু বিশেষ। তাই প্রবন্ধের নাম "পূজার উপহার" দেওয়া হইল। হে আমার প্রিয় স্বদেশবাসি পাঠক পাঠিকাগণ! দাসের উপহার গ্রহণ করিবেন কি?

কত রকমে আপনারা দাসের পরিচয় পাইয়াছেন, পরিচয় বাহিরের কেবল নয়—হৃদয়ের, বিশ্বাসের। তাই আজ হৃদয় খুলিয়া উপহার লইয়া আনন্দের সমাচার লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি, যদি আর কিছু নাই লন, আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিবেন তো?

আনন্দময় আনন্দ দানের পূর্ব্বে কখন কখন বিষাদের ছবি আঁকেন। বারি-ধারাকে মেঘের মধ্যেই রাখেন। এবার সপ্তমীপূজা ১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

১২ই তারিখে আশ্বিন সংখ্যা কুশদহ ছাপা শেষ করিয়া দিবেন এইকথা বলিয়া ছাপাখানায় কপী দেওয়া হয়। কিন্তু ছাপা শেষ হইল ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায়। সপ্তমীর দিন অপরাহ্নে দপ্তরীর ঘর হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিল। পূজার মধ্যে ছাপা হইয়াও কাগজ গ্রাহকগণের হাতে দিতে পারা গেল না, এজন্য মনে বড়ই কষ্ট হইল।

এইখানে একটা আমিত্বের কথা বলিতেছি, সকলে ক্ষমা করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মনে এইরূপ একটা ভাব আসিয়াছিল; এভাবে জীবন কাটানো আর চলে না। কেবল কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া আছি; সে উচ্চ জীবন কই? সে জাগ্রত বিশ্বাস, সে দৈববল—যাহার আদর্শ জীবনে এক সময় দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা তো আজো পাওয়া হয় নাই! এখনো ধর্ম্মান্দোলনে মন আন্দোলিত হইতেছে। বিশ্বাসের স্থির ভুমিতে মন এখনো দৃঢ় হইয়া বসিতে পায় নাই। প্রাণে ভক্তির ভাব কই! সে জীবন কই! এমন সময় শুনিলাম, "এবার পূজার বন্ধে গিরিডিতে 'নববিধান বিশ্বাসী সমিতির' একাদশ অধিবেশন হইবে।"

"নববিধান বিশ্বাসী সমিতি" জিনিষটা কি? আমি আপনাদের তাহা কিরূপে বুঝাইব, সেটাই আমার পক্ষে বড় ভাবনার কথা! তবে একথা বোধহয় খুব দুর্ব্বোধ নয় যে, যদি এক ভাবাপন্ন অনেকগুলি লোক (নর নারী) কোথাও একত্রিত হন তবে একটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার হয়। সুতরাং সমবিশ্বাসী সমিতির অধিবেশন ব্যাপারটা যে কি, তাহা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর নারী অনুভব করুন।

এই সুসমাচার শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণে স্বর্গের বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহা মেলায় যোগ দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সস্ত্রীক এই মহা মেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

সমিতিতে অবস্থান আহারাদির ভার সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুই জনের গাড়িভাড়া ইত্যাদী কিরূপে হইবে? জানি কাঙ্গালের ঠাকুর সকলই যোগাইয়া দেন। এক্ষেত্রে তাহাই হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহাশয়দিগের জন্য যে কয়েকখানি টিকিট সমিতি দিয়াছিলেন, এ কাঙ্গালের জন্যও একখানির ব্যবস্থা হইল। তাহাতে আমার মনে হইল, দাসের পারের কড়ি তিনি তো দিয়াই রাখিয়াছেন।

১৯শে বৃহস্পতিবার হইতে ২২শে রবিবার পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন। ২৩শে সোমবার গিরিডি নববিধান মন্দিরের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব। ২৪শে শেষ উপাসনা এবং মহারাণী কুচবেহার রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর কথকতা, ইত্যাদি

নির্দ্ধারিত হয়। ১৮ই মহাঅষ্টমীর দিন গিরিডি যাইবার দিন ধার্য্য ছিল। কলিকাতার যাত্রি যাঁহারা একখানি গাড়ি (ক্যারেজ) রিজার্ভ করিয়াছিলেন, আমরাও সেই সঙ্গী হইলাম। আমাদের অন্যান্য অভাবও আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ হইয়া গেল।

আমরা আহারাদি করিয়া বাসাবাটী কুশদহ কার্য্যালয় গুছাইয়া ৫টার সময় হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়িভাড়ার জন্য ১৲ টাকা রাখা হইয়াছিল কিন্তু জানা গেল একটি সমবিশ্বাসী বন্ধু কিছু শারীরিক অপটু আছেন, তাঁহাকে আমাদের গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমরা যাইবার পথে তাঁহাকে লইলাম। তিনি দয়া করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক গাড়িভাড়া দিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দেখি সম্মুখে সুবিখ্যাত জুয়েলার "মেসার্স ঘোষ এণ্ড সন্সের" প্রোপ্রাইটার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমৃতলাল ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ নীতিলাল প্রমুখ যুবকগণ। তাঁহারা একদল বাহক স্থির করিয়াছিলন, তাহারাই সমস্ত লগেজ গাড়িতে লইয়া গেল। ৬নং প্ল্যাটফরমে গিয়া দেখি সমবিশ্বাসী নর নারীগণে পূর্ণ; হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

আমরা যথা সময়ে গাড়িতে উঠিলাম। মধ্যের কম্পার্টমেণ্টে মহিলাগণ, আর দুই পার্শ্বের একদিকে যুবকগণ আর একদিকে প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—এমন কি অশিতিপর অন্ধ প্রায় বৃদ্ধ জনৈক প্রচারক পর্য্যন্ত বসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। অনেকের নিকটেই কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রী ছিল, কয়েকটি কুঁজায় শীতল পানীয় জল ছিল। ক্রমে খাদ্য সকল আদান প্রদানের মধ্যে সেবানন্দের এক তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। আমাদের গাড়ি খানি পার্শেল এক্সপ্রেসের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং ৪।৫টি বড় বড় ষ্টেশনে থামিয়াছিল মাত্র। প্রত্যেক ষ্টেশনে গরম চা ও খাবার যিনি খরিদ করিতেছেন তিনি অন্যকেও দিতেছেন। সকলের প্রাণ যেন আজ উদার উন্মুক্ত।

রাত্রি ২-৩০ মিঃ কিম্বা ৩ টার সময় মধুপুরে আমাদের গাড়ি কাটিয়া দিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল, ভোর ৫টায় আমরা গিরিডি পৌঁছিলাম।

৫।৬টি বাড়িতে এবং অমৃত বাবুর "তৃপ্তিকুটিরে" অধিকাংশ পুরুষদিগের, ৩।৪টি বাড়িতে এবং বৃহৎ "দ্বারকা ভবনে" মহিলাদিগের অবস্থান ও রন্ধনশালা, ভোজনাদির স্থান হইয়াছিল। একটি বন্ধু সস্ত্রীক (এমন কি তাঁহার ৮ম, ১০ম ও দ্বাদশ বর্ষিয় পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত) ভাণ্ডারের ভার রন্ধনালয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইয়া তৎসহ যুবকগণ মিলিয়া ২বেলায় ৩০০ শতাধিক নর নারীর আহারীয় পরিবেশনাদি করিয়া ৭দিন পর্য্যন্ত যে রূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

১৮শে আশ্বিন প্রাতে শ্রীযুক্ত অমৃত বাবুর 'তৃপ্তিকুটিরে' সমবেত উপাসনা হইল। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি এবং প্রারম্ভিক উপাসনা হইল। সমিতির অধিবেশন স্থান ব্রহ্মমন্দিরেই হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৭দিন আমরা স্বর্গের পবিত্র মিলনানন্দে উপাসনা, আলোচনা এবং কীর্ত্তনাদিতে বিশ্বজননীর প্রচুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম। শরীরের জন্যও সুস্বাদু পবিত্র বৈরাগ্য অন্ন প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাসী মণ্ডলী মায়ের সন্তান রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। জননীর স্নেহ প্রেম দেখিয়া কেহ কেহ পাগল প্রায়, কেহ কেহ মত্ত, কেহ কেহ শিশুত্ব লাভ করিয়া সকলে আনন্দে নাচিলেন, গাহিলেন, কাঁদিলেন এবং কাঁদাইলেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা কি মনে করিতেছেন আমি উপন্যাস পড়িতেছি?—না কবিতা আবৃত্তি করিতেছি, কিম্বা কল্পনায় একটা ভাবের কথা আপনাদিগকে শুনাইতেছি? বাস্তবিক, যখন সংসারের চারিদিকে চাহিয়া দেখি, তখন ঐরূপই মনে হয় বটে; এই ঘোর কলিযুগে যাহারা স্বর্গের কথা বলে, তাহারা কি তাহা সত্য বলে! কিন্তু আপনারা যে যাহাই মনে করুন না কেন, আমি কিন্তু ঠিক কথা বলিতেছি। আমরাও এই সংসারের জীব, ঘোর কলিযুগের মানুষ; কত সময় হয়তো সেইরূপ মলিন হইয়া পড়ি, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের সংবাদ এই যে, জননী নিজগুণে এবার এই অদ্ভুত লীলা করিতেছেন। কেবল বিশ্বাস করিতে পারিলেই জননী কৃপাগুণে ঐ সকল স্বর্গের সুখ দেন। আমাদিগকে পরিবর্ত্তিত মানুষ করিয়া ফেলেন,—ফেলিতেছেন!

এই বিশ্বাসী সমিতির আর একটি আসল কথা এখনো বলা হয় নাই। পৃথিবীতে ধর্ম্মের লীলা-বিধান যুগে যুগেই হইয়া আসিতেছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি মহাসত্য কথা এই যে, পাপী মনুষ্য কখনো আপনার পরিত্রাণের উপায় আপনি বিধান করিতে পারে না। সে বিধান বিধাতাই করেন। মানুষ যেমন নিজ দেহের উৎপত্তির কারণ নিজে নয়, প্রথম জন্মের বিধান যিনি করেন, তিনিই মানুষের এই যে দ্বিতীয় জন্ম—দ্বিজত্ব লাভ, তাহার উপায় সেও তিনিই করেন। বিধাতা বিধান পাঠান, কিন্তু মানুষ—বিশেষতঃ সাধারণ মানুষ আমরা তাহা বুঝি কখন, স্বীকার করি কখন? যখন তাহার মধ্যে অলৌকিকক্রিয়া দর্শন করি। তাই বুঝি প্রত্যেক বিধানে কিছু কিছু অলৌকিকক্রিয়ার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের বিচার করিবার স্থান ইহা নয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক যে, আধ্যাত্মিক অলৌকিক ক্রিয়া,

তাহারই দুই একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম অলৌকিক ক্রিয়া পাপীর উদ্ধার। জগাই মাধাই উদ্ধার, সল্ পল হওয়া, উমর খলিফা হওয়া। দ্বিতীয় অলৌকিক ক্রিয়া লক্ষপতির মুকুট ফকিরের চরণে লুটানো, রাজপুত্রের ভিক্ষা-পাত্র গ্রহণ। ধনী কাঙ্গাল সাজে সাজা। এই ক্রিয়া সকল বিধানে হইয়াছে। এবারও হইয়াছে, এখনও হইতেছে। দেবেন্দ্রনাথও একদিন ফকির সাজিয়াছিলেন। নববিধান সমিতিতে ঐরূপ এক দৃশ্য দেখিলাম!

কুচবেহার রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী এবার এই সমিতি এবং উৎসবের কার্য্যভার বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই দিবস উপাসনা, দুই দিবস সভা-নেত্রীর কার্য্য, দুইদিবস কথকতা করিয়াছিলেন; ইহা কেবল বাহিরের একটি কার্য্য সম্পাদন নহে। বোধ হয় ভারতবাসী—ভারতবাসী কেন, জগদ্বাসী সকলেই জানেন, পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি এখন মহারাণীর কার্য্যভার হইতে অবসৃত হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই কি জানেন তিনি এখন কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন? তাই গিরিডিতে ঐ যাহা দেখিলাম তাহাই আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। তিনি এখন তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পদানুসরণ করিয়া নববিধান বিশ্বাসী মণ্ডলীর —সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের, এবং পরমপিতার পুত্রকন্যাগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আজ প্রায় দুই বৎসর তিনি সেবিকা ব্রত গ্রহণ করিয়া মহারাণী হইয়াও কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীদিগের সঙ্গে সেবাব্রত পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণ যে কতদূর বিনীত নম্র এবং ভক্তি বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমি সকলকে কেমন করিয়া বুঝাইব। তিনি ভক্তিতে কাঁদিলেন, মণ্ডলীকে কাঁদাইলেন। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগৎ জননীর করুণার কথা কতই বলিলেন, তিনি আরো বলিলেন, "হে মণ্ডলীর ভাই ভগ্নিগণ, এখানে আপনারা সকলে আছেন। আমার পিতার ধর্ম্মবন্ধু সঙ্গী প্রচারকগণ—যাঁহারা আমার ভক্তিভাজন তাঁহারাও কেহ কেহ আছেন, আজ আপনাদের কাছে আমার প্রাণের কথা গোপন রাখিতে পারিতেছি না, আপনারা সকলেই জানেন, পৃথিবীতে আমার কামনার কি আছে? সম্মান তাহাও আমি কতদূর পাইয়াছি—মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নিকট পর্য্যন্ত, কিন্তু এ ভগ্ন-হৃদয় কি তাহাতে শান্তি লাভ করিতে পারে? এখন জননীর সুকোমল চরণতল ভিন্ন? আর যে আমার স্থান নাই। আর যে আমার কাজ নাই; ব্রহ্মানন্দের রক্ত আমাতে আছে—আমি কি তোমাদের সেবার অধিকারিণী হইতে পারিব না।"

মণ্ডলীও তাঁহার ভক্তি বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া সেই যিনি বিশ্ব-জননী আবার তিনিই কেশবচন্দ্রের "বড্‌ড ভাল মা" তাঁহারই মহিমা দর্শন করিয়া ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতাতে ভাসিতে লাগিলেন। সকলে একপ্রাণ হইয়া এক সুরে জগত জননীর জয়গান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

২৫শে আশ্বিন আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন। গিরিডি স্থানটি যেন সংসারের বাহিরে। কোন আবিলতা নাই। মেয়েদের চলাফেরা কদর্য্য সহরের ন্যায় বাধা জনক নহে। গিরিডিতে কেবল বিশেষ লোকদিগের বাস। স্থানীয় সাওতাল নরনারীগণ অনেকটা সহজ মানুষ। তাহারা ঐ স্থানের অনুকূল। আর স্থানটি কেমন তাহা অনেকেই জানেন,—যেমন প্রাকৃতিক মুক্ত স্নিগ্ধভাব, তেমনই স্বাস্থ্যকর। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে পথে তেমন কাদা হয় না।

আসিবার সময় আমার প্রিয় ভ্রাতা গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যো-পাধ্যায় যিনি গিরিডি ষ্টেশন বুকিংক্লার্ক। তিনি ষ্টেশন-কোয়াটরে সপরিবারে থাকেন। তাঁহার বাসায় আমার সহধার্ম্মিনীকে বেলা ৪টার সময় রাখিয়া গেলাম। বধুমাতাটি তাঁহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা চলিয়া আসিলে পঞ্চানন বাবুর বালিকাটি নাকি বলিয়াছিল, "ঠাকুর মা আবার কবে আসিবেন।"

রাত্রি ৯টার পর আবার ঐ রিজার্ভ গাড়িতে আমরা যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতায় আসিলাম।

এক কি তেত্রিশ কোটি*

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

"সেবকের নিবেদন" হইতে গৃহীত

রবিবার, ২১এ আষাঢ়, ১৮০২ শক ; ৪ঠা জুলাই, ১৮৮০।

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে হিন্দুস্থানের প্রাচীন বিবাদ অদ্য মীমাংসা করিতে হইবে। এই দেশে বহুকাল হইতে একটি প্রকাণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সেই সংগ্রামের এক দিকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপর দিকে পৌত্তলিকতা, এক দিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, অন্য দিকে বহু দেব দেবী। এই দুইয়ের মধ্যে যদি সন্ধি

---

* ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বর মানেন, আর কিছুই মানেন না, ইহাই সকলে জানেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মকে কি ভাবে উপাসনা করেন তাহা অনেকেই অবগত নহেন, এজন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাব প্রকাশার্থে উপরোক্ত বিষয়টি 'কুশদহ'তে প্রকাশিত হইল। (কুঃ সঃ (

স্থাপিত না হয়, তবে অকল্যাণ ও অনিষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যত দিন এই সংগ্রাম চলিবে, তত দিন রাজ্যের কল্যাণ নাই, সামাজিক কুশল নাই, পারিবারিক মঙ্গল নাই। ঈশ্বর এক কি তেত্রিশ কোটি? হিন্দুধর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলদেশে যদি নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে দেখি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বসিয়া আছেন। কিন্তু বৃক্ষের শাখা গণনা করিয়া দেখি সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের মূলেতে যদিও একেশ্বরবাদ নিহিত, ইহার পৌত্তলিক শাখা প্রশাখা অসংখ্য। এক দিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, আর এক দিকে দুই নহে, পাঁচ নহে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতা! কিরূপে এদেশে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি অসম্ভব? এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে কি কোন প্রকারে সন্ধি হয় না? অদ্য এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। আর্য্য সমাজের আদিতে এক ঈশ্বর পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল, কালক্রমে যখন পুরাণাদি রচিত হইল, তখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অথবা অসংখ্য দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। আদিতে ব্রহ্মপূজা অন্তে মূর্ত্তিপূজা। এক বীজ হইতে কোটি কোটি শাখা উৎপন্ন হইল। এক কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল? তেত্রিশ কোটি কিরূপে একের মধ্যে ছিল? এ অদ্ভুত তত্ত্ব-সহস্য শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়। কিন্তু এ অপূর্ব্ব কথা কে বলিবে? নববিধান! যেখানে নববিধানের বিজয়-নিশান উড়িতেছে সেইখানেই এই দুই বিরুদ্ধ মতে সন্ধি ও সম্মিলন দেখিতেছি। আর কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, দিতে পারিল না। কেবল নববিধানই ইহার উত্তর দিতে পারেন ও দিবেন। ভারতবর্ষ নববিধানের নিকট এই সুসমাচার শ্রবণ করিবেন!

ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী অনেকে তেত্রিশ কোটি শব্দ শুনিবামাত্র রাগে প্রজ্বলিত হন এবং উহা সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া উহার মূলতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ ও পরিহার করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মপূজা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। হিন্দুদিগের এই যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ইহা অসার খোসার ন্যায় কেবল বাহ্যিক আচ্ছাদন মাত্র, উহার ভিতরে ব্রহ্মস্বরূপের খণ্ড খণ্ড যে সকল ভাবরূপ শস্য নিহিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত সুকৌশলে বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ এখনও পৌত্তলিকতা পরাজয় করিতে সক্ষম হন নাই। নববিধান এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যে ভারতভূমিতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের নিশান

উড়িয়াছে, সেই নিগূঢ় ভূমিতে ঘটনাসূত্রে ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত হইল। এ সকল ঘটনার মধ্যে কি, হে ব্রাহ্ম, তুমি কোন আশ্চর্য্য সত্য উপলব্ধি করিতেছ না? যোগবিহীন চক্ষে এ সকল কেবল অসার পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কার মনে হয়, কিন্তু যখন যোগচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তখন যোগ প্রভাবে ঐ তেত্রিশ কোটির মধ্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তেত্রিশ কোটির প্রত্যেকের ভিতর একটি সত্য আছে, যাহা প্রতি ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়। দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা আমাদের পক্ষে অসত্য ও পাপ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য। কিন্তু মূর্ত্তি পরিহার করিতে গিয়া উহাতে যে ভাব মূর্ত্তিমান্ ছিল তাহা যেন আমরা ছাড়ি না। হিন্দুস্থানে যে অসংখ্য অগণ্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত তৎসমুদায় ব্রহ্মস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও বিভক্ত প্রতিভা মাত্র। দেব দেবীর ভিতর হইতে যদি আমরা নিগূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদেরই ভ্রান্তি, অনিষ্ট ও অকল্যাণ। এক ব্রহ্মেরই ভিতরে তেত্রিশ কোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করিতেছে।

হে ব্রাহ্ম, যখন তুমি আলোক দেখ তুমি আলোককে এক বর্ণ মনে কর; কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান সেই আলোকের এক একটি শুভ্র কিরণের মধ্যে সাতটি চমৎকার বিভিন্ন বর্ণ দেখাইয়া দেয়। সাদার ভিতরে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ থাকে কে জানে? শুভ্র সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে সাত প্রকার বিচিত্র বর্ণ আছে তাহা কি অজ্ঞান চক্ষু দেখিতে পায়, না মূঢ় মন কল্পনা করিতে পারে? যখন বিজ্ঞানবিৎ এক খণ্ড কাচের মধ্যে শুভ্র সূর্য্যকিরণকে প্রবিষ্ট করিয়া বিভাগ করিয়া ফেলেন, তখন তিনি উহার ভিতর সাত প্রকার বিভিন্ন বর্ণ দেখিয়া বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করেন;—"হে ঈশ্বর তুমি ধন্য, তোমার দুরবগাহ্য জ্ঞান কৌশল ধন্য। তুমিই কেবল উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ লুকাইয়া রাখিতে পার।" যেমন একটি শুভ্র বর্ণের মধ্যে লাল নীল প্রভৃতি সাতটি বিচিত্রবর্ণ লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ এক ব্রহ্মের মধ্যে তেত্রিশ কোটি ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। হে হিন্দু, তোমার মহাদেব, তোমার বিষ্ণু, তোমার সরস্বতী, তোমার লক্ষ্মী, তোমার গণেশ কার্ত্তিক, তোমার দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সমস্ত আমার ব্রহ্মের মধ্যে গুণরূপে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, পুরী, গয়া, কাশী, সর্ব্বত্র আমার ব্রহ্মের মন্দির। তোমার দেবালয়ে আমার ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তোমার তেত্রিশকোটি দেবতার তেত্রিশকোটি অঙ্গ একত্র করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তিকাচে পড়িলে কোটি কোটি

বিচিত্র বর্ণে বিভক্ত হয়। আবার ঐ সমুদয় বর্ণ সংযুক্ত করিয়া যোগনয়নে দেখিলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম দৃষ্ট হইবে।

যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ হও তবে, হে ব্রাহ্ম, তুমি বুঝিবে তোমার ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এই হিন্দুস্থানে মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। এ সকল পৌত্তলিক মূর্ত্তি তোমার পূজনীয় নহে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে নিহিত গুণনিচয় তোমার ব্রহ্মেরই, সুতরাং অবশ্য আরাধ্য। ব্রহ্মগুণের অবজ্ঞা পাপ। অতএব তুমি সারগ্রাহী গুণগ্রাহী হইয়া সমুদায় হিন্দু দেবতার যথার্থ ভাব, চরিত্রের বিভিন্ন গুণ গ্রহণ কর। ব্রহ্মকে আদর করিলে ব্রহ্মগুণের আদর করিতে হইবে। যত দেবদেবী, যত সাধু সাধ্বী, যত অবতার সকলের মধ্য হইতে ব্রহ্ম গ্রহণ কর। কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি এ দেশে প্রকাশিত হইত না, কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মের কোন একটি গুণ না থাকিত। অযোধ্যাতে রামের মন্দির হইত না, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মূর্ত্তি হইত না, উৎকলে জগন্নাথের মন্দির হইত না, গয়াতে বুদ্ধদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি এ সকল ব্যাপারের মধ্যে বিচিত্রগুণনিধি ব্রহ্মের এক একটি বিশেষ গুণ না থাকিত।

ভক্ত হিন্দু যখন দেখিলেন তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার দেশে বত্রিশ কোটি দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। তিনি বলিলেন, "এখনও আমার সমুদয় সাধ মিটে নাই। আমি ঈশ্বরের আরও এক কোটি রূপ দেখিতে চাই।" সমুদয় তেত্রিশ কোটি ভাবের সাধন না হইলে হিন্দুর বক্ষে কোন মতেই পূর্ণ শান্তি হয় না। হিন্দুর মন অতিশয় প্রেমিক ও ভক্ত এই জন্য অল্পেতে তাহার ধর্ম্মক্ষুধা মিটিল না। নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ ও ব্রহ্মলীলা দর্শন করিব এই মানসে ক্রমাগত সাধন ভজন করিল, সুতরাং তাঁহার আর অন্ত হইল না। ক্রমে তেত্রিশ কোটি হইয়া পড়িল। মনে করিও না যে উহা এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। তেত্রিশ কোটির অর্থ অসংখ্য। এক নহে, তেত্রিশ কোটি নহে, অসংখ্য ও গণনাতীত। কি অসংখ্য? ঈশ্বর অসংখ্য? না। ঈশ্বর এক। ঈশ্বর কি কখন অনেক হইতে পারেন? তবে তাঁহার লীলা কার্য্য বিচিত্র। অনন্ত আকাশরূপ ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" লেখা রহিয়াছে। মূল এক, শাখা পত্র অনেক। এক ঈশ্বরেতে অসংখ্য ভাব। এক নিরাকার ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার কার্য্যরীতি ও ভাবের প্রকাশ অসংখ্য। হরি এক, হরিলীলা বিচিত্র।

হিন্দুস্থান অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন একটি একটি রূপ

স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিল। এই ভ্রমে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। যাই বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল অমনি ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান পৌত্তলিক হিন্দুস্থান হইল। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আদি সনাতন ব্রহ্মস্বরূপকে সাকার গঠন হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য নববিধান স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু নববিধান কি "মার মার" শব্দ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? না। তিনি বলিলেন;—"দেবভাবে দেবভাবে বিবাদ হইতে পারে না? ঈশ্বর কি আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করিতে পারেন? আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিতে পারেন?" নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম যোগনয়নে দেখিলেন ব্রহ্মাধারে সেই খণ্ড খণ্ড সমুদয় জ্যোতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এক ব্রহ্মে তেত্রিশ কোটি দেবভাব একীভূত হইয়া রহিয়াছে।

হে সাধক, তুমি যদি তেত্রিশ কোটি দিন এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পার, তাহা হইলে তুমি তোমার প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের এক এক নূতন রূপ দেখিতে পাইবে। যে দিন জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর সাধন করিবে সেই দিন তুমি অনেক নূতন সত্য শিক্ষা করিতে পারিবে এবং বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরের লক্ষ্মীভাবের আরাধনা ও পূজা করিবে, সে দিন দেখিবে জগজ্জননী সত্য সত্যই তোমার সংসারের লক্ষ্মী হইয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, ধন ধান্য দিয়া পরিবারের সকল অভাব মোচন করিতেছেন এবং আশ্চর্য্য সুকৌশলে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যে দিন তুমি ঈশ্বরকে শক্তিরূপে পূজা করিবে, সেই দিন তোমার দুর্ব্বল মনে বলের সঞ্চার হইবে। যতই সেই আদ্যাশক্তিকে অন্তরে বাহিরে দেখিবে ততই তোমার অন্তরে বল শক্তি উদ্যম ও তেজ প্রস্ফুটিত হইবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরকে অনন্ত করুণারূপে দেখিবে সে দিন তুমি বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিতেছেন এবং পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিতেছেন। যতই তাঁহার অনন্ত করুণা ভাবিবে ততই তুমি ভক্তিরসে বিগলিত হইবে এবং প্রেমার্দ্র হৃদয়ে নরনারীর সেবাতে নিযুক্ত হইবে। কোন দিন ব্রহ্মের নির্ব্বাণরূপ দর্শন করিয়া মনের সমস্ত চিন্তা জ্বালা ও বাসনানল নিবাতে এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কখন আনন্দস্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া তোমার চিত্ত দুঃখ শোক বিস্মৃত হইয়া অপার হর্ষসাগরে ডুবিবে, তুমি সুখী মাতার ক্রোড়ে সুখী পুত্র হইয়া বসিবে। এইরূপে দশ দিনে দশ প্রকার, সহস্র

দিনে সহস্র প্রকার ভাবে ব্রহ্মারাধনা করিবে, এবং প্রত্যহ নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ দর্শন করিবে। কখন পিতা, কখন মাতা, কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন চিত্তহারী, কখন মনোমোহন কখন অসুর-সংহারক, কখন পাষণ্ডদলন, এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাদের হরি তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন এবং এই বিচিত্র সাধনের নবীনত্ব কখন শেষ হইবে না। এইরূপে তোমরা এক নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে অসংখ্য নিরাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একেতে তেত্রিশ কোটি এবং তেত্রিশ কোটিতে এক অনুভব করেন! এক ব্রহ্মতে তেত্রিশ কোটি, এবং তেত্রিশ কোটির মধ্যে এক ব্রহ্মকে না দেখিলে ব্রাহ্মগণ তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম আস্বাদন করিতে পারিবে না। যদি এক ব্রহ্মেতে তোমারা অসংখ্য মূর্ত্তি না দেখিতে পাও তাহা হইলে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই। সুতরাং তোমাদের দৈনিক প্রার্থনা শুষ্ক নীরস এবং পুরাতন হইবে। যাহাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা একই প্রকার হয় এবং নূতনত্ব ও বিচিত্রতাবিহীন তাহারা এক প্রকার পৌত্তলিক। কেন না তাহারা এক নির্জীব পাথরের ন্যায় দেবতার উপাসক। মৃত দেবতা নড়ে না, একই ভাবে পড়িয়া থাকে তাহাতে জীবন নাই, সুতরাং ভাবেরও পরিবর্ত্তন নাই। যে মৃত দেবতার পূজা করে, সেও মৃত ব্যক্তির ন্যায় নির্জীব হইয়া যায়। মৃত্তিপূজা ছবিপূজা মানুষকে পুতুলের ন্যায় ছবির ন্যায় নির্জীব করিবেই করিবে। যদি যথার্থ ঈশ্বরের উপাসক হও, তাহা হইলে তোমাদের উপাসনা নিত্য নূতন এবং চিরসরস হইবে।

আমাদের ঈশ্বর শুষ্ক মৃত পাথরের ন্যায় নহেন। হে ব্রাহ্ম, তোমার ঈশ্বর নিত্যনূতন। যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্ত্তন ও নবীনতা। যিনি জীবন্ত ঈশ্বর তিনিই কেবল চিরনবীন, তাঁহারই সাধন সদা সরস। তুমি আজ পুণ্যময় হরির পূজা কর, কাল যোগেশ্বরের পূজা কর, তাহার পর দিন ভক্তবৎসলের পূজা কর, এক এক দিন ঈশ্বরের এক এক রূপের সাধন কর। এইরূপ যদি তুমি ঈশ্বরের নিত নূতন রূপ সাধন কর, তাহা হইলে তোমার প্রতিদিনের প্রার্থনা পুস্তকে লিখিত হইলে দেখিতে পাইবে ৩৬৫ দিনে তুমি ৩৬৫ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছ, এবং যদি তুমি তেত্রিশ কোটি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি রূপ দেখিয়া কোটি কোটি ভাবরসে প্লাবিত হইবে। ব্রাহ্ম, তেত্রিশ কোটি দিন অপেক্ষাও তোমার আয়ু অধিক, অসংখ্য দিন তোমার জীবন, সুতরাং ইহকাল পরকালে তুমি ঈশ্বরের

অসংখ্যরূপ দেখিতে পাইবে, এবং অসংখ্য জাতীয় ভাবকুসুম লইয়া তুমি অসংখ্য-রূপধারী ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিবে।

ঈশ্বর এক ; কিন্তু তিনি বিচিত্রলীলারসময় ও অসংখ্য রূপধারী, সুতরাং হে ব্রাহ্ম, তোমার ভাব এক প্রকার হইতে পারে না। যখন তোমার ঈশ্বর জীবন্ত এবং অনন্তপ্রাণ ও অসংখ্যভাবের আধার, তখন তোমার পূজা অর্চ্চনার ভাবও অসংখ্য এবং জীবন্ত হইবে। তোমার দেবতা এক, কিন্তু তাঁহার দেবভাব তেত্রিশ কোটি। পূজা করিবে কেবল এক জনের, দুই জন কি ততোধিক কল্পনাও করিতে পারিবে না, কিন্তু সেই এক দেবতার যত বিচিত্রভাব আছে সমুদয় সাধন করিতে হইবে; নিত্য নূতনভাবে নবীনের অর্চ্চনা করিবে যে অনেক দেবতা মানে সে তো পৌত্তলিক, যে তেত্রিশ কোটি দেবভাব না মানিয়া একখানি মৃত পুরাতন কল্পনার আরাধনা করে সে ব্যক্তিও পৌত্তলিক। হে ব্রাহ্ম, তুমি অপৌত্তলিক হও। তোমার ব্রহ্ম অনন্ত-ভাব প্রসবণ। তাঁহা হইতে অবিশ্রান্ত নব নব দেবভাবের স্রোত বাহির হইতেছে, তুমি সেই স্রোতে প্রাণকে শীতল ও সুখী কর। তোমার দেবতা অশেষ রত্নখনি, তাঁহার ভিতর হইতে বিচিত্র বর্ণের বহুমূল্য ভাবরত্ন প্রতিদিন সঞ্চয় কর, প্রত্যহ নূতন সুরে নূতন ভাবে নূতনের গুণ গান কর এবং তাঁহার বিচিত্রলীলারঙ্গে মত্ত হইয়া নৃত্য কর তোমার ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার দশটি ভাবও ভালরূপে সাধন করিলে না। আলস্য, নির্জীবতা, শুষ্কতা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন অনুরাগের সহিত ব্রহ্মের এক একটি বিভিন্ন রূপনদীতে স্নান কর এবং জীবনেশ্বরের বিভিন্ন স্বর্গলোকের বিচিত্র স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ কর।*

পূজায় গৃহবাস

শারদীয় উৎসব বঙ্গদেশে যেন এক মহাশক্তি প্লাবিত করে। বছরের দুঃখ দৈন্য যাতনা ক্লেশ শোক তাপ নিরাশার তপ্ত-নিশ্বাস অবসান হইয়া জীবনের এক নব পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। বিরহবিধুরা বঙ্গ বধূ প্রবাসী স্বামী

---

* "সেবকের নিবেদন," পুস্তকাকারে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড, এবং ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্‌ কলিকাতা, এই দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সন্দর্শন আশায়—ছাত্রাবাসের রুদ্ধদুয়ার হইতে সন্তানকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিবার আশায় বঙ্গজননী পূজার অবকাশ প্রতীক্ষা করেন। আজ এক মহাচেতনা জাতীয় জীবনে লক্ষিত হয়। রাজবর্ত্মে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে, পথিকের কলরবে আমার নিরাশ হৃদয়েও যেন এক নবআলোক উদ্ভাসিত হইল। ভুলিয়া গেলাম মর্ম্মব্যথা, মুছিলাম আঁখি জল। জন কোলাহল দেখিতে একদিন ষ্টেশনে আসিলাম। ট্রেণে আমার বাল্যবন্ধু 'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাত হইল। অনেক দিনের পর তাঁহার সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলাম "তুমি যে একেবারে বুড়ো হোয়ে পড়েছ।" কথাটি বলিয়াই মনে হইল ভাল করি নাই কারণ দেখিলাম পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ি হইতে অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু আমার কথাটির প্রতিবাদ করিতেছেন। বুঝিলাম বন্ধুবরের নবপরিণীতা ভার্য্যা সঙ্গে আছেন! যাহা হউক কথাটি লইয়া আমরা উভয়ে হাসিলাম। তখন সে কথাটি চাপা দিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাড়ি যাবে না।" "আমি বলিলাম" ইষ্টকের উপর ইষ্টক প্রোথিত করিয়া যে আমাদের বৃহৎ গৃহটি আছে তাহাতে তো আর প্রাণ নাই—প্রেম ও নাই, সেখানে গিয়া কি করিব? তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাসগৃহে ফিরিলাম। কিন্তু কথাটি ভুলিতে পারিলাম না; সত্যই কি সেই পিতৃপুরুষের সেই পুরাতন অট্টালিকায় প্রাণ নাই? তাহার বৃহৎ অবয়বে আমার জন্য এক বিন্দু প্রেম রাখে নাই? তখন মনে হইতে লাগিল, না না মহাভুল বলেছি। ইষ্টকের উপর ইষ্টক সংযোযিত রাখিয়াছে কে—সে কেবল চুণ সুরকী নহে—পিতৃপুরুষের প্রেম। তখন সেই ইষ্টকখণ্ডের ভিতর দিয়া পিতৃপুরুষের প্রেম জীবন্তভাবে আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল। সাধ্য রহিল না আমার, যে সেই মহীয়সী আহ্বান অবহেলা করিতে পারি। শুনিয়াছিলাম যে শ্যামের বাঁশরীর রবে গোপিকা স্থির থাকিতে পারিত না, আমিও সেইরূপ অস্থির হইলাম। পশ্চিমগমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কি এক শক্তি আমার মধ্যে কার্য্য করিতে লাগিল।

বিজয়ার দিবসে সিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিলাম। পূজার ভীড় কমিয়া গিয়াছে। আমি একখানি গাড়িতে একা বসিলাম। তখন বহুবৎসর পূর্ব্বে অধীত আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের সেই বিখ্যাত ছত্রটি মনে পড়িল "I am the monarch of all I survey" দৃষ্টিভূত সমস্ত গাড়িটার আমি একমাত্র সম্রাট্। গাড়ি ছাড়িল, অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন আমি ছাত্রহীন সম্রাট কাজেই

মন একটু চঞ্চল হইল। যাহা হউক সময় কাটাইবার উপকরণ সঙ্গে ছিল তাহাতেই মনটাকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইংরাজি বাংলা সাময়িক পত্রে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। দুইধারে শ্যামল শস্যের উপর মুক্তাফলের ন্যায় বারি বিন্দু পতিত হইয়া যে এক শোভা সাজাইতেছে তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কোথাও দেখি ভীলসুন্দরীগণ বসনাঞ্চল বিস্তার করিয়া মৎস্য ধরিতেছে। নীলনভোমণ্ডল তখনও পরিস্কার হয় নাই। ধুমপান করিবার আশায় দীপশলাকা বাহির করিলাম। দেখিলাম বড় অক্ষরে লেখা আছে "made in japan" আজ এই আনন্দের দিনেও প্রাণটা একেবারে বিষণ্ণ হইল। প্রবল তুফানের ন্যায় যে স্বদেশী আন্দোলন জননী জন্মভূমির উপর দিয়া বহিয়াছিল তাহা কি সুধু "হাসির খেলা প্রমোদের মেলা মিছে কথা বেচা ছলনা।" যে জাতি নিত্য আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য বিদেশের নিকট হাত পাতিয়া থাকে তাহার আশা কোথায়। আমাদের শিল্প-উন্নতি সুধু খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়, বক্তার মুখেই রহিয়া গেল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" আর তো এখন কেহই "মাথায় তুলিয়া" লইতেছে না।

বেঙ্গলী পত্রে সেদিন পড়িয়াছিলাম স্যার ডিনসা পেটিট কাপড়ের কয়েকটি কলের জন্য পাঁচ কোটি টাকার অংশ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। সাত দিনের মধ্যে সমস্ত টাকা উঠিয়া গেল, আর আমাদের বঙ্গদেশ! হায় হায়। সবই বাক্য! বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গে লক্ষ্মী আনিতে পারিতেছে না। যাক্ সে কথা।

বাষ্পীয় শকট যমুনার তীরে আসিল। ভীষণ জল প্লাবনে ক্ষীণতন্বী যমুনার বক্ষ স্ফীত হইয়াছে। শৈশব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যমুনার শৈকতে কত বাল্য ক্রীড়া করিয়াছি, যমুনার কাল জলে কত বন্ধু লইয়া সন্তরণ করিয়াছি সেই ক্রীড়া ভুমি আজ প্লাবনে ভরিয়া গিয়াছে। যমুনা! তোমারই তীরে কদম্ব মূলে শ্যাম বাঁশী বাজাইত, তোমারই তীরে শ্যামের বাঁশরীর রবে গোপিকা নাচিত! যমুনাতীরে শ্যামের বাঁশরীর রব থামিয়াছে কিন্তু যমুনা মৃদু মন্দ পবন হিল্লোলে তাহার কাল জল সঞ্চালিত করিয়া যে গান গাহিতেছে সে এক বিশ্বসঙ্গীত, সে যে মানবের শিক্ষা দান; সে গাহিতেছে "Men may come and men may go, I go for ever.

কাল সাগরে মানব আসিতেছে আর ডুবিতেছে, কিন্তু আমি চিরদিন বহিতেছি?"

বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় আমাকে একদিন বলিয়া-

ছিলেন "আপনাদের গোবরডাঙ্গা ও তার সন্নিহিত গ্রামগুলির নাম হইতে বেশ বুঝা যায় কোন বৈষ্ণব সাধু উহাদের নামকরণ করিয়াছেন।" বস্তুতই তাই যমুনার একপারে 'কানাইয়ের নাট্যশালা,' আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যমুনাতীরে কানাই-নাট্যশালার ঘাটে একটি বৃহৎ প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ। আর অপরদিকে জমিদারদিগের প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে এক বৃহৎ উচ্চভূমি যাহা "পোপিণী পোতা" বলিয়া খ্যাত। "কুশদহ" পত্রে কুশদহের ইতিবৃত্ত অনেক লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু কোন লেখক এই সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারিলে বাংলা দেশের একটি প্রাচীন স্থানের ইতিহাস বাহির হইবে।

তারপর বেলা ৫টার সময় প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে যমুনাতীরে গেলাম। তাম্বুলরাগ-রঞ্জিতা সুবেশাসুন্দরীগণের কলকণ্ঠে ও শিশুগণের আনন্দরবে যমুনাতীর মুখরিত। আর শত শত নৌকা যমুনার কাল জল উছলিয়া প্রবলবেগে চলিতেছে। তখন সান্ধ গগণে পরিশ্রান্ত-অরুণ ক্ষীণজ্যোতি ছড়াইতেছে। স্নিগ্ধ সিন্দুর মেঘমালা যখন নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল—যমুনাসুন্দরী যেন অলর্কে সিন্দুর রাগরঞ্জিতা হইয়া কুলকামিনীগণের রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। সেই কালবরণে সিন্দুর রেখা। আমি তন্ময় হইয়া গেলাম—কে বলে কালবরণে সৌন্দর্য্য নাই। কালবরণ রাধিকাকে পাগল করিয়াছিল! কালকোকিলের কুহু রব হতাশ প্রাণে আশা জাগাইয়া দেয়। বিজ্ঞানের মুখে শুনুন সর্ব্ব বরণের মিলন কালরূপে।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর গৃহে ফিরিলাম। আজ হিন্দুর বড় শুভদিন। আজ বৎসরের কলহ, হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া চিরশত্রুকেও আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতেছে। আজ জাতির অভিমান, বংশের অভিমান, ধনের অভিমান, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, অভিমানের অভিমান ঐ প্রতিমার সহিত বিসর্জ্জন দিয়াছে।

মুসলমান বকরিদ উপলক্ষে এইরূপ সৌহৃদ্য স্থাপন করেন। কিন্তু হায় এই পবিত্র বকরিদের দিনে হিন্দু মুসলমানে কলহ জাগিয়া উঠে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব গ্রাসিনী—তাহার বৃহৎ গ্রাসের মধ্যে বুদ্ধদেব আসিয়া পড়িয়াছেন তিনি অবতারের আসন পাইয়াছেন। এক গো-হত্যাই মুসলমানকে তফাৎ করিয়া ফেলিতেছে। তাহা ভিন্ন আরবের ঋষিও বিশ্বগ্রাসিনী হিন্দুধর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া যাইতেন। হিন্দুধর্ম্ম মুখ ব্যাদান করিয়াছে তাই শুনিতে পাই "যে রাম সেই রহিম, যে মহাদেব সেই মহম্মদ।" এখনও যে মহম্মদ অবতারত্বে উঠেন নাই সেটা হিন্দু

ধর্ম্মের অপ্রসস্ত মুখব্যাদানের জন্য নহে, কিন্তু মুসলমানের গোহত্যার কারণ। হিন্দুধর্ম্মের মুখপ্রসারণ এত বৃহৎ হইয়াছে যে, যে জাতিভেদের উপর হিন্দু সমাজ এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই যে বাবু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যার বিবাহে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনের ন্যায় ত্রি-জাতি মিশিয়াছে তাহাও আজ হিন্দুবিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইল। হিন্দুর মুখপত্র প্রসিদ্ধ "হিতবাদী" উক্ত বিবাহ উপলক্ষে লিখিয়াছেন "উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের বধু গ্রহণ করিলে তিনি হিন্দুসমাজ বা জাতিচ্যুত হয়েন না, কেবল তাঁহাদের সন্তানগণ উচ্চবর্ণ হইতে স্খলিত হয়েন অর্থাৎ তাঁহারা এক পৃথক বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" হিন্দুধর্ম্মের এই সর্ব্বগ্রাসিনী উদারতা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ বিচলিত হইয়াছেন। তাই সেদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে "ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। আমার মনে হয় এই উদারতায় ব্রাহ্মসমাজের ভীত হইবার কিছুই নাই। কারণ ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য হিন্দু কখনও জাতি বা সমাজচ্যুত হয়েন নাই। হিন্দুধর্ম্মের ভিতর উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, পৌরাণিকী প্রতিমাপূজা—এমন কি চার্ব্বাকের নিরীশ্বরবাদও স্থান পাইয়াছে। এতদিন ছিল তোমার ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন—তুমি উপনিষদের ধর্ম্মই মান আর পৌরাণিক ধর্ম্ম মান বা নাস্তিক হও তুমি হিন্দুসমাজের গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিবে যদি তুমি জাতিভেদ মান। আজ যদি জাতিভেদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ের কারণ কোথায় রহিল? হিতবাদীর ভাষায় বলিতে পারি ব্রাহ্মেরা হিন্দু সমাজের আর একটি নূতন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যথা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যাঁহারা মানিয়া চলেন তাঁহারা সাকারবাদী-হিন্দু আর যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত তাঁহারা নিরাকারবাদী-হিন্দু আর যাঁহারা চার্ব্বাক পন্থী তাঁহারা নাস্তিক-হিন্দু!*

যাক্ আমার এত কথায় কাজ নাই। বিজয়ার আনন্দমেলা অবসান হইলে, পর দিবস বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম! ইচ্ছা ছিল স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যা-

* লেখক ব্রাহ্মসমাজের ভয়ের কারণ কোথা হইতে কল্পনা করিলেন, তাহা আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত সি,আর,দাস মহাশয়ের কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদের ভিন্ন কারণ। হিন্দুসমাজের উদারতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক তাঁহার নিষ্ফলপ্রয়াস বা অবান্তর বৃথা বাক্যব্যয় এ প্রবন্ধে না করিলেই ভাল ছিল। অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিবে, এ কথা লেখকের কল্পনাতেই থাক্। (কুঃ সঃ)

রত্নের কীর্ত্তি—তাঁহার সেই বাঁধা ঘাটে যাইব। কিন্তু পরিশ্রান্ত হইয়া আর ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না, বিশেষত ভীষণ বৃষ্টি রাস্তার যেরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহা দেখিয়া আর যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তখন "মঙ্গলালয়ে" প্রবেশ করিলাম। আজ মঙ্গলালয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া মন বড়ই বিষণ্ণ হইল। যেখানে কত সুন্দর পুষ্প ফুটীত আজ সেখানে উলুখড় আমার প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়াছে। এইখানে একটি পাঠালয় ছিল, কত লোকে সেই সকল পুস্তক পাঠে আনন্দলাভ করিত। স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশের কন্যাগণের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁহাদের পিতৃ-কীর্ত্তি যেন বজায় রাখেন।

তারপর ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তিন জন মালিকে উলুখড় কাটাতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত তাহাদের এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে দেখিলাম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সমাধি। সেই পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করিলাম। পরে এই ধার্ম্মিক কর্ম্মী পুরুষের জীবনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তিনি যে দেশে যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া বীরের ন্যায় কত অত্যাচার কত তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করিয়া সত্যং জ্ঞানং অনন্তের পূজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধন্য তিনি যিনি সাধু, ধন্য তিনি যিনি ভক্ত, ধন্য তিনি যিনি স্বদেশপ্রেমিক।

আমার গৃহবাসের দিন সংক্ষেপ হইল। কোজাগর পূর্ণিমার নিশিতে যখন নীলাকাশে পূর্ণ শশধর আনন্দধারা বিতরণ করিতেছিল তখন গ্রাম্য বালকগণ আমাদের গৃহে ভক্ত রাজা অবদানের ভক্তি-কথামৃত চিত্রপটে দেখাইয়া অভিনয় করিতেছিল। সে নর নারী সমাবেশ—সে চন্দ্রকিরণ-বিধৌত শুভ্র রজনীর মদিরা, সেই সুখ-স্মৃতি আমাকে অনেক দিন তন্ময় রাখিবে।

সুপ্রসিদ্ধ মিঃ ত্র্যম্বক রাও আগামীর সার্কাস্ ষ্টেশনের নিকট আস্তানা গাড়িতেছে দেখিতে দেখিতে চির প্রিয়—চির মধুর—চির বরেণ্য পিতৃপুরুষের বাসভূমির নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীবিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়। (বি-এল)

———

পূজা

—o—

ত্যজিয়াছি মরমের জীর্ণ আশা যত ;
সত্যহারা উদ্বেলিত ব্যথাব্যাকুলিত
অন্তরের মূর্চ্ছিত প্রদেশে, হে বাঞ্ছিত
পূর্ণমূর্ত্তি! দীপ্ত-স্নিগ্ধ সত্যবিকাশিত
কল্পনা-রচিত ছবি! বড় সাধ মনে
ধন্য হব আকাঙ্খিত চরণ পূজনে!
বিশ্বপ্রাণ তুমি—সান্তে প্রবাহিত তব
অনন্তের সূক্ষ্ম সূত্র—পৃথিবীর সব
অভিন্ন তোমাতে ; সুমহান, স্বপ্রকাশ,
সাফল্যে—গৌরবে—তেজে তোমার বিকাশ।
অযুক্ত মৌলিক জ্ঞান স্থূল জড়ত্বের—
ভেদাভেদ কলুষতা বিক্ষিপ্ত প্রাণের
বিদলিয়া বিচূর্ণিয়া, মুক্ত কর মোরে
বৈরাগ্যে বিশ্বাসে ত্যাগে হিয়া যাক্ ভ'রে।
এস, ভগ্নপ্রাণে মোর ও বিশাল রূপ
আঁকিয়া বুঝিয়া লই প্রতিষ্ঠা কিরূপ—
স্বরূপ কাহাকে বলে। পূজার বোধন
ব্যষ্টি ও সমষ্টি মাঝে আত্মপ্রসারণ!
আর পূজা—বিশ্বপ্রেম-আনন্দ সাধন—
খিন্ন বদ্ধ ছিন্ন করি সত্তা বিসর্জ্জন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমার বিবাহ

(ছোট গল্প)

১

সকলেই আমাকে সুন্দরী বলিত, কিন্তু আয়নায় মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতাম না, আমার সৌন্দর্য্য কোন্ স্থানে। জানি না, কিছুতে আমার

সৌন্দর্য্য ছিল কি না, কিন্তু কি বালক, কি বালিকা আমার খেলার সঙ্গীগণ সকলেই আমাকে ভাল বাসিত। আমার অপেক্ষা বয়সে বড় বালিকারা আমার খেলা ঘর সাজাইয়া দিত, পুতুলকে কাপড় পরাইয়া দিত, কখন কখন আমার চুল বাঁধিয়া দিত; আর বালকেরা গাছে উঠিয়া আম, জাম, কুল, পেয়ারা পাড়িয়া দিত; কেহ পড়া বলিয়া দিত, কেহ আমার হইয়া অঙ্ককসিয়া দিত। যে যতই ভাল বাসুক, আমার কিন্তু মনে হইত, যোগেশ দাদাই সকলের অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসে।

যোগেশ সর্ব্বদা আমাদের বাড়িতে আসিত না বটে, কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিত। আমি অনেকবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু কখন কিছু বলি নাই। তফাতে তফাতে থাকিয়া, যোগেশ আমাকে ভাল বাসিত, তাহার ভালবাসা যেন আমাকে জানিতে দিত না। কলেজের ছুটীতে কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিলেই আগে আমাদের বাড়ি আসিত; কিন্তু আমি যত বড় হইতে লাগিলাম, ততই তাহার সহিত কম দেখা করিতাম ও অবনত মুখে অল্প কথা কহিয়া তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতাম, যোগেশ কিন্তু আমি যে দিকে যাইতাম সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। ইহা যে ভালবাসার লক্ষণ, তাহা এ শাস্ত্রে যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অনেক দিন অনেক প্রকারে যোগেশের ভালবাসার প্রমাণ পাইয়াছি; সে কথা কত বলিব? তোমাদেরই বা শুনিতে ভাল লাগিবে কেন? কেবল এক দিনের একটি কথা বলি। সে দিন রবিবার; সুতরাং যোগেশ বাড়ি ছিল। আমরা পাঁচ ছয় জন সমবয়স্ক বালকবালিকা নদীর উপর যে বাঁশের সাঁকো ছিল, তাহার উপর উঠিয়া খেলা করিতেছিলাম। সাঁকো দোলাইতে দোলাইতে আমি জলে পড়িয়া গেলাম। নদীতে তখন আমার মতো মানুষের দুই মানুষ জল। জানি না, কোথা হইতে যোগেশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তুলিয়া ফেলিল। আমি ডুবিয়া গিয়া অনেকখানি জল খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মা যোগেশকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা লইতে আমাদের বাড়ি আসিল না।

২

ক্রমে আমার বয়স বাড়িতে লাগিল, আমার সমবয়স্কাদিগের কাহার কাহার সন্তান জন্মিল, তথাপি আমার বিবাহ হইল না। ইহার কারণ এই যে, পিতা বালিকাবিবাহের বিরোধী ছিলেন, তাহার উপর তিনি দূরদেশে চাকরী

করিতেন এবং আজ কালিকার বাজারে বর কিনিবার মত অর্থবল তাঁহার ছিল না। ইহাতে পাড়ার লোকেরা যে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিত না, এমন নহে। যোগেশেরও বিবাহের বয়স হইল, কিন্তু বিবাহ হইল না; সুতরাং আমার বিবাহ না হওয়া আমি ভাল বলিয়াই মনে করিতাম। আমি স্কুল ছাড়িয়া বাড়িতে পড়িতাম; কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা কর, তাহা হইলে বলি যে, আমার পড়া লোক-দেখান আমি পুস্তক খুলিয়া (অনেক সময় উল্টা করিয়া) যোগেশকে ভাবিতাম, সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছু কিছু করিতাম, কিন্তু যেন কলের পুতুলের মতো। সত্য কথা বলিতে কি, আমি প্রেমের ফাঁদে পা দিয়াছি, আমি যোগেশকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। অন্যায়টা কি করিয়াছি? আমার কি বয়স হয় নাই? আমার বয়স পনেরবৎসর তবু কি আমাকে ইচড়েপাকা বলিবে?

কবিরা যাহাকে নিঃস্বার্থ ও ১-এর নম্বর প্রণয় বলেন, তাহা আমার হৃদয়ে গজাইয়া উঠিল না; কারণ, লজ্জার মাথাখাইয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যোগেশকে বিবাহ করিয়া তাহাকে গলার কলসী করিয়া সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিতে আমার ইচ্ছা করিত। যোগেশের সহিত বিবাহ হইতে পারে কি না, সে বিচার না করিয়াই আমি চক্ষু কর্ণ বুজিয়া অকুলসমুদ্রে ডুবিলাম। এই প্রকার অবিবেচনার ফলে যে কত যুবক যুবতীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, নাটক নভেলে তাহা পড়িয়াছি, তথাপি আমি বিচার করিয়া ভাল বাসিতে পারি নাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমাকে দুই ঘা ঝাঁটা মার।

৩

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ, যোগেশের কলেজ বন্ধ। আমার আনন্দের সীমা নাই, কেন না, আমি প্রায়ই তাহাকে দেখিতে পাই; উদাসপ্রাণে অনেক দিন গণনার পরে গ্রীষ্মাবকাশ আসিয়াছে। এমন সময় বিধি বাদ সাধিলেন। পিতা বাঁকিপুরে বদ্‌লী হইয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ঘটনা খুব সুখের বটে; কিন্তু আর যোগেশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এই জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। যদিও শয্যা লই নাই, তথাপি গোড়া-কাটা লতার মতো আমি যেন শুকাইয়া গেলাম। পাঁচ দিনের বিদায় লইয়া পিতা আমাদিগকে বাঁকিপুরে লইয়া যাইবার জন্য বাটী আসিলেন। আমাদের গ্রাম খুব বড় নহে, সুতরাং কথাটা সকলেই শুনিল—এবং সকলেই দেখা করিতে আসিল। আমি পুস্তক গুছাইতেছি এমন সময়ে দেখিলাম, মার সহিত কথা বলিতে বলিতে যোগেশ উপরে আসিতেছে। মা তাহাকে আমার ঘরে বসিতে

বলিয়া নীচে গেলেন—এক জন ভিখারী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল। আমি অবনত মস্তকে পুস্তক গুছাইতে লাগিলাম—যোগেশ কোন কথাই বলিল না, আমার পুস্তকগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। আমার নীরব থাকা ভাল দেখায় না মনে করিয়া আমি বলিলাম, "যোগেশ দা! কাল আমরা বাঁকিপুর যাব।" যোগেশ বলিল, "তা তো শুনছি!" তাহার পরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আমাকে চিঠি লিখবে?" আমারও কান্না আসিল, আমি বলিলাম, "লিখব।" যোগেশ তাহার কলিকাতার বাসার ঠিকানা বলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনে থাকবে তো?" আমি বলিলাম, "থাকবে।" মুখে তো বলিলাম, থাকবে, কিন্তু ঠিকানাটা আমার ভাল করিয়া শোনাই হয় নাই। যোগেশ চলিয়া গেল, আমি ক্ষিপ্র হস্তে চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষে জল।

৪

প্রায় ৪ মাস হইল আমরা বাঁকিপুরে আসিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যোগেশকে পত্র লেখা হয় নাই—অনেক কাগজ নষ্ট করিয়াছি, একখানা পত্রও শেষ করিতে পারি নাই। কি লিখিব? কথা খুঁজিয়া পাই না! শেষে আমার অভিমান হইল—এ পর্য্যন্ত সে আমাকে একখানিও পত্র লিখিল না কেন?

আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল। যোগেশের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য পিতাকে মা পরামর্শ দিলেন যে, তাহার পিতৃব্যকে অনুরোধ করা হউক—যোগেশের পিতা ছিলেন না। পত্র লেখা হইল এবং তাহার উত্তরও আসিল। উত্তর? আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা—বিষ খাইয়া বা বস্ত্রে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দেশলাই সংযোগে নহে—যত দিন না জীবনাস্ত হয়, তত দিন মনের অগ্নিতে প্রতি মুহূর্ত্তে অল্প অল্প করিয়া মৃত্যু। কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! আমি যে যোগেশকে ভালবাসি, মা কি প্রকারে তাহা জানিলেন? বুঝি মার কাছে সন্তানের কিছুই গোপন করা চলে না! তাঁহারা সন্তানের নাড়ী নক্ষত্র তো জানেনই, মনের ভিতরেও প্রবেশ করেন? যোগেশের পিতৃব্য লিখিয়াছিলেন যে, সে যত দিন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে না পারিবে, তত দিন সে বিবাহ করিতে চাহে না। কথাটা পাকা বটে, কিন্তু আমার যে পাকা ধানে মই!

"সে বিবাহ করিতে চাহে না," কথাটা নিশ্চিত যোগেশের মনের কথা নয়—হয় সে আমার উপর রাগ করিয়া বলিয়াছে, না হয় তাহার পিতৃব্যের মিথ্যা কথা। এখন আমার কি করা উচিত, তোমরা কেহ বলিয়া দিতে পার?

কাহারও পরামর্শ পাইলাম না, আমি যোগেশের উপর রাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহাকে ভুলিব, তাহার আর নাম পর্য্যন্ত করিব না ; কিন্তু তাহা কি পারা যায়গো !

৫

হরেন্দ্র বাবু বাকিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল—যেমন রূপ তেমনই গুণ ; বয়স অল্প, উপার্জ্জন বিস্তর। তিনি লক্ষ্মী ছাড়া হইলেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে প্রতি দিন পুড়াইবার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া এক দিন পুড়িয়া ভস্ম হইলেন। তাঁহার আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে ইচ্ছা ছিল না, শ্মশানবৈরাগ্যের মতো বিপত্নীক-বৈরাগ্য আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ ছাড়িলেন না, কাজেই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার একটু বয়স্থাপাত্রী চাই, দেখিতে শুনিতেও ভাল হওয়া আবশ্যক ; আমার সহিত বিবাহ ধার্য্য হইল।

বিবাহের দিন স্থির হইল, আমার ভাঙ্গা হৃদয় আরও ভাঙ্গিল—আমি শয্যা পাতিলাম। মা সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু কি করিবেন? "সকলই বিধিলিপি" বলিয়া তিনি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু এ পীড়ার যে ঔষধ নাই, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। আমার স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী চাপিল—আমি স্থির করিলাম বাটী হইতে পালাইব, কিন্তু যোগেশ ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে নহে। যোগেশকে বাকিপুরে আসিতে পত্র লিখিলাম ; কেন, কি বৃত্তান্ত, সে সব কিছুই লিখিলাম না, তবে কবে বিবাহ, তাহা জানাইলাম। যথা সময়ে যোগেশের পত্র পাইলাম। কি জানি কেমন করিয়া সে জানিয়াছিল যে, হরেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিবাহ হইবে। ইহাতে সে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিবাহের দিন বাঁকিপুরে আসিতে সম্মতি জানাইল—আমি অকুলে কুল পাইলাম।

৬

বিবাহের দিন যোগেশ আসিল, কিন্তু হরেন্দ্র বাবুর নিমন্ত্রণে—তিনি তাঁহার মামাত ভাই। যোগেশের আকৃতি অতি বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, মুখে কালিমা পড়িয়াছে। বুঝি আমারও সেই দশা নতুবা আমাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল কেন। আমার সঙ্কল্প বিফল হইল—তাহার সহিত পলাইবার কথা মুখে আনিতে পারিলাম না। আমি 'মরিয়া' হইয়া উঠিলাম—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক ! যোগেশ হরেন্দ্র বাবুর বাটীতে চলিয়া গেল—তাহাকে বড়ই বিমর্ষ দেখিলাম।

নিয়ম মত বৈবাহিক কার্য্য সমস্তই চলিতে লাগিল। আমাকে যে যাহা

করিতে বলিল, আমি মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় সকলই করিলাম --যেন মরা মানুষের বিবাহ হইতেছে। অবশেষে বিবাহের সময় আসিল --আমার অবস্থা তখন নবমী পূজার ছাগশিশুর মতো -- আমার জ্ঞান ছিল কিনা,মনে নাই। দৃষ্টি শক্তিও যেন লোপ পাইয়াছিল। শুভ দৃষ্টির সময় আসিল, আমি চক্ষু চাহিলাম, কিন্তু এ তো অজ্ঞানের দৃষ্টি নহে, আমি দেখিলাম, বর আর কেহ নহে, স্বয়ং যোগেশ! আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, কিছুই মনে নাই। যখন আমার সম্পূর্ণজ্ঞান হইল, তখন আমি বাসরঘরে, যোগেশ আমার পার্শ্বে। বিধাতা অভাগিনীর কাতর প্রার্থনা শুনিলেন, এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

হরেন্দ্র বাবুর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, অনুরোধে পড়িয়া সম্মত হইয়াছিলেন। যোগেশের মুখে আমার অবস্থা শুনিয়া ও তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি তাহাকে বরাসন ছাড়িয়া দিলেন। ভগবান্ তাঁহার মনে শান্তি দিন। হরেন্দ্র বাবুর মতো ভাই, সংসারে যেন আরও দুই চারি জন জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

দেবকুমার

—০—

১৪

দেবকুমারের সহযাত্রী, ষ্টীমারের সেই বন্ধুটির বিশেষ সংবাদ এখনও দিই নাই। বন্ধুর নাম অনাদিনাথ, তিনি মাদ্রাজে কর্ম্ম উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। স্বদেশের লোক যে কি প্রিয়বস্তু, তাহা প্রবাসে না গেলে বুঝা যায় না। যতদিন বিদেশকে আপনার দেশ করিয়া না লওয়া যায়, ততদিন স্বদেশের যে কোন লোককে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মনে হয়। হইবেই বা না কেন? জীবনের যত প্রিয়বস্তু, বাল্যের যত আনন্দ, সকল স্মৃতি তাহার সহিত জড়িত থাকে। প্রতি রাত্রিতে যে আকাশ দেখিতেছি, প্রতিদিন যে গুল্ম পদদলিত করিয়া যাইতেছি, বিদেশে গিয়া তাহার মধ্যে কত মধুরতা অনুভব করি। চিরপরিচিত সেই আকাশ, সেই বৃক্ষ, সেই পাখীর রব স্বদেশকে দূর হইতে নিকটে লইয়া আইসে।

অনাদিনাথের সহিত দেবকুমারের প্রায়ই দেখা হইত;উভয়ে নানাবিষয়ে আলাপ করিতেন। একদিন অনাদিনাথ দেবকুমারকে রাত্রিতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ

করিয়াছেন, কর্ম্মের অবসানে দেবকুমার অনাদিনাথের গৃহে গিয়া বিশ্রামের পর নানাবিষয়ে কথা বলিতে লাগিলেন।

অনাদি। পারিয়াদের মধ্যে তোমার কাজ কর্ম্ম কেমন চলছে? কিছু উন্নতির আশা আছে বলে মনে হয়?

দেবকুমার। আশার তো যথেষ্ট কারণ আছে। এর মধ্যেই তাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তারা এমন শীঘ্র শীঘ্র লেখাপড়া শিখছে যে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। আমি পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে আমেরিকার লোকেরা নিগ্রোদের অতিশয় ঘৃণা করে, কিন্তু তারা লেখাপড়া শেখবার সুবিধা পেলে আমেরিকানদের পশ্চাতে পড়ে থাকে না। পারিয়াদের সম্বন্ধেও তাই দেখছি। *

অনাদি। এদের যে লেখাপড়া শিখাচ্ছ, এর পরিণাম কি হবে? কাজকর্ম্ম কিছু দিতে পারবে কি?

দেবকুমার। সে কথা মনে করে আমারও ভয় হয়। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন চাপরাশি মারা গিয়েছে, দেখি তার যায়গায় এদের মধ্যে কাউকে নিযুক্ত করতে পারি কি না। কিন্তু, ভাই, আমরা এদের উপর কি অত্যাচারই করছি! এরা অনেক বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। এরা সরল, বিনীত—নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ ক'রতে পারে। এদের মধ্যে কবি আছে, জ্ঞানী আছে। তামিল কাব্যের জন্মদাতাই একজন পারিয়া তাঁতি। সেই কাব্যই এখন মাদ্রাজের প্রাচীন সাহিত্য। আর লোকে এদের উপর শেয়াল-কুকুরের চেয়ে খারাপ ব্যবহার করে। আমরা জগতে একটা জাতিরূপে দাঁড়িয়ে অন্য জাতির সমান হ'তে চাই, কিন্তু ঘরের লোককে পিষে মারছি।

অনাদি। কিন্তু ইতিহাসে হীন জাতি ও উচ্চ জাতির দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দাসজাতি তো চিরকাল ছিল। আর তাদের মতো শক্তিশালী জাতি কয়টি ছিল। আজকাল আমেরিকায় তো নিগ্রোদের উপর যথেষ্ট অবিচার করে, কিন্তু তারা তো জ্ঞানে অর্থে ও বলে খুব উন্নতি করেছে। হিন্দুরা তবে কি দোষ করল?

---

* "কুশদহ"র শ্রাবণ সংখ্যায় দেবকুমার উপন্যাসের ১২২ পৃঃ ১০ পংক্তিতে ভ্রমক্রমে লেখা হইয়াছে, "ইহারা অপর জাতীয় বালকের মতো মেধাবী নয়," এই স্থলে হইবে ইহারা অপর জাতীয় বালক অপেক্ষা কম মেধাবী নয়। (কুঃ সঃ)

দেবকুমার। তুমি ইতিহাসের কেবল একটি পৃষ্ঠা দেখাচ্ছ। তুমি কি জাননা যে গ্রীস' ও রোমের পতন হ'ল এই দাসত্ব প্রথার জন্য? যারা নিজে প্রভু হয়ে অপরকে হীন চক্ষে দেখত, অথচ সকল কাজকর্ম্ম তাদের দ্বারাই করাত, এর ফলে তারা বিলাসী, সুখপ্রিয়, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল, এবং উহাই ঐ সকল জাতির পতনের কারণ। আমেরিকা একশত বৎসর হ'ল স্বাধীন হয়েছে, তার আপনার দৃষ্টান্ত দেখাবার এখনও সময় হয় নি। কিন্তু আমেরিকানেরা দাসত্ব-প্রথার দোষগুলি দেখে যদি তা তাদের দেশ হ'তে শীঘ্রই উঠিয়ে না দিত, তা হ'লে আমেরিকার এ উন্নতি দেখা যেত না। জানতো এব্রাহিম লিঙ্কন ইহা উঠাবার জন্য কি প্রাণপন করেছিলেন—দেশের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করতে হ'য়েছিল। আমেরিকায় এখন আর দাস নেই, কিন্তু সাধারণে নিগ্রোদের বড় ঘৃণা করে। যদি এ বিদ্বেষ চলে না যায়, তবে এক সময়ে হিন্দুদের মতো এদেরও অবস্থা এসে প'ড়বে।

অনাদি। হাঁ, হাঁ, তুমি ষ্টীমারে ঐরূপ একটি কথা বলেছিলে বটে, আচ্ছা কথাটা কি আর একটু পরিষ্কার করে' বল দেখি।

দেবকুমার। কথাটা এই যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রীস ও রোমের ইতিহাস অপেক্ষাও পুরাতন, সেই জন্য জাতিবিদ্বেষের পরিণাম এখানে অতি পরিষ্কার দেখা যায়। আর্য্যেরা ভারতে এসে অনার্য্যদের প্রতি ঘৃণা করতে লাগলেন। ক্রমে তারা পরাজিত হ'য়ে অস্পৃশ্য শূদ্র হ'য়ে রইল। কি অবিচার দেখ! অল্পসংখ্যক আর্য্য এসে অনার্য্যদের দাস ক'রে রাখলেন। যদি আর্য্যেরা শূদ্রদের উন্নতি ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন, তা হ'লে বরং এই অবস্থা সমর্থন ক'রবার একটা কারণ থাকত। কিন্তু তাঁরা ব'ললেন, শূদ্রেরা বাসন মাজবে আর কাট কাটবে, বেদে তাদের অধিকার নেই। রামের মতো রাজা, এক শূদ্র তপস্যা ক'রছিল ব'লে তাকে কেটে ফেললেন; মনুর ব্যবস্থা, শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একস্থানে ব'সলে তার কোমর হ'তে কেটে ফেলবে। এ অন্যায় অবিচারের ফল, হাতে হাতে ফ'লল। আর্য্যদের পরস্পরের মধ্যেও এই ঘৃণা-বিদ্বেষ এসে প'ড়ল। প্রথমে হ'ল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন জাতি। কিছু কাল বিবাদ চ'লল, ব্রাহ্মণ বড় না, ক্ষত্রিয় বড়! শেষে ব্রাহ্মণেরা নামে বড় রইলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের অধীন হ'য়ে পড়লেন। এখানেও শেষ নয়! ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর ইত্যাদি কত জাতিতে যে হিন্দুসমাজ ভাগ হ'য়ে প'ড়ল, তা আর বলা যায় না। কেউ কার ভাত খায় না এবং কারও সঙ্গে

কার সম্ভাব রইল না। জাতিগঠনের মন্ত্র একতা; সেখানে দাঁড়াল বিরোধ। ক্রমে দেশ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়'ল। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করতেন, কিন্তু তাঁরা যখন বিলাসী, অলস ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লেন, তখন আর ভারতবর্ষকে রক্ষা করে কে?

অনাদিনাথ। এতো ঠিক কথাই। ইতিহাস প'ড়লে এ সব বুঝা যায়।

দেবকুমার। আচ্ছা, ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিই। জগতে ন্যায় বিচার ব'লে' কি একটা জিনিষ নেই? আমি যদি একজনের উপর অন্যায় ব্যবহার করি, তা হ'লে বুঝি যে আমার পাপ হ'ল, সেই বিধি কি জাতিসম্বন্ধেও খাটে না? এক জাতি অপর জাতির উপর অবিচার ক'রলে কি পাপ হয় না? বিধাতা কি একই বিধি দ্বারা সকল শাসন করছেন না? আমার মনে হয়; মানুষ যেসকল মানসিক পাপ করে তার শাস্তি বরং পরলোকে হ'তে পারে, কিন্তু জাতি-সম্বন্ধে যে পাপ, তার শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। আমরা তাই পাপের ফল ভুগছি, কিন্তু দুঃখ হয় এত দেখেও মানুষের চোখ খোলে না।

অনাদিনাথ এই সকল কথায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের এখন উচিত, হীনজাতিকে শিক্ষিত করে তাদের আমাদের সমান অধিকার দান করা।"

দেবকুমার। তুমি যদি মাদ্রাজি ভাষাটা শিখে ফেলতে পারতে, তা হ'লে আমার কাজে অনেক সাহায্য করতে পারতে।

অনাদি। আমি তো চেষ্টা করছি, কিন্তু একেবারে অনার্য্য ভাষা, এই জন্য বড় বিলম্ব হচ্ছে।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে আহার প্রস্তুত। উভয়ে আহার করিতে গেলেন। আহার শেষ করিয়া উভয়ে আসিয়া আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

দেবকুমার। তোমার নিকট আজ আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানীর সকল খবর রাখ কি?

অনাদিদাথ আগ্রাহান্বিত হইয়া কহিলেন, "না, কি হয়েছে, বল দেখি।"

দেবকুমার। এই যে বীণাপুরমের রাজা—তাঁর সর্ব্বনাশ হচ্ছে। তোমার কাছে সব কথা বলছি, তুমি প্রকাশ কোরো না। রাজা জীবনবীমা কোম্পানীর একজন অংশী ও ডিরেক্টর। যত দাবী আস্‌চে, সমস্ত তাঁর টাকা হতে দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে যদি চলে তবে রাজার রাজত্ব আর বেশি দিন থাকবে না।

অনাদি। রাজা কি এ সব কথা বুঝেন না?

দেবকুমার। আর ভাই, রাজার কি মনুষ্যত্ব আছে? বড় লোকের মধ্যে এমন সরল, নিরহঙ্কারী উন্নতমনা লোক আমি কমই দেখেছি, অথচ খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু মিস্ আয়ার তাঁর সর্ব্বনাশ করছেন। তিনি তাঁকে এমনি ভুলিয়ে রেখেছেন যে রাজার কোন দিকে দৃষ্টি নেই, যেন দেখেও দেখেন না। পরিণাম তাহলে বড় কষ্ট হয়।

অনাদি। যে অধঃপাতে যেতে বসেছে তাকে বাধা দিবে কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য মিঃ আয়ার মাদ্রাজে এমন একটা সম্ভ্রান্ত লোক হয়ে তিনি প্রকাশ্যে এমন সব কাজ হতে দিচ্ছেন।

দেবকুমার। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লেখ যে, বীণাপুরমের রাজা যে ভাবে অর্থব্যয় করছেন, তাতে যদি গভর্ণমেণ্ট ষ্টেটের ভার না নেন, তা হলে শীঘ্রই এ রাজ্য নষ্ট হয়ে যাবে। গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত একজন হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হউক।

অনাদি। আমি তা অনায়াসে লিখতে পারি, কিন্তু একথা প্রকাশ হলে তুমিও যে পরোক্ষভাবে এর মধ্যে আছ তা মিঃ আয়ার বুঝতে পারবেন! তখন তোমার চাকরি নিয়ে গোল হবে।

দেবকুমার। সে যা হবার হবে, তুমি কালই পত্রখানি লিখবে।

অনাদিনাথ স্বীকৃত হইলে দেবকুমার আবার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন আমার তো মিঃ আয়ারের বাড়িতে থাকা বিশেষ কষ্টকর হয়ে উঠছে, মিস্ আয়ার আমার সহিত বড় ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে চান, আমি যত দূরে দূরে থাকতে চাই, তিনি ততই নিকটভাবে কথা বলতে চান। যখন মিষ্টার আয়ার বাড়িতে না থাকেন, তখনই তিনি ড্রইং রুমে বসে আমার সহিত কথা বলেন। তাঁর কাজের কথা, কে তাঁকে প্রশংসা করেছে, কেবল এই সকল কথা। অনেক সময়ে যে সোফায় আমি বসে আছি, সেই সোফাতেই এসে বসেন। কি মনে করবেন বলে আমি উঠে বসতে পারি না। ফলে সে বাড়ি থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অনাদি। দেখো ভাই, যেন ফাঁদে পোড়োনা। তোমার কথা শুনে যে আমার ভয় হচ্ছে।

দেবকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ভয়ের কোন কারণ নেই। বেশি বাড়াবাড়ি দেখলে তোমার এখানে চলে আসছি!" কিন্তু কেন যে ভয়ের কারণ নাই, তাহা দেবকুমার বলিলেন না। তাঁহার মনে আর একখানি সরল,

পবিত্র মুখ জাগিতেছিল যাহার নিকট তাঁহার হৃদয় বিক্রীত হইয়াছে। নিরুপমার সেই পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তিনি সকল প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন।

অনেক রাত্রিতে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। মিঃ আয়ারের গেটের প্রায় নিকটে আসিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি লোক অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল, দেবকুমারও তাহার পশ্চাতে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। অবশেষে রাস্তার আলোকস্তম্ভের নিম্নে আসিয়া তাহাকে ধরিলেন! ধরা পড়িবা মাত্র সে লোকটি 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবকুমার দেখিলেন, সে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পারিয়া মণ্ডল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মণ্ডল! তুমি এত রাত্রে মিঃ আয়ারের বাড়িতে এসেছিলে যে?"

মণ্ডল। বাবু তোমাকে দূর হতে দেখতে পেয়ে যাতে আমাকে না চিনতে পার তার জন্য দ্রুত চলে আসছিলাম। আয়ারের সঙ্গে আমার কিছু কারবার আছে। তাই তাঁর কথা মতো দেখা করতে এসেছিলাম।

দেবকুমার। আয়ারের সহিত তোমার কি কারবার?

মণ্ডল। সে কথা বাবু তোমার এখন জেনে কাজ নেই।

দেবকুমার। যাক্। তোমার সহিত দেখা হয়ে ভালই হ'ল। তোমাকে যে লোকটির কথা—বলেছিলাম তাকে তুমি কাল সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে নিয়ে যেও কালই তাকে চাপরাশির কাজে নিযুক্ত করব।

মণ্ডল। আচ্ছা বাবু নিয়ে যাব।

মণ্ডল কেন অসময়ে এখানে আসিয়াছিল ইহা ভাবিতে ভাবিতে দেবকুমার ভিতরে গেলেন। ঘরে গিয়া দেখেন মিঃ আয়ারের ঘরে আলো জ্বলিতেছে; তিনি কাগজ পত্র দেখিতেছেন ও কি হিসাব লিখিতেছেন। মিস্ আয়ারও জাগিয়া রহিয়াছেন—দেখিয়া তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

১৫

পরদিন যথাসময়ে ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইল। চাপরাশিদিগের মধ্যে প্রথম হইতে উত্তেজনার ভাব দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু অবসর পাইলেই সকলে একসঙ্গে বসিয়া কি যেন পরামর্শ করিতেছে।

একজন বলিতেছে, "কি, আমরা পারিয়ার সহিত কাজ করব? টাকার

জন্য জাত খোয়াব, তা কখনই হবে না! ম্যানেজার বাবু যদি পারিয়া নিযুক্ত করেন,আমরা দল বেঁধে কাজ ছেড়ে যাব। আমাদের কি আর কাজ জুঠবে না ?”

২য় জন কহিল, “কাজ ছাড়তে হবে না। আমরা যদি সকলে এক যোগে কাজ ছাড়তে চাই, তখন নিশ্চয়ই বাধ্য হয়ে পারিয়াকে ছাড়িয়ে দেবেন।

অপর একজন কহিল, “হঠাৎ কাজ ছাড়া ঠিক নয়। আগে ম্যানেজার বাবুকে বলা যাক্—তিনি যদি না শোনেন,আমরা আয়ার সাহেবকে গিয়ে বলব।”

এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে মণ্ডল পূর্ব্বকথিত লোক লইয়া উপস্থিত হইল। দেবকুমার তাহাকে নিজের কাছে ডাকিলেন। এবং আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তার পর চাপরাশির কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। মণ্ডল তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে, ব্যাঙ্কের সকল চাপরাশি দলবদ্ধ হইয়া দেবকুমারের নিকট করযোড়ে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে যে মুখপাত্র সে বলিতে লাগিল, “হুজুর! পারিয়ার সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারব না। যদি পারিয়াকে রাখেন, আমাদের বিদায় করুন।”

দেবকুমার কহিলেন, “তোমরা এরূপ বলছ কেন? তোমরা তোমাদের কাজ করবে, সে তার কাজ করবে; এতে তোমাদের আপত্তি কেন? আমি এরূপ অসঙ্গত আপত্তি শুনতে পারব না।”

তাহারা দেবকুমারকে সেলাম করিয়া বাহিরে আসিল এবং কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া আয়ারের গৃহাভিমুখে গেল। আয়ারের নিকটও তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে অভিযোগ জানাইল। আয়ার এইকথা শুনিয়া তখনই গাড়ি করিয়া ব্যাঙ্কে আসিলেন, এবং দেবকুমারের উপর বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন।

দেবকুমার বলিতে লাগিলেন, “পারিয়াদের যদি একটু কাজের সুবিধা না দেওয়া যায়, এরা কোন দিন উন্নত হতে পারবেনা। আপনি একটু শক্ত হ'লে সকল গোলমাল মিটে যাবে।”

আয়ার। আমরা ব্যাঙ্কের কাজে তো দেশহিতৈষিতার কাজ মিশাতে পারি না। এখন চাপরাশিরা কাজ ছেড়ে দিলে কাজের বড় ক্ষতি হবে। তুমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

দেবকুমারকে দুঃখের সহিত বাধ্য হইয়া নিয়োগ স্থগিত রাখিতে হইল।

সন্ধ্যাকালে দেবকুমার মণ্ডলের সহিত দেখা করিয়া সকল কথা বলিলেন।

মণ্ডল কহিল, 'বাবু আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছিলাম ; তুমি চেষ্টা করে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ভদ্র লোকদের উপর আমাদেরও শোধ নেবার আর এক উপায় আছে।

দেবকুমার বিস্মিত ভাবে মণ্ডলের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কি উপায় বল না ?

মণ্ডল। বাবু, কাল রাত্রে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমাকে বলেছিলাম যে আয়ারের নিকট আমার কাজ ছিল। কি কাজ তা তোমাকে বলি নাই। আমরা ভদ্রলোকদের বাড়ি হতে সোনা,রূপা,টাকা চুরি করি। আয়ার সেসকল জিনিষ আমাদের নিকট হতে অর্দ্ধেক দামে কিনে নিয়ে থাকেন। এমনি করেই আমরা ভদ্রলোকের উপর শোধ লই।

দেবকুমার। বল কি,আয়ার চোরাই মাল কেনেন ? আমার বিশ্বাস হয় না।

মণ্ডল। তোমরা আয়ারকে সোজা লোক মনে কোরো না। আমরা যত চুরি করি, সেসব যদি তিনি না রাখতেন, তা হ'লে আমরা এত চুরি করতে সাহসই পেতাম না। চোরাই মাল হজম করা বড় শক্ত। কিন্তু তিনি বড় মানুষ, তাঁকে কে সন্দেহ করবে ?

দেবকুমার। তোমাদের কি সকলেই চুরি করে ?

মণ্ডল। না, কেহ কেহ করে। যে-সে চুরি করতে গেলে যে ধরা পড়ে যাবে। আমি চুরি করি না। কিন্তু যারা চুরি করে, তাদের নিষেধ করি না। আমাদের উপর ভদ্রলোকদের যেরূপ অত্যাচার, প্রকাশ্যে তো আর আমরা তার প্রতিশোধ নিতে পারি না, তাই গোপনে তার প্রতিফল দিই।

দেবকুমার মণ্ডলকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে এরূপ কাজ করা বড় অন্যায়—ভবিষ্যতে বিপদে পড়বে ; এখানে পার হলেও পরলোকে ঈশ্বর শাস্তি দিবেন। মণ্ডল বুঝিল কি না, কিছু বুঝা গেল না।

তিনি অতি দুঃখিত অন্তরে গৃহে ফিরিলেন। মিঃ আয়ার উচ্চপদস্থ ও উচ্চবংশীয় ; কিন্তু নীচ জনোচিত প্রবৃত্তি। এদিকে ভদ্র নামে পরিচিত হইয়া গোপনে চুরি ও নানা অন্যায় কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। এ পাপের কি শাস্তি নাই ?

১৬

বীণাপুরমের রাজা দিনে কিম্বা রাত্রির মধ্যে রাণীর সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করেন না। দিনের বেলায় কিছুক্ষণ রাজকার্য্য দেখিয়া, বৈকালে মিস্ আয়ারকে

লইয়া গাড়ি করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। সন্ধ্যাকালে প্রায়ই নিমন্ত্রণের ওজর করিয়া বাড়ি থাকেন না, এবং অনেক রাত্রিতে বাড়ি গিয়া বাহিরেই থাকেন। রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়। রাণীর প্রাণে ইহা সহ্য হইবে কেন? সকল কথাই তাঁহার কানে যাইত এবং সমস্ত শুনিয়া তিনি ঘৃণা লজ্জা ও দুঃখে মরিয়া যাইতেন। মানব যখন সর্ব্বস্ব হারাইতে বসে, তখন আর তাহার মনে অভিমান থাকে না, বিশেষতঃ স্বামীর নিকট স্ত্রীর আর মান, অভিমান কি আছে? এতদিন তিনি স্বমুখে স্বামীকে কিছু বলেন নাই, আর অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই রাজাকে কিছু বলিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। মিস্ আয়ারের নাম উল্লেখ করিতে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, "মিস্ আয়ারের পায়ের সঙ্গে রাণীর তুলনা হয় না?" রাণী সেই দিনই আত্মহত্যা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার একমাত্র শিশুটির দিকে তাকাইয়া তাহা হইতে বিরত রহিলেন।

মিস্ আয়ারের এক দাসী রাজার বাড়িতে মধ্যে মধ্যে আসিত। সে হীন জাতি হইলেও রাজার দিবারাত্রি আয়ারের বাড়ি থাকা তাহার ভাল লাগিত না। রাণীর নিকট বসিয়া সে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিত।

একদিন সে কহিল, "রাণীমা! আয়ারের বাড়ি একজন বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে, রাজার সহিত তাঁর বড় ভাব। তুমি একবার তাঁকে বলো, তিনি যদি রাজাকে ফিরাতে পারেন"।

রাণী কহিলেন, " আর ঘরের কথা বার করে কি হ'বে? বিধাতা যদি দয়া করেন, তবেই আমার অদৃষ্ট ফিরবে।"

দাসী। না মা, তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। বাবুটির সহিত আমাদের রাজার বড় ভাব। আর তিনি আয়ারের লোক নন। পারিয়াদের অনেক উন্নতি করেছেন। তিনি ভারী সরল লোক।

রাণী। আচ্ছা কাল তাঁকে একবার আমার নাম ক'রে ডেকে আনিস। দেখিস্ কেহ যেন জানতে না পারে!

দেবকুমারের কানেও রাজবাড়ির কথা উঠিয়াছিল। রাণীর অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনিও মনে মনে অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন তাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় দাসী আসিয়া যখন গোপনে তাঁহাকে রাণীর বার্ত্তা জানাইল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন।

যথাসময়ে দাসী আসিয়া তাঁহাকে রাণীর নিকট লইয়া গেল। রাণী পর্দ্দার আড়াল হইতে তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন, "বাবা! শুনেছি, তোমার সহিত রাজার বড় ভাব। সেইজন্য তোমাকে একবার ডেকেছি। রাজার অবস্থা তো সব দেখতে পাচ্ছ? রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হচ্চে, রাজা দিবারাত্রি আয়ারের বাড়িতেই থাকেন। তুমি কি রাজাকে কোনরূপে ভাল করতে পার?"

দেবকুমার। মা! ভাল করা ঈশ্বরের হাত। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। আপনার অনুমতি হয় তো আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। ফল কি হবে বলতে পারি না।

রাণী। দেখ বাবা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। আমি এমনি অনাথিনী হ'য়ে পড়েছি যে সমুদ্রের মধ্যে একগাছি তৃণ পেলেও তা ধরি।

দেবকুমার। মা, আমার দ্বারা যা হ'তে পারে, তার ত্রুটি হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলিয়া দেবকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন।

পরদিন দেবকুমার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তিনি কহিলেন, "গোপনে আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে।" রাজা সে ঘর হইতে সকলকে যাইতে কহিলে সকলে চলিয়া গেল! দেবকুমার তখন রাজার হাতে একখানি চিঠি দিয়া কহিলেন, "এ চিঠি-খানি আমার।"

মিস্ আয়ার দেবকুমারেকে এই পত্রে তাহার প্রেম প্রকাশ করিয়াছে। চিঠি খানি দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি মিস্ আয়ারের নিকট হইতে পাইয়াছেন।

চিঠি পড়িয়া রাজার মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "ভাই, এতদিনে আমার মোহ ঘুচল। আমি কি কুলটার প্রেমেই মজেছিলাম। আমি ভাবতাম মিস্ আয়ার আমাকে ভালবাসে, এখন দেখছি সমস্তই প্রবঞ্চনা।"

দেবকুমার। আপনি অন্ধ হ'য়ে কিছুই দেখেন নাই। মিষ্টার আয়ার ও তাঁর কন্যা ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে এই ফাঁদে ফেলেছেন। আপনার টাকাতেই ইষ্টার্ণ ঘাট জীবনবীমা কোম্পানীর দাবী দেওয়া হ'চ্চে। আপনার টাকা ব্যাঙ্কে আছে বলেই ব্যাঙ্ক স্বচ্ছল। আপনার অর্থ শুষে নেবার জন্য বাপ ও মেয়ে এ ফাঁদ পেতেছে।

রাজা। এখন সব বুঝতে পারছি। মানুষ যে এমন কপট হ'তে পারে, তা আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করি নি।

দেবকুমার। আপনি রাণীর নিকট যে ভালবাসা পাবেন, সে ভালবাসা কি আর কোথাও পাবেন? এমন পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম অগ্রাহ্য করে, আপনি স্বার্থপর নারীকে সর্ব্বস্ব দিয়েছেন। আপনার সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে রাণীর মতো আর আপনি কার নিকট আশ্রয় পাবেন।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ভাই, ঠিক বলেছ! আমি বড়ই অপরাধ ক'রেছি। কিন্তু এখন কি করি আমাকে বল। মিষ্টার আয়ার তো আমাকে সহজে ছাড়বে না। ভয় হয় আবার তাদের কোন ফন্দির ভিতর পড়ি।

দেবকুমার। আপনি তাদের সহিত একেবারে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিন। নিকটে গেলেও দেখা করবেন না। আপনি রাজা—একটা রাজ্যের অধিপতি আপনাকে মিষ্টার আয়ার কি করবেন?

রাজা। আচ্ছা তাই ক'রব। এখন আমি একবার অন্দরে যাই, তুমি কাল একবার আমার সহিত দেখা ক'রবে, ভুল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। (বি-এ)

বিবিধ

বাতুলায়;—বঙ্গদেশে মোট তিনটি বাতুলালয় আছে। ভবানীপুরেরটি কেবল সাহেবদের জন্য, বহরমপুরে ও ঢাকায়, এই দুইটিই বাঙ্গালী নরনারীর জন্য। সমগ্র বঙ্গের উন্মাদগ্রস্ত নর-নারীর কখনই ইহাতে স্থান হইতে পারে না। ১৯১৫ সালের কার্য্যবিবরণী দেখিলে বুঝা যায়, ক্রমে লোকে উন্মাদাগারের উপকারিতা বুঝিতে পারাতে উহার জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক। সম্ভবত মুসলমানগণ এখনো উহার উপকারিতা ততদূর বুঝিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে সমস্তই হিন্দু— একটিও মুসলমান স্ত্রীলোক নাই! মুসলমানগণ অধিক পর্দ্দানশীন,তাই তাঁহাদের পাগলিনীদিগকে ঘরে আবদ্ধ রাখিতে যত্ন করেন। কার্য্যবিবরণীতে উন্মত্ত হইবার বিবিধ কারণ দেখানো হইয়াছে,তন্মধ্যে কতক পিতা মাতা হইতে, আর অধিক

সংখ্যক গাঁজা, চরস, সিদ্ধি ও মদের নেশার জন্য। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীলোকের নেশার সংখ্যাও কিছু আছে। হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মধুপান নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নারী জাতির মধ্যেও কিছু কিছু সুরাপানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা অতিশয় আশঙ্কার বিষয়। (বিজ্ঞান)

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কার্য্য ;—অজয়নদীর বন্যায় বহু গ্রাম ভাসিয়া যাওয়ার বিপন্ন নরনারীদিগের সাহায্যার্থে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী তাহাদের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় এঙ মণ্ডলীর কার্য্যকারীশক্তি সর্ব্বতোমুখী হউক। মণ্ডলীর জনৈক সেবক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে (সঞ্জীবনীতে) লিখিয়াছেন; "বন্যা প্রপীড়িতদের সেবা করিতে গিয়া এক নবযুগের অবির্ভাব দেখিলাম—দেখিলাম কমিশনার সাহেবের সদাশয়তা দেখিলাম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তের সমবেদনা। ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ দেব মহোদয়গণের ন্যায় উচ্চমনা লোক, যতই রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশসেবায় মনোযোগী হইবেন। ততই দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"

উপবাস ;—আজ কাল বিবিধ চিকিৎসা-গ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রাদিতে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এবিষয়, যত আলোচনা হয় ততই ভাল। আমরা বহুপূর্ব্বে একবার একটি কথা শুনিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে বিনাচিকিৎসায় অনেক জীবন নষ্ট হয় বটে কিন্তু অতিরিক্ত বা অনাবশ্যকীয় ঔষধ সেবনে (over medicated) তদপেক্ষা অধিক লোকের প্রাণ নাশ হয়। আর পৃথিবীতে অনাহারে এবং কদন্নভোজনে অনেক প্রাণ নষ্ট হয় বটে কিন্তু অতিভোজনে তদপেক্ষা অধিক লোকে পীড়িত হয় এবং জীবন হারায়। প্রাচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উপবাসের যথেষ্ট উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি "স্বাস্থ্যসমাচার," কার্ত্তিক সংখ্যায় "উপবাস" শিরোমানা প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে অগ্রে উপবাসের অপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"অতিরিক্ত উপবাস করাও অন্যায়। অধিক উপবাস করিলে গাত্রে বেদনা, ক্ষুধার অভাব পিপাসা, দর্শন, ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস, মনের চঞ্চলতা, মোহ ইত্যাদি নানা বিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত উপবাসে রোগী অধিক দুর্ব্বল না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা

করা উচিত। বায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট, পিপাসাযুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর, গর্ভবতী রমণী, বালক, বৃদ্ধ, ভয়যুক্ত ব্যক্তি, ক্ষয় কাশ প্রভৃতি রোগে পীড়িত বহুদিন জ্বর প্রভৃতি, রোগ ভোগ করিয়া যাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে, এমন সমস্ত ব্যক্তিকে উপবাস করানো অনুচিত।"

তারপর উপকারিতা সম্বন্ধে ;—

"অনেক সময় কেবল উপবাস দ্বারা নানাবিধ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। আহার্য্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে এই সময়ে নানারূপ গবেষণা চলিতেছে ; সুস্থ শরীরে কিরূপ খাদ্য ও রোগ সংযুক্ত হইলে কিরূপ পথ্য ব্যবস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, খাবার জিনিষে ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে শরীরের কি অনিষ্ট সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য নিরূপিত হইতেছে। অতিরিক্ত আহার, অনাহার এবং অনিয়মিত আহার অনেক পীড়ার প্রধান কারণ রূপে গণনীয় হইয়া থাকে। বাত, যকৃৎ সংসৃষ্ট নানাবিধ পীড়া উদরাময়, অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি অতি-ভোজনের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

মিঃ বি, এল, গুপ্ত ;—সুবিখ্যাত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত,২১শে অক্টোবর পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয় ছিলেন। অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ইনি একসময়ে বিলাত গিয়া সিভিলসার্ব্বিস পাস করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ পর্য্যন্ত হইয়া শেষ বরদারাজ্যের মন্ত্রী হন। ইনি যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ তখন খাঁটুরা নিবাসী ব্রাহ্ম ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাবালাকে হিন্দু আত্মীয়গণ গোপনে হিন্দুসমাজে হিন্দুপাত্রের সহিত বিবাহ দেন, এইজন্য যে কেস্ হয়, তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সে অনুমান ৪০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। মৃত্যুকালে গুপ্ত মহাশয়ের বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। জগতজননী তাঁহার যশস্বী-কৃতি সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দান করুন। গত ১২ই নবেম্বর ৯নং রডন ষ্ট্রীট্ ভবনে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ-কৃত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়া কয়েক বিষয়ে মোট ১৮০০৲টাকা দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উভয় বিভাগে ১০০০৲, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ২০০৲ মূকবধির বিদ্যালয় ১০০৲ ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী ১০০৲ কলিকাতা অনাথআশ্রম ১০০৲ আতুরাশ্রম ১০০৲ অন্ধবিদ্যালয় ১০০৲ বেঙ্গল সোসিয়াল লিগ্ ১০০৲।

মানবের মহত্ত্ব—ঈশ্বর সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা, সুতরাং ছোটবড় নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে এ মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি তিনজন ধাঙ্গড় বোম্বাই নগরের ভূগর্ভস্থ নর্দামা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছিল। তথাকার

বিষাক্ত বাষ্পে একজন ধাঙ্গড় সংজ্ঞাশূন্য হয়। তাহার উদ্ধারের জন্য আর দুই জনও নর্দামার মধ্যে প্রবেশ করে তাহারাও অচেতন হয়। অবশেষে এই দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে। ধাঙ্গর বংশে জন্মিলে কি হয়, ইহারাই প্রকৃত মানুষ, সকলেরই নমস্য। (সঞ্জীবনী)

হাটা পরীক্ষা—২১ জন যুবক বিডন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে প্রাতে ৬টায় যাত্রা করিয়া বিডনষ্ট্রীট, কর্ণোয়ালিশষ্ট্রীট, কলেজষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট, লোয়ার সাকুলার রোড, অপারসাকুলার রোড, শ্যামবাজার ব্রিজ রোড, বেলগেছিয়া রোড হইয়া পাতিপুকুর ষ্টেসন পর্য্যন্ত ৯ মাইল পথ গমন করেন। জে, বসু ১ ঘণ্টা ২৬ মিঃ এস, এন, দত্ত ১ ঘণ্টা ২৬ মিঃ ৩০ সেঃ ও ডি, এন, দত্ত ১ ঘণ্টা ২৮ মিঃ ১৫ সেঃ গন্তব্যস্থানে উপনীত হন। (সঞ্জীবনী)

ক্যানসার রোগে যাহারা মারা যায় তাহার মধ্যে অতিরিক্ত সুরাপান, অতিরিক্ত চা পান, এবং ধুম পায়ীর সংখ্যাই বেশী। অতিরিক্ত মাংসভোজন এবং অতিভোজনও উহার একটি কারণ।

অত্যন্ত হিক্কা উপস্থিত হইলে গভীর ও দ্রুত শ্বাসগ্রহণ করিলে তাহা বন্ধ হয়।

পরীক্ষাতে জানা গিয়াছে মাখম একটি প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—o—

জলেশ্বর—রাজা কাশীনাথের সময়ে জলেশ্বর যে একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল, তাহার আভাস পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। যমুনানদীর তীর হইতে দক্ষিণে ধর্ম্মপুর পর্য্যন্ত প্রাচীন জলেশ্বরের সীমা ছিল। কালের কি পরিবর্ত্তন! যেখানে রাজা পাত্র-মিত্র লইয়া বসিতেন, সে স্থান এখন নির্জ্জন প্রান্তর; যেখানে তাঁহার অন্তঃপুর ছিল, সেই স্থানই এখন প্রাচীন জলেশ্বরের চিহ্ন ও নাম মাত্র রহিয়াছে। এই রাজ-সংসারে কাজ করিয়া ইছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজ সভায় এত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী ছিলেন, যে সেই জন্য ধর্ম্মপুর গ্রামখানি হইয়াছিল। এত বড় একজন রাজার বংশাবলী এখন কালেরগর্ভে নিহত; কিন্তু তাহার কারণ কি? কেবল

যে রাজা কাশীনাথের বিবরণ এইরূপ তাহা নহে, অনুসন্ধান করিলে বাংলায়—বাংলার কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ তমসাচ্ছন্ন। ইংরাজ রাজ্যের ফলে এক্ষণে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা দেশে দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের মধ্যে যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার নামটি ব্যতীত তাঁহার বংশের প্রায় আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কুশদহের মধ্যে এরূপ অনেক আছেন। খাঁটুরার রাজা রত্নেশ্বর, দেগঙ্গার রাজা চন্দ্রকেতু, ইছাপুরে জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ, মল্লিকপুরের গুহ বংশ এবং চৌবেড়িয়া (চতুর্বেষ্টিত দুর্গ) রাজবংশের বংশ-বিবরণ ও কীর্ত্তিকলাপ কালের কবলে পতিত, তাহার উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত।

জলেশ্বরের শিব, আজো কুশদহের মধ্যে পূজিত হইয়া আসিতেছেন! এই শিব, রাজা কাশীনাথের স্থাপিত। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হয়। ইহাকে জলেশ্বরের গাজনের মেলা বলে। মুসলমানদিগের মহরমে যেরূপলাঠি খেলা হয়—হিন্দুদিগের গাজনেও পূর্ব্বে সেরূপ লাঠিখেলা হইত। এক্ষণে এই লাঠিখেলা অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া উঠিয়া যাইতেছে! পূর্ব্বে যাহারা লাঠি খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিত স্থানীয় লোক অথবা জমিদার তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতেন। অনেক জমিদার তাহাদিগকে দারয়ান করিয়া উপযুক্ত মাহিনা দিতেন। এই গাজনপর্ব্বে পূর্ব্বে পিঠফোঁড়া ও জিব ফোঁড়া হইত, সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের কৃপায় তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এই দেশে যেরূপ গাজনে লাঠি খেলা হইত, বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলায়ও সেইরূপ ঝাঁপানের সময় লাঠিখেলা হইত। মনসাদেবীর উপলক্ষ করিয়া ঝাঁপান হয়।

জলেশ্বর নাম কেন হইল? অনেকে অনুমান করেন ইহার দুই দিকে দুইটি নদী থাকায় সেই সময়ে এই নাম হইয়াছে। উত্তরে যমুনা ও পশ্চিমে রাধামণির খাল। এই রাধামণির খাল এক্ষণে একটি সামান্য খালের মতো। ইহার উপর দিয়া সেণ্ট্রাল রেল গিয়াছে। গোমা ষ্টেশনের উত্তর দিয়া বেলেঘাটার সোনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। একসময়ে ইহা জলেশ্বরের পশ্চিম প্রান্ত বাহিনী ছিল। *

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

* কুশদহের প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীটে সম্পাদকের নিকট অথবা লেখকের নিকট গোবরডাঙ্গা-ইছাপুর পোঃ আঃ, (২৪ পরগণা) এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ;—আজ আমরা আমাদের একজন কুশদহবাসী, চিত্র-শিল্পি ও স্বভাব-কবির পরিচয় দিব। অবশ্য পরিচয় দিবার প্রয়োজন এবং কিঞ্চিৎ স্বার্থকতা আছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। স্বরূপের পরিচয় এই পর্য্যন্ত এখন গুণের পরিচয় দিব। ইঁনি চিত্রকর; ইহার হস্ত তৈলচিত্রে বহুদিন হইতে নিপুণতা লাভ করিয়াছে, ইনি কুশদহবাসী অনেকেরই তৈলচিত্র (অয়েল পেইণ্ট) লিখিয়াছেন। তারপর ইনি স্বভাব-কবি, এ পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কুশদহে কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে, সম্প্রতি ইঁহার রচিত একটি নূতন সঙ্গীত এখানে প্রকাশিত হইল; পাঠকপাঠিকাগণ দেখিবেন তাঁহার রচনা, এবং ভাবুকতার মধ্যে কেমন একটি বিশেষত্ব আছে।

"আমি আমি করি বুঝতে নারি আমি কে।
কুলটা নারি যেমন চিনিলে না তার স্বামী-কে।
আমি শব্দ অতি তুচ্ছ, আমির চেয়ে কৃমি উচ্চ.
যেমন না দেখিলে তৃণ-গুচ্ছ জানা যায় না জমিকে।
আমি যদি আমার হ'তাম, আত্ম-তত্ত্বে মন দিতাম,
আত্মারামকে চিনে নিতাম, জেনে আত্ম-যামিকে।"

ইঁহার রচিত বহু সঙ্গীত আছে। ফলতঃ ইনি আমাদের কুশদহের গৌরবের। তবে তাঁহার একটি দোষও আছে, তিনি "কুশদহে" লেখেন না। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভবানীপুর বকুলবাগান লেনে ছিলেন, কিছু দিন হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া মাতামহালয়ের পুরাতন অংশে সপরিবারে বাস করিতেছেন।

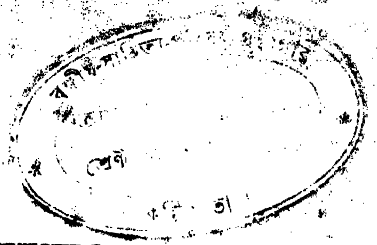
আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি; রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সম্প্রতি দেশভ্রমণ এবং তীর্থ-দর্শন মানসে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এখন গুরু-ভার-বিষয়-চিন্তায় ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত-হৃদয়,—কেবল তাহা নহে ভগ্ন-স্বাস্থ্য! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সপরিবারে বহু স্থান-পদ-মাহাত্ম্য এবং পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সকল দর্শনে জগতজননীর মহিমা দর্শন করিয়া আত্মায় শান্তি এবং দেহে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সচ্ছন্দে আবার জন্মভূমি জননীর বক্ষে ফিরিয়া আসুন। তাঁহার কল্যাণে দেশের কল্যাণ একান্ত নির্ভর করিতেছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ই, বি, এস, রেলওয়ের সেণ্ট্রালবিভাগের ট্রেণের সময় পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রাতের ট্রেণখানি একেবারে উঠাইয়া দেওয়ায় যে মহাঅসুবিধা ঘটিয়াছে তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া ছিলাম। তারপর ২৮ শে অক্টোবরের দৈনিক বাঙ্গালীতে গোবরডাঙ্গার নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রেও আমরা দেখিলাম ঐ অসুবিধার কথাটি বিশদভাবে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আরও এবার আমরা বলিতেছি যে, সমস্ত দিনের শেষ ট্রেণখানি যাহা সন্ধ্যা ৬টার সময় গোবরডাঙ্গায় আসে উহা আরো কিছু সময় পরে হইলে ভাল হয়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে আমরা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপ্যালিটী নাকি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে, পানীয় জলের একটি পুষ্করিণী (রিজার্ভ ট্যাঙ্ক) গৈপুরে হইবে। তারপর সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুষ্করিণী খাঁটুরায় হইবে শুনা যায়। এই পরিবর্ত্তন নাকি মিউনিসিপ্যাল আইন-সঙ্গত হয় নাই ; এজন্য গৈপুর করদাতৃগণ মিউনিসিপ্যালিটীর নামে আলিপুর জেলাকোর্টে এক নালিস রুজু করিয়াছেন। মকর্দ্দামা এখনো বিচারাধীন। সুতরাং তৎপূর্ব্বে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিব না।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর হইতে যে রাস্তা গৈপুর ফকিরপাড়া ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ রাস্তাটুক পাকা হইবার জন্য আমরা বার-বার গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু অদ্যাপি কোন ফল দৃষ্ট হইল না। এখন আমাদের মনে হইতেছে, মাটকোমরা, ইছাপুর, নিবাসী, যথা—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বেণীমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রমুখ ব্যক্তিগণ মিলিয়া যথা বিহিত বিধানে, রাস্তাটী পাকা হইবার জন্য যদি চেষ্টা করেন, তবে কখন ঐ কার্য্য অসম্পন্ন থাকিতে পারিবে না। ঐ সকল গ্রামবাসিগণের ষ্টেশনে যাতায়াতের পক্ষে রাস্তাটী কতদূর প্রয়োজনীয় তাহাতো সকলেই জানিতেছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইল্কিনস্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়,
ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

অষ্টম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ { অষ্টম সংখ্যা

সঙ্গীত

পরজ—একতালা।

মা জগতজননী।
বিশ্বজনবন্দিনী, বিচিত্র গুণধারিণী চৈতন্যরূপিনী।
লয়ে প্রেম কোলে সকল সন্তানে, করিছ, পালন স্নেহ-দুগ্ধ দানে,
স্মরণে তোমায় উথলে হৃদয় ওগো হৃদয়বাসিনী।
হোয়ে কল্পতরু কর বিতরণ, অন্ন জল জ্ঞান প্রেম পুণ্য ধন,
দীন-ভক্ত জনে দাও দরশন, ভক্তচিত্তবিহারিণী ;—
রূপের ছটায় বিজলি চমকে, করে ঝলমল জলে চারিদিকে,
কোটী সূর্য্যপ্রভা, অনুপম শোভা, প্রতাপে কম্পিত ধরণী।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

দুঃখ-বিজয়

—*—

এ দেশের দর্শন শাস্ত্র ছয়খানি। ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা। প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্তি দুঃখবাদ। সকল দর্শনকারের মত এই যে, সংসার দুঃখময়। সংসার প্রকৃতপক্ষে দুঃখময় কি না, তাহার আলোচনা কেহ করেন নাই। সংসার যে দুঃখময় এ কথা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, দর্শনকারগণ সংসারের সুখকেও দুঃখেরই ভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ সুখও দুঃখানুষক্ত। দার্শনিকগণ প্রত্যেক দর্শনে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া দেওয়াই এ দেশীয় দার্শনিকদিগের চরম উদ্দেশ্য। ন্যায়দর্শনের মতে মিথ্যাজ্ঞানের হ্রাস এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ন্যায় দর্শন বলেন—প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গ লাভ হয়।

বৈশেষিক দর্শনের মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স্। বৈশেষিক মতেও নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়? দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যজনিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়।

পূর্ব্ব মীমাংসার মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে।

সাঙ্খ্য দর্শনের মতে দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিকউপায় যেমন যথেষ্ট নহে, বৈদিক উপায়ও তেমনি যথেষ্ট নহে। সাঙ্খ্য মতে, দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান।

পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান দ্বারা দুঃখ দুরীভূত হয়, মোক্ষলাভ হয়। সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাঙ্খ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায়। পতঞ্জলির মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদ-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়—যোগ।

বেদান্তের দর্শন অদ্বৈত মতে মানুষ অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসার-জড়িত মনে করে; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম। এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি? অবিদ্যাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে। জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে; অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়, দুঃখ নিবারণের উপায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদান্ত দর্শনের যে দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তিকেই মুক্তিলাভের উপায়—দুঃখজয়ের উপায় বলিয়াছেন।

জগৎ দুঃখময় কি সুখময় অথবা লীলাময়, সে দার্শনিক বিচার আজ তুলিব না। জগতে শোক দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ যন্ত্রণা, অপমান নির্য্যাতন যাহা যাহা চক্ষের সম্মুখে নিত্য দৃষ্ট হইতেছে, রোগে অনাহারে, শোকে কত নরনারী ক্লেশ পাইতেছে, এই দুঃখ দুর করিবার উপায় কি? চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি মানুষ কাটা পাঁঠার মত দুঃখ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এই দুঃখ নিবারণের ঔষধ কোথায়? দেশ-প্লাবনে বাড়ী ঘর ভাসিয়া যাইতেছে, মুখে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, এ প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীকে ষড়দর্শনের দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া দিলে কি দুঃখ নিবারণ হইবে? কখনও নহে।

প্রত্যেক মানুষ বিশ্ব-মানবের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং নিজের দুঃখ দুর করিতে হইলে পারিবারিক দুঃখ, সামাজিক দুঃখ, দেশের দুঃখ, জগতের দুঃখ দুর করা প্রয়োজন। একটির সহিত আর একটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অতএব নিজের দুঃখ দুর করিবার অর্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণে জগতের দুঃখ দুর করা। এখন প্রশ্ন এই, কিসের দ্বারা এই দুঃখ দুর হইতে পারে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, দুঃখ দ্বারাই দুঃখ দুরীভূত হয়। যেমন কানে জল গেলে জল দিয়া সেই জল দুর করিতে হয়, তেমনি দুঃখ দিয়াই দুঃখকে দুর করিতে হয়। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্।

কথাটা প্রথম শুনিলে মনে হইতে পারে এ আবার কি রকম কথা? যদি দুঃখকে দুর করিতে গিয়া দুঃখই করিতে হইল, তবে সবই ত দুঃখ হইয়া গেল। যে দুঃখ দিয়া অন্য একটা দুঃখ দুর করিব. সেটা কি দুঃখ নহে? বাস্তবিক কথা তাহা নহে, যখন মানুষ দুঃখের বিরুদ্ধে দুঃখকে বরণ করে, তখন সে সুখের নব উষার আলোক-রেখাই দেখিতে পায়; অর্থাৎ মানুষ দুঃখ দ্বারা দুঃখকে দুর করিয়াই

জগতে সুখরাজ্য স্থাপন করিতে পারে। মাতা নিজের দুঃখ দিয়াই সন্তানের দুঃখ নিবারণ করেন, সাধ্বী নারী দুঃখ দিয়াই স্বামীর কষ্ট নিবারণ করেন, মাতৃভক্ত সন্তান দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াই বৃদ্ধ পিতামাতার দুঃখ দূর করেন।

ঐ যে কৃষক অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে অথবা প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত দেহে ক্লান্ত হইয়া শস্যক্ষেত্রে দারুণ কষ্টে কার্য্য করিতেছে, এই দুঃখ-ধন দিয়াই যে প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার কত আনন্দ। ঐ যে ছাত্রগণ রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার ফল বিদ্যালাভ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি পাইয়া তাহারা কত আনন্দিত হইবে। কত কষ্ট, কত দুঃখ করিয়া মানুষ ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে, যখন দুঃখ দ্বারা অর্জ্জিত ফল প্রাপ্ত হয়, তখন কত আনন্দ। মানুষ দুঃখ দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই সে আনন্দ পাইয়া থাকে। মানুষ যাহা দুঃখ দ্বারা লাভ করে না, তাহাতে তাহার আত্ম-প্রসাদজনিত আনন্দের উদয় হয় না। বিদ্যা, ধন, এবং গৌরব যেমন দুঃখ দ্বারা লাভ হয়, তেমনি ধর্ম্মও তপস্যা দ্বারা দুঃখ দ্বারা লাভ হয়।

জগতের মহাজনগণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দুঃখ দ্বারা অক্ষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। যীশু ক্রুশকাষ্ঠে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া এবং মহম্মদ দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। জগতে এমন একজন মহাজনের নাম কেহ করিতে পারিবেন না, যিনি দুঃখ দ্বারা স্বীয় কাম্যবস্তু ক্রয় করেন নাই। যেমন দুঃখ দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়, নরনারী উন্নতির উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তেমনি দুঃখ দ্বারাই অপরের দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। সভ্যতা, শৌর্য্য বীর্য্য লাভের মূলেও দুঃখ। যখন গ্রীক্ ও রোমক জাতি দৈন্যের মধ্যে বাস করিত, তখনই তাহারা নানা বিষয়ে উন্নত হইয়াছিল। যখন সেই দুঃখের স্থলে অতুল ধন সম্পদ্ এবং তাহার সহিত বিলাসিতা আসিয়াছিল, তখনই গ্রীক্, রোম বিনাশের দশায় উপনীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন দুঃখের ব্রত গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন, প্রজাপালন এবং ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তখনই ভারত-বর্ষ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বৌদ্ধযুগের পাঁচ শত বৎসরই ভারতের স্বর্ণযুগ। বর্ত্তমান জাপান দুঃখের ভিতর দিয়াই জগতের প্রবল শক্তিমান্‌দিগের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

জগতের আবিষ্কারকদিগের জীবনে দেখা যায়, তাঁহারা কত দুঃখ কষ্ট দিয়া

জগতের সুখ সৌভাগ্য বাড়াইয়াছেন। তাঁহারা নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য একটুও চেষ্টা করেন নাই। নিজের দুঃখ দ্বারা জগতের আনন্দ আনয়ন করিয়াছেন। ডাঃ লিভিংষ্টোন, ষ্টান্‌লী প্রভৃতি অন্ধকারময় মধ্য-আফ্রিকার ভৌগলিকতত্ত্ব আবিষ্কারকদিগের জীবনে দেখা যায়, তাঁহারা লক্ষ্য সাধনের জন্য কি ভীষণ কষ্ট, কি অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। দধীচি মুনি যেমন—অসুরদিগকে বধ করিবার জন্য, দেবতাদিগকে বজ্রনির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়াছিলেন, সেইরূপ কত মহাপুরুষ নব নব আবিষ্কারের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

জগতের ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক সংস্কারকগণ কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচার, কত সংগ্রাম, কত দুঃখ ক্লেশের ভিতর দিয়া লক্ষ্যপথে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে মনে হয়, দুঃখ ভিন্ন আর ইঁহাদের কোনই সম্বল ছিল না। দুঃখ ইঁহাদের বর্ম্ম, দুঃখ ইঁহাদের অস্ত্র, দুঃখই ইঁহাদের বল। দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যায় শয়ন করিয়া —পরম আরামে বাস করিয়া অর্থাৎ অন্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল নিজের সুখ অন্বেষণ দ্বারা দেবত্ব ত দূরের কথা, মানবত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঔষধালয়ের দৃশ্য বোতলের (Show bottle) ন্যায়—পটের ছবির ন্যায় তাহারা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় বাস করে।

জগতে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে। এক শ্রেণীর মানুষ পশুর ন্যায় আহার অন্বেষণ করে, সন্তান পালন করে, কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীকে মানুষ বলা যায়। ইঁহারা আত্মোন্নতি সাধন করিয়া সুখী হইতে চাহেন। সর্ব্বকার্য্যে কেবল আপনাকে দেখেন, এমন কি; ইঁহারা ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়াও কেবল আপনার মুক্তি, আপনার অনুষ্ঠান, আপনার পরকালকেই দেখেন। বিশ্বমানবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ অনুভব করেন না। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষকে দেবতা বলা যায়। ইঁহারা কর্ম্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে বিশ্বমানবের সহিত একীভূত হইয়া পরার্থে কার্য্য করিয়া থাকেন! নিজের দুঃখ দ্বারা অপরের সুখ বৃদ্ধি করাই ইঁহাদের প্রেমের সাধনা। এই শ্রেণীর নরনারীর হৃদয় হইতেই এই অমৃত বাণী উত্থিত হইতেছে,—

"দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।"

ভারতীয় সাধকগণ প্রথমে দেখিয়াছিলেন,কেবল আপনাকে এজন্য আপনাকে লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। আপনার দুঃখ দূর করিবার জন্য ধর্ম্মসাধনা

অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা জ্ঞানের ধর্ম্ম, কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম কেবল আপনাকে দেখে না, আপনাকে যেমন দেখে, পরকেও তেমনি দেখে ; বরং আপনা অপেক্ষা বেশী দেখে পরকে। প্রেম-ধর্ম্মের সাধক বুদ্ধদেব নির্ব্বাণের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মৈত্রী চাহিয়াছিলেন। যীশু আপনি জগতের পাপভার বহন করিয়া—ক্রুশকাষ্ঠে আত্ম-দান করিয়া চাহিয়াছিলেন,—জগতের কল্যাণ। এখানেই প্রেমের ধর্ম্ম জীবন্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। যিনি অপরের দুঃখের বোঝা বহন করিতে প্রস্তুত, তিনিই প্রেম-ধর্ম্মের উপাসক। প্রেম-ধর্ম্ম বলিতেছে,—

"ধনী যে তুই দুঃখ ধনে, সেই কথাটি রাখিস্ মনে,
ধুলার পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায় লড়তে হবে।"

মানুষ আপনার অশ্রুজল, আপনার রক্ত দিয়া ধুলার উপরে সত্য সত্যই স্বর্গ গড়িয়াছে। সেণ্ট্ অগষ্টিনের মাতা মণিকা দেবী কত বেদনা, কত হাহাকার, কত ক্রন্দন, কত প্রার্থনা দ্বারা পুত্রের জীবনে সুমহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। মানুষ হৃদয়বেদনা দিয়া যাহা চাহে, পরমেশ্বর তাহা না দিয়া থাকিতে পারেন না।

মূল প্রশ্নটি আবার উপস্থিত করিতেছি,—কি উপায়ে দুঃখের উপরে জয়লাভ করিতে পারা যায়? জগতের নরনারী প্রতিদিন সন্তাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা এই প্রশ্ন করিতেছে,—"দুঃখ বিজয়ের উপায় কি?" এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ষড়্দর্শন যাহা বলিতেছে, তাহা ঠিক প্রত্যুত্তর নহে।* এ শ্রেণীর দর্শনকারকগণ ইহা ভাবেন নাই যে, সমগ্র বিশ্বমানব লইয়া আমাদের জীবন।† অপরের দুঃখ দূর করিতে না পারিলে নিজের দুঃখ দূর হয় না। সকলের সঙ্গে আমরা পরস্পর অচ্ছেদ্য যোগে সংবদ্ধ। যদি কেহ অপরের দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবল নিজের দুঃখ দূর করিতে প্রয়াসী হন, তবে সেই স্বার্থপর জীবন কখনও দুঃখমুক্ত হইবে না। প্রেমের ধর্ম্ম বলিতেছে, তুমি অপরকে সুখী করিতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার দুঃখ দূর হইবে, অর্থাৎ পরোপকারেতেই সুখ। কবি অমৃতময় কণ্ঠে বলিতেছেন,—

---

* "ঠিক্ প্রত্যুত্তর নহে" না বলিয়া যথেষ্ট নহে বলাই সঙ্গত। কারণ মানব সমাজে সত্যের বিকাশ ক্রমশ হইতেছে। (সম্পাদক)

† তাঁহাদের চিন্তা ও সাধনা বিশ্ব-মানবের জন্যই। (সম্পাঃ)

"দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়া দহন করে মারতে হবে।"

দুঃখ না পেলে নিজের দুঃখ ঘুচেনা, দুঃখ না পেলে পরের দুঃখও দূর করিতে পারা যায়না। পশ্চিমদেশের বর্ত্তমান যুগের বিশ্বপ্রেমিক ভক্তশ্রেষ্ঠ টলষ্টয় আপনার জমিদারী প্রজাদিগের মধ্যে বিলি করিয়া দিয়া তিনি এই কথা বলিলেন,—"এই বিস্তৃত জমিদারী আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছেন। প্রজাগণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কেবল সামান্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ; কিন্তু ইহার মধ্য হইতে মূলধন এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিতেছেনা। আমি এই অন্যায় আচরণ দূর করিব। সম্পত্তি আমার নহে , প্রজাদের।" তিনি সমুদয় সম্পত্তি প্রজাদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। শেষে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেন ? ভিক্ষার দ্বারা নহে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজে সামান্য কৃষকের ন্যায় কৃষিকার্য্য করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন। কাউণ্ট টলষ্টয় ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য কর্ত্তন করিয়া অতি দীন ভাবে পল্লীজীবন কাটাইতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে আপনার দুঃখ দিয়া অপরের দুঃখকে দূর করা। টলষ্টয় যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, যখন তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, যখন পরিজনেরা তাঁহার নিকটে বসিয়া সেবা করিতেছিল, তখন সেই দুঃখবীর বিশ্বপ্রেমিক তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—There are mllions of suffering people in the world, why are there so many of you round me ?" "জগতে লক্ষ লক্ষ দুঃখপীড়িত মানব রয়েছে, তোমরা আমার কাছে এতগুলি লোক কেন ?" ইহাই প্রেমিক টলষ্টয়ের শেষবাক্য। টলষ্টয় দুঃখরূপ রোগ দূর করিবার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই ঔষধ এই, দুঃখ দ্বারা দুঃখ বিজয়।

হে ধনী, তোমার অতুল সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য না রাখিয়া যদি গরীবদিগের শিক্ষার জন্য, রোগীর চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিতে থাক, নিজে গরীবের ন্যায় থাকিয়া,গরীবকে উন্নত করিবার চেষ্টা কর, তবেই 'দুঃখবিজয়ী' নাম গ্রহণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পার। সিসিল রোড সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় খনির সত্বাধিকারী ছিলেন, তিনি .৪ কোটি টাকা শিক্ষাকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজে ফতুর হইয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইল "দুঃখ বিজয়ের উপায়।

জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল। নরনারী অন্নবস্ত্রের অভাবে কাতর। যাঁহারা চালের বস্তা মাথায় লইয়া কখনও নৌকায়, কখনও গলা জল ভাঙ্গিয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া চাল, বস্ত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা কি নিজের দুঃখ দ্বারা অপরের দুঃখ দূর করিলেন না?

মহামতি গান্ধি এক বেলা আহার করিয়া থাকেন। নিজে বাজার করেন। ভৃত্য রাখেন না, স্বামী স্ত্রীতে রন্ধন করেন। অতি সামান্য আহার, সামান্য বস্ত্র। তাঁহার এই বৈরাগ্য কেন? ভারতের দুঃখ দূর করিবার জন্য। তিনি বলেন, 'আমি যদি একবেলা আহার করি, তবে আমার আর একবেলার আহার্য্য দ্বারা অজ্ঞাতভাবে একটি গরীব রক্ষা পাইবে। অর্থাৎ সমর্থগণ প্রত্যেকে যদি এক বেলা আহার করেন, তবে জিনিসের মূল্য সুলভ হইবে, এবং তদ্দ্বারা গরীবদিগের উপকার হইবে।" বিদ্যাসাগর 'দয়ার সাগর' বলিয়া যে বঙ্গদেশে পূজিত, তাহার কারণ এই, তিনি আপনার দুঃখ দিয়া অপরের দুঃখ দূর করিতেন।

যখন মানুষ দুঃখ দিয়া অপরের দুঃখ দূর করিতে থাকে, তখন সে আনন্দের স্বাদ পায়। অপরের দুঃখ দূর হইতেছে দেখিয়া প্রাণে যে বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ আনান্দের উদয় হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ। দুঃখের ভিতর দিয়াই আনন্দ রাজ্য সৃষ্ট হয়—সুখের ভিতর দিয়া নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যড়্দর্শনকার বলেন,—সংসারে যে সুখ দেখিতেছ তাহাও দুঃখ; কিন্তু জ্ঞানী ভক্তগণ বলেন,—দুঃখ সুখেরই অপর মূর্ত্তি। এই তত্ত্বকথাটি কবি অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন,—

"দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায় অশ্রু মুছে মুছে,
চোখের জলে দেখ্‌তে না পাস দুঃখ গেছে ঘুচে।"

যেদিন জগতে এই শুভদিন উপস্থিত হইবে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দুঃখ দ্বারা অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইবে, সে-দিন, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এখন একটি প্রশ্নের—মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। প্রতিপক্ষ প্রশ্ন করিতে পারেন,—"মানুষ ত দুঃখের জন্য দুঃখ বহন করে না; অতএব অপরের জন্য কেন দুঃখ বহন করিব?" অপরের জন্যই হউক, নিজের জন্যই হউক, মানুষের মধ্যে এমন কি বাধ্যতা আছে যে, সে ইচ্ছা করিয়া দুঃখের বরণ করিবে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অতি সংক্ষেপে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, তথাচ একটু খোলসা

করিয়া কিছু বলা কর্ত্তব্য। এই বেদী হইতে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা সম্বন্ধে আমি একটি উপদেশ দিয়াছিলাম। তাহাতে অতি স্পষ্ট ভাষায় ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, যে, ভাব অর্থাৎ প্রেমই কর্ম্মের নেতা। এ স্থলেও সেই কথা। মানুষের মধ্যে যে প্রেম আছে, সেই প্রেম জাহাজের কলের বাষ্পের ন্যায়। বাষ্পের জোরে যেমন প্রকাণ্ডকায় জাহাজ চালিত হয়, তেমনি মানুষ হৃদয়-নিহিত প্রেমের বলে দুঃখ-সাগরে চালিত হইয়া থাকে। এবং যিনি প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন না। সেই দুঃখ তাঁহার পক্ষে সুখ। মা যে সন্তানের জন্য দুঃখ করেন, সেই তাঁহার পক্ষে আনন্দ নহে কি? জগতের নরহিতৈষিগণ প্রেমেরই উত্তেজনায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁহারা পরহিতের জন্য না করিতে পারেন, এমন কষ্টকর কার্য্য নাই; না ছাড়িতে পারেন, এমন কোন স্বার্থ নাই। সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আপনি ফকির হইতে পারেন। প্রেম হইতে যে কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তাহা সংসারের লোকের চক্ষে দুঃখময় হইলেও প্রেমিকের নিকট তাহা সুখময়, আনন্দময়। এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই প্রেমিক-চিত্ত বলিয়া উঠে, "দুঃখও আনন্দরূপমমৃতং", অতএব কথাটা এই দাঁড়াইল, দুঃখ বিজয় হইবে কিসের দ্বারা? দুঃখ দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা—যে কর্ম্মের মূলে প্রেম, সেই কর্ম্ম দ্বারা। পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, প্রেম আমাদের কর্ম্মের জনক হউক—দুঃখ-বিজয়ে আমরা অগ্রসর হই।

(তত্ত্বকৌমুদী হইতে গৃহীত)

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

বঞ্চনা

—:০:—

বঞ্চনা করিলে কেহ
বঞ্চিত না হয়;
সঞ্চিত পুণ্যের ফল
চিত্তে নাহি রয়!

চিত্তে যবে পুণ্যবল
হয়ে আসে ক্ষীণ,
জীবন আপনি তবে
হয় প্রভাহীন!
তখন তাহারে আর
কে করে বঞ্চনা;
আপনায় করে সে যে
আপনি লাঞ্ছনা!
আপনা হারায়,—সেই
বঞ্চনার সার;
বঞ্চিত তাহার সম
বিশ্বে কেবা আর?

শ্রীহেমলতা দেবী।

মনোরমা

১

প্রৌঢ় রমাকান্ত বাবু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হার্ম্মোনিয়াম লইয়া বসিলেন। নিজে দু একটি শ্যামাবিষয় গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন "মা মিনু, আয় মা।" রুনু ঝুনু মল বাজাইয়া একটি তন্বঙ্গী কিশোরী গৃহ মধ্যে আসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, "বাবা, ডাকছ?"

"হ্যাঁ মা, সেই নূতন গানটা যে শিখেছিস্ গেয়ে একবার শোনা তো মা।" বালিকা পিতার পার্শ্বে বসিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তি সদন, সাধন ধন হে,"

গায়িকার মধুর স্বর হার্ম্মোনিয়ামের পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া নামিয়া খেলা করিতে লাগিল, ভক্ত রমাকান্ত তন্ময়-চিত্তে বাজাইতে লাগিলেন। গানের অপূর্ব্ব ভাবে তাঁহার চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনোরমা গাহিতে

গাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। রমাকান্ত বাবু ত্রস্তভাবে কহিলেন,"আহা হা,থাম্‌লি কেন মিনু, কি সুন্দর গানটি মা, প্রাণ ভরে আবার গা।"

মনোরমা পুনরায় গাহিতে লাগিল, কিন্তু গান আর তেমন জমিল না, সুর কেবলই ভুল হইতে লাগিল। রমাকান্ত বাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন"কি করিস পাগ্‌লী, ঘুম পাচ্চে না কি ? এমন ভাবপূর্ণ সঙ্গীত একটু স্থির হয়ে ধৈর্য্য ধরে গাইতে পারলি না ? আচ্ছা সন্ধ্যের সময় আবার গাস, এখন যা, খেলা কর গে।"

মনোরমা চকিতে আর একবার বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল।

মনোরমার জননী সুখময়ী তখন আহারান্তে পান খাইতে খাইতে শুপারি কাটিতেছিলেন। দয়া ঝি তাঁহার একরাশি চুল কুলাইয়া দিতে দিতে মিনুদিদির বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল, মনোরমাকে সে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে যাহাতে ভাল ঘরে বরে পড়িয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই তাহার আন্তরিক কামনা।

এমন সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঘটকী সৌরভী তাহার বিপুলদেহ দোলাইয়া স্বর্ণবলয় তাগামণ্ডিত হাত দুটি নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী, "এস মা এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। দয়া ঝি "এস দিদি, অনেক দিন বাঁচবে, এখুনি তোমার নাম হোচ্ছিল" বলিয়া সম্ভাষণ করিল, সৌরভী জাকিয়া বসিয়া কহিল ;—

"আর মলেই বাঁচি দিদি, লোকের গা'ল খেয়ে আর শাপ মন্নি কুড়িয়ে কত দিন আর বাঁচবো ?"

"বালাই, মরবে কি দুঃখে দিদি, দু ঠেঁয়ের মানুষ এক ঠেঁই করতে, চার হাত এক জায়গায় করতে তোমরাই তো আছ। প্রজাপতি দেবতা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন, তোমরা ম'লে লোকে বৌ জামাইয়ের মুখ দেখবে কাদের কৃপায়?"

দয়ার এহেন সুযুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া সৌরভী অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিল, "তুমি যা বলছ তা তো ঠিক, কিন্তু পোড়া লোক সবাই কি তা মনে করে ? বিয়ের দশ বিশ বছর পরেও যদি কুটুমের কি বৌ জামাইয়ের কিছু খুঁৎ বেরুলো তো অমনি ঘটকীকে দুশো গালাগালি ; আমরা তো জানৎ পক্ষে কারও মন্দ জুটিয়ে দিই না, তারপর আপন আপন অদৃষ্ট।"

"সে তো বটেই বোন, কথায় বলে অদৃষ্টের লিখন, না যায় খণ্ডন, এখন আমাদের মিনুর যে পাত্রটির খবর এনেছিলে সে কি হোলো ?"

সুখময়ী কহিলেন, "হ্যাঁগা বাছা, সে ঘর বেশ জানা শোনা তো ? আমার তো তেমন আপনার জন কেউ নেই যে ভাল করে খুঁটিয়ে খবর আন্‌বে, উনিতো সদাশিব, এক কথাতেই হ্যাঁ দিয়ে বস্‌বেন।"

সৌরভী বিজ্ঞতার সহিত কহিল "বল কি বৌদি, তোমরা কি আমার পর ? যে জায়গার সম্বন্ধ এনেছি, ছেলে নিজেই মেয়ে দেখতে আসবে. রূপে যেন কার্ত্তিকটি, দুটো পাশ, বছরে বিশ হাজার টাকা জমিদারীর আয়,মেয়েকে হীরে মুক্তে মুড়ে নিয়ে যাবে, বাপ নেই মা আছে, মায়ের ঐ এক ছেলে, আর একটি মেয়ে, মেয়েটিও তেমনি বড় লোকের ঘরে পড়েছে, তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে বৌদি, কিছু ভেবো না, কাল সকালে আমি ছেলেকে নিয়ে আসব তাঁরও মেয়ে দেখা হবে,তোমারও ছেলে দেখা হবে।"

সুখময়ী সানন্দে সম্মত হইলেন, এমন সময়ে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় মনোরমা নিজের পোষা ময়ুরটি তাড়াইতে তাড়াইতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌরভী অনিন্দ্য-মূর্ত্তি কিশোরীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বৌদি, মেয়ে যেমন গৌরীর মতন, তেমনি মহাদেব জামাই হবে, হর গৌরী মিলন দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করবো।"

সুখময়ী হাসিয়া কহিলেন, "মহাদেবের মতন নেশাখোর যেন হয় না ঠাকুরঝি।"

২

মাতা নির্জ্জন গৃহে ফর্দ্দ করিতেছেন। কন্যা মাতার কোলে মুখ লুকাইয়া কহিল "মা, তোমরা আমার বিয়ে দিও না, আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না।"

জননী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পাগল মেয়ে, বলিস কি ? বিয়ে না করলে কি মেয়ে জন্ম কাটে ? তাতে অমন সুন্দর, রূপে গুণে ধনে মানে জামাই পাচ্ছি, ছি মা, তুমি লেখা পড়া শিখেচ, এই কি বুদ্ধিমতীর মতন কথা ? বেটের চোদ্দ বছরে পড়েছ, এ বয়সে মেয়েরা ছেলের মা হয়।"

"কেন মা ? পুলিনা, নির্ম্মলা, ওদের তো এখন বিয়ে হবে না, ওরাতো আমার চাইতে বড় ?"

"ওদের কথা আলাদা, আমরা হিন্দু, ওরা ব্রাহ্ম, ওদের ঘরে বিয়ে না হলেও নিন্দে নেই। ওসব তুলনা করতে নেই, ভালোয় ভালোয় বিয়ে হোক, স্ত্রীলোকের স্বামী সেবার চাইতে আর ধর্ম্ম নেই, মেয়ে জন্ম ওতেই সার্থক হয় মা।"

মনোরমা উঠিয়া গেল, সুখময়ীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি মনে করিলেন পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসন আশঙ্কায় কন্যার কোমলচিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে,হায় হায়! তাঁহারও কি ততোধিক কষ্ট হইবেনা ? সে তো নূতন পরিজন মধ্যে, নূতন স্নেহ-বেষ্টনীতে শীঘ্রই স্বান্তনা লাভ করিবে, আর তাঁহাদের গৃহের একমাত্র আনন্দ-পুত্তলী স্বর্ণ-প্রতিমা মনোরমা চলিয়া গেলে এ গৃহ কি অরণ্য তুল্য হইয়া পড়িবে না ? জননীর দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তিনি শুভকার্য্যে অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

৩

ফুলশয্যার রাত্রে আনন্দোৎফুল্ল সন্তোষ,স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা, নানা পুষ্পাভরণা নববধুকে সাদরে চুম্বন করিয়া কহিল, "আমায় একটা গান শোনাও, আমি তোমার গানেতেই মজেছি, আমি বড় গান ভালবাসি।"

মনোরমা স্বামীর মুখ-নির্গত তীব্র সুরার গন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিল "তুমি মদ খাও ? ছিঃ।"

সন্তোষ হা-হা করিয়া হাসিয়া কহিল "একি বড় লজ্জার কথা ? তুমি যে বড় গোঁড়া দেখছি ? তোমার বাবা কি ব্রাহ্ম না কি ? পুরুষ মানুষ মদ খাবে তাতে আবার লজ্জা কি ? আচ্ছা, বল দেখি, কদিন তুমি আমায় দেখেছিলে ? আমি তো তোমায় দেখেই ভালবেসেছিলুম, তুমিও কি বাস নি ?"

মনোরমা উত্তর দিল না, স্বামীর স্খলিত কথাগুলি তাহার কানে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল, সে যে উপর্য্যুপরি তিন দিন গান গাহিবার সময়, জানালার অনতিদূরে সন্তোষকে লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এবং সে দৃষ্টিতে তীব্র লালসার ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সন্তোষ যখন বন্ধু সঙ্গে কন্যা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার সুন্দর শ্রী-ছাঁদ দেখিয়া সুখময়ী অবশ্য অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমা তখনই তাহাতে কি দেখিয়া ছিল যে জন্য, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয় ভাবীপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে সেই জন্যই সকল সঙ্কোচ ঠেলিয়া জননীকে বলিয়াছিল, মা তোমরা আমার বিবাহ দিও না, কিন্তু হায় নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

মনোরমাকে নীরব দেখিয়া সন্তোষ আবার কহিল, "আমার বুদ্ধিকে তারিফ দিতে হয়, যেমন তোমায় দেখে মোহিত হলুম, অমনি আশ পাশ হতে তোমাদের খবরটা নিয়ে ফেললুম, সৌরভী ঘটকীকে নগদ দশটাকা হাতে

গুঁজে দিয়ে বড় বক্‌শীসের লোভ দেখিয়ে লাগিয়ে দিলুম, কিন্তু মা বেটি কি বিয়ে দিতে রাজী হয়? কত হাতে পায় পড়ে তবে মাকে রাজী করলুম। আচ্ছা যাক্; মনোরমা এখন সত্যি বল দেখি, আমায় পছন্দ হয়েছে কি না?"

মনোরমা তখন আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া, ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বেগতিক দেখিয়া সন্তোষ পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, "বুড়োধাড়ি মেয়ে, তার আবার কান্না ওসব প্যান প্যানানী আমি সইতে পারি না, মনে করেছিলুম, দুটো গান টান শুনবো, নতুন গানও দু একটা শেখাব, বাপ তো খালী বেহ্মসঙ্গীত শিখিয়েছে বই তো নয়, এ বয়সে কি আর ঐ সব ভাল লাগে? দুটো মধুর রসের গান গাইবে, যাতে প্রাণ তর্ হয়ে যাবে; নাও বাবা প্রাণ ভরে আগে কেঁদেই নাও।"

বাক্যহীনা মনোরমা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে ননদিনী হিরণ্ময়ী আসিয়া সাদরে ভ্রাতৃবধুকে চুম্বন করিয়া কহিল "বোনটি, একলা কি করছ? মুখ ধুয়ে জল খাবে চল।" ননদিনীর সাদর সম্ভাষণে মনোরমার চক্ষে জল আসিল, গত রাত্রের স্মৃতি আবার তাহার কোমলচিত্তকে পীড়ন করিতে লাগিল, মনোরমা বালিকা নহে, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বধুর মনের ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সে বুঝিল এ অশ্রু পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে সদ্য বিচ্ছিন্না বালিকার নহে, ইহা নবোঢ়ার কোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রথম তীব্র আঘাতে জাগ্রত বেদনাশ্রু। সহানুভূতিতে হিরণ্ময়ীর প্রাণ পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল, সে বধুকে সঙ্গে করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া, দাসীকে তাহার মুখ ধোয়াইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়া মাতা অন্নপূর্ণার গৃহে আসিল।

গৃহিণী বৌভাতের আয়োজনের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। হিরণ্ময়ী মাতাকে একা দেখিয়া কহিল, "মা, কাল এসে তো কোন কথা বল্‌তে পারিনি, তোমারও কি মা ছেলের সঙ্গে সঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে অমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পারলে না, শেষটা তাকে মার ধোর পর্য্যন্ত ক'রে বিদেয় করলে, তারপর আবার একটা অবলা সরলার সর্ব্বনাশ করতে বসলো? তুমি তো মা ছেলের গুণ জান? তবে কেন বিয়ে দিতে রাজী হলে? আমি যদি বিয়ের দিনও টের পেতুম তা হ'লে কি বাপ মার একমাত্র সোণার প্রতিমাকে এমনি অযোগ্যের হাতে দিতে দিতুম?"

অন্নপূর্ণা কাতর কণ্ঠে কহিলেন "বাছা, তোমায় তো কতবার আস্‌তে লিখেছি, সন্তোষকে আমি কিছুতেই শাসনে রাখতে পারছি না, দিন দিন আরও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌ছে, আমাকে আর মোটেই মানে না, বৃদ্ধ দেওয়ানজী যিনি আমার বাপের বয়সী, তাঁকেও গ্রাহ্য করে না, তোমায় যা একটু ভয় করে, তুমি থাক্‌লে হয়তো কিছু সামলে চল্‌তে পারে, তা তোমরাও আস্‌তে চাও না, বড় বৌটার দুর্গতি দেখে শেষে ভয়ে ভয়ে আমিই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম, কেন পরের বাছা অপঘাতে মর্‌বে। তারপর আবার বিয়ে করবে বলে ছেলে একেবারে খেপে উঠ্‌লো, কত বুঝালুম, কত মানা করলুম, কিছুতেই থামলো না,আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে যে এ বারে বৌ নিয়ে ভালভাবে ঘর কন্না করবে, আর কোনও বদ্ খেয়াল করবে না, কত হাতে পায়ে পড়তে লাগলো, কাজেই রাজী না হয়ে করি কি; এখন ভগবানের দয়ায় মতি গতি—"

হিরণ্ময়ী মাতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার বোধ হয় এখনও ওর কপালে অনেক দুর্গতি আছে।"

অন্নপূর্ণা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে, তুমি বাছা কিছুদিন এখানে থেকে যাও, বড় টাকা পয়সা ওড়াচ্ছে, দেনা প্রায় হাজার দশেক টাকা হয়েছে, তার তো একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে, অদৃষ্টে যে কি আছে তা জানি না, একটি ছেলে, তা এমন কুলাঙ্গার হোলো, তাঁর বংশে যে এমন সন্তান হবে এ যে স্বপ্নের অগোচর ছিল।

অন্নপূর্ণার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, মাতাকে কাতর দেখিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, "আমায় দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে, পূজার পরে এসে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে বৈ কি, সঙ্গদোষেই এতটা বেগড়াল; নইলে আগে তো বেশ শান্ত সচ্চরিত্র ছিল, পড়াশুনাও ত বেশ করছিল; সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ মা, এখন এ বৌটাকে সুনজরে দেখবে কি? তুমি মা ভাঁড়ারের জিনিষ গোছ করে বার করে দাও, আমি একবার রান্নাঘরটা দেখে আসি।"

হিরণ্ময়ী চলিয়া গেল, অন্নপূর্ণা চক্ষু মুছিয়া, মনে মনে সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিলেন।

৪

বিবাহের তিনমাস পরে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নবোঢ়া মনোরমাকে পতিগৃহে

আসিতে হইল, সন্তোষ স্ত্রীকে কহিল, "আমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাঁরা সন্ধ্যার সময় আসবেন, তুমি প্রস্তুত থেকো।"

মনোরমা সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল "সে হবে না, আমি কারও সঙ্গে আলাপ করতে চাই না।"

"ইস্" এখনই এত ফোঁস্ ফোঁসানি? মেয়ে মানুষের এত তেজ? স্বামীর কথা অমান্য করা? আমার কথা না মেনে চললে কিন্তু ভাল হবে না জেন।"

মনোরমা নিরুত্তরে গৃহ হইতে চলিয়া গেল, সন্তোষ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, এবং আপন মনে কহিল "দেখা যাক্ এ তেজ ভাংতে পারি কি না, সাধে কি আর বলে—'হলুদ জব্দ শিলে,আর বৌ জব্দ কীলে,' আমার কাছে রূপ যৌবনের মটমটানি খাটবে না চাঁদ।"

* * * * *

বাড়িতে পূজা, মহা সমারোহে চৌধুরীদের বাড় বহুদিন হইতে পূজা হইয়া আসিতেছে, পুরাতন দেওয়ান হরিশঙ্কর বাবু স্বর্গীয় প্রভুর সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইলেও প্রতীকারের তিনি কোনও উপায় পান নাই। এই পবিত্র মাতৃপূজার দিনে, সে স্বচ্ছন্দে বহির্ব্বাটীর সুসজ্জিত কক্ষে বন্ধু বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রসিদ্ধা গায়িকা ও নর্ত্তকী মেহেরজানকে লইয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছে। সুরার স্রোত অবাধে বহিতেছে। সঙ্গীগণের উচ্চ হাস্যধ্বনি ও মাঝে মাঝে ভীষণ হাততালির শব্দে গায়িকার মধুর কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ নৃত্য গীতের পর শ্রান্তা মেহেরজান মখমলের তাকিয়া হেলান দিয়া রূপার ফরাসীতে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। সুরসিক কোনও ব্যক্তি রুমালের দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ বা খানিকটা এসেন্স মেহেরজানের গায়ে ঢালিয়া দিয়া তাহার চিত্তবিনোদনে প্রয়াস পাইল।

সন্তোষ কহিল "বিবিজান, তুমি চুপ করে থাকলে এ ঘরে যে টেঁকা দায় হয়, তুমি মধুরকণ্ঠে আবার গান ধর, প্রাণটা জুড়িয়ে যাক, নইলে যে সব মজা মাটী হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া, কটাক্ষ হানিয়া, অভিমানের সুরে মেহেরজান কহিল "বাবুজী, আপনি বড় মহৎ লোক, আপনার মত দিলদরিয়া লোক খুব কমই এই কলিকাতা সহরে আছে, আপনি আমায় বড় মেহেরবাণী করেন, সেই

জন্যে আপনার কাছে আমার নালিস আছে। যদি অনুমতি করেন, নিবেদন করি।" বাইজী স্বহস্তে বোতল হইতে সুরা ঢালিয়া, গ্লাসটি সন্তোষের মুখের নিকট ধরিল, সন্তোষ এক নিশ্বাসে পান করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই শুনবো, কি তোমার নালিস বিবিজান ?"

"আপনি আবার বিবাহ করেছেন, স্ত্রীটি শুনছি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী, তা আপনার হাত ঝাড়লে, আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই, আমার পাওনা বক্‌শীস বাকী আছে, এই পূজার সময় সেটা শোধ করে ফেলুন।"

সন্তোষের মাথা ঘুরিয়াগেল। তাহার তহবিলে যে কপর্দ্দক শূন্য, ঋণে সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কিরূপে সে এখন চারুহাসিনী, বরাঙ্গিনী বাইজীর মান রাখিবে ? বিশেষ মেহেরজানকে কিছু অল্প মূল্যের কোন জিনিষ দেওয়া যাইতে পারে না, এবং সেটা সন্তোষেরও পদোচিত হইবে না, পরে দিব বলিলে বন্ধু-সমাজে উপহাস ভাজন হইতে হইবে, অতএব কি করা যায়, সন্তোষ ইহাই ভাবিতে লাগিল।

সন্তোষকে নিরুত্তর দেখিয়া, বাইজী মৃদুহাসিয়া, মধুরস্বরে আবার কহিল, "সন্তোষ বাবু কি ভড়কে গেলেন ? ভয় পান তো আমি অভয় দিচ্ছি, আপনি কিছু মনে করবেন না. আপনার কাছে কতবার পেয়েছি বলেই চাইছি; আপনার মতো সদাশয় লোকের কাছে চাইব না তো আর কার কাছে চাইব ? তা আপনার যদি এমন কোনও অসুবিধা থাকে, তা হলে আমি চাই না।"

পূর্ব্বেকার যাচঞা অপেক্ষা, মেহেরজানের এই অভিমানমিশ্রিত কথা গুলিতে সন্তোষ অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িল. সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, দিতে আর অসুবিধা বা আপত্তি কি,তবে তুমি কি চাও সে-টা জানতে পারলে—"

ইত্যবসরে বাহির হইতে দরোয়ান হাঁকিল "হুজুর, বৌ রাণী মাইকো গহনা লেকে গিরীশ আয়া হ্যায়।"

সন্তোষকে উঠিতে দেখিয়া, একজন বন্ধু কহিল, নিজে যাবার দরকার কি ? সেক্‌রাকে ডেকে পাঠাও না ?"

"দরোয়ান, গিরীশকে এইখানে পাঠিয়ে দাও।"

গিরীশ স্বর্ণকার বহুবৎসর হইতে এ বাড়ির গহনাদি গড়িয়া আসিতেছে, সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা নিজেরই হার ভাঙিয়া নব বধুর জন্য,নূতন ধরণের নেকলেস গড়িতে দিয়াছিলেন।

গিরীশ তাহা লইয়া আজ আসিয়াছে। সন্তোষকে নর্ত্তকী ও পারিষদ বেষ্টিত দেখিয়া গিরীশ কহিল "আমি বাড়ির ভিতরেই যাচ্ছি, মা-ঠাকরুণকে দেখাব।"

কয়েকজন অমনি বলিয়া উঠিল "কি জিনিষ একবার আমরা কি দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারি না? দেখাও না বাবা।" গিরীশ বাধ্য হইয়া, বাক্সটি খুলিয়া ধরিল। হীরক-লকেট সংযুক্ত, মুক্তাখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণহার ঝক ঝক করিয়া উঠিল, সকলেই গিরীশের নির্ম্মাণনৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। মেহেরজান লুব্ধ নয়নে হারছড়াটির দিকে চাহিয়া কহিল, "সন্তোষ বাবু, এ হার পরলে বৌ রাণীর সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়বে নয় কি?"

সন্তোষ সে উপহাসের মর্ম্ম বুঝিয়া কহিল, "গিরীশ তুমি যাও, হার আমি মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" অনিচ্ছা সত্ত্বে গিরীশ সন্তোষের হাতে গহনা দিয়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেল।

একজন কহিল "সন্তোষ বাবু, বাইজীর গলায় একবার পরিয়ে দেখুন না, বাহার টা কেমন খোলে, তা থেকে আপনি মিসেস চৌধুরীর সৌন্দর্য্যটাও আইডিয়া করে নিতে পারবেন। পরালে তো আর ক্ষয়ে যাবে না, বাইজীও কেড়ে নেবেন না।"

সন্তোষ বিনা আপত্তিতে স্বর্ণহার সুপ্রসন্না বাইজীর কণ্ঠে পরাইয়া দিল, বাইজী, হাস্যমুখে পুনরায় স্বহস্তে সুরা ঢালিয়া সন্তোষের হাতে দিয়া কহিল, "আপনার কি খোলা প্রাণ, কি খোস মেজাজ্, অনেক বড় লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো কারও হাত দরাজ দেখি নি।"

সন্তোষ পানপাত্র গলাধঃকরণ করিয়া কহিল, "বা মেহেরজান, বেশ মানিয়েছে, ঠিক যেন পরীস্থানের নীলপরী উড়ে এসে বসেছে, তবে এই হারই তোমার বকসীস হোলো, এখন নালিস মিটল তো?"

চারিদিকে চটাচট হাততালির ধুম পড়িয়া গেল, "ব্রেভো সন্তোষ বাবু" বলিয়া কেহ রসভ চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাইজী নমস্কার করিয়া জোড়হাতে সন্তোষকে কহিল "আমি আপনার দাসী বলে মনে রাখবেন, আপনার দান আমি মাথা পেতে নিয়ে ধন্য হলুম, আপনি বৌ-রাণীকে আবার দুএকদিনে নতুন হার গড়িয়ে দেবেন; তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন, তাঁরই জন্মে এ হার পেলুম—আপনার দয়াকে শত ধন্যবাদ।"

স্বর্ণহার ছড়াটির মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

দেবকুমার

রাজা দেবকুমারের নিকট হইতে রাণীর মহলের দিকে চলিয়া গেলেন। আজ তাঁহার সে গর্ব্বিতভাব আর নাই। এতদিন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিলেন। আজ তাহা একটি আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং রাণীর প্রতি নিজের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছেন। লজ্জায় পদে পদে যেন বাধা পাইতে লাগিলেন। রাণীর কক্ষের নিকটে গিয়া নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী তখন গৃহমধ্যেই ছিলেন। পুত্রটি তাঁহার নিকটেই খেলা করিতে ছিল। অনেক দিনের পর রাজা আজ রাণীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন. তাঁহার আর সে পূর্ব্ব শ্রী নাই। শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। বেশ-বিন্যাসের তেমন পরিপাট্য নাই, কেবল মাত্র সধবার চিহ্ন স্বরূপ সামান্য দুই একখানি অলঙ্কার তাঁহার অঙ্গে রহিয়াছে।

রাজাকে দেখিবা মাত্র তাঁহর পুত্র—"বাবা এসেচেন, বাবা এসেচেন" বলিতে বলিতে রাজার নিকট ছুটিয়া আসিল। রাজার ক্রোড়ে উঠিয়াই বলিতে লাগিল, "বাবা তোমাকে কতদিন দেখি না কেন? তুমি কোথায় যাও, আমাকে নিয়ে যাও না কেন? চাকরের সঙ্গে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না, আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমি মার কাছে বসে কত গল্প শুনছিলাম, মা আর এখন বেশী গল্প করতে পারেন না, একটুতেই কেঁদে ফেলেন, আমারও কান্না পায়।

সন্তানের প্রত্যেক কথা রাজার মনে কাঁটার মতো বিদ্ধ করিতে ছিল. রাজা তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিলেন. "আচ্ছা বাবা তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। তুমি সহিসকে তোমার ঘোড়া ঠিক করতে বলে দিও। এখন একটু বাহিরে গিয়ে খেলা কর।"

রাজা বিষণ্ণভাবে শয্যায় বসিলেন। রাণী তাঁহার এই ভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

রাজা। না, আমার শরীর ভাল আছে।

রাণী। তবে কি নূতন কোন ঘটনা হয়েছে? ষ্টেট্ তো গবর্ণমেন্টের হাতে গেল। নিজের স্বাধীনতা আর কিছু থাকল না। অবশ্য এতেও তোমার মনে কষ্ট হোতে পারে।

রাজা। ষ্টেট্ আজ না হয় দুদিন বাদে ফিরিয়ে পাব। সেজন্য তত দুঃখ করি না। আমি অনেক দিন হোতে তোমাকে অনাদর কোরে যে দুষ্কার্য্য করেছি, সে ভুল এতদিনে আমি এখন ঈশ্বর-কৃপায় বুঝতে পেরেছি। সেজন্য আমার মন অতিশয় অনুতপ্ত হোচ্ছে। তুমি আমার গত অপরাধ সকল ক্ষমা কর।

রাণী ক্ষণকাল চুপকরিয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি একটু আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলেন "আমার বড় ভয় হোচ্ছে, তুমি সেই পাপ প্রলোভন একেবারে কেমন কোরে এড়াবে?"

রাজা। দেখ, মানুষ যে বিষয় যতক্ষণ না বুঝিতে পারে, ততক্ষণ তার নিকট সেটা কঠিন থাকে, কিন্তু একবার সত্য ভাবে সেবিষয় বুঝলে আর সে জন্য তার ভয় থাকে না।

রাণী। তুমি এখন কি রূপে সেই পাপের সংশ্রব ত্যাগ করবে তার কি কিছু স্থির করেছ? মিস্ আয়ার কি তোমাকে সহজে ছাড়বে?

রাণী। আর আমি তাদের সঙ্গে কখনও কিছুতেই দেখা করব না। তারা আমার কি করবে? তবে কিছু অর্থের ক্ষতি হয়তো আরো হবে।

রাণী। তা হউক, আমি অর্থ চাই না. কেবল তোমাকেই চাই। রাণী মনের আবেগে এই কথা বলিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা আর থাকিতে পারিলেন না, শয্যা হইতে নামিয়া রাণীর হাত ধরিয়া শয্যার উপর আপন পার্শ্বে বসাইলেন।

আনন্দে রাণীর চক্ষের জল আর বাঁধ মানিল না। তিনি রাজার পায়ের ধুলা লইয়া আপন মস্তকে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন. "তোমার ভালবাসা ফিরিয়ে পেলাম, এ আনন্দ আমি রাখতে পারছিনা। তোমার দোষের কথা আমার কিছু মনে পড়ছে না। তুমি আমার ছিলে আবার আমার হোলে। আগে যা হবার হয়েছে,সে কথা আর মনে কোর না। তোমার ভালবাসা পেয়েই আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হোল। আজ যে কি আনন্দ হোচ্ছে, তোমায় কি বলিব। যদি রাজ্য থাকিত, আজ দেওয়ানকে প্রজাদের এক বৎসরের খাজনা ছেড়ে দিতে বলতাম।"

রাণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "দেখ তুমি যেদিন আমাকে বললে, আয়ারের মেয়ের পায়ের যোগ্য আমি নই—"

রাজা। আর সে কথা কেন তুলছ, সে কথা মনে করলে আমি তোমার দিকে তাকাতে পারিনা, ও কথা তুলে আর আমার মনে কষ্ট দিওনা।

রাণী। না, শোন! তোমার কথা শুনে আমার মনে এমন কষ্ট হোল যে, আমি স্থির করেছিলাম আত্মহত্যা কোরে সকল কষ্ট দূর কোরব। কিন্তু সন্তানের দিকে তাকিয়ে পারলাম না। যখন আমার মন কিছু শান্ত হোল তখন আমার মনে হোতে লাগল যে, তুমি অনেকটা ঠিক কথাই বলেছ। আমি এতদিন ভেবেছিলাম যে তোমার ভালবাসার উপর আমার দাবী আছে। কিন্তু তোমার ভালবাসা পেতে হোলে, আমায় তোমার মনের মতো হওয়া উচিত, তা মনেই করতাম না। যদি আমি তোমার মনের মতো হোতে চেষ্টা করতাম তা হোলে তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারতাম। তুমি যে সকল সংস্কারের কথা বলতে কিন্তু আমি মূর্খ, তার মর্ম্ম ভাল বুঝি না. তোমার কথার কি জবাব দিব? তুমি দেশের কুসংস্কার ছেড়ে আমাকে যে ভাবে পেতে চাইতে, আমি আমার চিরকালের কুসংস্কার ছাড়তে চাইনা, সেই জন্য মনে হয়, আমিই তোমার কাছে অপরাধী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি এখন হোতে যাতে তোমার মনের মতো হোতে পারি তার চেষ্টা করব। যদি কখনও ত্রুটি হয় আমাকে মার্জ্জনা কোর।

রাজা। মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বেশ আমি তার জন্য বন্দোবস্ত করব। কিন্তু তোমার পবিত্র ভালবাসাই আমার নিকট অধিক মূল্যবান।

রাণী। তা যাই বল না কেন, আমার অহঙ্কার ঘুচেচে। আমার এখনও বয়স আছে, মনের শক্তি আছে, আমি যাতে আত্মোন্নতি করতে পারি, আজ হোতে তার চেষ্টা কোরব। ভেবেছিলাম যদি তোমাকে একবার ফিরাতে পারি, দেখব তোমার মন আমি অধিকার করতে পারি কি না। সেই জন্য আমি কত চেষ্টা করেছি। সেদিন দেবকুমার বাবুকে পর্য্যন্ত ডাকিয়ে, তোমাকে সৎপথে আনবার জন্য বলেছিলাম।

রাজা। দেবকুমার বড় ভাল লোক। আমার মত পরিবর্ত্তনের মূলই সেই ব্যক্তি। দুঃখের বিষয় এখন রাজত্ব নাই, তাকে আর কোন রূপ সাহায্য করতে পারছিনা।

পরদিন রাণী দেওয়ানকে ডাকিয়া নিজের নিকট হইতে ৫০০১ টাকা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে দিলেন।

১৮

অনাদিনাথ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিল। গবর্ণমেণ্ট বীণাপুরমের

রাজার আয় ব্যয় দেখিবার জন্য একজন হিসাব পরীক্ষক পাঠাইলেন। হিসাব পরীক্ষক আয়ব্যয়ের সহিত এই রিপোর্ট দিলেন যে, আয় ব্যয়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যদি অবিলম্বে এরাজ্যের ভার না লন, তাহা হইলে শীঘ্রই এ রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজ তহবিলে টাকা নাই, অথচ ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রহিয়াছে ; ব্যাঙ্ক ফেল হইলে রাজার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি টান পড়িবে।

গবর্ণমেণ্ট সেই বিবরণ পাইয়া রাজাকে মাসিক ভাতা দিয়া রাজ্যের ভার অস্থায়ী ভাবে নিজের হস্তে লইলেন।

এদিকে মিষ্টার আয়ার ও মিস্ আয়ার আর কিছুতেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পান না এবং হিসাব পরীক্ষক আসিয়া যে রিপোর্ট দিল, তাহাও জানিতে পারিলেন। এই সকল দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল নিশ্চয়ই দেবকুমার ইহার মধ্যে আছে। একদিন দেবকুমারকে ডাকিয়া মিষ্টার আয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গবর্ণমেণ্টকে গোপনে বীণাপুরমের রাজা সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে, তুমি জান?" দেবকুমার কহিলেন, "আমি দিই নাই, এইমাত্র বলতে পারি। তার অধিক আর কিছু বলতে পারি না।"

আয়ার। যেই লিখুক ; তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছ। ঘরের শত্রুকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। তোমার এখানে কাজ করা আর পোষাবে না। তুমি এখানে থাকলে বিপদে পড়বে।

দেবকুমার। আমারও আর এখানে থাকবার ইচ্ছা নেই। আমার টাকাটা পেলেই কালই চাকরি ছেড়ে দিতে পারি।

আয়ার। টাকার কথা আমি এখন কিছু বলতে পারিনা। তোমার হিসাব পরীক্ষা না করলে আমি টাকা দিতে পারি না।

দেবকুমার। হিসাবে প্রতিদিন আপনার সহি আছে, তার জন্য আমি দায়ী নই। আমার টাকার সম্বন্ধে যদি কিছু গোল করেন, আপনার বিপদ হবার সম্ভাবনা। পরিয়াদের সঙ্গে মিশে আপনার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জেনেছি ; যা প্রকাশ হোলে, আপনার বিশেষ ক্ষতি হবে।

মিঃ আয়ার আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিয়া দিলেন, "তুমি এখন যেতে পার কাল ব্যাঙ্কে তোমার সঙ্গে কথা হবে।"

এই ঘটনার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে দেবকুমার অনাদিনাথের বাসায় আসিয়াছিলেন। অনাদিনাথের একা থাকিতে অসুবিধা হয় ; এই কথা বলিয়া তিনি মিঃ আয়ারের গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

মিঃ আয়ারের গৃহ হইতে বিদায় লইয়া তিনি নূতন বাসায় আসিতেছেন, এমন সময়ে একটি মন্দিরের নিকট দেখিলেন যে একজন জীর্ণ শীর্ণ লোক মন্দিরের সোপানের নিকট শুইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—

"আমার বড় দুর্ভাগ্য। আমি এখন আমার পাপের ফল ভোগ করছি। আমি ব্রাহ্মণ, আমার বাড়ি ব্রহ্মপুর--গঞ্জাম জিলায়। একবার বড় দুঃখে পড়ে আমি তাঁতির ভাত খেয়েছিলাম। সেই পাপে আমার স্ত্রীপুত্র সব মারা গিয়েছে, আমিও নিজে ব্যারামে ভুগছি। তাই পাপ মোচনের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করব। এখন সেতুবন্ধে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। দেবকুমার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মানুষ সংস্কার বশে কত কি মনে করতে পারে? তিনি তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন. "তুমি মিছে সংস্কার বশতঃ এমন মনে করছ, তুমি যদি তাঁতির ভাত না খেতে, তা হোলেও তোমার এ অবস্থা হোত। এইত দেখ না ব্রাহ্মণরা মুসলমানের হাতে ও কায়স্থের হাতে খাচ্ছে, কত লোকে মুরগী. গরু, খাচ্ছে কিন্তু তাদের কি সকলের স্ত্রীপুত্র মরছে?"

কিন্তু সে তাহা বুঝিল না; সে নিজের পাপের কথা বলিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। দেবকুমার তাহাকে কয়েকটি পয়সা দিয়া চলিয়া আসিলেন।

বাসায় আসিয়া অনাদিনাথকে কহিলেন, "আমার মাদ্রাজের যবনিকা পতন হোল। মিষ্টার আয়ার আমাকে কাজ হোতে জবাব দিলেন।"

অনাদি। সেকি? এত শীঘ্র? আজ বিশেষ কিছু হয়েছে না কি?

দেবকুমার। সেই যে তুমি বীণাপুরম রাজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে চিঠি লিখেছিলে, মিঃ আয়ার সন্দেহ করেছেন যে আমি তার মধ্যে আছি। সে সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বলি নি। শেষে আমি বললাম আমার টাকাটা দিলেই আমি চলে যেতে পারি। তিনি আমাকে হিসাবের গোলে ফেলতে চান, কিন্তু বোধ হয় তা সাহস পাবেন না।

অনাদি। তুমি মাদ্রাজ ছাড়বে কেন? আমার ব্যবসায়ে তোমাকে অংশী কোরে নিচ্ছি। তুমি পারিয়াদের মধ্যে যে কাজ করছ তা যদি ছেড়ে দিয়ে যাও তা হোলে সব নষ্ট হবে।

দেবকুমার। সে বিষয়ে আমি তোমার উপর নির্ভর করছি। তুমি এ কাজ গুলির ভার নিলে, আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে যেতে পারি।

অনাদি। মিঃ আয়ারের সঙ্গে তোমার বিবাদ হয়েছে, কিন্তু মাদ্রাজ তো

কোন দোষ করে নি। আমার সঙ্গে ব্যবসায়ে যোগ দাও। দুইজনে যদি এক সঙ্গে মিশেছি, তবে আর পৃথক হবো কেন?

দেবকুমার। বন্ধু, তোমার দয়ার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তোমার এত আগ্রহ দেখে আমার এক একবার ইচ্ছা করছে যে তোমার সঙ্গে থেকে যাই। কিন্তু তুমি আমার বাল্য জীবনের কথা সমস্ত বোধ হয় জান না। আমার জীবনের ইতিহাস শুনলে, কেন যে তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করছি তা বুঝতে পারবে।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার গত জীবনের ইতিহাস বলিলেন। তিনি আরও কহিলেন, মিষ্টার বোসকে আমি পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি। তাঁর নিকট যে স্নেহ পেয়েছি, পৃথিবীতে আর কেহ আমাকে তা করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি তিনি স্বর্গে থেকে আমার কল্যাণ কামনা করছেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে সমগ্র জীবনদ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করব। তিনি যে বলেছিলেন, "বাছা তুমি ভাল হও, ইহা অপেক্ষা আর কিছুতে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।" সে কথা সকল সময়ে আমার প্রাণে জাগছে। আমি একা মানুষ, আমার এত অভাবই বা কি আছে? তিনি যে টাকা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, তাতেই আমি নিজের মত ব্যবস্থা করে নিতে পারি। কিন্তু কিসে আমা দ্বারা অপরের কিছু সেবা হোতে পারে, এই চেষ্টা না কোরে কিছুতেই আমি স্থির থাকতে পারি না।

অনাদি। তা হোলে তুমি মাদ্রাজ ছাড়তে চাও কেন? এখানেত তোমার জীবনের উদ্দেশ্য অনুরূপ কাজই করছিলে?

দেবকুমার। ভাই আমার হৃদয়ের আর একটি কথা শুনলে তুমি সমস্তই বুঝতে পারবে। আজ মিঃ আয়ারের গৃহ হোতে আসবার সময়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। গঞ্জামের একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে দিনপাত করে। দেখলাম মন্দিরের দ্বারে বসে ভিক্ষা করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বললে, সে তাঁতির ভাত খেয়েছিল বলে সেইপাপে তার স্ত্রীপুত্র মরে গিয়েছে, এবং সে পাপ মোচন করবার জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছে। তুমি জান আমি নিজে হীনজাতি। যে ভিক্ষা কোরে খায় সে পর্য্যন্ত আমাদের হেয় ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে! এ অপবাদ ঘুচাতেই হবে। চণ্ডালেরা কি মানুষ নয়, তাদের মধ্যে কি সৎভাব নেই, তারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়? আমি তাই মনে করেছি দেশে গিয়ে নমঃশূদ্রদের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করব। অনেক অসুবিধা হবে, বুঝতে পারছি, কিন্তু বাংলা দেশে যে

আমাদের পারিয়াদের মতো কোরে রাখবে তাহা সহ্য করতে পারছি না। তুমি যদি আমার এখানকার কাজ গুলির ভার লও, তাহা হোলে আমি আমার সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করতে পারি।

দেবকুমার নিরবে বন্ধুর কর মর্দ্দন করিলেন, এবং উভয়েরই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

পরদিন দেবকুমার ব্যাঙ্কে মিঃ আয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বিনা আপত্তিতে দেবকুমারের টাকা দিয়া দিলেন। হিসাব নিকাশের কারণ দেখাইয়া তাঁহার টাকা বন্ধ করিতে সাহস পাইলেন না।

দেবকুমার বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানী ফেল হইয়া গেল। কত নিরাশ্রয় বিধবা অনাথা হইল। মাদ্রাজে এক মহাআন্দোলন উপস্থিত হইল। মিঃ আয়ার, রাজা ও দেবকুমারের দোষ দিতে লাগিলেন। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিলনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। (বি এ)

বিবিধ

গোবধে ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মের অনিষ্ট,—বাংলা দেশের মুসলমান চালিত সংবাদপত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের পর্ব্বোপলক্ষে গোবধ সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি করেন তাঁহা যুক্তি সঙ্গত নয়। কলিকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য সহরে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানদের জন্য প্রত্যহই গোবধ হইতেছে, এবং বাজারে গোমাংস বিক্রয় হইতেছে, এবং তদনুরূপ হিন্দুদের জন্য ছাগ ও মেষ বধ হইতেছে, এবং ঐ মাংস প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং জীবহিংসায় হিন্দুদের কোন আপত্তি নাই। মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানদের জন্য প্রত্যহ গোবধ ও গোমাংস বিক্রয়েও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, শুধু বকরিঈদ্‌ প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে গোবধ করিলেই হিন্দুদের আপত্তি। ইহা দেখিয়া মুসলমানরা বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মপালনে হস্তক্ষেপ করা হিন্দুদের নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবহার। মুসলমানেরা আরে বলেন যে, গোবধ যেমন একশ্রেণী হিন্দুর পক্ষে আপত্তি জনক, ভগবানের মূর্ত্তিস্থাপন করিয়া তাহাকে পত্র ফলমূল দিয়া পূজা করাও মুসলমানদের পক্ষে তেমনি আপত্তিজনক।

কিন্তু তাঁহারা তো কোন গ্রামবাসী হিন্দুর প্রতিমাপূজায় বাধা দেন না। তবে হিন্দুরা মুসলমানদের পর্ব্বোপলক্ষে গোবধে বাধা দিবেন কেন? দুগ্ধদানে বা হল-বহনে অসমর্থ হইলে গো সকলকে ভাল করিয়া খাওইয়া মুসলমানেরা তাহা আহারার্থ বধ করেন। আর হিন্দুরা এই অবস্থায় গরুকে প্রথমতঃ অর্দ্ধাহার অবশেষে অনাহারে রাখিয়া প্রাণে মারেন। মুসলমানেরা বলেন, গোজাতির উপর নিষ্ঠুরতার হিসাবে তাঁহাদের ব্যবহার হিন্দুদের ব্যবহার অপেক্ষা শতগুণ কম নিষ্ঠুর। মুসলমানেরা যাহা বলেন, তাহা যে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত, তাহা স্বীকার করি। তথাপি আমরা বলি আফগানিস্থানের মহামান্য আমীরের উপদেশানুসারে মুসলমানেরা ধর্ম্মের জন্য গোবধ না করিয়া মেষ ছাগাদি বধের প্রথা প্রচলিত করিলে, ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই মঙ্গল হইবে।

বেদান্ত বা উপনিষদ-সিদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিমাপূজা বা জাতিভেদ নাই, সুতরাং ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহিত কোন বিরোধ নাই। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না বলিয়া বাংলায় অধিকাংশ হিন্দু তৎপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী। হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের এই সাধারণ ভূমিতে একাসনে বসিতে পারেন। ইহাতে হিন্দুর প্রতিমা পূজা নাই; মুসলমানের গোমাংস ভক্ষণ নাই। উচ্চশ্রেণী বা শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যেও আহার বিহার ও বিদেশ গমন সম্বন্ধে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে. সুতরাং হিন্দু মুসলমানের এক নূতন সাধারণভূমি দিন দিন প্রসারিত হইতেছে কিন্তু মুসলমানদের গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুর পক্ষে মহাবিঘ্ন হইয়া রহিয়াছে ইস্‌লাম ধর্ম্মের শত শত গুণ হিন্দুর নিকট এই দোষে মলিন হইয়া গিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিম্নশ্রেণী হিন্দুর জলগ্রহণ করেন না; এমন কি কোন কোন জাতির লোককে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া থাকেন। এই প্রকার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু যদি মুসলমানদের পর্ব্বোপলক্ষে গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণের নিয়ম না থাকিত তাহা হইলে আমার বোধ হয় যে তাহারা খৃষ্টের পরিবর্ত্তে মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। কারণ মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় এমন সাম্যের ধর্ম্ম আর জগতে নাই। কাবুলের আমীর আসিয়া মুজুর মুসলমানের সহিত বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন। ভারতবর্ষে তো কত খৃষ্টীয়ান রাজা ও সম্রাট্ আসিয়াছেন। তাঁহারা কবে সামান্য দেশী খৃষ্টীয়ানের সহিত একাসনে বসিয়া উপাসনা করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে যাহারা নিপীড়িত হইতেছে, ইস্‌লাম ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের নিপীড়নের অবসান হয়।

ভাগলপুরের হিন্দু মহিলার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ তাহার প্রমাণ। কিন্তু মুসলমানের গোবধ ও গোমাংসাহার নিপীড়িত হিন্দুর পক্ষে ইস্‌লাম গ্রহণে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানদের ন্যায় খৃষ্টীয়ান্‌দের পক্ষে গোমাংসের অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মকার্য্য নয়। এই বিভীষিকা না থাকায় কেহ খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় না। আমি এই জন্য বলি যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের কল্যাণার্থে মুসলমানেরা যদি বাংলা দেশে ঈদ্‌ প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে গোবধ ও গোমাংসাহরের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ছাগ মেষাদি বধের নিয়ম করেন, তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু উৎপীড়িত হিন্দু দ্বারা তাঁহাদের সম্প্রদায় অধিকতর পুষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। (সঞ্জীবনী) শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ওলাউঠার ঔষধ। চকদিঘীর জমিদার রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত ঔষধটি শিক্ষা করিয়া বহুতর কলেরার রোগীকে ব্যবহার করাইয়াছেন। তাহাদের অনেকে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তিনটি পাথর কুচির পাতা ৩টি গোলমরিচের সহিত জলে বাটিয়া পূর্ণবয়স্ক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনেক স্থলে এক মাত্রাতে আরোগ্য হয়, একমাত্রায় আরোগ্য না হইলে আবশ্যক মত আরও দিবে; তবে ক্রমে মাত্রা কমাইয়া দিতে হইবে। (বাঙ্গালী)

মুক্তিফৌজের কাজ—ভারতবর্ষের মুক্তিফৌজের কাজ করাইবার জন্য কমিশনার মিচেল ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আসিতেছেন। মুক্তিফৌজ যে কত রকম কাজ করেন তাহা সকলের জানা নাই। তাঁহাদের রেশমের কারবার আছে। তাহা ছাড়া তাঁহারা ফলের চাষ করেন। অপরাধী বালকদিগকে কাজকর্ম্ম শিখান, দুষ্কৃতান্বিত জাতি সকলকে নানারূপ শ্রম শিল্প শিখাইয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা গরীবলোকের অনেকরকম উপকার করেন।

নিবেদন

খুঁজে ছিল কিগো স্নেহমাখা কার দুখানি করুণ আঁখি,
কম্পিত করে খুলি বাতায়ন দুয়ারে-শ্রবণ রাখি।
চেয়েছিল বুঝি বারেকের তরে হেরিতে পথের মাঝে,
অই যে আসিছে চপল-চরণে ধূলিভরা হীনসাজে।

উতল নিশাস পাগল বাতাসে মিশে আছে ভাবি মনে,
সুধাইয়াছিল বুঝি ধীরে ধীরে প্রভাতের সমীরণে,
মধু-কণ্ঠের মঞ্জু রাগিণী স্বরগের বীণা তান,
শুনেছিল মোর উচাটন হিয়া পাতিয়া অযুতকান।
বুঝেছিল বুঝি নীরব-উষার বিমল গগণ তলে,
বাজিয়া উঠিবে ঝঙ্কার তব, মরম তন্ত্রীদলে।
শুনগো আমার নিবেদন টুকু—ক্ষম অপরাধ মোর,
লহ গো চরণ ধোয়াতে আমার এ দীন-নয়নলোর।

প্রীতিবালা সরকার

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

মাটিকোমরা,—কুশদহের মধ্যে মাটিকোমরা একখানি অন্যতম প্রাচীন গ্রাম। ইহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত তাহা বলা সুকঠিন। এই গ্রামটি যমুনা নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে এক মাইল ও প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল মাত্র। যমুনা নদী এখানে যেরূপ গভীর এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে এখনও ১৫।১৬ হাত জল থাকে। ঘটকেরা ও বাগ্যকরেরা এই গ্রামের আদিম অধিবাসী ছিল, পরে অন্য ব্রাহ্মণগণ এখানে আসিয়া বাস করেন।

"বাঁস বাজ্‌নে ঘটকেরা
তিন নিয়ে মাটিকোমরা।"

অর্থাৎ এখানে বাঁস যেরূপ বড় ও বহুল, কুশদহে এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। বাজনদার এখানে পূর্ব্বে অনেক ঘর ছিল। মাটিকোমরার নিকট পশ্চিম দিকে হিংলাট্ নামক একটি গ্রাম আছে। তথায় মাটী খনন কালে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও অতি প্রাচীনকালের ইষ্টক সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ইহাতে বোধ হইতেছে হিংলাট এককালে সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল। হায়! কালের কঠোর কুঠারাঘাতে তাহা বিস্মৃতির অতলজলে নিমর্জ্জিত হইয়াছে। কে বলিতে পারে যে এই মাটিকোমরা এককালে ধন জনে পরিপূর্ণ ছিল না! রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের পূর্ব্বে ইহা যে ব্যবসায় প্রধান

স্থান ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে! রামভদ্রের পূর্ব্বে ইহা কিরূপ ছিল তাহা আমরা অনেক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হই নাই। রামভদ্রের আদি নিবাস খুলনা জেলার কাটিপাড়া গ্রামে। ইছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ রামভদ্রকে ৩৬ বিঘা নিষ্করজমি দিয়া মাটিকোমরা গ্রামে বাস করান। "নদের গদা, "কুশদহের ভদা" এই প্রবাদ বাক্যটি আবাহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। নবদ্বীপের গদাধর শিরোমণি ও কুশদহের রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত উভয়েই খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম বিখ্যাত ছিল। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য গদাধর শিরোমণি, রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বাঞ্চলের নগদ্বীপ নিবাসী কোন এক অজ্ঞাতনামা সিদ্ধান্ত উপাধি ধারী পণ্ডিত মিথিলায় গমন করিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছিলেন:—

"কুশদ্বীপ, নগদ্বীপ, নবদ্বীপ নিবাসিনঃ। তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত,শিরোমণি,মনীষিণঃ।"

রামভদ্রের বংশাবলীর পরিচয় সংক্ষেপে একটু লিখিত হইল:—

"গৌড়দ্বীপে প্রকীর্ত্তী রতিপতি জনকে গ্রন্থকর্ত্তাতিভক্ত, ভূলোকৈঃ পূজিতোহভূৎ অতুল কুল যশো রামভদ্রশ্চ ধীমান্। * * * । অধুনা বিশ্বতে তেষাং কনিষ্ঠ শশি ভূষণঃ॥"

এই বংশের শেষ প্রদীপ শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন কয়েক বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থান পূরণ হইবার আশা সুদূর পরাহিত।

মাটিকোমরা গ্রামে ঘটক মহাশয়েরাই প্রাচীন বংশ ও বর্দ্ধিষ্ণু শ্যামাচরণ ঘটক ওকালতী ব্যাসায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক এই ঘটক বংশ সম্ভূত না হইলেও একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের এক্ষণে সহকারী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় একজন অমায়িক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইহারা মাটিকোমরাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। কুশদহের কৃতিসন্তান দ্বারা কুশদহ অনেক আশা করেন। জানিনা তাঁহারা ম্যালেরিয়া গ্রস্ত মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে, কতদূর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমার বাল্যবন্ধু এই মাটকোমরা নিবাসী স্কুল সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্জ্জনে মায়ের জন্য দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ফেলিতে দেখিয়াছি। সমবেত চেষ্টা ভিন্ন পল্লীর উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ শিবদাস কুণ্ডুর সহিত জগত জননীর আবার একটি জীবন-মরণ-রহস্যময় খেলা হইয়া গেল। "কুশদহের" পাঠকপাঠিকাগণ স্মরণ হয় কি? ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসের কুশদহে স্থানীয় সংবাদে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে,—"গোবরডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ শিবদাস কুণ্ডু টালীগঞ্জ হইতে সিয়ালদহ ট্রামগাড়ীর ফাষ্টক্ল্যাসে আসিতেছিলেন। ধর্ম্মতলায় গাড়ি বদলের সময় তিনি ইলেকট্রি সক্ লাগিয়া অচৈতন্য হইয়া গাড়ি হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম সময়ে, কোন মহাত্মা ইংরাজ তাঁহাকে মরণশীল পতন হইতে ক্রোড়ে ধারণ করেন, এবং গাড়ি করিয়া পার্ক ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গিয়া যোগ্য ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা ও সপরিবারে সুশ্রুসা করেন। সমস্ত রাত্রির পর বেলা ৮·১৬ মিঃ সময়ে শিবদাস চৈতন্য লাভ করিয়া জীবন প্রাপ্ত হন।" কিন্তু সেই জীবন সহায় পরমবন্ধুকে শিবদাস বুঝি তেমন করিয়া চিনিতে এবং কৃতজ্ঞতা দানের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এবং জীবনদাতা বিধাতাকেও বুঝি ধরিতে পারেন নাই। তাই কি তিনি আবার এই নূতন আর এক খেলা খেলিলেন?

গত ৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীমান্ শিবদাস, গোবরডাঙ্গা হইতে রাত্রি ৩টার ট্রেণে কলিকাতা আসিতেছিলেন। তিনি ফাষ্টক্লাসে একাকী ছিলেন, সঙ্গে ছিল ৩ হাজার টাকার নোট। গুমা ষ্টেশন ছাড়িয়া যখন গাড়ি চলিতেছে সেই সময় একজন আবৃত-মুখ ভীমকায় দস্যু চলন্ত গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শিবদাসের গলা চাপিয়া ধরিল। তাহাতেই তিনি প্রায় জ্ঞান শূন্য হইলেন। তারপর শিবদাসেরই শালের হাঁসিয়া ছিঁড়িয়া তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিতে লাগিল। তখন শিবদাস সম্পূর্ণরূপে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সুতরাং অর্থগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে মহাপুরুষের আর কোন বিঘ্নই ঘটিল না। যখন ট্রেণ বারাশাত আসিল তখন রাত্রি প্রভাত প্রায়। শিবদাসের অল্পে অল্পে চৈতন্য হইতে লাগিল, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণরূপে অবস। তারপর যথাসময়ে কলিকাতায় আসিলেন এবং থানা পুলিস যেমন মামুলী করা হইয়া থাকে তাহা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন ফল এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তারপর এই সংবাদ যিনি শুনিলেন তিনিই বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!" এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি, বিশ্বজননী অতিশয় কৃপা করিয়া শিবদাসের সঙ্গে জীবন-মরণ-রহস্যময় খেলা দেখাইলেন, তবে তাহা শুনিয়া কে-না হাসিবেন? কিন্তু এই ঘটনায় বিশ্বাসী-ভক্তের চক্ষে প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। একথা কে বুঝিবেন?

গৈপুর নিবাসী—রাঁচি প্রবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী গত ২রা অগ্রহায়ণ পরলোকগমণ করিয়াছেন। এই রত্নগর্ভা নারী অনূন্য অশিতিবর্ষ বয়সে ৫ পুত্র ১ কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রি দৌহিত্র দৌহিত্রীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া ইহলোকের চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ইহাকে আমরা 'সুখের মরণ' বলিতে কুণ্ঠিত নহি। এখন তাঁহার আত্মা শান্তিধামে স্থান লাভ করুন ইহাই কল্যাণময়ী জননীর শ্রীচরণে আমাদের কামনা। ইনি কলিকাতা আহিরিটোলার কন্যার গৃহে থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গ্রামের জঙ্গল কাটানর কথা কুশদহে লিখিবার জন্য কেহ কেহ বিশেষতঃ গৈপুর অথবা বেলিনীর দুই একটি বন্ধু মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বলিয়া থাকেন। গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটির যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য—রাস্তার আশ-পাশ গুলি পরিষ্কার রাখা তাহা তো হইয়াই থাকে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি গ্রামের প্রকৃত জঙ্গল যাহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বাগানগুলি, তাহার সংস্কার ব্যতীত প্রকৃত জঙ্গল পরিষ্কারের কার্য্য কিছুতেই হইবে না। ইহাতে আপাততঃ কিছু ক্ষতি অসুবিধা আছে বটে কিন্তু ইহার পরিণাম ফল যে লাভ জনক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক একটি আম কাঠালের ফলহীন পুরাতন বাগানের স্থলে যদি ঐরূপ বিবিধ ফল এবং তরকারির নূতন নূতন বাগান হয়, তবে দেশের শোভা স্বাস্থ্যোন্নতির কতদুর সহায় হইবে তাহা সকলে কল্পনা করুন। কিন্তু একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা প্রত্যেক পুরাতন বাগানের অধিকারীদিগের উপরই নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি দেশের মঙ্গলার্থে নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারেন, তবেই একার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। আর ইহাতে বিলক্ষণ মনের বলেরও প্রয়োজন। কারণ আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীরা পুরাতন সংস্কারের ন্যায়, পুরাতন গাছপালা গুলি—নিষ্ফল হইলেও তাহাকে বিনাশ করিয়া তৎস্থানে নূতন রোপণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এ বিষয়ে আমরা এতগুলি গ্রামের মধ্যে এপর্য্যন্ত একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি;—গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একটি পুরাতন ফলের বাগান অবশ্য তাহাতে দুই একটি ভাল আমের গাছও ছিল,তাহা ছেদন করিয়া নিবিড় জঙ্গলাবৃত গ্রামের মুক্তি-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে পথে আর কাহারও পদার্পণ করিতে না দেখিয়া আমরা আর জঙ্গল কাটার কথা চর্ব্বিত চর্ব্বণে নিবৃত্ত ছিলাম। কেবল দুই একটি বন্ধুর অনুরোধে আবার এক কলম কালি- এই কালি কাগজ মাহর্ঘের দিনে খরচ করিতে হইল, দেখা যাক্ কোন ফল হয় কি না।

মাটিকোমরার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত নবেম্বর মাস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগে যোগ্যতার সহিত ক্রমশঃ পদোন্নতি সহকারে কার্য্য করিয়া শেষ বৰ্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনেস্পেক্টরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। জানি না এক্ষণে তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করিবেন। আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনে এখন তাঁহাকে দেশের কাজে পাইতে চাই। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ও কলিকাতা মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা গত বারে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর হইতে গৈপুর ফকিরপাড়া ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা হইবার জন্য চেষ্টান্বিত কার্য্যে তাঁহাদিগের প্রতি যে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ছিলাম, মনে হয় উহা খুবই সময় উপযোগী হইয়াছে। তা ছাড়া ইছাপুর মাটিকোমরার মধ্য দিয়া যে কাঁচা রাস্তা গিয়াছে, তাহারও অবস্থা অনেক সময় বিশেষ বর্ষাকালে অত্যন্ত খারাপ হয়। চেষ্টা করিলে লোকাল বোর্ডের দ্বারা এই রাস্তার সংস্কার হইতে পারে না কি? এতদ্ভিন্ন পল্লী সেবার কত কাজই রহিয়াছে। উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন তবে কি কিছু হয় না?

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় পরলোক গমনের পূর্ব্বে ১০ জন নববিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ট্রাষ্টীর প্রতি মন্দিরের কার্য্য পরিচালনার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া, ট্রাষ্টীগণ প্রকৃত পক্ষে ভারগ্রহণ করিয়া সাপ্তাহিক উপাসনাদির কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় দত্ত মহাশয়ের এক আত্মীয়া ব্রাহ্মিকা ভগ্নী, ব্যক্তিগতভাবে গত দুই বৎসর যাবৎ যথা সাধ্য মন্দিরে একটি মালী রাখিয়া রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য এবং বৎসরান্তে উৎসবাদি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মন্দিরের আসল কার্য্য নিয়মিত রূপে সাপ্তাহিক উপাসনা হওয়া এবং তথায় সর্ব্বদা উপযুক্ত কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকা। অর্থের দিকে তাকাইয়া ধর্ম্ম কার্য্যে অগ্রসর হওয়া, এই লক্ষণ কখন ধার্ম্মিক-দিগের জীবনে দেখা যায় না। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; অর্থ আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যে সহায় হইয়াছে। সুতরাং অর্থাভাব দেখিয়া খাঁটুরা মন্দিরের কার্য্যে উদাসীন থাকা, ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। আমাদের মনে হয়, ট্রাষ্টীগণ সমবেত ভাবে যদি ইহার জন্য একটু মনোযোগী হন, মন্দিরের কার্য্য কখনই বন্ধ থাকিতে পারিবে না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড
উইলকিনস্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়,
ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

অষ্টম বর্ষ } পৌষ, ১৩২৩ { নবম সংখ্যা

যুগ-ধর্ম্ম ঘোষণা

সঙ্গীত

(ভৈরবী— তেওট)

ঘুচাতে ভবভার, নাশিতে অন্ধকার, পাঠালে যুগে যুগে বিধান।
আপনি দণ্ড ধরি, রিপুকুল সংহারি, রাখিলে নিজবলে ভক্তের মান। (হরি)
বহু পুরাকালে, প্রাচীন আর্য্যকুলে, সৃজিলে কত যোগী ব্রহ্মবান্,
বেদ বাইবেল নীতি, কোরাণ শ্রুতি স্মৃতি, প্রকাশি বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান।
পুরাণ ভাগবতে, গীতা মহাভারতে, শিখালে প্রেম ভক্তি যোগ ধ্যান,
শুক জনক শিব, শ্রীরাম রাঘব, সকলে প্রচারিল হরিনাম।
প্রহ্লাদে শিশুকালে, নানা বিপদে ফেলে, করিলে জীবগণে ভক্তিদান;
নানক শাক্য ধ্রুব, নারদ বাসুদেব লীলার সহায় ভকত প্রধান।
দাউদ ইলাইজা, জেরিমীয়া মুষা, জিহোবা নাম করেছিল গান;
একেশ্বরবাদী মহম্মদ আদি তোমারি প্রেরিত প্রিয় সন্তান।
য়িহুদি বংশধর যিশু গুণসাগর, ভক্তরাজ পবিত্রাত্মা পরিত্রাণ;
তাঁহারে শত্রু হাতে, বধিয়ে ক্রুশাঘাতে, দেখালে দাস্য মুক্তির প্রমাণ।
চৈতন্যের সন্ন্যাস, মহাভাব বিলাস, তোমারি লীলাবিহার বিধান।
পরাভক্তি দিয়ে, তাঁহারে পাঠায়ে করিলে বিগলিত পাপীর প্রাণ।
জ্ঞানভক্তি যোগ কর্ম্ম, সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ, বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম-বিধান;—
লইয়ে অবশেষে, আসিলে বঙ্গদেশে, দিতে জগত জনে পরিত্রাণ।
এই নববিধানে, সাধু দেবাত্মগণে, হইলেন ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান;
তোমারি অনুমতি অখণ্ড রাজবিধি, বুদ্ধি যুক্তির নাহি অভিমান।
সকলে এক হ'য়ে, ব্রাহ্মগণে ল'য়ে, তোমার সঙ্গে করেন নৃত্য গান;
কুতর্ক ভেদবাদ, বিবাদ বিসংবাদ, নব বিধানে হ'ল অবসান॥

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব

——:*:——

যীশুখৃষ্টের জন্ম দিনকে বড়দিন বলা হয়। বড় দিনের অবকাশে কর্ম্মে অবসর লইয়া সকলে নানা প্রকার আনন্দ সম্ভোগে কাটাইলেন। খৃষ্টীয় মণ্ডলীর নরনারী খৃষ্টের নামে প্রার্থনাদি যোগে খৃষ্টের সাধনা করিলেন। প্রকৃত খৃষ্ট-জীবন লাভের পথে কয়জন অগ্রসর হইলেন তাহা কে বলিতে পারে। কার্য্যতঃ সকল পূজা পার্ব্বণ গুলিকেই সর্ব্বশ্রেণী সৎ অসৎ আমোদ সম্ভোগের উপায় স্বরূপ করিয়া লইয়াছে। যাক্ সে কথা। আজ আমরা খৃষ্টোৎসবে একটু খৃষ্ট চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

"কুশদহ"র পাঠক পাঠিকাগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, কুশদহে খৃষ্ট চরিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন কি? বস্তুত আমারাও এতদিন বিশেষ ভাবে কখনো খৃষ্ট চরিত আলোচনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হই নাই; তবে এবার কেন এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কারণ অথবা উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

"কুশদহ"র একটি প্রধান লক্ষ্য, উদার ভাবে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সত্য গ্রহণ করা। স্বাধীন চিন্তা যোগে আন্তরিক সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার সংকীর্ণতা এবং ভ্রান্তি দুর করাই জ্ঞান এবং সত্য লাভের একটি প্রশস্ত পথ। যাঁহারা খৃষ্টের নামে বিশেষ কোন সদ্ভাব পোষণ করেন না, অন্তত তাঁহাদের একবার এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

আর্য্য বা হিন্দু জাতি বহুকাল এসলাম ধর্ম্মের অধীনে শাসিত পরিচালিত হইয়া এখন খৃষ্টধর্ম্মের অধীনে আসিয়াছে। যাঁহারা ইহাকে বাহুবলের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত নহি। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতে ইংরাজ রাজত্ব বিধাতার বিধান। যে জাতি যখন কিছু প্রদানের জন্য অন্য জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাহারা তাহাদের নিকট কিছু গ্রহণ করিতেও বাধ্য হয়। কারণ আদান-প্রদানই জগতের অন্তর্ব্বাহ্য স্বভাব।

হজরত মহম্মদ এবং এসলাম ধর্ম্মকে হিন্দু যত কেন পৃথক জ্ঞান করুন না, কিন্তু যে দিন উভয় ধর্ম্ম পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন হইতে উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হইয়াছে। কারণ সত্যে সত্যে ভেদ নাই। কোন

জাতিই সত্যের পূর্ণতার দিকে একদিনে অগ্রসর হয় নাই, বৈজ্ঞানিক,ঐতিহাসিক জ্ঞানী সাধু ভক্তগণ তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। এক সময়, মহাম্মদ এবং এসলাম ধর্ম্মই যেমন মুসলমান জাতীকে উন্নত করিয়াছিল, তদ্রূপ খৃষ্ট ও খৃষ্টান ধর্ম্ম ইংরাজ জাতির সকল প্রকার উন্নতির মূল শক্তি। যে দিন ভারতে ইংরাজ জাতি আগমন করিয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুজাতির উপর খৃষ্ট প্রভাব অথবা হিন্দু-খৃষ্টধর্ম্মের মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন আমাদের দেখা উচিত, আমরা কোন্ আদর্শে খৃষ্টকে গ্রহণ করিতে পারি। আমরা কি খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ঐতিহাসিক খৃষ্টকে গ্রহণ করিতে পারি? কখনই না। কিন্তু প্রকৃত খৃষ্ট—যিনি ঈশ্বর পুত্র তাঁহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কেন না প্রত্যেক মানবই সত্য সত্য ঈশ্বর-তনয়, খৃষ্ট নিজ চরিত্রে সেই তনয়ত্ব দেখাইয়া সাধনের পথ সহজ করিয়া দিলেন। এ সকলই পিতার ইচ্ছাতে সম্পন্ন হইল। খৃষ্টীয়মণ্ডলী যে খৃষ্টকে কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করেন, সে খৃষ্টকে আমরা কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। করিলে ঈশ্বরের অবমাননা এবং খৃষ্টকেও বিকৃত করা হয়। খৃষ্টীয়মণ্ডলী কল্পিত খৃষ্টের উপাসনা করিয়া "খৃষ্টধর্ম্ম" নামে এক সংকীর্ণ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সত্য দীর্ঘকাল অসত্যের আবরণে আবৃত থাকিতে পারে না, তাই আবার যথা সময়ে ভারতে এক নবযুগের অভ্যুদয়ে সকল সাধু মহাজনের বিকৃত ব্যাখ্যা বিদুরিত হইয়া যাঁহার যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা প্রকাশিত হইল। তাই আজ আমরা নব ঈশাকে পাইয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। নবযুগের বিধান-সঙ্গীতাচার্য্য প্রেমদাস যিশুর জন্মোৎসবে গাইলেন ;—

"জনমিল যিশু দেবশিশু ধরাতলে। স্বর্গলোকে জয়গীত গায় দেবদলে।
(তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলে)
আহা কি রূপের ভাতি, তরুণ অরুণ কান্তি, অন্ধকার মাঝে যেন রত্নমণি জ্বলে।
মেরী জননীর আঁখি ভাসে অশ্রু জলে। (নবশিশু কোলে লয়ে রে)
দেখাইতে ধর্ম্মনীতি, শত্রুকে করিতে প্রীতি, নাশিতে পাপ কুরীতি পুণ্যের অনলে।
(নিজ প্রাণ সমর্পিয়ে রে)
বিলাইতে দাস্ত মুক্তি অবনী মণ্ডলে। (পিতাপুত্রে এক হয়ে—মহাযোগ বলে)
হায় কবে ঈশা, শশি, আমার ভিতরে পশি, করিবেন লীলা বসি হৃদয় কমলে।
(প্রাণে প্রাণে এক হয়ে রে)"

খৃষ্ট প্রচারিত বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ কি সূত্রে বিকৃত হইল তৎসম্বন্ধে একজন গভীর ব্রহ্মযোগীর চিন্তাশীল লেখনী হইতে যাহা নিসৃত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"প্রত্যেক বিধান প্রবর্ত্তক আপনার সহিত মণ্ডলীর ও তাঁহার প্রচার-বন্ধুদিগের কি সম্পর্ক তাহা অল্লাধিক সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া যান, কিন্তু কাল সহকারে মানব-হৃদয় তাহা বিস্মৃত হইয়া বিধান প্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের বা পবিত্রাত্মা কিম্বা মধ্যবর্ত্তির আসনে বসাইয়া ধর্ম্মকে মলিন করিয়া ফেলে। যখন মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরাদেশে ইহুদী দেশে স্বর্গের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া অনেক লোক বলাবলি করিত ইনি কে? ইনি কি 'ইলিয়াস্' না 'জেরিমিয়া'? এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার সম্বন্ধে কি বল? তখন পিটার উত্তর করিলেন, "আপনি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র খৃষ্ট।" উত্তর শ্রবণ করিয়া খৃষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি পিটার—এই শৈলোপরি আমি আমার মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব।" ঈশ্বর পিতা—খৃষ্ট তাঁহার আদর্শ পুত্র, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া পুত্রত্ব লাভ—এই তাঁহার প্রচারিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের নব সুসংবাদ। প্রেরিতগণ মধ্যে প্রায় সকলেই এই ভাবেই ঈশাকে গ্রহণ করিলেন, কেবল জন ও পল ইহার কিছু ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ক্রমে খৃষ্টানগণ ইহুদীদিগের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ হইতে স্খলিত হইতে লাগিল। অবশেষে কতিপয় খৃষ্টযাজক নীস্ (Nice) নগরে 'পিতাঈশ্বর' 'পুত্রঈশ্বর' 'পবিত্রাত্মা ঈশ্বর' এই ত্রিনীতিবাদ স্থাপন করিয়া খৃষ্ট প্রচারিত বিমল ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতায় পরিণত করিলেন। এই ধর্ম্মমতকে এক্ষণে Athanasian Creed বলে।"

ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিম্বা তিনিই এই জগতরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, এ দার্শনিক তত্ত্বের মিমাংসা এখানে করিব না। তবে তিনি কোনো সপ্তমস্বর্গে বসিয়া এই সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এরূপ মত আমরা পোষণ করি না, কিন্তু তিনিই জগত-প্রাণ হইয়া জগতে বিগুমান আছেন। অথচ তিনি এই জগতের কোনো পদার্থ নহেন। তিনি সর্ব্বাতীত সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ পুরুষ। তিনি যেরূপেই সৃষ্টি করুন,—তিনিই এই জগতের স্রষ্টা। কেননা তিনি প্রেমময়, প্রেমই সৃষ্টির কারণ। প্রেমেই এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে। মানব সন্তানের উৎপত্তির মূলে প্রেমই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম কখনো একাকী থাকে না, তাই কবি গাইলেন,—"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম যে হোতো মিছে" তাঁহার সৃষ্টির চরম স্বার্থকতা আমরা দেখিতেছি তাঁহার মানব সন্তানে। তিনি তাঁহার মানব সন্তানের দেহ, মন, আত্মা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তজ্জন্য জড়জগৎ মনজগৎ এবং অধ্যাত্মজগৎ বা ধর্ম্মজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এই বাহ্যজগতের সহিত মানব প্রকৃতির এক অখণ্ড নিয়ম সুশৃঙ্খলায় গ্রথিত করিয়া

পরিচালনা করিতেছেন। জগতের কার্য্য সকল বিধি নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিতেছেন। "ছন্দে উঠে শশি রবি, ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।" আমরা প্রত্যেক রাজ্যের নিয়ম পালন দ্বারা সেই সেই রাজ্যে অগ্রসর হইয়া উন্নত হইতে সক্ষম হই। শারীরিক নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে! মানসিক নিয়ম—নীতি জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি অনুমোদিত মনের পরিচালনা করিলে মন সুস্থ থাকে, ধর্ম্ম-জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধনা দ্বারা আত্মার উন্নতি লাভ হয়। ইহার কোনটির ব্যতিক্রমে তৎ তৎ রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। তখন আমরা বিনাশের পথে ধাবিত হই।

সৃষ্টির চরম স্বার্থকতা যেমন মানব সন্তানে, তদ্রূপ আবার মানব জীবনের চরম স্বার্থকতা ভগবানকে লাভ করায়। ভগবানকে লাভ করিতে হইলেও ঐ নিয়ম পূর্ব্বক সাধনভজন করিতে হয় সত্য, কিন্তু কেবল মানুষ সাধন ভজন দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইত না যদি তিনি তাহার কোন বিধি ব্যবস্থা না করিতেন। তিনি মানবাত্মার মধ্যে তাঁহার এক এক স্বরূপের বিশেষ প্রকাশ দ্বারা এক একটি চরিত্র প্রকটন করিয়া তাঁহার এক একটি বিশেষ সন্তানকে পাঠান, তাহাই তাঁহার বিধান। ইহা দ্বারা সাধারণ মানব মণ্ডলী ভগবানের স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বল মানব-চিত্ত সেই সন্তানদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই পূজা করিয়াছে। ইহাতেও আংশিক রূপে বিধানের কার্য্য হইয়া আসিয়াছে। আমরা আজ যাঁহার জন্মের কথা আলোচনা করিতেছি, যীশু সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ—ঈশ্বর তনয়। পৃথিবী তাঁহার সন্তানদের লইয়া পৃথক্ পৃথক্ দল করিয়াছে। স্বর্গে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। সকলেই সেই এক পিতার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পিতাকে ছাড়িয়া কেবল পুত্রকে গ্রহণ করিলে দল না হইয়া পারে না। যেখানে পিতার সঙ্গে সকল পুত্রের মিলন সেখানে দল কোথায়?

যীশুর অলৌকিক জন্মকাহিনী—অমানুষিক; ক্রিয়া সকল বর্ণন দ্বারা তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইব না। আমরা বিশ্বাস করি; স্বাভাবিক মনুষ্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অসামান্য ধর্ম্ম প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন।

এসিয়া মাইনরে প্যালেষ্টাইনের মধ্যে সামান্য অবস্থায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার বাল্য-জীবনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ঐ সময় তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংশ্রবে ছিলেন। তার পর তিনি প্রদীপ্ত যৌবনে পবিত্রাত্মার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এক-

দিকে তাঁহার সরল-বিশ্বাস ভক্তিপূর্ণ ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি সরল প্রাণ নরনারী যেমন তাঁহার অনুগমন করিল, অন্যদিকে কুটবুদ্ধি সংসারাসক্ত বিলাসপরায়ণ অভিমানীগণ তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত করিয়া নিষ্ঠুররূপে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তিনি প্রেমের ধর্ম্ম বিলাইতে আসিয়াছিলেন,তাহা তাঁহার এই কঠোর পরীক্ষাতেই জগৎ-সমক্ষে প্রমাণিত হইল। তিনি অজ্ঞান অপরাধীদিগকেও ভাই বলিয়া ক্ষমা করিলেন কেবল তাহা নহে, পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলেন।

খৃষ্টীয়মণ্ডলী খৃষ্টের প্রেম ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করেন। ইহাই তাঁহাদের প্রচারের সর্ব্ব প্রধান বিষয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সহচর নিত্যানন্দের জীবনে রূপান্তরে ঠিক ঐ শ্রেণীর প্রেম ও ক্ষমার যে দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে যীশু জীবনের কেবল প্রেম ও ক্ষমাই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গৌরবেরআসনে বসাইতে পারিত না, বিশেষতঃ ভারতের নিকট। যীশু জীবনের প্রেম ও ক্ষমা অত্যুজ্জ্বল জীবযোগের ফল স্বরূপ। ভারতের ঋষিদিগের ব্রহ্মযোগ ধর্ম্মের একপৃষ্ঠা, যীশুর জীবযোগ ধর্ম্মের আর একপৃষ্ঠা—কিন্তু এ জীবযোগও ব্রহ্মযোগ যুক্ত জীবযোগ। এ দেশের ঋষিগণ বহু কঠোর সাধন দ্বারা যে পথে ধ্যানযোগে ব্রহ্মযোগ লাভ করিলেন, যীশু অন্য পথে ইচ্ছা যোগে ব্রহ্মযোগ এবং জীবযোগ লাভ করিলেন। ব্রহ্মযোগ ও জীবযোগ মিলিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের অভ্যুদয় ভারতেই অভ্যুদিত হইল। খৃষ্ট জীবন ভারতে সমাগত না হইলে জগতে ধর্ম্মের পূর্ণতা সংঙ্ঘটিত হইতে পারিত না। ঈশার যাহা স্বর্গরাজ্য নবযুগে তাহার নাম "প্রেমপরিবার" হইল। ধর্ম্মের জন্য সংসার যেখানে ছিল অন্তরায়,এখন সেই সংসারে পরম জননীকে দেখিয়া সংসার স্বর্গরাজ্য হইল। নবযুগের বিশ্বাসী মণ্ডলী এ সাধনতত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। এই আদর্শ দিন দিন জগৎ সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে।

এইবার ঈশার অমৃতময় বাণী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রভো. শাস্ত্র মধ্যে কোন অনুজ্ঞাটি প্রধান? ঈশা বলিলেন, তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত, সমুদয় আত্মার সহিত, এবং সমুদয় মনের সহিত প্রীতি করিবে. ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান অনুজ্ঞা, দ্বিতীয় অনুজ্ঞা ইহার সদৃশ, তুমি তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।

তোমরা শুনিয়াছ ইহা কথিত আছে, তুমি আপন প্রতিবাসীকে প্রীতি করিবে; কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করিবে; আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শত্রুদিগকে প্রীতি কর, যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা তোমাদিগকে বিদ্বেষ এবং

নির্য্যাতন করে তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা কর। ইহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে। যেহেতুক তিনি স্বীয় সূর্য্যকে সাধু এবং অসাধু সকলের উপর উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলের উপর বারিবর্ষণ করেন।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে নতুবা সে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।

অন্যের নিকট তুমি যাদৃশ ব্যবহার প্রয়াস কর, তুমি তাহাদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কর।

যদি আত্মা বিনষ্ট হয় তবে সমুদয় পৃথিবী লাভ করিয়া কি উপকার? এই ভূমণ্ডলে এমন বস্তু কি আছে আত্মার বিনিময়ে মনুষ্য যাহা প্রদান করিতে পারে?

ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ, যাহারা তাঁহার উপাসনা করিবে সত্যেতে ও ভাবেতে তাঁহার উপাসনা করিবে।

তোমরা সত্যকে জানিবে, সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবে।

ধন্য তাহারা যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করে ও পালন করে।

যাহাদিগের অনুতাপের কোন প্রয়োজন নাই তাদৃশ নব নবতি জন পুণ্যাত্মা অপেক্ষা একজন পাপী অনুতাপ করিলে স্বর্গে আনন্দ হইবে।

যে কেহ আপনাকে বড় করে তাহাকে নত করা হইবে, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে অবনত করে তাহাকে উন্নত করা হইবে।

তুমি তোমার ভ্রাতার চক্ষুঃস্থিত তৃণকণার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর কিন্তু আপনার চক্ষুঃস্থিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড অবলোকন কর না?

সামান্য বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত সে মহৎ বিষয়েও বিশ্বস্ত; এবং যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে অন্যায়াচারী সে ব্যক্তি মহৎ বিষয়েও অন্যায়াচারী।

অসাধুতা দ্বারা পরাজিত হইও না কিন্তু সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় কর।

তোমরা পরমেশ্বরের মন্দির-স্বরূপ, তাঁহার আত্মা তোমাদিগের অন্তরে অধিবাস করিতেছে।

কি ভোজন, কি পান, যে কোন কার্য্য কর, সকলই ঈশ্বরের মহিমার জন্য সম্পাদন কর।

আমরা যেন সৎকর্ম্মে কখন পরিশ্রান্ত না হই, কারণ যদি আমরা ক্লান্ত না হই তবে আমরা যথা সময়ে ফল লাভ করিব।

যদি কেহ বলে আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কারণ যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রীতি করে না সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করিতে পারে।"

প্রবন্ধের দীর্ঘতা ভয়ে তাঁহার আরো কতকগুলি অমৃতময় উপদেশ উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আমরা ক্ষুব্ধচিত্তে প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

মনোরমা

৫

শারদীয়া পূজার কয়েক দিন পরে, সন্তোষের প্রথমা স্ত্রীর পিতা, বৃদ্ধ এ্যাটর্ণী অমরনাথ জামাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্তোষ পূর্ব্বে হইতে জানিতে পারিলে কখনই দেখা করিত না, কিন্তু সে তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল। শ্বশুরকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল! অমরনাথ একখানি চেয়ার নিজেই টানিয়া লইয়া বসিয়া জামাতার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, "সন্তোষ, শয়তানীবুদ্ধির সাধ এখনও মেটেনি? আবার একটি বালিকার সর্ব্বনাশ করতে বসেচ? হায়, হায়! আগে যদি একটু জানতে পারতুম, তা হলে সে রত্নহার কি তোমার মতো বানরের গলায় পড়তো?"

সন্তোষ রাগিয়া কহিল, "সেসব কথায় আপনার কি অধিকার? আমি যদি দুটো ছেড়ে পাঁচটা বিয়ে করি? আপনি কি তার ভরণ-পোষণ করবেন?"

"বটে? তা প্রথম স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য কি মাসহারা ব্যবস্থা করেচ? তাকে যে ত্যাগ করলে, সেজন্য আমার এতটুকু দুঃখ নেই, তোমার মতো পাষণ্ডের হাতে অপঘাত মৃত্যু হতে সে যে বাঁচলো এই যথেষ্ট, কিন্তু তার খোরাক পোষাকের জন্য তুমি কি দিচ্ছ তাই শুন্‌তে চাই।"

"এক পয়সাও না, যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়, স্বামীর উপর প্রভুত্ব করতে চায়, সে কি স্ত্রী নামের যোগ্য? তারা হিন্দু-গৃহের কলঙ্কস্বরূপ, অমন স্ত্রী পরিত্যজ্যা বলেই তো ত্যাগ করেছি, সে আবার মাসহারার দাবী করে কোন মুখে?"

অমরনাথ, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, টেবিলের উপর এমন সজোরে মুষ্টাঘাত করিলেন যে ফুলদানগুলা কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তিনি বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "এত দূর স্পর্দ্ধা! নির্লজ্জ, তোমার মতো দুশ্চরিত্র, সতী নারীর মর্ম্ম কি বুঝবে! বাছার সর্ব্বাঙ্গে যে কালশিরা পড়ে আছে, তা দেখলে চোখ ফেটে জল নয়—রক্ত বার হতে চায়! বেশ, বৃদ্ধ বয়সে এখনো অমরনাথের শরীরে কত শক্তি আছে, তোমায় তা দেখাবো, তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়, তবু একবার এসে তোমার যা মতলব তা জানলুম, এর পর আমার কর্ত্তব্য আমি করবো। তোমার মতো স্ত্রীহত্যাপ্রয়াসীর বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াতে আমি কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করবো না।"

সন্তোষ, শ্বশুরের উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, সেস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনায়, গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী অমরনাথের উচ্চ কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া আসিতেছিল, সন্তোষ তাহাকে কহিল, "দিদি, বুড়ো বড় রেগেচে তুমি একবার যাও, বড় বৌর জন্যে মাসহারা চায়, আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম দেবো না, কিন্তু বুড়ো না আদায় করে ছাড়বে না।"

হিরণ্ময়ী বাহিরের গৃহে আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল। অমরনাথ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "মা লক্ষ্মী কবে এলে? তুমি যে এখানে আছ তা জানতুম না।"

হিরণ্ময়ী কহিল "আমি প্রায় চার মাস এখানে আছি। সন্তোষের জন্যে আমায় থাকতে হয়েচে, সে যেরকম অধঃপাতে যাচ্ছে তাতে আমাদের কারও প্রাণে সুখ শান্তি নেই, বাপ পিতাম'র নাম তো ডোবালে। দেনা অনেক করেচে, বিষয় কতক বিক্রী না করলে শোধবার উপায় নেই, আপনার কাছে আমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা করে, অমন স্বর্ণপ্রতিমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করলে, মায়ের ইচ্ছে, বড় বৌকেও আবার আনেন, তবে "

অমরনাথ বাধা দিয়া কহিলেন "তাকে আর এঘরে আসতে হবে না, আমি জানবো আমার কন্যা বিধবা হয়েচে, তোমার শুনতে রূঢ় লাগচে মা, কিন্তু কি করবো, বাছা যে পাশব অত্যাচার সহ্য করেছে! আহা, আমরা যে সে ননীর গায় কখনও একবারও হাত তুলিনি, এখনও মার আমার পিঠের কালশিরা গুলো মেলায় নি।"

হিরণ্ময়ী কহিল, "সন্তোষ মাকে একটুও ভয় করে না, আমায় যা একটু মেনে চলে, কিন্তু সে বোধ হয় নতুন নতুন, কি করে যে শোধরাবে", হিরণ্ময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

অমরনাথ কহিলেন, "কি মহৎবংশের সন্তান, আর কি লোকের ছেলে কি হয়ে গেলো, লেখা পড়া শিখেও যে মানুষ এতটা অধঃপাতে যায় তা আমার জানা ছিল না।"

হিরণ্ময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যা অদৃষ্টে আছে তা অখণ্ড-নীয়। বড়বৌর নামে আর এ বৌর নামে দুখানা তালুক শীগগিরই লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হবে, নইলে ও তো সব খুইয়ে কুলবধূদের পথে বসাবে বইতো নয়। বড় বৌকে একবার দেখতে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে যাব?"

অমরনাথ কহিলেন "বেশ তো, একদিন যেয়ো, মনোরমাকেও নিয়ে যেয়ো,

সুশীলার সঙ্গে তার আলাপ আছে, দেখা হলে চিনতে পারবে, কিছু দিন এক স্কুলে পড়েছিল, রমাকান্ত বাবুকে আমি চিনি, তিনি অতি সৎলোক, তাঁরও অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! সকলি কর্ম্মফল, এই বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র।"

৬

দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে, পালঙ্কের উপরে একটি যুবতী বসিয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। শিশু ঘুমাইয়া মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করিতে নিতান্তই নারাজ, বিশেষ অদূরে তাহার সইমা ছবি আঁকিতেছে তাহার কাছে রঙের বাক্স ও তুলি প্রভৃতি লোভনীয় দ্রব্যগুলি লইয়া সে এতক্ষণ কাড়াকাড়ি করিতেছিল; মা আসিয়াই কিন্তু তাহাকে টানিয়া লইয়া কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। শিশু হাত পা ছুড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মা "আয় আয় ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আয়" প্রভৃতি ছড়া কাটিয়া নিদ্রাদেবীর আহ্বান-গীতি গাহিতেছেন, ক্রমে ক্রমে শিশুর চক্ষু দুটি মুদিত হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। সুশীলা ছবি আঁকা ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, "সই, খোকা ঘুমুলো? আহা কি সুন্দর দেখাচ্চে? নিদ্রারই যেন প্রতিমূর্ত্তি, আহা গালে একটা চুমো দিই।" অতি সন্তর্পণে সুশীলা সুপ্ত শিশুর গালে চুম্বন করিল।

শিশুর মা কমলা শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া কহিল "এখন খানিক ঘুমুলেই নিশ্চিন্ত, যে দুরন্ত হয়েচে। বোস্ সই, দুটো কথা কয়ে বাঁচি।"

সুশীলা বসিলে কমলা কহিল, "দু বচ্ছর পরে দেখা, কিন্তু সই বলবো কি, আমার বুকটা তোর দুঃখে ফেটে যাচ্চে. কি শ্রী ছিল, কি হয়েচে. তোর মতন নারীর এমন দুর্ভাগ্য হোল, বিধাতার কি বিচার ভাই!"

"ও কথা বলতে নেই, কিসের দুঃখ বোন্? এতদিন আমারও ঐরকম মনে হোতো, কিন্তু এখন আর কোনো দুঃখ নেই, এখন বেশ আছি, সে কথা যাক, এখানে কদ্দিন থাকবি?"

"বোধ হয় বেশী দিন নয়, কিন্তু কি যে বলিস্, নারীজন্ম যদি স্বামী সেবাতেই বঞ্চিত হোল, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে? আচ্ছা সই, তুই তো এত বুদ্ধিমতী, তবে একটা পুরুষকে বশে আনতে পারলি নি? এও তো বড় লজ্জার কথা! এত রূপ তোর, এ রূপে-গুণে স্বামীর মনকে বাঁধতে পারিস নি? আমার বোধ হয়, তুই বড় অভিমানী, সেই মানের আগুনেই সব খুয়েছিস্।"

মৃদু হাসিয়া সুশীলা কহিল, "তুই শুনে কি সব বুঝতে পারবি? প্রথম প্রথম অভিমানভরেই থাকতুম. তারপরে দেখলুম, স্বামী তাতে আরও অধঃপাতে

যাচ্চেন, তখন কখনও হাতে পায় ধরে বোঝাতুম, কখনও ঝগড়া ঝাঁটিও করতুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু না; যা-তা বলে গাল দেন, আর বলেন "মেয়ে মানুষ বাঁদীর মতন থাকবে, স্বামীর উপর কথা ক'বে কি? আমার যা খুসী করবো, সইতে না পার চলে যাও," কত বুঝিয়েচি সই, কিন্তু সে বোঝবার নয়। তারপর মার-ধোর আরম্ভ করলে, অনেক সহ্য করেচি, মনে করেছিলুম, যদি সুমতি হয়; কিন্তু সই, ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ।" সুশীলা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কমলা স্নেহার্দ্র স্বরে কহিল, "হায় হায়, এমনতো কখনও শুনিনি, মূর্খ সে, তাই এমন রত্ন পেয়ে আদর কল্লে না, আচ্ছা সই, সে যে আবার বিয়ে করেচে, তার জন্যে কি তোর একটুও কষ্ট হয় না?"

"পাগলি আর কি, যে সমুদ্রে শয্যা পেতেচে, তার আবার শিশিরে ভয় কি? মনোরমা বড় ভাল মেয়ে, এক স্কুলে ছোট বেলায় পড়েছি, মেয়েটি যেন ছবির মতো, তারও কপালের বিড়ম্বনা।"

"তা তার কপালে যদি সুখ থাকে, শোধরাতেও পারে।"

"আহা, তাই হোক্, সে সুখী হোক্, ভগবান তাই করুন।"

"আচ্ছা সই, সত্যি করে বল্ দেখি, সন্তোষের জন্যে মনটা কাঁদে কি না। ভালবাসা তো আর যাবার নয় বোন্, তাকে তো দেখতেও ইচ্ছে করে।"

ঈষৎ হাসিয়া সুশীলা কহিল, "যদি বলি করে না।"

"মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি নে।"

"যদি তা সম্পূর্ণ সত্য হয়।"

"তা হলে সে কি হিন্দুর মেয়ের কথা? হিন্দুর মেয়ে, স্বামী যেমনই হোক্ তাকে ভালবাসবেই, স্বামী তাকে ত্যাগ করলে সে জনমে মরণে তারই দাসী হোয়ে থাকবে।"

"সই, স্বামীর অগাধ প্রেমের অধিকারিণী হোয়ে ঐ সব বক্তৃতা বেশ সহজে বোলে যাচ্চিস্, যদি একবার আমার মতো অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতিস্ তো মনের গতি অন্যরূপ হোতো,—পাপ পুণ্য বুঝতে পারি নে, হৃদয়ের ধর্ম্ম বুঝতে পারচি বটে, যাকে একদিন জীবন পণ করে ভালবেসেছিলুম, এখন দেখচি, আর তার প্রতি এতটুকু স্নেহ নেই, মন একেবারে বিরূপ হয়ে গেছে, যে একদিন সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল, সে সেই হৃদয়মন্দির হতে চিরনির্ব্বাসিত হোয়েচে, তুই আমায় অসতী ভাবছিস্, গাল দিচ্ছিস্, কিন্তু যা সত্যি তা অকপটে

বলচি, যুক্তি তর্ক নিয়ে ভালবাসা চলে না সই, হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মে মানুষ ভালবাসে।"

"বড় ভয়ানক কথা বলছিস্ সই, দেবতারে বিসর্জ্জন দিয়ে কি নিয়ে জীবন কাটাবি বোন্? তাঁরই স্মৃতি নিয়েই তুই জীবনের অবশিষ্ট দিন বেশ কাটাতে পারতিস্, প'রবর্ত্তন শীল ভালবাসার কি মূল্য আছে সই? সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি ভালবেসেছিলি, অত্যাচারের পীড়নে কি সে ভালবাসার বিকৃতি হওয়া সম্ভব? তবে ঠিক ভালবাসিস্ নি।

"তোর যুক্তি তর্কে আমি পারবো না। জীবন কাটাতে হোলে তার স্মৃতি ভিন্ন আর উপায় নেই কেন? আমি বিশ্ব-দেবতাকে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কোরে নেবো, জগৎ সংসারে কত কাজ আছে. সেই সব কাজে আপনার জীবনকে ঢেলে দেবো, এতেও কত আনন্দ আছে, রিক্ত হৃদয় কেমন পূর্ণ হোয়ে উঠবে, সকল ব্যর্থতা আমার সফল হবে।"

"ও সব বাজে কথা রেখে দে, মেয়ে মানুষের মুখে ও সব কথা সাজে না। পুরুষের অনেক কাজ, অনেক লক্ষ্য থাকতে পারে, কিন্তু নারীর একটি মাত্র কর্ত্তব্য, একটি মাত্র আশা, একটি মাত্র অবলম্বন, তা কি? না, স্বামীর প্রেম; তা হোতে বঞ্চিত হোলে, নারীজন্ম বৃথাই হোলো।"

"তোর সঙ্গে আমার মত মিলবে না. পুরুষকে ছেড়ে নারীর তা হোলে কোনো অস্তিত্বই নেই এই তোর কথা, আমি তা মানি নে, যা গিয়েচে, যা হারিয়েচে, তারই জন্যে বুকভরা হাহাকার নয়নভরা অশ্রু নিয়ে এমন অমূল্য মানব জীবন খুইয়ে ফেলবো? ভগবানের অবিচার ও অদৃষ্টের দোষ দিতে থাকবো, তা কেন?"

এমন সময়ে হিরণ্ময়ী ও মনোরমা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সুশীলা শশব্যস্তে উঠিয়া হিরণ্ময়ীকে প্রণাম করিল, এবং মনোরমার হাত ধরিয়া পর্য্যঙ্কে বসাইল। কমলাকে কহিল "সই, ইনি আমার বড় ননদ।" কমলা উঠিয়া হিরণ্ময়ীকে প্রণাম করিল। সুশীলা সংক্ষেপে তাহার সই কমলার পরিচয় হিরণ্ময়ীকে বলিল। হিরণ্ময়ী কহিল "বড় বৌ তোর জন্যে বড় মন কেমন করতো, তাই একবার দেখতে এলুম, সেদিন তালুই মশাইকে বলেছিলুম।"

"বেশ করেছেন দিদিমণি, বাবা বলেছিলেন, আপনি আসবেন।" মনোরমার হাত ধরিয়া কহিল, "মনোরমা, চিনতে পারচ? কত টুকু ছিলে, কত বড়টি হয়েছ।" মনোরমা হাসিল। সে বিস্মিতনয়নে সুশীলাকে দেখিতেছিল,

এমন সুগঠিত দেহ, এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, এমন নয়নভরা মাধুর্য্য, অধরভরা হাসি। এই নারী যাহাকে প্রণয়-বাঁধে বাঁধিতে পারে নাই, তাহার কি ক্ষমতা যে তাহাকে আকৃষ্ট করে? সুশীলাকে সে ছোট বেলায় দেখিয়াছিল, এখন সে আকৃতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী কহিল "মাঐমা আসচেন, নীচে দেখা গেল, সকলের শরীর গতিক ভাল তো?"

"হাঁ দিদি, বাবার শরীর কিন্তু ভাল নয়।" এমন সময়ে সুশীলার মাতা পাণ লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। "মা লক্ষীরা, পাণ খাও মা" বলিয়া সকলের হাতে পাণ দিয়া, তিনি বসিয়া সস্নেহে হিরণ্ময়ীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুশীলা মনোরমাকে অন্যান্য গৃহগুলি দেখাইতে লইয়া গেল। হিরণ্ময়ী কহিল, "একখানা তালুক বড় বৌয়ের নামে লিখিয়ে এনেচি, এখনও রেজেষ্ট্রী হয় নি, তালুই মশায়কে দেখাতে এনেচি, বড়ই দুঃখ যে আপনাদের সঙ্গে এমন হলো।"

"আমার অদৃষ্ট মা, অমন রূপে-গুণে ধনে-মানে জাজ্বল্যমান জামাই পেয়েছিলুম অদৃষ্টে সুখ নেই। যাক্ সে জন্যে আর আক্ষেপ করি নে, আমি তো ওঁকে বলেছিলুম যে, মেয়েকে পেটে ঠাঁই দিয়েচি দুমুঠো ভাতও জন্মকাল দিতে পারবো। উনি বললেন না, তাকেই দিতে হবে, তার যত সম্পত্তি থাকতে আমি ছাড়বো কেন? "যাক্ মা এখন এ বৌকে ভাল বাসচে তো?"

"খামখেয়ালী, কুসংসর্গ ত্যাগ না করলে মতিগতি শোধরানো দায়, মা বড় মনকষ্টে আছেন। সুশীলা কি বড় মন মরা হোয়ে গেচে?"

প্রথম প্রথম খুবই ভেঙে পড়েছিল, মেয়ের মুখের দিকে চাইতে ভয় হোত, আজকাল বেশ ভাল আছে, আমার বড় ছেলের কাছে বেশ মন দিয়ে ছবি আঁকতে শিখচে. উনি নিজে ওকে নিয়ে রাত্রে পড়াতে বসেন, বেশ মন দিয়ে পড়াশুনাও করচে, মনে করবো মেয়ের আমার বিয়ে হয় নি, মেয়ে পাঠিয়ে রাতদিন পথ তাকিয়ে থাকতুম, কখন কি হয় ভয়ে আড়ষ্ট থাকতে হোত, এ একটা হেস্ত নেস্ত হোয়ে গেছে ভালই হয়েছে।"

হিরণ্ময়ী সুশীলার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল, এক্ষণে এসকল কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কমলা ভাবিতেছিল, "কি আশ্চর্য্য, এরা কি প্রকৃতির লোক, মেয়ে রত্ন হারাইয়াছে তাহাকে কাচের প্রলোভনে ভোলাইতে চাহিতেছে মাত্র, অথবা এ ভিন্ন আর উপায় কি?

৭

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি। তখন অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলায় শীতের প্রভাব মোটেই বুঝা যায় না, কিন্তু যমুনার ধারে, নিশি-প্রভাত সময়ে উহার অস্তিত্ব প্রবল রকমই অনুভূত হয়। নিদ্রাভঙ্গে বাংলার খোলা বারান্দায় যখন মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই, সমস্ত পূর্ব্বাকাশ, দক্ষিণের সীমা পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শরত ঋতুর শেষে তখনও আকাশে স্তূপাকার মেঘের খেলা, সুতরাং নানা আকৃতির পুঞ্জীভূত মেঘমালার উপরে সেই নবকিরণ-ছটা কি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের না সৃষ্টি করিয়াছে! সম্মুখে যমুনার তরঙ্গহীন নীল জলের মধ্যে সেই স্বর্ণাভা প্রতিভাত হইতেছে। দূরে রাজপথের দুইপার্শ্বে নিম্ববৃক্ষের সারি, তাহাদেরও উপরকার স্থানে স্থানে পত্র-গুচ্ছে কাঁচা সোনার রং ধরিয়াছে। বাগানে দুটি শিউলী ফুলের গাছ ফুল-ভারে ছাইয়া আছে। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিবামাত্র, ঝর ঝর করিয়া শিথিলবৃন্ত ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িয়া সুগন্ধময় সুন্দর শয্যা কাহার জন্য রচনা করিতেছে। মনোরমা জীবনে অনেক প্রভাত দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার তরুণ উষালোকের মতো কোনও উষালোক তাহার হৃদয়কে এমন করিয়া স্পর্শ করে নাই, তাহার হৃদয়-বীণার তারে এমন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে জানিতে দ্যায় নাই যে সে একা—বড় একা, তাহার জীবন বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসম্পূর্ণ। চারিদিককার এই সুন্দর দৃশ্য যেমন তাহার চিত্তকে আনন্দ-রসে সিক্ত করিয়া তুলিল, তেমনি তখনি তাহার মনে পড়িয়া গেল, হায়, এই বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আজ তারা দুটি প্রাণীতে উপভোগ করিতে পারিত! কিন্তু সন্তোষ এখন কোথায়? সে তো কচিৎ রাত্রে গৃহবাস করে মাত্র। বৎসরাধিক কাল মনোরমার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এই এক বৎসর কালই সুদীর্ঘ যুগের মতো কিশোরীর আনন্দপূর্ণ জীবনে কি পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে!

যে মনোরমার বিশাল চক্ষু দুটি সর্ব্বদা পুলকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল থাকিত, হাসির প্রভায় যে রক্তিম ওষ্ঠাধর দুটি সর্ব্বদাই সুন্দর দেখাইত, সর্ব্বাঙ্গে যেন একটি নির্ম্মল আনন্দের আভাস লীলায়িত হইত, আজ সে একখানি মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা! তাহার সে উল্লাস নাই, সে চাঞ্চল্য নাই! ষোড়ষবর্ষীয়া তরুণীর সর্ব্বাঙ্গে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য প্রকাশমান!

সন্তোষ জননীকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কলিকাতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। হিরণ্ময়ীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া, [illegible]গুলির ও ঋণের একটা বিলি-বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। হিরণ্ময়ী কঠোরতা

অবলম্বন করিয়া, ভ্রাতার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সন্তোষ কখনও এরূপভাবে নিজের বিলাস ব্যসন চরিতার্থতায় বাধা পায় নাই, সুতরাং এ পীড়ন তাহার অসহ্য বোধ হইল। অথচ নগেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে সে ভয় করিয়া চলে। বহির্ব্বাটীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া জঘন্য আমোদ আহ্লাদেও সে বঞ্চিত হইয়াছিল, ইচ্ছামত ঋণ করিয়া খরচ করিবার পথেও বাধা পড়িল, কোনও রাত্রি বাহিরে যাপন করিলে হিরণ্ময়ী ও নগেন বাবুর নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, এ বিড়ম্বনায় তাহার ক্ষোভের সীমা ছিল না, সে তখন মাতাকে ধরিয়া বসিল, "মা, চল তোমায় কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া আনি," পূর্ব্বে অর্থের অসদ্ভাব না থাকিলেও অন্নপূর্ণা কখনও তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং পুত্রের এই প্রস্তাবে তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। দেশ বিদেশ দর্শনে, দেবদেবী পূজায় তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি পাইবেন, অনেক পাপ তাপ নষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল; হিরণ্ময়ীও মনে করিল, কিছুদিন কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিলে সন্তোষেরও মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে যাত্রার উদ্যোগ হইল। মনোরমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু মনোরমা চিরকাল কলিকাতার সঙ্কীর্ণ বাটীতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশসমূহের অভিনব দৃশ্যাবলী, নানাস্থানের প্রকৃতির বৈচিত্রময়ী অপরূপ সৌন্দর্য্য তাহার মানসচক্ষে এত রহস্যময় কল্পনাকে সাজাইয়া বসিয়াছিল, আজ সহসা সে কল্পনাকে সার্থক করিবার সুযোগ সে ত্যাগ করিবে কেন? সে হিরণ্ময়ীকে কহিল "দিদিমণি, আমি মার সঙ্গে যাব, আপনি অনুগ্রহ কোরে মত করুন"। সন্তোষের সঙ্গে মনোরমাকে পাঠানো ভালই মনে করিয়া হিরণ্ময়ী সম্মত হইল। কিন্তু সে ভ্রাতৃজায়ার অঙ্গ হইতে মূল্যবান গহনাগুলি খুলিয়া নিজের কাছে রাখিল। একজন মাত্র বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া, সন্তোষ মাতা ও পত্নী সমভিব্যাহারে প্রথমে গয়ায় আসিল। সেখানে দিন কয়েক থাকিয়া তাহারা কাশীতে উপস্থিত হইল। কাশীর মহাসমারোহে সকলকার চিত্তকে এত অধিক আকৃষ্ট করিল যে, দুইমাস সে স্থানে থাকিয়াও কেহ সেস্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। প্রাতে গঙ্গাস্নান ও অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন, সন্ধ্যায় জাহ্নবী তীরে পবিত্র হৃদয়ে সান্ধ্যবন্দনা ও দেবমন্দিরে আরতি পূজায় অন্নপূর্ণার অন্তর ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তিনি ভাবিতেন, সংসারে আর ফিরিয়া সুখ কি? জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা যদি এখানে দেবতার চরণতলে কাটাইতে পাই? আর সন্তোষ? তাহার ন্যায় ধনী, বিলাসী যুবকের যোগ্য সহচর

মিলিতে অধিক বিলম্ব হইল না, সেও বেশ মনের আনন্দে দিনযাপন করিতেছিল।

মনোরমা কলিকাতায় বিশাল প্রাসাদের, একটি কক্ষে নিজের বিষাদপূর্ণ হৃদয় লইয়া সর্ব্বদা গুমরিয়া মরিত। তাহার সমবয়স্কা তেমন সঙ্গিনীও ছিল না। এখানে তাহার পিঞ্জরাবদ্ধ অন্তঃকরণ যেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু হায়! আজ আবার সে নিজেকে যেমন করিয়া নিঃসঙ্গ অনুভব করিল, পূর্ব্বে কখনও তাহা করে নাই। যে পাইয়া বঞ্চিত হয়, সে জগতে বড় অভাগা সন্দেহ নাই, মনোরমা স্বামীর ভালবাসা কখনও পায় নাই, পাইবার জন্য বড় আকুলও হয় নাই, কিন্তু তবু আজ যেন তাহার মনে হইল, সে বড় দুর্ভাগিনী, তাহার নারীজন্ম বৃথা।

কাশীতে সন্তোষ পুনরায় পূর্ব্বেকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল দেখিয়া অন্নপূর্ণা কাশী পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিলেন। কিন্তু যে দুষ্ক্রিয়াসক্ত তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় কতক্ষণ? সন্তোষ এলাহাবাদেও ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। মনোরমা, সে দিন যমুনার নীল জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল, আমার জীবন তো একটি বোঝা মাত্র, সাধ করিয়া এ বোঝা বহিয়া মরি কেন? আমার কোনও আশা নাই, কোনও আনন্দ নাই, কোনও সাধ নাই, পৃথিবী থেকে আমার বাসা যত শীঘ্র উঠে, ততই ভাল। ঐ তো সন্মুখে শান্তি সলিলা যমুনা, ওর বুকে এক লহমার মধ্যে আমার তো এ পোড়া জীবনের বোঝা নামাইয়া দিলে হয়. কিন্তু মৃত্যু-চিন্তায় তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, স্নেহময় জনক জননীর মুখচ্ছবি স্মরণ হইল। আবার তাহার মনে হইল, এই নবীন যৌবন, এই দেহভরা অনুপম সৌন্দর্য্য, প্রাণভরা কত অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সবই এমন করিয়া এক মূহুর্ত্তে মৃত্যুর নিষ্ঠুর কবলে অর্পণ করিব কেন? আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিনা কেন? কিন্তু কিসের অপেক্ষা? দুশ্চরিত্র স্বামী যদি কালে সংশোধিত হয়, যদি সে ভবিষ্যতে দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া, তাহার গৃহলক্ষ্মীর পানে ফিরিয়া চায়; এই আশায় জীবন যাপন করি না কেন? হিন্দু নারীর ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ ও ব্রত কোথায়? কিন্তু হায়, মনোরমার হৃদয় যে বিদ্রোহী হইতে চায়, সে যে বলিতেছে, "না, না, ও প্রলোভন আমায় দেখাইও না, দয়া করিয়া সময় মত ভালবাসিবে, কৃপা করিয়া কোনও দিন ফিরিয়া চাহিবে, সে ভালবাসা আমি চাই না, যে আমার মনের মত নয়, তাহাকে আমি ভালবাসিতে পারিব না, তাহার ভালবাসা আমার প্রার্থনীয়ও নয়।"

মনোরমা নিজের মনের ভাব স্মরণ করিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়া যুক্তকরে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, "ঠাকুর আমায় মার্জ্জনা করো, মার্জ্জনা করো। স্বামীকে দেবতা মনে করে তাঁর সব ত্রুটি ভুলে যেতে চাই, কিন্তু আমার বিদ্রোহী হৃদয়েকে যে কিছুতেই মানাতে পারছি নে প্রভু!" (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

দেবকুমার

১৯

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণপুরের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নমশূদ্রেরা পাটের চাষ করিয়া অনেক টাকা পাইয়াছে। তাহারা আর ব্রাহ্মণদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাহারা সহজে দাসত্ব করিতে চাহে না এবং করিলেও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চাহে। যাহাদের ঘরে অন্ন আছে, তাহারা বিশেষ লাভ ব্যতীত অপরের কাজ করিতে প্রস্তুত নহে।

ইহা ব্যতীত আরও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আপনাদিগের মধ্যে পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং স্থির করিয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জল গ্রহণ না করিলে, তাহারা ব্রাহ্মণদিগের কোন কাজ করিবে না। পল্লীগ্রামে কাঠ-কাটা, জমি চাষকরা, মৃতদেহের সৎকারের জন্য কাষ্ঠ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি কাজ নমশূদ্রেরাই করিত। সুতরাং তাহাদের এই প্রতিজ্ঞায় রায় বাবুরা অতিশয় অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহারা দুই একজনকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন। কিন্তু কেহই পঞ্চায়েতের কথা অমান্য করিল না। অবশেষে তাঁহারা তাহাদের পীড়নের এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিলেন। গ্রামে অনেক-গুলি দিঘী আছে, তাহা সকলেই ব্যবহার করে। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দিঘী হইতে কোন নমশূদ্রকে জল লইতে দিবেন না। গ্রামে কূপখননের ব্যবস্থা নাই। প্রথমে নমশূদ্রদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। দূরে মাঠের মধ্যে যে জল সঞ্চিত থাকে, নমশূদ্র নারীগণ তাহাই পানের জন্য লইয়া আসিত। যখন গ্রামের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, সেইসময় বাবু চারুচন্দ্র রায় পেন্সন লইয়া গৃহে আসিলেন। তিনি তাঁহার স্বজাতির এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "পশ্চিমে

দেখিলাম লোকে গ্রীষ্মে জলদান করিবার কত ব্যবস্থাই করিতেছে। রাস্তায় রাস্তায় লোক রাখিয়া জল দিতেছে। 'আর তোমরা এই গরিব লোকদিগের জলদান করা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছ। আমি এরূপ কাজ করিতে পারিব না।" তিনি নমশূদ্রদিগকে বলিয়া দিলেন যে "তোমরা আমার পুষ্করিণীতে আসিয়া অনায়াসে জল লইয়া যাইয়ো।" অনেকে জলের জন্য আসিত, আবার অনেকে আসিত না।

যাহা হউক, রায় বাবুরা ইহা অপেক্ষা আর একটি কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। সেখনগর অদূরবর্ত্তী মুসলমানপ্রধান গ্রাম। মুসলমান ও নমশূদ্রদিগের মাঠের জমি অনেক স্থলেই সংলগ্ন। রামকৃষ্ণপুরের জমিদারেরা গোপনে গিয়া এই মুসলমানদিগকে স্বগ্রামস্থ নমশূদ্রদিগের সহিত ক্রমাগত বিবাদ বাধাইতে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ইহার ফলে মাঠে দুই একটি সামান্য খণ্ডযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখনগরের দলপতি সৈয়দ আবদুল রহিম অতি বিচক্ষণ লোক। তিনি আপনার স্বজাতিগণকে তিরস্কার করিয়া এবং নমশূদ্রদিগের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই বিবাদগুলি মিটাইয়া দিয়াছেন। সেইজন্য ইহা পুলিশের কর্ণগোচর হয় নাই।

রামকৃষ্ণপুরের মধ্যে চারুবাবুর গৃহসজ্জা অনেকটা ইংরাজি ধরণের। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং ভৃত্যগণের কোলাহল-রহিত। বাহিরের উদ্যান নানা পুষ্পে সজ্জিত। এখানে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে এমন হৃদ্যতা অনুভব করিয়া যান যে, নিজগৃহে আছেন কি পরগৃহে আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা রায় মহাশয়ের কথা বহুদিন ভুলিতে পারেন না। তাঁহার অভ্যর্থনার মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, অথবা আপনার ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শন নাই। রায় মহাশয়ের কন্যা ও ভগিনী তাঁহার বন্ধুগণের সম্মুখে আসিতে সঙ্কুচিত হন না, এবং সন্ধ্যার সময়ে যখন সকলে একত্র বসিয়া কথা বলেন, তখন অতিথিও সেই পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় বসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। তাঁহার অবসর-সময়ের জন্য পুস্তক সংবাদপত্র তাঁহার নিকট থাকে। সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করেন, এবং অতিথিকে শয়ন করাইয়া রায় মহাশয় আপনি শয়ন করিতে যান। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, "আপনি অতিথিকে এত সম্মান দেখাইয়া আপনার মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া থাকেন।" কিন্তু রায় মহাশয় বলিতেন, "আতিথ্যে আমাদের দেশ অপেক্ষা ইংরাজেরা শ্রেষ্ঠ। আমরা মনে করি যে কেবল একবেলা

আহার দিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু ইংরাজেরা যাহাকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকে আপনার গৃহের ন্যায় বুঝিতে ন্যায়। তাহাদের ভাল বিষয়গুলি আমরা কেন অনুকরণ করিব না ?"

একদিন সন্ধ্যাকালে রায় মহাশয় ও তাঁহার কন্যা ভগিনী সকলে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। নিরুপমা বলিল, "বাবা, তুমি যে সেদিন বল্‌লে দেবকুমার বাবু এখানে আসবেন লিখেচেন, আজও তো তিনি এলেন না।"

রায়। দুইএকদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন। কেন মান্দ্রাজ ছেড়ে আসচেন, কিছুই লেখেন নি। এ সময়ে তাঁর না এলেই ভাল হোতো।

নিরুপমা। কেন বাবা, তুমি কি তাঁকে আশ্রয় দিতে পারবে না ?

রায়। কেন মা, তুমি কি আমাকে এমনিই মনে কর ? আমি ভাবচি, এখন গ্রামে যেমন চণ্ডাল-বিদ্বেষ চলেছে, তাতে তিনি এসে নানাদিক থেকে কেবল অপমানিতই হবেন। দেশের লোকে তো আর তাঁর মূল্য বুঝবে না।

নিরু। কেন, তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। এখানে তাঁর অপমান করবে এমন সাধ্য কারও হবে না।

রায়। আমাদের এখানে থাকলে তো ভালই, কিন্তু তিনি যেরূপ স্বাধীনচেতা লোক, তাতে আমাদের এখানে যে বেশীদিন থাকতে চাইবেন, তা মনে হয় না।

করুণাময়ী। দেবকুমার আমাদের বাড়িতেই থাকবে বইকি। ছেলে মানুষ কত দিনই বা থাকবে। এখন তার কাজকর্ম্মের সময়, বেশীদিন কি আর থাকতে পারবে ? লোকে আমাদের গাল দেবে, দিক না ! তাতে আমাদের আর কি হবে ?

ইহার পরদিন দেবকুমার, রায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ পরিবারের সহিত তাঁহার অল্প দিনের পরিচয়, কিন্তু নিজের গৃহে থাকিলে যেমন মনে হইত, তাহা অপেক্ষাও যেন এখানে অধিক আদর পাইলেন। তিনি রায় মহাশয়ের নিকট গ্রামের সকল কথা শুনিলেন, এবং তাঁহাকে নিজের সঙ্কল্পের কথা কহিলেন। রায় মহাশয় কহিলেন "একার্য্য অতিশয় কঠিন, আর তোমার নিজের উন্নতির আশা পরিত্যাগ করে, কেন ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা সহ্য করবে। কিন্তু তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে চাই নে, তুমি মনে কোরো, আমি তোমার পশ্চাতে আছি। তবে অবশ্য একথা বুঝতে পার সমাজ ছাড়া কি কঠিন—হয়তো প্রকাশ্যে কিছু করতে পারব না। কিন্তু যখন তোমার টাকার আবশ্যক হবে, আমাকে জানালে আমি সাধ্যমত তা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব।"

দেবকুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "আপনার সহানুভূতি অর্থ অপেক্ষা আমার নিকট অধিক মূল্যবান।"

২০

দেবকুমার নমশূদ্রদিগের মধ্যে গিয়া বয়স্ক দুই একজনের সহিত কথা কহিলেন। নানা তর্কবিতর্কের পর তাহারা একদিন তাহাদের পঞ্চায়েৎ ডাকিল। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সকলে উন্মুক্ত অঙ্গনে সমবেত হইল। পঞ্চায়েতের দলপতি সকলকে বুঝাইয়া দিল, "দেখ ভাই সকল! সেই যে রামার মা ছিল, তার ছেলে রামচন্দ্র এই বাবু; আমরা শুনেছিলাম রামচন্দ্র খৃষ্টান হয়েচেন, কিন্তু সে মিছে কথা। এই বাবু আবার আমাদের মধ্যে আসতে চান, তোমরা কি মনে কর?"

এই কথাতে নমশূদ্রতরঙ্গ আন্দোলিত হইল। কেহ কহিল, "ইনি খৃষ্টান না হলেও খৃষ্টানের ভাত তো খেয়েচেন। একে জাতে নেয়া হবে কেমন কোরে?" কেহ বলিল, "আমরা গরীব, গরীবই থাকি, আর বড়লোক চাই নে।" আবার কেহ বলিল, "বেশ তো, সকলের মত হয়, আমার আপত্তি নেই।" অবশেষে একজন বয়স্ক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, "ভাই সকল! আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়। আমার কথাটা সকলে একবার বুঝে দেখ।" সকলে নিস্তব্ধ হইলে সে বলিল, "তোমাদের কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হোচ্চে। আমরা যদি আমাদের ভাল লোকদের এমনি করে জাতে না লই, আমরা কি কখনও বড় হতে পারব? তোমাদের মধ্যে কে আছ, এই বাবুর কাছে দাঁড়াতে পার দাঁড়াও দেখি। এর মতো লেখাপড়ায়—এর মতো বুদ্ধি, এর মত সভ্য, তোমরা কে আছ, আমাকে বল।" (সভা মধ্যে 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ' শব্দ হইতে লাগিল)। প্রৌঢ় আবার বলিতে লাগিল, ইনি যে আমাদের মতো চাষার সঙ্গে আবার মিশতে চাচ্চেন, এ আমাদেরই ভাগ্য। তোমরা এ দিকে বামুনদের সাতে লড়াই করতে চাও, আর এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে দলে নিতে চাও না। কেবল মুখে বড়াই করলে তো হবে না? সব দিক বুঝতে হবে। এর মতো লোক যদি আমরা না নিই, তবে আমরা কখনও ভাল হতে পারব না, তাই আমি বলি, তোমরা আর গোলমাল না করে এঁকে জাতে লও।"

এই বলিয়া প্রৌঢ় উপবেশন করিলে, সকলেই বলিতে লাগিল, "ঠিক কথা, এঁর মতো লোক আমাদের মধ্যে আসচেন সেত আমাদেরই সৌভাগ্য।"

তখন দলপতি বলিল, "বেশ কথা—আমিও তাই চাই। কিন্তু এঁকে তো

শুধু জাতে নিলেই হবে না। এঁর থাকবার জন্ত ঘর করে দিতে হবে। আমাদের ঘরে কি ইনি থাকতে পারেন? আমি বলি এঁর মায়ের ভিটে পড়ে রয়েচে, তোমরা সকলে মিলে সেখানে একখানি ভাল ঘর করে দাও। এক এক বাড়ি হতে একজন করে কাজে লাগলে সাত দিনে বেশ ঘর হয়ে যাবে।”

দেবকুমার কহিলেন, “ঘরের যা মজুরি লাগে তা আমি দেব।” কিন্তু তাহারা কহিল, “আমরা কি এতই গরিব যে তোমার ঘর করতে মজুরি নেব?”

সকলে উদ্যোগী হইয়া দেবকুমারের ঘর তুলিয়া দিল। তাহারা জঙ্গল হইতে বাঁশ কাটিয়া মাটির দেওয়াল তুলিয়া খড়ের চালের সুন্দর ঘর করিয়া দিল। দেবকুমার অন্যান্য খরচ দিলেন, এবং যাহাদের অবস্থা ভাল নহে, তাহাদিগকে গোপনে মজুরি দিলেন। এইরূপে তাঁহার গৃহ প্রস্তুত হইল।

গৃহে আসিয়াই তিনি পঞ্চায়েৎ-সভা ডাকিলেন। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গন ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পূর্ণ করিয়া সকলে ভূমির উপর উপবেশন করিল। তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “তোমরা যে ব্রাহ্মণদিগের অধীনতা অস্বীকার করচ, এ শুভলক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। তোমরা যে নিজে মানুষ, তোমাদের শক্তি আছে, অধিকার আছে, একথা তোমরা বুঝতে পেরেছ, এ দেখে আমি বড় সুখী হয়েছি কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কতদিন তোমরা রাখতে পারবে? ব্রাহ্মণেরা তোমাদের চেয়ে জ্ঞানে, শিক্ষায় ও অর্থবলে শ্রেষ্ঠ। যদি তোমরা তাঁদের মতো হতে চাও তবে নিজের উন্নতি কর। নিজে যদি জ্ঞানে শিক্ষায় বড় না হতে পার, তা হলে আবার তাদের দাসত্ব করতেই হবে। আমি তাই তোমাদের উন্নতি দেখতে চাই। আমি বিদেশে থেকে চাকরি বা ব্যবসা করে টাকা রোজগার করতে পারতাম, কিন্তু তোমাদের ভালর জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি।”

একজন বলিল, “ঠিক বলেছ, দাদাবাবু। (যুবকেরা সকলেই দেবকুমারকে দাদাবাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে) তুমি বল আমরা কি করব?” দেবকুমার কহিলেন, “সেই কথাই আমি বলছি, সকলের আগে তোমাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া শিখাতে হবে। লেখা পড়া না শিখলে তারা কখনও মানুষ হবে না। আমি একদিন ছেলেদের, আর একদিন মেয়েদের পড়াব। তোমাদের সকলের ছেলেমেয়েকে আমার কাছে পড়তে দিতে হবে। যারা একটু বড় হয়েচে, মাঠে কাজ করতে যায়, তারা সপ্তাহে তিন দিন করে সন্ধ্যার পরে আমার কাছে পড়তে আসবে। তোমরা এখন বড় হয়েছ, তোমাদের কাজকর্ম্মের জন্য লেখাপড়া

করবার আর সময় নেই। কিন্তু প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময়ে আমার এখানে একত্র হবে। আমি নানা কথা, দেশবিদেশের কথা, চাষের কথা, সমাজের কথা—নানা কথা তোমাদের শোনাব। তাতে তোমরা লেখাপড়া না শিখে অনেক কথা জানতে পারবে। তার পরে, তোমাদের ক'জনের অবস্থা স্বচ্ছল বল? তোমাদের নানা দিক দিয়া খরচ কমাতে হবে। তোমাদের কাহারও ব্যারাম হোলে, আমাকে খবর দেবে, আমি ডাক্তারী জানি, আমার নিকট ওষুধ আছে, তোমাদের চিকিৎসার কোন খরচ লাগবে না। তার পর, দোকান হতে তোমরা যেসকল জিনিস কিনে থাক, তাতে কত বেশী ব্যয় হয়, সে হিসাব তোমরা বুঝতে পার না। দোকানদারেরা জিনিসের ঠিক দামের উপর অনেক লাভ করে। তাই তোমরা সকলে একজোট হও। যার যে জিনিসের দরকার তা আমার নিকট বলবে, সেইসকল জিনিস পাইকারি দরে কিনলে খুব সস্তা পাবে। যদি তোমরা আগাম টাকা দিতে পার ভাল, না পার আমার টাকা দিয়ে কিনে আনব। কোন জিনিস কেনবার জন্য আর তোমরা দোকানে যেও না।" এতক্ষণ সকলে দেবকুমারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কথা শুনিতেছিল। এইবার কতকগুলি কণ্ঠ মিলিত হইয়া এক শব্দ উত্থিত হইল "বেশ কথা দাদাবাবু!" দেবকুমার আবার বলিতে লাগিলেন। "মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে গিয়ে কিরূপ সুদ দিতে হয়, তাতো সকলেই দেখেছ। এক বৎসরে টাকায় ছয় আনা সুদ, ধান কর্জ্জ করলে আরও বেশী সুদ দিতে হয়। তাই, তোমরা মহাজনের নিকট না গিয়ে নিজেদের মধ্যেই টাকার মহাজনী করতে পার, তার কৌশল শিখিয়ে দেব। তোমরা মাসে মাসে যা জমাতে পার, তা আমার কাছে রাখবে। আমি অন্য জায়গা হতে আরও টাকার বন্দোবস্ত করব। তা হতে অল্প সুদে সকলকে ধার দেওয়া যাবে। এদিকে তোমরা যারা টাকা রাখবে, তারাও সুদ পাবে। দরকারের সময় তোমাদের টাকা চাইলেই পাবে। বল এ বিষয়ে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে রাজী আছ কি না?"

সকলেই কহিল, "তোমার উপর আমাদের অবিশ্বাস নেই। তুমি মহাজনের হাত হোতে বাঁচিয়ে আমাদের ভালই কোরবে।"

দেবকুমার কহিলেন, "আর একটি কথা আছে। তোমরা কখনও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করবে না। বিবাদ করলে নিজেরাই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। আর যদি বিবাদ করে আদালতে যাও, খরচে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়বে। তাতে কাজ

নেই। তোমাদের মধ্যে যাদের তোমরা মান্য কর, এমন কয়েকজন লোক ঠিক করে দাও, সমস্ত বিবাদ তাঁরাই মীমাংসা করে দেবেন। তাঁরা যা মীমাংসা করবেন, ভাল হোক, মন্দ হোক, তাই মাথা পেতে স্বীকার করতে হবে। তাঁরা যে অবিচার করবেন, এ মনে কোরো না। তাঁরা যা বিচার করবেন, তা নিশ্চয়ই ভাল হবে।

তখনই দেবকুমার এবং আর ৪ জন লোক নির্ব্বাচিত হইল। সকলেই দেবকুমারের কথা স্বীকার করিল। তার পর দেবকুমারের প্রস্তাবে সমস্ত জিনিস পত্র খরিদ করা ও প্রত্যেকের অভাব মতো দিবার জন্য একজন বিশ্বাসী পরিশ্রমী সৎলোক বেতন দিয়া রাখা হইল। হিসাবপত্র রাখার ভার দেবকুমার নিজে লইলেন। এইরূপে দেবকুমার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী (বি-এ)।

কাশীতে তিন দিন

—:*:—

আমাদের দৈনিক জীবনে প্রত্যেক কার্য্যে পরম দয়াময় বিশ্ববিধাতা ভগবান মঙ্গলময়ের করুণা প্রকাশ পায় আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি এই প্রবন্ধে আমার কাশী যাতায়াত বৃত্তান্ত সহ ভগবানের অসীম দয়ার নিদর্শন যাহা দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব।

গত বড় দিনের ছুটিতে ইচ্ছা হইল যে, এবার কাশী বেড়াইয়া আসি। যাইবার আগে অনেকে বলিলেন যে, এবার কাশীতে অত্যন্ত শীত, যাইয়ো না. কষ্ট পাইবে।" তাহাতে আমি শীতোপযোগী গরমবস্ত্রাদি লইয়া ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার বৈকালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া দেখি যে, গাড়ীতে স্থান পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার ইণ্টার ক্লাস পাস ছিল। গাড়ীতে মোটে দুই-খানি ইণ্টার ক্লাস দিয়াছে। তাহাতে একেবারে প্যাসেঞ্জারে পূর্ণ। বাকী সব থার্ড ক্লাস। সে গুলিও দেখি পরিপূর্ণ। বৈকালবেলা গরমে একেবারে

গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছি; ভাবিলাম, এ গাড়ী বুঝি পাইলাম না। তখন গাড়ী ছাড়িতে আর মাত্র ১৫ মিনিট আছে। গাড়ী ছাড়িবে ঠিক ৪-৩৫ মিনিটে। আমি এ-গাড়ী ও-গাড়ী করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় রেলের একটা কুলি আসিয়া আমার বিছানা ও ব্যাগ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ কাঁহা যায়েগা" আমি বলিলাম, "হাম বেনারস যায়েগা।" সে বলিল, "আইয়ে, আপকো চড়ায় দেঙ্গা, এক চৌয়ানি দিজীয়েগা।" আমি বলিলাম, "চলো" তার পর সে আমাকে একটি থার্ড ক্লাস গাড়ীতে লইয়া গিয়া-বলিল, "আপ হিঁয়া উঠিয়ে।" আমি তাহার কথামতো সেই গাড়ীতে উঠিয়া দেখি যে, ১৬ জনের স্থলে ২১ জন উঠিয়াছে। তবে সবাই ভদ্রলোক ও বাঙালী। এবং সেই গাড়ীতে আমার সমপাঠীর একটি ছোট ভাইও ছিল। সেই আমাকে আগ্রহ করিয়া বসাইল। সেই অবস্থাতে কুলির সাহায্য ও গাড়ীর ভদ্রলোক গুলির সহানুভূতি পাইয়া ভগবানের দয়ার কথাই মনে হইল।

৪-৩৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। কোন রকমে একটু বসিবার স্থান পাইলাম। ক্রমে গাড়ীর সকলের সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গেল। গাড়ীতে ভগবত বিষয়ে অনেক গান হইল। রাত্রি ৯টার সময় একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "এবার উপরের জিনিসগুলি নামাইয়া নীচে রাখা যাক্। আপনি উপরে বিছানা ছড়াইয়া ঘুমান।" ইহাও ভগবানের এক অপ্রত্যাশিত দয়া, কারণ আমি কখনো মনে করি নাই যে গাড়ীতে এত লোকের মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তরূপে ঘুমাইয়া যাইতে পারিব।

আমাদের গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক তাঁহার একটি ছোট ছেলেকে লইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিও "কাশী যাইবেন।" তাঁর ছেলেটিকে কাছে ডাকাতে সে আমার নিকট আসিল এবং আমার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল। প্রায় সমস্তক্ষণ সে আমার নিকট ছিল। তাহার পিতা বলিলেন, "অমূল্যকে (ছোট ছেলের নাম) আপনার নিকট দিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম।

ঠিক ভোরের বেলা ৫৷৷০টায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। উপরে বসিয়াই দুই তিনটি প্রভাতী সঙ্গীত গাইলাম। তার পর নীচে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়া ছেলেটিকে লইয়া সঙ্গের খাবার বাহির করিয়া খাইলাম। আমাদের ট্রেণ যখন শোণ নদীর পুলের উপর দিয়া পার হইল, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিস্তৃত শোণ নদী, চতুর্দ্দিকে চড়া পড়িয়াছে, কেবল মাঝখান দিয়া একটু সংকীর্ণ জলস্রোত তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই বালির চড়ার উপর

দিয়া লোক যাতায়াত করিতেছে। যখন আমাদের ট্রেণ কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার পুলের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখন গাড়ীর সমস্ত লোকের অপূর্ব্ব আনন্দ হইল। কারণ, পুলের উপর হইতে কাশী অত্যন্ত সুন্দর দেখায়, সে যে কি আনন্দ! আমরা যে যার জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক করিয়া লইলাম। এইবার আমাদের নামিতে হইবে। ট্রেণ যখন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে থামিল, তখন হেমন্ত বাবু (অমূল্যর পিতা) আমাকে বলিলেন, আপনি চলিয়া যাইবেন না, আমি মেয়েদের গাড়ী হইতে আমার স্ত্রীকে নামাইয়া লই। আপনি অমূল্যকে লইয়া নামুন। আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আমরা এক সঙ্গে যাইব।"

বাহিরে গিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া তাঁর স্ত্রী ও ছেলেটিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যান, আমি একখানা এক্কা করিয়া যাইব। তাহাতে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়, আপনি এমন করিয়া আমাদের সহিত আসিলেন, এখন আপনাকে কি এই অপরিচিত স্থানে ছাড়িয়া দিতে পারি? তাহা হইবে না, আসুন, তাঁহার ছেলেটিও বলে আপনি আসুন। আমাদের সহিত চলুন। তখন আমি ভাবিলাম, ইহাও ভগবানের দয়ার এক নিদর্শন। আমি বলিলাম "আপনি গাড়ীর ভিতরে উঠুন, আমি গাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া যাইতেছি।" তাহাতে তিনি বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ, এই কাঠ ফাটা রৌদ্রে আপনি চালে যাইবেন কি করিয়া? না তাহা কখনই হইবে না, আপনি ভিতরে আসুন। এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে বসাইলেন ও অমূল্য আসিয়া আমার কোলে বসিল। তার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া আমাদের নাম ধাম, গন্তব্য স্থান ইত্যাদি সমস্ত একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়া গেল। পুনরায় গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাই তো আমার গন্তব্য স্থান খুঁজিয়া পাওয়া সহজ বোধ হইতেছে না তো। এমন সময় গাড়ী বাঙালী টোলায় আসিল। দুটি কুলি গাড়ী ধরিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাইব। হেমন্ত বাবু তাঁহার গন্তব্য স্থান বলিলে, তাহারা গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল। তখনও আমি ভাবিতেছি, আমার গন্তব্যস্থানে আমি কি করিয়া পৌছিব। আমি রাস্তায় আমার বিছানাপত্র নামাইয়া কুলিকে আমার গন্তব্যস্থান বলায় সে বলিল, আগে হেমন্তবাবুকে পৌছাইয়া দিয়া তাহার

পর আপনাকে পৌঁছাইয়া দিব। এই প্রকার বন্দোবস্ত করা হইতেছে, এমন সময় যাঁহাদের বাড়ী যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সবাইকে এক-দল বাঁধিয়া সেই দিকে আসিতে দেখিতে পাইলাম। ইহাতে আমি প্রথমে অবাক হইয়া ভগবানের আশ্চর্য্য দয়ার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। সেই দুইপ্রহর রৌদ্রে, না খাওয়া, না স্নান, রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, কোথায় কোন্ দিকে যাইব, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহাদিগকে পাইলাম। তখন হেমন্ত বাবুকে বলিলাম, "আপনি যান, আমি যেখানে যাইব, তাঁহাদের পাইয়াছি।" তাঁহার ছেলে আমাকে ছাড়িয়া কোল হইতে নামিতে চাহে না।—তিনি অনেক বুঝানর পর তবে নামে।

হেমন্তবাবু চলিয়া গেলেন, তার পর আমার বন্ধুরা বলিলেন, আপনার সহিত দেখা না হইলে বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইত। বাড়িতে কেবল কয়েকজন বৃদ্ধা আছেন মাত্র। আমরা সবাই চলিয়া আসিয়াছি। তা বেশ হইয়াছে, আমরা এক জায়গায় প্রসাদ পাইতে যাইতেছি, আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, চলুন সবাই সেখানে যাই।" এই বলিয়া আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমার বিছানা লইলেন, কেহ ব্যাগটি লইলেন। তার পর সকলে একটি বাড়িতে গেলাম। সেখানে স্নানের জন্য জল না থাকায়, যাঁহার বাড়ি তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে সঙ্গে দিলেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া কেদার-ঘাটে স্নান করিতে গেলাম।

গত বৎসর বড়দিনের ছুটিতে যখন আমি কাশী আসিয়াছিলাম, সেই প্রথম দিনেও এই কেদার-ঘাটে স্নান করিয়াছিলাম। রাত্রে ট্রেণে ভ্রমণ, তার পর এত বেলায় গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিয়া শরীর অত্যন্ত স্নিগ্ধ বোধ হইল। সেই বাড়ি গিয়া প্রসাদ পাইলাম। তাহাও অতি উপাদেয় বলিয়া মনে হইল। আমি জীবনে অনেক দিন এরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করি নাই! আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমার বন্ধুদের সহিত তাঁহাদের বাড়ি আসিলাম। এই তো গেল ২৪শে ডিসেম্বর রবিবারের কথা। তার পর দিন ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিন। সে দিন একটু বিশেষ রকমে খাওয়া দাওয়া হইবে, সেই জন্য রবিবার বিকালবেলা সব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত হইল। আমাদের মধ্যে দুটি দল হইল, একদল বাজারে যাইবে, আর একদল বেড়াইতে যাইবে। আমি শেষোক্ত দলে রহিলাম। আমরা খানিকটা বেড়াইয়া আসি-

লাম। রাত্রে ঠাণ্ডা ও শীতের জন্য বেশী বেড়ানো হইল না। সন্ধ্যার একটু পরে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেই দেখি, সবাই কীর্ত্তন গাহিতেছেন। আমি আসিতেই সবাই অনুরোধ করায় ২। ১টি কীর্ত্তন গাইলাম। তার পর আহারাদি করিয়া সবাই নিদ্রা যাই।

২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার—আজ বড় দিন। ক্রিশ্চিয়ানদের আজ বড় আনন্দের দিন। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সবাই সবাইকে আজ প্রীতি উপহার ও নানাবিধ সামগ্রী পাঠাইতেছে। আজ বড় দিন-উপলক্ষ্যে এই বাড়িতে খুব ধুমধাম। সকালে কেহ কেহ আবার বাজার করিতে গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। কাশীর বাজার খুব বড়, জিনিসপত্রও খুব সস্তা বোধ হইল, অনেক বেলায় সবাই মিলিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিতে গেলাম। স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরের জন্য ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা গ্রহণ করিয়া বেলা ৩৷৷০ ৪টার সময় প্রসাদ পাওয়া গেল। সে বেশ চোর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় হইয়াছিল। কাশীতে যাঁহাদের বাড়ি ছিলাম, আমি তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ির ছেলেদের গৃহশিক্ষক। শ্রীযুক্ত কালীধন দে, ইহার সূতার কারবার আছে। ইনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমাকে বলেন, কাশীতে গিয়া আমাদের বাড়িতে থাকিবেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল, শ্রীযুক্ত বলাইচরণ পাল, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চম্পাটি ইঁহারা কালীধন বাবুর আত্মীয়বন্ধু কাশীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা জ্ঞানানন্দ স্বামী নামক এক স্বর্গীয় সাধুর শিষ্য। বাড়িতে ঠাকুর আছেন। তার পর সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলিয়া বাহির হওয়া গেল। কাশীর চক্ দেখা হইল। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করা হইল। অন্নপূর্ণার বাড়িতে মোহান্ত মহারাজের সহিত দেখা হইল। অতি প্রশান্তমূর্ত্তি, দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। পর দিন মঙ্গলবার অন্নপূর্ণার ভোগ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। তার পর বাড়ি ফিরিয়া কীর্ত্তনাদি হইল। তার পর আহারাদি করিয়া শয়ন করা গেল।

২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—আজ খুব প্রাতে প্রভাতী কীর্ত্তন হইল। তার পর অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের বাড়ি যাইয়া ভোগের বন্দোবস্ত করা হইল। মোহান্ত মহারাজের নিকটে একটি ছেলে আছে, দেখিতে বেশ সুশ্রী, বয়স ১৪৷১৫ বৎসর হইবে। তাহাকে দেখিলে কে বলিবে যে, সে বাঙালীর ছেলে, দেখিতে ঠিক হিন্দুস্থানীর ছেলেদের ন্যায়। তাহার পূর্ব্ব কথা যাহা শুনিলাম অত্যন্ত আশ্চর্য্য। সে তাহার পিতার তৃতীয় পুত্র। বাল্যকালে সে অত্যন্ত

দুরন্ত ছিল, কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পিতা এলাহাবাদে বেশ একজন গণ্যমান্য বড় লোক। তিনি ছেলেটিকে লইয়া মোহান্ত মহারাজের নিকট দেন। মোহান্ত মহারাজের নিকট আসিয়া তাহার পর হইতে শান্ত শিষ্ট ভাল হইয়া গেল। সেই হইতেই সে মোহান্ত মহারাজের নিকট আছে। মোহান্ত মহারাজও তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন।

তার পর বেলা হইলে অহল্যাবাঈয়েরঘাটে আমরা স্নান করিলাম। স্নানান্তে সবাই মিলিয়া বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনে গেলাম, যাহার যাহা পূজা ও মানসিক ছিল তিনি তাহা দিলেন। যেখানে পূর্ব্বে বিশ্বনাথের মন্দির ছিল, এখন সেই স্থানে আওরঙজেবের মস্‌জিদ্ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাও দেখিলাম। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া অন্নপূর্ণার ভোগ বিশ্বনাথের প্রসাদ গ্রহণ করা গেল। বৈকাল বেলা সবাই মিলিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া নৌকা ভাড়া করা হইল। অসি ও বরুণা দেখিতে যাওয়া হইবে। প্রথমে গঙ্গার উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অসি দেখিতে যাওয়া হইল। ছোট একটি খালের মতো রহিয়াছে, বর্ষাকালে উহা জলে পূর্ণ হইয়া যায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর বরুণা দেখিতে যাওয়া হইল না।

দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি মহাপুরুষের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাহার পাশে ধ্যাননিরতা একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। গত বৎসরও ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তি যাঁহার তাঁহার যে ইতিহাস শুনিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

ইহার বাড়ি এলাহাবাদে ছিল। বাল্যকাল হইতেই ইনি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। প্রথমে তিনি একটি বিবাহ করেন, কিন্তু সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি প্রথম স্ত্রী সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করেন। এলাহাবাদে ওকালতি করিতে থাকেন ও অবসর সময়ে যোগ অভ্যাস করিতেন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। দুই স্ত্রীতে সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব কলহ হইতে থাকে। প্রথমে কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রীদ্বয়কে বলেন যে, "তোমরা আমাকে কি গৃহছাড়া করিবে?" কিন্তু তাঁহার কথায় তাঁহারা কর্ণপাত না করিয়া কলহই করিতে থাকেন। এক দিন তিনি কোর্ট হইতে আসিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া দেখেন যে, তাঁর স্ত্রীদ্বয় কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই এক কাপড়েই গৃহত্যাগ করিয়া একেবারে এই দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসেন। যে যাহা দয়া করিয়া দিয়া

যাইতেন, তাহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বাকী দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুবৎসর এখানে তিনি বাস করেন। শীতে ও রৌদ্রে তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া পুঁটিয়ার রাণী তাঁহার জন্য চাকা-বিশিষ্ট একখানি কাঠের ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগকালে সেই ঘর সুদ্ধ তাঁহার দেহ বিসর্জ্জন করা হয়। তাঁহার দুই স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁহাকে পুনরায় সংসারে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। শেষে তিনি মৌনব্রতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

২৭শে ডিসেম্বর, বুধবার—সকালে উঠিয়া বাজারে ও বিশ্বনাথ গলিতে যাইয়া আবশ্যকীয় জিনিস কিনিয়া আনিলাম। কারণ, অদ্য ২টার সময় আমাকে কাশী ছাড়িতে হইবে। কাশী হইতে ১ মাইল দূরে দুর্গাবাড়ি অবস্থিত, গতবৎসর দুর্গাবাড়ি গিয়াছিলাম, সে মহা ধুমধাম ব্যাপার। কি সুন্দর! তার পর কাশী ছাড়িয়া কিছু দূরে বৌদ্ধদের কীর্ত্তি সারনাথ স্তূপ আছে। তাহা একটি দেখিবার জিনিস। আজকাল ইংরাজেরা উহা সংস্কার করিয়া লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতেছেন। তার পর বেণীমাধবের ঝরণা। ইহার চূড়ায় উঠিলে কাশীর সমস্ত দিককার দৃশ্য দেখা যায়। কাশীর সেন্‌ট্রাল হিন্দু-কলেজ ও তৎ-সংলগ্ন বোর্ডিং হাউসও একটি দেখিবার জিনিস। কি সুন্দর বাড়ি, ভিতরে খেলিবার মাঠ। আর দেখিবার আছে, শঙ্করাচার্য্যের মঠ। সেও এক সুন্দর জায়গা। তাহার পর সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া বেনারস ক্যাণ্টনম্যাণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া মেল ধরিয়া মোগলসরাই আসিলাম। মোগলসরাইয়ে আসিয়া দেখি, দিল্লী এক্সপ্রেস আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই এক্সপ্রেসে চড়িলাম। উহা গ্রাণ্ড কর্ড লাইন দিয়া হাওড়ায় আসে। যখন সন্ধ্যা ৭৷৷০টা, তখন আমাদের ট্রেণ শোণনদীর পুলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম যে, শোণনদী পার হইতে ঠিক ১২ মিনিট লাগিল। পুলটি প্রায় ২৷৷০ মাইল কি ৩ মাইল লম্বা। তার পর গ্র্যাণ্ড কর্ডে টানেল গুলি দেখিবার জিনিস। পাহাড় কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া রেল লাইন পাতা হইয়াছে। একেবারে অন্ধকার। এই টানেল গুলি করিতে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে কাশীতে তিন দিন বাস করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় নিরাপদে সুস্থ শরীরে ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু।

শীতের গান

—oo—

শ্যামল ঘাসে
যবের শীষে
আজকে পো'যে
শিশির কণা
পড়লো এসে।

বাড়ীর কাছে
বাগান মাঝে
ফল ধরেছে
ফুলের গাছে ;
মাটির পরে
বায়ু ভরে
শুক্‌নো পাতা
পড়'ছে ঝরে।

গাঁদা দলে
অতসী ডালে
বাতাস চলে
হেলে দুলে।

খেজুর বনে
আকুল প্রাণে
উড়ছে মাছি ;
রসের হাঁড়ি
ঝুলায় গাছি।

কুয়াশা ঘেরা
নদীর ধারে
ক্ষেতটি ভরে ;
সরষে মুলো
কলাই ফুলে
ভোম্‌রা চলে
দলে দলে,
আকুল স্বরে।

যাচ্ছে চলে
গাঁয়ের-পথে,
কৃষক ছেলে
মুনিব-বাটি,
মাথায় নিয়ে
ধানের আঁটি।

কাপড় দিয়ে
গা'জড়িয়ে
পাড়ার যত
ছেলে মেয়ে,
বসেছে সবে
রোদে গিয়ে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
(বিদ্যাবিনোদ)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—:*:—

গয়েশপুর—কুশদহের মধ্যে গয়েশপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, একঘর তাম্বুলি ও অন্যান্য জাতির বাস। যমুনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হওয়াতে গ্রীষ্মকালে এইস্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। যখন গোবরডাঙ্গায় চিনির কারখানা অধিক পরিমাণে ছিল, তখন এখানেও [illegible] কারখানা ছিল। বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় সকল কারখানার

অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। গোবরডাঙ্গায় দুই তিনটি মাত্র কারখানা এখনও লোকের মনে পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

গোবরডাঙ্গার ষ্টেশন হইতে গয়েশপুর এক মাইল দূরে অবস্থিত। গয়েশপুরের উত্তরে কঙ্কনাহ্রদ, পশ্চিমে রত্নাখালির খাল, দক্ষিণে যমুনানদী ও পূর্ব্বে মৃজাপুর নামক একখানি মুসলমান প্রধান পল্লী।

যেমন গোপীপুর—ইষাইপুর, চারিঘাট প্রভৃতি গ্রাম কালের পরিবর্ত্তনে গৈপুর, ইছাপুর, চারঘাট প্রভৃতি পরিবর্ত্তিতনাম প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ গবেশপুরও কাল সহকারে গয়েশপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গবেশপুর নাম যথার্থই রাখা হইয়াছিল। কারণ গো+ঈশ=গবেশ এই পদ সিদ্ধ হয়, "গো" অর্থে গরু ও জল দুই হয়। গবেশপুরে তিনদিকে জল থাকায় গবেশ নাম ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি এখানে এখনও দেখা যায়, এইজন্যে "গো" শব্দে যখন মাটী বুঝায় তখন "গবেশ" মানে উত্তম স্থান বুঝায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—গায়সউদ্দিন নামক কোন মুসলমান জমিদারের জমিদারি ছিল বলিয়া গয়েশপুর নাম হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, নিকটে মৃজাপুরও মুসলমানের দ্বারা স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। কুশদহের মধ্যে গয়েশপুর যেন অন্য পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন বোধ হয়।

প্রতাপাদিত্য যখন তাঁহার রাজধানী ধূমঘাট হইতে যাত্রা করিয়া ইছাপুরে রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশের নিকট আসেন, তখন এই গয়েশপুরের নিকট প্রতাপপুরে ছাউনি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশ যখন নীলকর দ্বারা অধ্যুসিত, তখন কুশদহেও তিন চারিটি নীল কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গয়েশপুরের পশ্চিমদিকে সরকারপাড়ার নিকট ইহাদিগের একটি কুঠির এখনও ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

যেমন কুশদহের অন্যান্য পল্লীগুলি একে একে ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই গ্রামখানিরও সেই অবস্থা।　　শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা-শ্যামবাজার প্রবাসী, গোবরডাঙ্গার দেওয়ানবাটীর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পতিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর-কৃপায় তিনি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু তাঁহার সোপার্জ্জিত সম্পত্তির উপর এইরূপ এক 'উইল' প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাঁহার কলিকাতাস্থিত পাঁচখানি বাটী—যাহার মূল্য পঞ্চাশসহস্র মুদ্রার অধিক, তাহার আয়ে "জে, চাটার্জ্জি হাঁসপাতাল" নামক একটি দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ, 'ভিক্টর মেডিকেল কলেজে'র পরিচালক কমিটীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। আয়ের পরিমাণ অনুসারে ইহাতে কেবল হিন্দু নরনারী বালক বালিকা চিকিৎসিত হইতে পারিবে। এই উইল তাঁহার জীবনান্তে কার্য্যকরী হইবে।

যতীন্দ্র বাবু নিঃসন্তান; তিনি তাঁহার পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ জনহিতকর কার্য্যে অর্পণ করিয়া সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহার অর্থের পরিমাণ যেরূপ অল্প, তাহাতে সহরের লোকের জন্য "হস্তীমুখে দুর্ব্বা ঘাস" দানের

ব্যবস্থা না করিয়া তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের সেবার জন্ত তাঁহার ঐ সল্প পরিমাণ অর্থের দ্বারা কিছু কাজ করিলে তিনি যথেষ্ট যশস্বী এবং স্বার্থকতা লাভ করিতে পারেন। দেশের স্বাস্থ্য এবং পানীয় সম্বন্ধে অনেক অভাব আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনো উইল পরিবর্ত্তন করিয়া এমন ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারিতেন, যাহাতে তাঁহার অর্থের দ্বারা তাঁহার প্রতিবাসী উপকৃত হইতে পারেন।

কুশদহ-পঞ্জী সম্বন্ধে—

(কুশদহ সম্পাদকের আবেদন)

গত ১৩২২ সালের চৈত্র মাসের 'কুশদহ'র শেষ পৃষ্ঠায় "বিশেষ দ্রষ্টব্যে" লিখিত হইয়াছিল; "আগামী ১৩২৩ সালের কুশদহে "কুশদহ-পঞ্জী" শিরোনামে ধারাবাহিকরূপে কুশদহ অধিবাসিগণের বংশাবলী—নাম ধাম—পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী পর্য্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ বিবরণ সংগ্রহের অভাবে তখন তাহা আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে মনে হইতেছে যে, কুশদহ-পঞ্জী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করাই শ্রেয়। নচেৎ উহাতে দীর্ঘ সময়ও লাগিবে এবং কুশদহ মাসিক নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে ব্যাঘাৎ হইবে। কিন্তু কুশদহ-পঞ্জী পুস্তকখানিও সামান্ত হইবে না। দীর্ঘ সময় ও যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ হইবে। তবে এ বিষয়ে আমি দেশস্থ বিশেষ বিশেষ যে ১০।১৫ জনের সহিত কথা কহিয়াছি, তাঁহারা সকলেই উৎসাহ দান করিয়াছেন। কিন্তু সংগ্রহ কার্য্যের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমি দেশস্থ প্রত্যেক অধিবাসির নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে, ইহা প্রত্যেকের নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ বিবরণ লিখিয়া না পাঠাইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন। কি প্রণালীতে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবে তাহার এক আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল। অন্তত ১৫ই চৈত্রের মধ্যে যদি কুশদহের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের বংশ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় তবে আগামী বৈশাখ হইতে ছাপার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে।

১। নিজ নাম, গোত্র, নিবাস। স্ত্রীর নাম, আপনার শ্বশুরের নাম, গোত্র, তাঁহার নিবাস।

২। আপনার পুত্রগণের পর পর নাম, বয়স, বিবাহিত অবিবাহিত। পুত্রবধুগণের পর পর নাম, তাঁহাদের পিতার নাম, গোত্র, নিবাস।

৩। কোন পুত্রের কয়টি পুত্র ও কন্যা তাহাদের নাম, বয়স, বিবাহিত অবিবাহিত। পৌত্র বধুগণের নাম; পিতার নাম, গোত্র নিবাস।

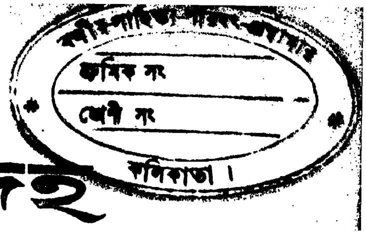
৪। আপনার কন্যাগণের পর পর নাম, বয়স, বিবাহিত অবিবাহিত। জামাতাগণের পর পর নাম, তাঁহাদের পিতার নাম, গোত্র, নিবাস।

৫। দৌহিত্র, দৌহিত্রীগণের নাম, বয়স, বিবাহিত অবিবাহিত। তাঁহাদের স্বামী ও স্ত্রীর নাম, তাঁহাদের পিতার নাম, গোত্র, নিবাস।

৬। আপনার পিতা ও পিতামহের ঐরূপ পরিচয়।

পুস্তকের মূল্যাদির বিষয় বিবরণ সংগ্রহের পরে নির্দ্ধারিত হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়,
ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

অষ্টম বর্ষ } মাঘ, ১৩২৩ { দশম সংখ্যা

সঙ্গীত

কাফি—ঝাঁপতাল

প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্ম্ম পারাবার পারে হে—
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

—রবীন্দ্রনাথ

বাগেদবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

সেবকের নিবেদন হইতে।

—*—

মূর্ত্তি-উপাসকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় যাহারা মুখে আপনাদিগকে (নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক) বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু চলে না, বলে না, নড়ে না, জীবনের লক্ষণ দেখায় না—এমন এক কল্পিত ছায়ার পূজা করে।

যে বস্তুর কথা কহিবার শক্তি নাই, যাহা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না, তাহা কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি বাক্য স্বরূপ, তাঁহার নাম বেদ।

যে ঈশ্বর উপদেশ দেয় না, যে ঈশ্বর পাপের প্রতিবাদ করে না, যে ঈশ্বর পাপের দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক অকল্যাণের হেতু।

যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে চাও তবে ঈশ্বরকে বাক্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ কর।

হিন্দুস্থানে ঈশ্বরের যে ভাব সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মগণ, তোমরা সে ভাব অবহেলা করিতে পার না। তোমরা কে? জগজ্জননী জ্ঞানদেবী সরস্বতীর সন্তান, তোমরা তাঁহারই উপাসক। তিনি চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিনী-বাগ্দেবী, তিনি বাক্যস্বরূপ। কেমন বাক্য? নিত্যবাক্য, অশেষবাক্য, সত্যবাক্য, অভ্রান্ত—বেদবাক্য।

ঈশ্বরের বাক্যতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সেই বাক্যতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। যদি ব্রহ্মবাণী না থাকে তবে পাপী সহস্রবার প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলেও স্বর্গ হইতে কোন উত্তর পাইবে না।

এতকাল হিন্দুস্থানে সরস্বতীর যে আদর হইয়াছে তাহার কি কোন অর্থ নাই?

ঈশ্বর অনন্তজ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞানজ্যোতি অতিশয় শুভ্র; উহার অভাবই অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞান, আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল; অজ্ঞান, অন্ধকারের ন্যায় কালো। যাঁহারা আদিতে ঈশ্বরের জ্ঞান-রূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ও ধ্যান ধারণ করিতেন। এইজন্য কালক্রমে পৌত্তলিকেরা সরস্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মল শুভ্রবর্ণে চিত্রিত করিল।

আমরা যোগবলে জড়-প্রতিমাকে উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকার-বিদ্যাকে দেখিয়া বলিলাম ;—হে নিরাকার-বাগ্দেবী-সরস্বতী, তোমাকে প্রণাম করি।”

কেহ কেহ ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া সরস্বতীকে সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা কি মূল সরস্বতী—ব্রহ্ম প্রকৃতিকে অস্বীকার করিব ? শাখার দোষ বলিয়া মূল পরিত্যাগ করিব কেন ? নদী বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া, যে হিমালয় হইতে নদী বিনিঃসৃত হইতেছে আমরা সেই হিমালয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

সরস্বতীর জিহ্বার বিশ্রাম নাই, এবং তাঁহার বীণাও অবিশ্রান্ত বাজিতেছে। বীণাপাণীর সাধকগণ, যখনই তোমরা কাণ পাতিবে তখনই তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। যদি জ্ঞান চাও, যদি নূতন নূতন সত্য শিখিতে চাও, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম চাও, তবে তাঁহার শান্তিপ্রদ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ কর।

হে ব্রহ্মোপাসক, তুমি কদাপি মনে করিও না যে, তোমার ব্রহ্মের জিহ্বা নাই। তাঁহার এক অনন্ত আকাশব্যাপী জিহ্বা আছে। সেই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বর অনন্ত আকাশে অনন্তকাল অসংখ্য ভাষায় অসংখ্য কথা বলিতেছেন, এবং জীবের হিতের নিমিত্ত যোগ ভক্তি প্রভৃতি বিচিত্র-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রহ্মবাণীর শেষ নাই। মানুষ অর্দ্ধঘণ্টা কি পাঁচঘণ্টা বক্তৃতা করে এবং তাহার পর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু ঈশ্বর অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কত কোটিভাষায় কোটিভাবে বক্তৃতা করেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষায় কথা কহিতেছেন। জ্ঞানী, মুর্খ, ধনী, দীন, পাপী সাধু সকলের সঙ্গে—প্রতিজনের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায় তিনি কথা কহিতেছেন।

তাঁহার কথার বিরাম নাই, সুতরাং আমাদের বেদ বেদান্তেরও অন্ত নাই। প্রতিবর্ষে—প্রতিমাসে—প্রতিপক্ষে—প্রতিদিনে—প্রতিঘণ্টায়—প্রতিমিনিটে সেই সদ্‌গুরু উপদেশ, আদেশ, প্রত্যাদেশ বিধান করিতেছেন।

ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বের কথা নহে ; কিন্তু সত্য সত্যই অগণ্য যোগী ঋষি, অগণ্য সাধু ভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্ন্যাসী, সেই অনন্ত আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিতেছেন। অনন্তআকাশ-সিংহাসনে বসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা এক বৃহৎ গুরু, বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন ; চোর চুরী করিস্ না, স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচার করিস্ না, সংসারী সংসারে ডুবিস্ না, অবিশ্বাসী অবিশ্বাস করিস্

না। (সাধক) যোগ সাধন কর। প্রেমিক, একেবারে ভক্তিরসে প্রাণকে নিমগ্ন কর। এইরূপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে নানা প্রকার বিধি নিষেধপূর্ণ উপদেশ দিতেছেন।

ব্রহ্মের উপদেশ কখন থামে না, তাঁহার বক্তৃতা অবিরাম হইতেছে; কেবল বিবেক-কর্ণ পাতিলেই শুনা যায়।

(বিশ্বাসী সাধকগণ), এমন নিত্য বাগীশ্বরী মধুরভাষিণী—সরস্বতী আর কি কোথাও দেখিয়াছ? ব্রহ্মমুখ হইতে জীবন্ত জ্ঞানস্রোত বিনিঃসৃত হইয়া জীবের অজ্ঞান-জঞ্জাল দূর করিতেছে। সরস্বতীর নির্ম্মল-মুখ হইতে সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সাধকদিগের মনের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে।

অনেক মানুষের বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের বক্তৃতার ন্যায় এমন জীবন্ত জ্বলন্ত বক্তৃতা আর কোথাও শুনি নাই। জ্ঞানস্বরূপা-সরস্বতী ক্রমাগত বিচিত্র জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসব করিতেছেন। মনুষ্য মনে যত সত্য—যত ভাবের বিমল কিরণ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় সরস্বতীর জ্যোতি। ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অজ্ঞান অবিদ্যা। সরস্বতী ছাড়া সকলই দুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্ম্মতি।

ব্রহ্মের মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির আশঙ্কা করিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রান্ত পরাবিদ্যা তাঁহারই নিকটে পাইবে।

হে (সাধকগণ) তোমরা এই বাগ্দেবীর পূজা অর্চ্চনা কর এবং ইঁহার কথামৃত পান করিয়া প্রাণকে শীতল কর। ব্রহ্মের তেত্রিশকোটী রূপের মধ্যে এই এক সরস্বতীরূপ অর্থাৎ বিদ্যারূপ যত্নের সহিত সাধন কর।

সুন্দর বন

—:—

বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগকে সুন্দরবন বলে। ইহার পশ্চিমসীমা মেদিনীপুর জেলা ও পূর্ব্বসীমা আরাকান প্রদেশ। অতি প্রাচীনকালে রামায়ণী যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান এই সুন্দরবনকে সমতট বলিত। সূর্য্যবংশের মহারাজ রঘু যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, সেই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের রাজা ও সুহ্ম দেশের রাজাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৩৫।৩৬।৩৭ শ্লোকে লিখিত আছে বঙ্গদেশের রাজার বহু নৌসৈন্য ছিল, তাঁহাকে জয় করিয়া তথায় সমুদ্রতীরে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সে সময়ে

এই স্থান ধন ধান্য পরিপূর্ণ জন বহুল নগরী ছিল। এক্ষণে যে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ তাহা কোন্ সময় পর্য্যন্ত লোকালয় ছিল ? যখন ইহার নাম সমতট ছিল, তখন ইহার পশ্চিমে সুহ্মদেশ ও পূর্ব্বে হিড়িম্বদেশ ছিল।

রঘুর দিগ্বিজয়ের পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বঙ্গদেশের রাজার নাম ব্যতীত আর কিছু শুনা যায় না। তৎপরে ৮ম শতাব্দীতে যখন আরবেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, তখনও তাহারা এই সুন্দরবনকে সমৃদ্ধিশালী দেশ দেখেন।

"During the time of Arab invassion of India, Suliman came to the Lower Bengal and saw that the Delta of the Ganges was then in a flourshing country, there existed then many cities which tracted with Arracan."

Bulletions geographical Account.

অর্থাৎ বুলেটীন সাহেবের প্যারিসের ভৌগলিক ইতিবৃত্তের ২০৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আরবের স্থলেমান নিম্নবঙ্গের ব দ্বীপগুলিকে সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন এবং মগেরা তাহাদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিত।

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব সময়ে এই স্থানকে সমতট বলা হইত। তৎপরে এই স্থানের অনেকঅংশ "কুশদহ" নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে "কুশদহ, অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া কয়েকখানি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কুশদহের দক্ষিণাংশ কোন্ সময়ে "সুন্দরবন" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশ পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু জমিদারে পুর্ণ ছিল। এই জমিদারদিগকে "বারভূঁঞ্যা" বলা হইত। এই বারভূঁঞ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব সমগ্র সুন্দরবন ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়েও ইহা সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পূর্ণ ছিল।

Beveridge সাহেব "Were the Sunderbans inhabited in ancient time ?" নামক পুস্তকে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লিখিতেছেন :—

"Sandwip itself was, it is true, cultvated in cearaer Fredanc's time (1569), but so it is now, and there is no reason to suppose that its civilization was greater then than it is present"

এই সকল বিবরণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের পরও এখানে লোকের বসতি ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যত্নে এই সুন্দরবনের অনেক অংশ এক্ষণে পরিষ্কৃত হইতেছে, এই সময়ে এই স্থানে অনেক বড় বড় বাড়ী পাওয়া যাইতেছে। "The remains of these fine cities are found in lots Nos. 116, 211, 165 and 146. Mr. Swinhoe has published a figure of the reins lately dis covered in lot No. 116, the temple is of the Budhist type of architecture."

ক্যানিং টাউনের কিছু দূরে সুন্দরবনের গভীরতম প্রদেশে "জটার দেউল" নামক একটি মন্দির দেখা যায়।

উপরি উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মোগল রাজত্বের প্রথম অবস্থায় এই স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয় নাই।

এত বড় স্থান এই অল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল? ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। একটি কারণ ভীষণ ঝটিকা সহ ভূমিকম্প; অপরটি পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচার।

ঐতিহাসিকগণ ১ম কারণ—ভীষণ ঝড়ের তিনটি সময় উল্লেখ করেন। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে, ১৬৮০ অব্দে ও ১৭৩৭ অব্দে।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দের ঝটিকা সম্বন্ধে বলেন:—In the 29th year of the present era (A. D. 1585) one afternoon, an immence wave, set the whole district under water. For nearly 5 hours the waves remained agitated, the lightning and the wind were terrible; houses and ships were distroyed, only the Hindu temple and the Tàlàr escaped. About two hundreds of thousand souls perished in this hurricane.

অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হয়, তাহাতে দুই লক্ষ লোক ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

তৎপরে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে যে ঝটিকাবর্ত্ত হয়, তাহাতে এই সুন্দরবন প্রদেশের ৬০০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কিন্তু ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে যে ঝটিকাবর্ত্ত হয়, সেই সময়ে ঝড়ের সহিত ভূমিকম্প হয়, দেশের অন্য স্থান অপেক্ষা এই স্থান নিম্ন হওয়ায় জোয়ারের সময় সমুদ্র

জল দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই জন্য এখানকার লোক ঘর বাড়ী ছাড়িয়া উত্তরদিকে গিয়া বসতি করে। এই ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই স্থান ক্রমে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

২য় কারণ—পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচার; ব্লকম্যান সাহেব এ সম্বন্ধে বলেন—

The deserted state of the Sunderbuns is due to the incursious of the Portuguese and the Mags rather than to cyclones.

আমরাও ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, মোগলরাজত্বের সময়ে পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য অনেকে সমুদ্রতট ও সমুদ্র নিকটবর্ত্তী নদীতট পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই জন্য এই স্থান লোকাভাবে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

এই ভীষণ জঙ্গলের নাম সুন্দরবন কেন হইল?

পর্ত্তুগীজ লেখকেরা বলেন, এই স্থান অর্দ্ধ সভ্যলোকের বাসস্থান ছিল। এই সভ্য লোকদিগকে চন্দভন্দ বলিত। এই চন্দভন্দ হইতে প্রথমে "সুন্দর বাঁধ" এই নাম হয়। তৎপরে রূপান্তরিত হইয়া সুন্দরবন এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা লিখিত হইল;—

"There livad in this part of Bengal a Semi Barbarous tribe named Chanda Bhanda, very similar to the Malangi of the present day. From the name Chanda Bhanda the name Sunder is derived."

রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্যে দেখিতে পাই চাঁদ খাঁ এর সম্পত্তি বিক্রমাদিত্য পাইয়াছিলেন, এই চাঁদখাঁকে পর্ত্তুগীজেরা "Ceandican" বলিত। এই চিয়াণ্ডিকান নাম হইতে সুন্দরবন নাম হইয়াছে।

"Ceandican was the old name of the property in the Sunderbans which Protap's father Vikramaditya got from King Daud.

আবার কেহ কেহ বলেন,—এখানে সুঁদরিকাঠ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম সুন্দরবন হইয়াছে। রেভারেণ্ড জে, লং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সুন্দরবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন :—এখানে সুন্দর

বাঁধ ছিল বলিয়া ইহার সুন্দরবন নাম হইয়াছে। আরও তিনি বলেন, সমুদ্রের ধারের বন বলিয়া সুন্দরবন নাম হইয়াছে।

বহু দিন এই স্থান পতিত অবস্থায় থাকায় ইহার উর্ব্বরতা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য বহু যত্ন করিতেছেন। যে সকল লোক এই আবাদ অঞ্চলে চাষের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী একে একে সুপ্রসন্ন হইতেছে, এক্ষণে এই সুবিস্তৃত আরণ্য-প্রদেশ সাগরসঙ্গম হইতে মেঘনা নদী পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ১৭০ মাইল এবং প্রস্থে ৭০।৮০ মাইল। ইহার পরিমাণ ফল ৭৫৩০ বর্গ মাইল। সুন্দরবনের যদিও কতক অংশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি এখনও প্রায় ৫৫00 বর্গ মাইল ভূমি অরণ্যে আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

দেবকুমার

২১

একদিন অনেকে দেবকুমারের গৃহের সম্মুখে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে একজন বলিল, ‘দাদা বাবু, তুমি তো এত ব্যবস্থা করলে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে আমাদের জল লওয়া বন্ধ করেছে। মেয়েগুলো রোদে দূর হতে জল আনতে যে কি কষ্ট পায়, তা আর বলতে পারি নে।”

দেবকুমার কহিলেন, “কেন চারুবাবু তাঁর পুকুর হতে জল লবার জন্য আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। আর এক কাজ কর। পাড়ার মধ্যস্থলে একটি কূপ খনন কর ; যেমন করে আমার বাড়ি করে দিলে, তেমনি করলে সহজেই একটি বড় কূপ হতে পারে। তাতে বারোমাস জল থাকবে। পশ্চিমে তো এই করেই জল পায়। তাদের প্রায়ই পুকুর নেই।”

দুই মাসের মধ্যে কূপ হইল ; জল বন্দ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া রায় বাবুরা অন্য উপায়ে নমশূদ্রদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী মুসলমানপ্রধান গ্রামে গিয়া, মুসলমানদিগকে নমশূদ্রদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

এ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহায় মুসলমানদিগের পুরোহিত বা মোল্লা মৌলবী গোলাম রহমান। গোলাম রহমান হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং তাহার কথা শুনিয়া অশিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সকল সংবাদ পাইয়া দেবকুমার অবিলম্বে সেই গ্রামে গেলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সে গ্রামে সৈয়দ আবদুল রহিম জমিদার এবং শিক্ষিত লোক। তাঁহাকে বলিলে হয় তো এই আসন্ন বিপদের কোন প্রতিবিধান হইতে পারে।

সৈয়দ আবদুল রহিম তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবকুমার গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবকুমার অভিবাদন করিলেন, "সেলাম আলেকম্।"

আবদুল রহিম। আলেকম সেলাম, আসুন বাবুসাহেব, বসুন।

দেবকুমার। আমি একটু বিশেষ কার্য্যের জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমার নাম দেবকুমার বোস্, নিবাস রায় গ্রামে।

আবদুল। আপনার আর পরিচয় দিতে হবে না। আমি আপনার নাম শুনেছি, আর আপনি যে সকল কাজ করচেন, তাও আমি শুনেছি। আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড় আনন্দিত হলাম।

দেবকুমার। আমিও আপনার প্রশংসা শুনেছি! আপনার মতো শিক্ষিত ও উদারচেতা লোকের নিকট অনেক আশা করি বলেই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

আবদুল। আল্লা আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য আদেশ করেছেন। যদি আমরা পরস্পরকে সাহায্যই না করলাম, তবে আমরা মানুষ কিসে?

দেবকুমার। আপনার কথায় বড় সুখী হলাম। আমি সংবাদ পেলাম যে, আপনার গ্রামের মুসলমানেরা ভিন্নগ্রামের নমশূদ্রদের আক্রমণ করবার ষড়যন্ত্র করচে। এ কি সত্যি!

আবদুল। বাবু সে কথা আর কি বলব, আমাদের যে মোল্লা, সেই এ কাজের উৎসাহদাতা। শুনচি আপনাদের গ্রাম হতে লোক এসে মোল্লাকে নানা প্রলোভন দেখাচ্চে। খোদাতালা আমায় মাপ করুন, কিন্তু এই মোল্লার উপর আমার ভাল ভাব নেই। দেখুন আমাদের ধর্ম্মে সুদ লওয়া ও মদ খাওয়া হারাম—একেবারে নিষেধ। মোল্লা গোলাম রহমান, গরিব লোককে

টাকা ধার দিয়ে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করে। গ্রামে এক তাড়ির দোকান আছে, যত ছোটলোক মুসলমানেরা সেখানে গিয়ে তাড়ি খায়। মোল্লা এসকল বিষয়ে তাদের নিষেধ করে না। শুনচি কয়েক দিন ধরে কেবল জেহাদ ঘোষণা করছে। হজরত মহম্মদ যে জেহাদ করেছিলেন, সে আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু মোল্লা তা স্বীকার করে না। নানারূপ লোভ দেখিয়ে সকলকে উত্তেজিত করছে। কখনো বা বলে, কাফেরের সহিত লড়াই করলে, তোমাদের অনেক পুণ্য সঞ্চয় হবে। তা ছাড়া লুঠ পাঠের লোভও দেখাচ্চে। এখন দেখুন, কিরূপ লোকের হাতে আমরা পড়েছি।

দেবকুমার। এর কি কোন প্রতিকার নেই।

আবদুল। আমার নিকট কয়েকজন লোক এসেছিল তারা মোল্লার সকল কথা বোলে, আমার মত চেয়েছিল, আমি বলেচি, আল্লার আদেশ অগ্রাহ্য কোরে সুদ খেয়ে যে হারামী করছে, তার কথা তোমরা বুঝে সুঝে গ্রহণ করবে। মুসলমানেরা যে তাড়ি খায়, তার বিরুদ্ধে তো তিনি কিছু বলেন না। মহম্মদ সাহেব কেবল আরবদের আক্রমণ হতে আপনার অনুচরদের বাঁচাবার জন্য জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু লুঠ করবার জন্য সেই জেহাদ মোল্লা ঘোষণা করছেন। তিনি কোরাণ সরিফ হতে দেখান দেখি, যে কাফেরের সহিত যুদ্ধ করা খোদাতালার আদেশ।" সেই সকল কথা শুনে মোল্লা আমার উপর ভারি রেগে গেছে। লোকের নিকট বলে বেড়াচ্চে, "ও বেটা কাফের, ও সৈয়দ আহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী। উহার কথা তোমরা শুনো না।"

দেবকুমার। সৈয়দ আহম্মদের ধর্ম্ম কি?

আবদুল। দেখুন কোরাণের অর্থ কি সকলে বুঝতে পারে? বিশেষত গোঁড়া, অশিক্ষিত লোকের কি তা বোঝা সম্ভব। আলিগড়ের স্যার্ সৈয়দ আহম্মদ কোরাণের প্রকৃত ব্যাখ্যা করে আমাদের অনেক ভ্রান্তি দূর করেছেন। আমাদের কোরাণে স্বর্গের বর্ণনা আছে, জিব্রিল ইত্যাদি স্বর্গীয় দূতের অনেক কথা আছে। সৈয়দ আহম্মদ বলেন, স্বর্গও নাই, স্বর্গীয় দূতও নাই, সকলই সেই খোদাতালা, তিনি যখন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন, তখন তাঁকে জিব্রিল বলা যায়। এইরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু গোঁড়া মূর্খ মৌলবীদের তা সহ্য হল না। তাঁর উপর তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন করেছেন, বলতে গেলে স্যার্ সৈয়দ আহাম্মদ অনেকটা মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে

সেইরূপ করেছেন। আশা করা যায়, যদি আলিগড় কলেজ বড় হয়, স্যার্ সৈয়দের মত ক্রমে প্রচারিত হবে।

দেবকুমার। আমি যে তার চেয়েও বেশী বলি, আমি বলি আপনারাও হিন্দু—যখন আপনারা হিন্দুস্থানবাসী, তখন হিন্দু ব্যতীত আর কি? এ দেশে যত মুসলমান আছে, তারা হিন্দু হতেই তো হয়েছে। কয়জন লোক আরব ও পারস্য হতে এসেছে?

আবদুল। বাবু আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নিজেদের নামের সহিত কখন বা সৈয়দ, কখন বা সেখ যোগ করি। সৈয়দেরা মহম্মদ সাহেবের বংশ। কিন্তু সৈয়দেরা বাস্তবিক সৈয়দ কি না, তা কে অনুসন্ধান করতে যায়, আমরা এ দেশের লোকই মুসলমান হয়েছি। আচ্ছা বাবু, হিন্দুরা যে প্রতিমা পূজা করে, আমরা তাদের সহিত এক হই কি প্রকারে?

দেবকুমার। কেন, সকল হিন্দুরা তো প্রতিমা পূজা করে না। এই দেখুন না, যাঁরা শিক, নানকের মতাবলম্বী তাঁরা প্রতিমা পূজা করেন না। অনেক শিক্ষিত হিন্দু, কিম্বা যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরাও প্রতিমা পূজা করে না। কেন আপনাদিগকে কি হিন্দুর এক শাখা বলা যায় না?

আবদুল। বাবু আপনি যে নতুন কথা বলছেন, হিন্দু ও মুসলমানে এত ভিন্ন যে এক মনে করাও যেন কল্পনা মনে হয়।

দেবকুমার। আমি নতুন কথা বলছিনে। হিন্দু মুসলমানের মিলন চেষ্টা পূর্ব্বে আকবর করেছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে হিন্দু বিবাহ করে ছিলেন। পুত্রেরও বিবাহ দিয়ে ছিলেন। আরংজেব না রাজা হলে হয় তো হিন্দু ও মুসলমান এক হয়ে যেত।

আবদুল। কিন্তু ধর্ম্ম তো এক হত না।

দেবকুমার। ধর্ম্মও এক হত। আপনারা ঈশ্বরকে যেভাবে চিন্তা করেন, হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র বেদেও ঠিক সেই ভাবই আছে। আপনারা বলেন, "আল্লা আকবর," হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" আপনারা বলেন, "বেস্‌মল্লা", হিন্দুরা বলেন, "ওঁ।" পরস্পর একই কথা। এতে হিন্দুর সহিত এক হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

আবদুল। কিন্তু ঈদ, কোরবানি, এ সকলের কি করে মিলন হবে?

দেবকুমার। এইখানেই যত গলদ্। আমার মনে হয়, ধর্ম্মের দুটি দিক্ আছে—একটি সত্যের দিক, আর একটি সংস্কারের দিক। ধর্ম্মের দিক দিয়া

দেখলে আপনাদের সহিত আমাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। আপনাদের অনেক কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। যা নেই, তা আমরা গ্রহণ করেছি। রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য রামমোহন ইঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করেছেন। চৈতন্যের ধর্ম্ম বাদ দিলে, আর সকলের শিষ্যেরাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু সংস্কারের দিকেই যত গোলমাল। হিন্দুর যেমন জাতিভেদ সংস্কার, আপনাদের তেমনি রমজান, ঈদ এবং কাফের-বিদ্বেষ। মহম্মদ যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহা হলে এ সকল আরবীয় সংস্কার মুসলমান ধর্ম্মে আসত না।

আবদুল। মহম্মদ সাহেব ভারতবর্ষে জন্মিলে মুসলমান ধর্ম্ম কেমন হ'ত?

দেবকুমার। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম করতেন বটে, কিন্তু অজ্ঞতা হেতু যেখানে সাকার উপাসনা হয়, তারপ্রতি বিদ্বেষী হতেন না। যেমন জাতিভেদ অবতারবাদ তাঁর ধর্ম্মে নেই, তেমনি এ দিকে ভারতে ঈদ, রমজান ও গো হত্যা ছিল না, সুতরাং তিনি এ সকল কখনও ধর্ম্মের অঙ্গ করে যেতেন না। এক কথায় তাঁর উদার ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তিনি সকল হিন্দু সংস্কার ও অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তন করতেন।

আবদুল। আচ্ছা ধরলেম, আমরা আরবীয় সংস্কার গ্রহণ করেছি, কিন্তু এতে আমাদের কি ক্ষতি হচ্চে।

দেবকুমার। আমি সরলভাবে বলছি, এতে মুসলমান সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেক জাতিও দেশের সংস্কার ভিন্ন এবং তাহা বহুযুগের শিক্ষার ফল। অবশ্য সকল সংস্কারই যে ভাল, তা বলছি নে। কিন্তু যে সংস্কারগুলি কল্যাণপ্রদ, তা পরিত্যাগ করে আমরা উন্নত হতে পারি নে। বর্দ্ধিত গাছের মধ্যভাগ হতে কেটে অপর বৃক্ষের মুলের সহিত যোগ করে দিলে যেমন তা শুকিয়ে যায়, সেইরূপ আমাদের জাতীয় সংস্কার পরিত্যাগ করে বিজাতীয় সংস্কার গ্রহণ করলে, সমাজ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মুসলমানসমাজ যে উন্নতিবিমুখ, এই তার একটি কারণ। আপনারা আরবীয় ও তুরস্ক যাই মনে করুন না কেন, আপনারা ভারতীয় সংস্কার কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। সেই জন্য আমি আপনাদিগকে হিন্দুই বলে জানি, অর্থাৎ আপনারা মহম্মদীয় হিন্দু।

আবদুল। আমি পূর্ব্বে এভাবে কখনও চিন্তা করি নিই। আপনি আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন। হিন্দু ও মুসলমান যদি এত কাছে হয়, তা হলে তার মতো সুখের বিষয় আর কি আছে? স্যার্ সৈয়দ বলেছেন, হিন্দু ও

মুসলমান ভারতের দুই চক্ষু। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তারা দুই চক্ষু নহে, দুই ভাই। কি grand idea (মহান কল্পনা)।

দেবকুমার। এরূপ মিলন ব্যতীত এ দেশের উদ্ধার নেই। যে গৃহে ভাই ভাইয়ের সহিত বিবাদ করে, সে গৃহ কিরূপ অশান্তিপূর্ণ হয়। এ ভারতেও তাই হয়েছে।

আবদুল। কিন্তু এই অশিক্ষিত লোকদিগের কি বলে বুঝাব ? এরা তো সহজে এ কথা বুঝবে না।

দেবকুমার। আমার নির্ভর আপনার উপর। আপনার হৃদয় আছে, সুতরাং আপনার ক্ষমতাও আছে। আপনি চেষ্টা করলে ইহা সহজেই হবে। সকলকে ডেকে আপনি বুঝিয়ে দিন। আশাকরি কৃতকার্য্য হবেন।

আবদুল। কালই আমি সকলকে ডেকে বুঝাব। কিন্তু আপনাকেও থাকতে হবে।

দেবকুমার সম্মত হইয়া বিদায় লইতেছিলেন, কিন্তু সৈয়দ আবদুল রহমান বলিলেন, "না না, তা হবে না। আপনি আমার বন্ধু ও অতিথি, আপনাকে আজ আমার গৃহেই থাকতে হবে। আপনার গ্রামের লোক এখানে কেহ নেই যে গ্রামে গিয়ে গোলমাল করবে। আমরা এক সঙ্গেই আহার করব।"

পরদিন সৈয়দ আবদুল রহমানের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে গ্রামস্থ সকল মুসলমান আসিয়া একত্রিত হইল। তিনি ধর্ম্ম, নীতি ও রাজকীয় দণ্ডের কথা বলিয়া তাহাদের কথিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে কহিলেন। দেবকুমারও কিছু বলিলেন। সকলেই স্বীকার করিল যে হিন্দুদিগের সহিত বিবাদ করিবে না। সুতরাং মোল্লার সকল চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল।

২২

রায় মহাশয় ও করুণাময়ী নিরুপমাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দেওয়া বিষয়ে একমত এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, করুণাময়ীর ভাব যে বাল্যকালে বিবাহ দিলে যদি নিরুপমা বিধবা হয়, তাহা হইলে তাঁহার মতো বৈধব্যজীবন যাপন করিতে হইবে। রায় মহাশয় মনে করিতেন যে, অপ্রাপ্তবয়সে ও অপরিণত বুদ্ধি লইয়া ঘোরতর দায়ীত্বপূর্ণ বিবাহিতজীবনে প্রবেশ করা অসঙ্গত। যে, বিবাহ কি জানে না—বিবাহের দায়ীত্ব সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই,তাহার বিবাহ কেবল একটা খেলা মাত্র। কিন্তু,তিনি কন্যাকে বয়স্থা রাখিয়া আর এক সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। বয়স্থা কন্যাকে কেবল তাঁহার নিজের নির্ব্বাচিত যে কোনো ব্যক্তিকে সম্প্রদান

করিতে পারেন না, তাহার যখন বুঝিবার শক্তি হইয়াছে, তখন সে নিজেই তাহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির গুণাগুণ বিচার করিয়া যদি বিবাহে সম্মত হয়, তাহা হইলে মঙ্গল। আর তাহা না হইলে, তাহাকে সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কষ্ট দেওয়া হইবে। প্রত্যুত তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য এখন কেবল নির্দ্দেশ করা, নিরুপমা নিজেই তাহার স্বামী নির্ব্বাচন করিবে। যদিও ঐরূপ কথায় কখনো তিনি বলিতেন না, কিন্তু কার্য্যে তাহাই করিতেন। তিনি অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। বলিতেন "কোনো সভ্যদেশে এ প্রথা নাই। প্রাচীন ভারতেও এ প্রথা ছিল না, মুসলমান সময় হইতে ইহা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল প্রদেশ মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হয় নাই, সে দেশে এ প্রথা নাই। আমাদের মতো স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাঁহারা কোনো অংশে হীন নন। আমাদের কি অধিকার আছে যে তাহাদিগকে অন্তঃ পুরবর্ত্তিনী করিয়া রাখিব। কেহ গৃহে আসিলে নিরুপমাকে কাহারও সহিত কথা বলিতে নিষেধ করিতেন না, করুণাময়ী এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রায় সর্ব্বদায়ই উপস্থিত থাকিতেন। যাঁহারা সচ্চরিত্র, তাহাদেরই এ গৃহে স্থান ছিল। চারুবাবু যাহাদিগকে ভাল বলিয়া মনে না করিতেন, তাহাদিগকে তিনি কখনও পরিবারে পরিচিত করিয়া দিতেন না।

নন্দলাল করুণাময়ীর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, নিরুপমার সহিত কোনো নিকট সম্পর্কে বাধে না। ছেলেটি দেখিতে মন্দ নয়, লেখা-পড়াও কিছু শিখিয়াছে, কিন্তু অবস্থা ততো ভাল নয়। করুণাময়ীর ইচ্ছা যে, তাহার সহিত নিরুপমার বিবাহ হয়। রায় মহাশয় সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "বেশ তো, যদি নিরুর পছন্দ হয়, আমার আপত্তি কি? নিরুর তো আর অর্থের অভাব হবে না।" নন্দলাল প্রায়ই রায় মহাশয়ের গৃহে আসিত, এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে দেবকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। চণ্ডালের সন্তান বলিয়া দেবকুমারকে মনে মনে সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত এবং সে যে রায় পরিবারে মিশে তাহা তাহার ভাল লাগিত না। কিন্তু গৃহের সকলেই যখন তাহাকে সম্মান করেন তখন নন্দলাল মুখে দেবকুমারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিত না।

তাহার রাগের আরো কারণ ছিল; নিরুপমা সুন্দরী ও রায় মহাশয়ের বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, নন্দলাল নিরুপমাকে বিবাহের আশায়ই সে গৃহে যাতায়াত করিত। কিন্তু সে দেখিত যে, নিরুপমা দেবকুমারের সকল মতে মত দিতেছে, তাহার মতেরই অধিক মূল্য দিতেছে। দেবকুমার যখন

থাকে তখন তাহার মুখ আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সকল দেখিয়া মনে মনে দেবকুমারের উপর তাহার অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিয়াছিল।

একদিন নন্দলাল, দেবকুমার ও নিরুপমা বসিয়া কথা বলিতেছেন, করুণাময়ী কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্যত্র গিয়াছেন, এমন সময় জাতিভেদ সম্বন্ধে একটি তর্কে নন্দলাল রাগিয়া উঠিয়া দেবকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "চণ্ডালের ছেলের লাঙ্গল ধরা ব্যবসায়, ভদ্রলোকের সহিত মিশিলেও তাহার পূর্ব্ব সংস্কার যায় কি?" দেবকুমার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নিরুপমার আরক্ত মুখ ও নয়নের ভঙ্গী দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। নিরুপমা বলিলেন, "নন্দলাল বাবু আপনার সাহস তো কম নহে? দেবকুমার বাবুর সমযোগ্য আপনি নন। আপনি কাকে কি বলছেন, তা আপনি জানেন না। দেবকুমার বাবুকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। যে তাঁকে অপমান করতে পারে তার সহিত, আমরা কথা বলি না।" এই বলিয়া নিরুপমা সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, এবং আপন ঘরে গিয়া লজ্জা ও দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী সেই ঘরে কোন কর্ম্মোপলক্ষ্যে গিয়া নিরুপমার এই ভাব দেখিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি আসিয়া নন্দলালকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি জান না, এঁরই জন্য দাদা ও নিরু একবার বেঁচেছিলেন। এমন বিনয়ী ভাল ছেলে, তাকে তুমি এমন কথা বল! তুমি কি মানুষ?"

নন্দলাল কথন কাতর হইয়া বলিল, "না, মাসিমা, আমার হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল বলে, একটা কথা মুখ দিয়ে বার হয়ে গিয়েছে, আর এমন কথা বলব না। আমি দেবকুমার বাবুর নিকট ক্ষমা চাইব।" দেবকুমার ইহার পূর্ব্বেই উঠিয়া রায় মহাশয়ের সহিত দুই একটি কাজের কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নন্দলাল ক্ষমা চাহিবে, সে মিথ্যা কথা, যাহাহউক এই ঘটনায় তিন জনের মনে তিন প্রকার ভাব হইল। নিরুপমার অত্যন্ত লজ্জা হইল যে, দেবকুমারের সম্মুখে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে বহুদিন হইতে দেবকুমারের চিন্তা একটু একটু করিয়া নিরুপমার সকল হৃদয় অধিকার করিয়াছে। পাছে পিতা শুনিলে কি বলেন, এই জন্য, তিনি করুণাময়ীকে পিতার নিকট একথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

নন্দলালের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, দেবকুমার থাকিতে নিরুপমাকে

পাইবার তাহার কোনো আশা নাই। যদি কেহ তাহার শত্রু থাকে, তবে সে দেবকুমার; কিসে দেবকুমারকে জব্দ করিবে, সে এখন হইতে তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

দেবকুমার মনে মনে নিরুপমাকে ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু তিনি কখনো মনে করিতে পারেন নাই যে, নিরুপমাও তাহাকে ভালবাসে। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইতে লাগিল নিরুপমার প্রেম প্রতিদানে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু আবার মনে হইল, নিরুপমা ধনীর কন্যা, ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, বিশেষত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা, তিনি তাহার ন্যায় হীনকুলোদ্ভব দরিদ্র ব্যক্তিকে ভালবাসেন সে বিষয়ে অবিশ্বাস হইতে লাগিল। ইহার পরে, তাঁহাদের বিবাহ কিরূপ অসম্ভব সে কথা মনে করিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

২৩

একদিন দেবকুমার রায় মহাশয়ের গৃহ হইতে আসিয়া দেখিলেন যে, দুর্গানাথ মণ্ডল, তাঁহার জন্য বিমর্ষ মুখে অপেক্ষা করিতেছে।

দুর্গানাথ কহিল, "দাদাবাবু একটা কথা বলব বলে তোমার জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি? তুমি ছাড়া আর কাউকে সে কথা বলতে পারি নে।"

দেবকুমার। কি বল, আমি শুনছি।

দুর্গানাথ। আমার কন্যা হৈমকে লয়ে বড় বিপদে পড়েছি। তুমি জান সে বিধবা, কিন্তু তার সন্তান হবে, আর গোপন রাখা চলে না। আমার জাতিও গেল, মানও গেল, আমি যে কি করব, কিছু বুঝতে পারছি না। এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

দেবকুমার কিছু রূঢ় স্বরে কহিলেন, "হৈম যখন বিধবা হ'ল, আমি তোমাকে বললাম, দেখ, হৈমর বিবাহ দাও, বিবাহ দাও।" তুমি তখন বামনদের দেখাদেখি বললে, সে কি হয়? এখন আমি আর কি করব?"

দুর্গানাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা বাবু, তুমি যদি রাগ কর, তবে আর কার কাছে যাব। তুমি ছাড়া আমাদের আপনার কে আছে? তুমি যা হয় একটা পরামর্শ দাও। আমি এ কলঙ্ক সহ্য করতে পারব না। বল তো ঔষধ দিয়ে সন্তান নষ্ট করে ফেলি। আমি হৈমকে ছাড়তে পারব না—সে ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নেই।"

দেব। সাবধান, এমন কাজ কখনও কোর না। যদি নরহত্যা কর,

গোপন থাকবে না। ঈশ্বরের অভিসম্পাৎ চিরদিন ভোগ করবে, আর রাজদ্বারে যে দণ্ড, তাও পাবে।

দুর্গানাথ। তবে কি করব, পরামর্শ দাও।

দেবকুমার। চল আমি একবার তোমার বাড়ী যাব।

দুর্গানাথের গৃহে গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় দুখ হইল। রায় বংশের কিশোরীলালই যত দোষে দোষী। দেবকুমার কি ভাবে কি কাজ করিবেন, দুর্গানাথকে তাহা সমস্ত বলিলেন।

ইহার দু'দিন পরে কিছু রাত্রি হইলে, একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজ সঙ্গে রাখিয়া ও একটি পিস্তল পকেটে পুরিয়া, দেবকুমার দুর্গানাথের বাড়ীতে গোপনে উপস্থিত হইলেন, এবং দুর্গানাথকে একখানি বংশযষ্ঠি লইতে বলিলেন। অবশেষে উভয়ে নিঃশব্দে হৈমর ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিশোরীলাল পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবকুমার দুর্গানাথকে দরজায় তালা বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেবকুমার কিশোরীলালকে বলিলেন, "যদি তুমি পলাতে চাও বা আমার কথামতো কাজ না কর, তোমাকে আজ এখানে আমি কুকুরের মতো মেরে পুঁতে রাখব। আমি যা বলি, ভাল করে শোন। তুমি যে দোষ করেছ, হৈমকে বিবাহ করা তার উপযুক্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু হিন্দুসমাজে ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা চলিত নেই। সেই জন্য আমি তোমাকে বিবাহ করতে বলতে পারি নে। কিন্তু এই অবোধ বালিকা যে জাতিচ্যুত হবে. তার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ তোমাকে করতে হবে, এবং এর গর্ভে যে সন্তান হবে, পনরবৎসর পর্য্যন্ত তার ব্যয় বহন করতে হবে এবং যদি কন্যা হয়, তা হলে তার বিবাহের জন্য আরও তোমাকে টাকা দিতে হবে। আমি এই ষ্ট্যাম্প কাগজে সমস্ত লিখে এনেছি। হৈমবতীর খরচ যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ টাকা। এবং তার সন্তান হলে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তার খরচ মাসিক ১০৲ টাকা। এই কাগজে তুমি দস্তখত কর।"

কিশোরীলাল কহিল, "আমি দস্তখত করব না।" এই বলিয়া সে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেবকুমার দুর্গানাথকে ইশারায় তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিতে বলিলেন। কিশোরীলাল ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সহজেই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলা হইল। দেবকুমার হৈমবতীকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন, এবং পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি পিস্তল লইয়া তাহার কাণের কাছে ধরিলেন এবং

বলিলেন, "খবরদার যদি চীৎকার কর, তবে তখনই মরবে। আমি তোমাকে পাঁচমিনিট সময় দিচ্চি, এরমধ্যে কি করবে ভেবে ঠিক কর।" এই বলিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া, কিশোরীলাল বলিয়া উঠিল। "আমার বাঁধন খোল, আমি সহি করচি। তখন তাহার হাতের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। কালী কলম, সকলই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ছিল, কিশোরীলাল সহি করিল। দুর্গানাথ ও দেবকুমার সেই কাগজে সাক্ষী বলিয়া সহি করিলেন।

তার পর, তাহার সকল বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। দেবকুমার কাগজখানি নিজের কাছে রাখিয়া বলিলেন, "যদি কখনও তুমি ইহার অন্যথা কর, আদালতে নালিশ করে তোমার সকল বিষয় ক্রোপ করব।" কিশোরীলাল বন্ধন মুক্ত হইয়া, সদর্পে কহিল, "এর ফল তুই পাবি। আমি যদি এর প্রতিফল না দিই, তবে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান না।"

"তুমি আমার যা করতে পার কোর। তোমার মতো পাষণ্ডের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করি।"

কিশোরীলাল চলিয়া গেলে দেবকুমার কহিলেন, "এত সহজে কাজ হবে আমি আশা করি নি। যদি সহি না করাতে পারতাম, আমার নিজের হাজার টাকা হৈমবতীর জন্য রেখে দিতাম।"

দুর্গানাথ কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইয়া কি বলিবে ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, কেবল দেবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদাবাবু—"

কিশোরীলাল ও নন্দলালের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। পর দিন নন্দলাল আসিলে, কিশোরীলাল কহিল, "দেবা বেটাকে শাস্তি না দিলে আমার মন কিছুতেই শান্ত হচ্চে না। বেটা আমাদের সমস্ত চেষ্টা নষ্ট করছে।"

নন্দ। বেটা মলে আমি বাঁচি। ভাই, ও থাকতে, আমার আর চারুবাবুর কন্যার আশা নেই।

কিশোরী। তুমি যদি উপস্থিত কাজে আমার সাহায্য কর, আর পরে যখন চারুবাবুর জামাতা হবে, তখন যদি কিছু টাকা দাও, আমি তোমার কণ্টক দূর করে দিই।

এই বলিয়া গোপনে তাহাদের অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল, এবং সেইদিনই একখানি পত্র লইয়া নন্দলাল গোপনে ভিন্ন গ্রামে চলিয়া গেল। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী [বি-এ]

মনোরমা

—০—

৮

কিছু দিন এলাহাবাদে থাকিবার পর সন্তোষ মাতা ও পত্নীকে লইয়া জব্বলপুরে আসিল। এখানেও একটি বাগান-সহিত সুন্দর বাংলো ভাড়া লইল। একদিন সকলে মিলিয়া নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিতে গেল। সে সুন্দর দৃশ্য দর্শনে মনোরমার বড় আনন্দ হইল। নূতন দেশের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া সে নিজের মনকষ্ট অনেক সময় ভুলিয়া যাইত। আর সন্তোষ? এখানেও তার মনের মতন দু'চারি জন সঙ্গী জুটিল।

প্রথম প্রথম সে মনোরমাকে একটু ভালবাসার চক্ষে দেখিত, কিন্তু সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলা যায় না, রূপের নেশা মাত্র। দিনের পর দিন যেমন সে নেশার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, মনোরমার প্রতি তাহার আর সে অনুরাগ রহিল না। সমস্ত দিন, এবং অধিকাংশ রাত্রি পর্য্যন্ত সে বাহিরে কাটাইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্র তো তাঁহার নিষেধ মানিয়া চলিবেই না, বধূকে তিনি কত রকমে বুঝাইলেন, "মা একটু বুঝে শুনে চল, তোমারি মন্দ, তোমারি ক্ষেতি হবে, একটু হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে রাতটুকু যাতে ঘরে থাকে তার চেষ্টা কর।" মনোরমা কিন্তু তাহা পারিল না, বরং স্বামী নিকটে না আসিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। সন্তোষের সহিত কথা কহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। সন্তোষের চরিত্র—তাহার মনে সন্তোষের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা জন্মিবার মোটেই অবসর দ্যায় নাই, প্রথম হইতেই মনোরমা স্বামীকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। হিন্দু পরিবারের মধ্যে মেয়েদের শৈশব হইতেই সংস্কার হয়, স্বামী যেমনই হউন, স্ত্রীর চক্ষে তিনি দেবতা, মনোরমার পিতার শিক্ষা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, পুরুষ যেমন রমণীর চরিত্রের সাধুতা ও পবিত্রতার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবে, নারীও সেইভাবে পুরুষের চরিত্র-বিচার না করিয়া চলিবে কেন? উভয়েই সংসার বা সমাজের পবিত্রতা সমভাবে রাখিয়া চলিতে বাধ্য। তিনি নিজে অত্যন্ত সাধু-স্বভাব, তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক, সেই জন্যই মনোরমা পিতার ন্যায় লোকের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। সুরাপায়ীদিগকে পিতারই ন্যায় সে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; আর আজ অদৃষ্ট-দোষে সে এমনি একজন মদ্যপেরই সহধর্ম্মিণী হইয়াছে।

সহধর্ম্মিণী ! মনোরমার হাসি আসিত, প্রাণ যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহার সহধর্ম্মিণী কেমন করিয়া হওয়া সম্ভব ? সমাজ বলিবে, বিবাহের মন্ত্রবলে, কিন্তু ওগো তা হয় কই ? যদি না হয়, সে নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে পতিতা, সতীকুলশিরোমণি হিন্দুললনার তালিকা হইতে বিচ্যুতা। তাই যদি হয়, তবে তো মনোরমা মহা-পাপিয়সী ! কিন্তু সে যে হৃদয়ের সহিত যথাশক্তি সংগ্রাম করিত, বিদ্রোহী হৃদয়কে সে মানাইতে চেষ্টা করিত, দেবতার ত্রুটি বা দোষ লক্ষ্য করা সেবিকার পক্ষে মহা অপরাধ, তার শাস্তি অনন্ত নরক-যাতনা ; কিন্তু অবাধ্য হৃদয় সে শাসন-বিধি মানিতে চায় কই ? স্বামীর সহিত সে মোটেই বাদানুবাদ করিত না, সন্তোষ যাহা কিছু করিতে বলিত, নীরবে তাহা সম্পাদন করিত। সেজন্য সন্তোষও মনোরমাকে প্রথমা পত্নীর ন্যায় গালাগালি বা প্রহার করিত না।

জব্বলপুরে মনোরমার একটি সঙ্গিনী জুটিল, মনোরমাদের বাগানের পার্শ্বেই তাহাদের বাসাবাটী। মেয়েটির নাম কামিনী, সে মনোরমারই সমবয়স্কা। ক্রোড়ে একটি নধরকায় দেড়বৎসরের শিশু। কামিনীর স্বামী জাতিতে স্বর্ণকার, নিজের একখানি দোকান আছে। মনোরমার সহিত কামিনীর আলাপ শীঘ্রই সখীত্বে ও ঘনিষ্টতায় পরিণত হইল। মনোরমা সঙ্গিনী পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবস্থা-বিশেষে মনোরমার সহিত কামিনীর কতখানি প্রভেদ। মনোরমা লক্ষপতির গৃহের বধূ, কামিনী দরিদ্র স্বর্ণকার-পত্নী, মনোরমা সুশিক্ষিতা সুন্দরী রমণী, কামিনী বর্ণজ্ঞান শূন্যা, রূপগৌরববিহীনা। কিন্তু দুইখানি তরুণ হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পড়িল ! এই জন্যই কি কবি বলিয়াছেন "বয়সের সঙ্গে কি মনের মিল ?" কামিনী প্রত্যহ কার্য্যাবকাশে শিশুটিকে লইয়া, মনোরমার কাছে আসিয়া বসিত। দুইজনে কত গল্প-গুজব হইত ; মনোরমা কত বই পড়িয়া কামিনীকে শুনাইত। সেলাই, বোনা সে বহুদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার কামিনীর খোকার জন্য ফ্রক সেলাই করিতে নূতন করিয়া মন দিল। কামিনীও মোজা বোনা শিখিতে লাগিয়া গেল। মনোরমা সুগন্ধি তৈল দিয়া কামিনীর চুল বাঁধিয়া দিত। কামিনীর আপত্তি সত্ত্বেও নিজের রেশমফিতা দিয়া খোপা বাঁধিয়া দিতে ছাড়িত না, খোকার মাথা আঁচড়াইয়া পরিপাটি করিয়া সিঁথি কাটিয়া দিত। শ্বেতপ্রস্তরের ও কাশীর খেলনা কিনিয়া বাক্স বোঝাই করিয়াছিল, এখন সে সেগুলির একটি একটি প্রত্যহ খোকাকে আনন্দের সহিত উপহার দিত।

খোকার পিতা বাড়ীতে আসিবার সময় হইলে কামিনী শশব্যস্তে খোকাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত। মনোরমা বলিত "খোকাকে রেখে যাও না ভাই, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব" কামিনী হাসিয়া বলিত, "না বৌরাণী, উনি বাড়ী এসে খোকাকে না দেখলে অস্থির হন্, ঘুমিয়ে থাক্‌লে ঘুমন্ত ছেলেকে চুমু খান, আর বারবার বলেন "কতক্ষণে উঠবে, আমি বাড়ী এলাম আর এখন ওর ঘুনোবার সময় হল!"

মনোরমা হাসিয়া কহিত "তবে খোকাকে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই, তুমি থাক, একটু পরে যেও।"

কামিনী তাড়াতাড়ি কহিত "বৌরাণী কি পাগল? আমায় না দেখলে তিনি রাগ করবেন যে, তাঁকে খেতে দেব, রোজই তো আমি আসচি দিদি।"

কামিনী চলিয়া গেলে মনোরমা কত কি ভাবিত। নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া সে কামিনীর সৌভাগ্যকে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যদি অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী না হইয়া কোন সচ্চরিত্র দরিদ্র পুরুষের গৃহিণী হইত, যদি স্বামীর প্রাণপূর্ণ নির্ম্মল প্রণয় লাভ করিত, তাহা হইলে তাহার নারীজন্ম সার্থক হইত। সে যদি কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগত ক্লান্ত স্বামীর বিশ্রাম ও সেবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে পারিত, আর কখনও বা অন্তরালে থাকিয়া স্বামীর অনুসন্ধিৎসু ব্যাকুল-আঁখির অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাইত, স্বামীর সোহাগপূর্ণ প্রীতিবাক্যে যদি তাহার চিত্ত পরিপুর্ণ হইত, তাহা হইলে পর্ণকুটীরে বাসও তাহার কত আনন্দের ছিল। যদি সে একটি হাস্য-বিকসিতমুখ কচি শিশুকে লইয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত, পিতাকে দেখিয়া জননীর ক্রোড় হইতে শিশু পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তিনি শিশুকে স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া, অজস্র চুম্বনে সে সুকোমল গণ্ড দুটি ভরিয়া দিতেন, হাসির লহর তুলিয়া শিশু উভয়ের হৃদয়ে সুধার ধারা ঢালিয়া দিত, প্রীতিবিস্ফারিত চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনোরমার হৃদয় পত্নীত্ব গর্ব্বে, মাতৃত্ব-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত, স্বীয় জীবনের সার্থকতার জন্য সে জীবনদাতাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিত। হায়রে কল্পনা, মনোরমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত, গুরু-বেদনায় তাহার বক্ষস্থল নিষ্পেষিত হইতে থাকিত। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে মনে মনে কহিত "ভগবান্, কোন্ পাপে আমার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিলে প্রভু!"

মনোরমা এক একবার ভাবিত, সন্তোষের হাতে পায়ে ধরিয়া সে তাহাকে

কুপথ হইতে ফিরিতে বলিবে, কিন্তু সপত্নীর কথাও সে শুনিয়াছে, সে অভাগিনী তো অনেক চেষ্টা করিয়াছে। সন্তোষ মাঝে মাঝে বলে, "মেয়ে মানুষ, খাও দাও, দু'খানা গয়না পর, ঘরে বসে আমোদ আহ্লাদ কর, পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাতে যেয়ো না, তুমি চুপ-চাপ আছ, এ বেশ ভাল। সেটা ভারী ডেঁপো ছিল, তাই মেরে তাড়িয়েছি। তবে তোমার যেন কিছু স্ফূর্ত্তি দেখতে পাইনে, প্রাণটা এ বয়সে এত নীরস কেন?" এইসকল কথা স্মরণ করিয়া মনোরমা আর স্বামীর মতি-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিত না, বিশেষ আরক্তলোচন, স্খলিতচরণ, জড়িত-বচন স্বামীকে শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা ও ধিক্কারে যুগপৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

৯

মনোরমা গৃহের মধ্যে বসিয়া নতমুখে একখানি পুস্তক পড়িতেছে, সহসা গৃহমধ্যে একজন সুবেশ সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া সন্তোষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনোরমা সচকিতে মাথার ঘোমটা টানিয়া গৃহের অন্তদ্বার দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। সন্তোষ দ্বার রোধ করিয়া কহিল, "মানুষ হয়ে, মানুষকে এত ভয়? বাঘও নয় সাপও না, উনি তোমারি মতন একজন মানুষ। ওগো ও ভদ্রলোকটির পরিচয় পেলে এখুনি তোমার চোখে মুখে হাসি ঠিক্‌রে পড়বে, উনি আমার বন্ধু না—ভয় নেই, তোমার বন্ধু. তোমারি কাছে এসেছেন। বিনয় বাবুকে চেনো না? তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে, ইনি এখানে মাষ্টারী করেন, মাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছেন, তোমার বাবা আমায় চিঠি লিখে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, বিনয়বাবুর মা ওঘরে মার কাছে বসে আছেন, এঁকে আমি তোমার কাছে নিয়ে এলাম।"

মনোরমা আসিয়া বিনয়ের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। বিনয় স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "চিন্‌তে পারছ মনু? অনেক দিনের পর দেখা।"

মনোরমা কহিল, "বসুন দাদা, পিসিমা ভাল আছেন? আপনারা সব ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ—ভাল আছি বই কি. "নইলে এলাম কি করে?" বলিয়া বিনয় চেয়ারে বসিয়া কহিল, "সন্তোষ বাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

"না দাদা. আমার বাইরে যেতে হবে, মনোরমা, দেখো যেন আদর যত্নের ত্রুটি না হয়, ভাল করে খাইয়ো দাইয়ো। বিনয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, আবার দেখা হবে।" সন্তোষ যেন আর কি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কথাটা

কেমন আটকাইয়া গেল। শেষে ঐ ক'টা কথা বলিয়া মুখটি বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল।

সন্তোষ চলিয়া গেলে, স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় মনোরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, বিনয়ের অন্তরে যেন একটা ঘা পড়িল। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনয় কহিল, "তোমার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে, সাত বৎসর সময় তো বড় কম নয়। বিনয়ের মানস-চক্ষে একটি তন্বাঙ্গী বালিকার লীলাচঞ্চল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, বর্ত্তমান পূর্ণ-যৌবনশ্রী-উদ্ভাসিতা সৌন্দর্য্য প্রতিমার মধ্যে সেই বালিকাই মিশিয়া আছে ভাবিয়া তাহার যথেষ্ট আনন্দ হইল। যখন বিনয় স্কুলে পড়িত, পাশাপাশি বাড়ী থাকায়, দুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। বিনয়ের মা মনোরমার পিতাকে ভাই সম্বোধন করিতেন। বিনয়ের পিতা জব্বলপুরে বদ্‌লী হওয়াতেই দুই পরিবারে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পত্রাদি দ্বারা বরাবর খবরাখবর চলিত। বিনয়ের পিতৃবিয়োগ হইবার পর, বিনয় অগত্যা কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়, এবং প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এখন সে এম-এ, পড়িতেছে। মনোরমার মাতার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, বিনয়ের সহিত মনোরমার বিবাহ দেন, কিন্তু তাহারা বড় দরিদ্র বলিয়া সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, এমন সুন্দরী মেয়ে, তাহার উপর দু'চার হাজার টাকা দিলে, বিনয়ের অপেক্ষাও রূপে গুণে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, জামাতার অভাব হইবে না। বিনয়ের মাতারও মনে সাধ হইত বালিকা মনোরমাকে বধূরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার কন্যা ছিল না, বধূকে কন্যারূপে পাইয়া সে সাধ পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া এ প্রস্তাব মনোরমার পিতামাতার নিকট করিতে পারেন নাই, স্বামীর বেতন মাত্রই তাঁহাদের ভরসা, এমন অবস্থায় মনোরমাকে বধূ করিবার বাসনা বৃথা, তবে যদি ভগবান্ দিন দেন, বিনয় মানুষ হয়, তাহা হইলে আলাদা কথা। তারপর জব্বলপুরে যখন তিনি হঠাৎ মনোরমার বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলেন তখন তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু মনোরমা লক্ষপতির গৃহের বধূ হইল, সুন্দর বিদ্বান পতি লাভ করিল শুনিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে নবদম্পতির কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

মনোরমারা জব্বলপুরে আসিয়াছে বলিয়া মনোরমার মাতা; ক্ষীরোদাকে (বিনয়ের মাতা) উহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পত্র লিখিলেন।

সন্তোষকেও সেই সঙ্গে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। বিনয় আজ রবিবারে ছুটির দিনে মাতাকে সঙ্গে লইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

মনোরমা কহিল "দাদা, আপনার চেহারাও অনেকটা বদ্‌লে গেছে, আপনি কি লম্বাই না হয়েছেন।"

হো হো করিয়া হাসিয়া বিনয় কহিল "লম্বা হাতে তোমায় রোজ রোজ চাটুয্যেদের কুল গাছ থেকে কুল পেড়ে দিতুম, মনে আছে তো? তুমি আবার বলতে "দাদার হাত আর একটু লম্বা হলে ঐ ডালটায় নাগাল পেতে, আমি বলতুম, কিছুদিন পরে নাগাল পাব দেখিস্। তা এখন তো লম্বা যথেষ্ট হয়েছি, দুঃখের বিষয় তোমার আর গাছের কুল পাড়িয়ে খাবার লোভের বয়স নেই।"

মনোরমা হাসিল। সে প্রীতিপূর্ণ শৈশব-চিত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! আহা! সে স্মৃতি কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর। সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যদি আবার সে দিন ফিরিয়া পাওয়া যাইত।

এই সময় বিনয়ের মাতা গৃহের মধ্যে আসিলেন। মনোরমা পিসিমার পায়ের ধূলা লইল, ক্ষীরোদা মনোরমাকে বক্ষে চাপিয়া, চুম্বন করিয়া কহিলেন, মনের সুখে থাক, মনে প্রাণে শান্তি লাভ কর, তার বাড়া জিনিষ দুনিয়ায় আর নেই।"

এই কয়টি কথায় মনোরমার চক্ষে জল আসিল, মনোরমার বিদ্যুল্লতাবৎ জ্যোতিপূর্ণ দেহে ও সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ মুখে, যে এক ম্লান বিষাদ-ছায়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, ক্ষীরোদা তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, ভ্রাতৃজায়ার পত্রখানি তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু তিনি মনের ভাব চাপা দিয়া কহিলেন, বাঃ মনোরমা, বেশ বাংলোটি তো, চারিদিক খোলা, তাতে আবার বাগানটি কি সুন্দর! এমন জায়গায় আপনিই মন প্রফুল্ল হয়।

বিনয় কহিল, "সন্তোষ বাবুর সখও খুব দেখচি। বিদেশেও খুব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়েচেন, ঘরে আসবাব কিছু তো কম নয়, মায় হার্ম্মোনিয়াম পর্য্যন্ত—মনু তো ছোট বেলায় খুব গাইতে পারতো, না মা?"

মনোরমা তাড়াতাড়ি কহিল "পিসিমা, বউ তো আননি, দাদার কি বিয়ে দাও নি?"

"না মা, দিতে তো চাই, কিন্তু এ বিদেশে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম, তেমন মেয়ে পাচ্চি নে যে।"

"মেয়ের আর অভাব কি পিসিমা, বাঙালীর ঘরে মেয়ের জীবনের আর

মূল্য কি ? কুপাত্র অপাত্র তাদেরই গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে জোটে, আর দাদার মতো সুপাত্রের জন্য আপনি মেয়ে পাচ্চেন না ?"

বিনয় হাসিয়া কহিল "মনু যে দাদাকে মস্ত সুপাত্র ঠাওরালে দেখছি, কিন্তু সুপাত্রের আসল বস্তুর যে বড় অভাব, টাকা—"

"কেন দাদা, আপনি তিনটে পাশ করছেন, এখনো এম-এ পড়চেন, তিন চার হাজার টাকা তো লোকে সেধে আপনাকে দেবে।"

"না মনু, বিয়ে করে টাকা নিতে পারব না, মাকে বলেছি একটি ভাল পাত্রীর অনুসন্ধান কর মা, সে যেন দরিদ্রের মেয়ে হয়, তাকেই আমি বিয়ে করব, দেশের এক জনকে যদি কন্যাভার-মুক্ত করতে পারি তাতেও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করব। আমার মায়ের জাতকে আমি বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, দেশে তাদের যথেষ্ট নির্য্যাতন হচ্ছে, আমার প্রাণে তাতে বড়ই আঘাত লাগে।"

পুত্র-গৌরবে উৎফুল্লা ক্ষীরোদা স্নেহাপ্লুত-কণ্ঠে কহিলেন, "তুই একা এই শত শত—সহস্র সহস্রের মধ্যে কি আর সদৃষ্টান্ত দেখাবি বাবা! তার চাইতে রজনীবাবুর মেয়েকে বিয়ে কর, মস্ত ধনী, মেয়েও পরমা সুন্দরী, আমরা কিছু চাইব না, তাঁরা আপনা হতেই যে যথেষ্ট দেবেন।"

জোড়হাতে বিনয় কহিল "রক্ষে কর মা, রজনী বাবুরা তিন ভাই দুশ্চরিত্র, মাতাল, তাদের গুণ তুমি তো জান মা, সে ঘরের মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

ক্ষীরোদা কহিল "কি যে বলিস তার ঠিক নেই। বাপ খুড়ো মাতাল, তাতে মেয়ের কি দোষ? তোর অনাছিষ্টি কথা, পুরুষ পরশমণি, একটু কোথায় কি করলে পুরুষের তাতে কোন দোষ নেই, মেয়ের পক্ষে তা মহাপাপ, হিন্দুর মেয়ে তা জানেও।"

বিনয় উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল "না মা, মেয়েরা যতক্ষণ পুরুষদের কঠোর ভাবে না বিচার করবে, পুরুষরা ততক্ষণ এই রকম অধঃপতিত থাকবে, আমি যেমন পবিত্র স্বভাবা নির্ম্মল চরিত্রা স্ত্রী চাই, প্রত্যেক মেয়েও যেন ঠিক সেইরূপ স্বামী চায়, তা হলে সকল পুরুষও সংযত হতে শিখবে। রজনীবাবুর বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে একথা ভাবা এক প্রকার স্বাভাবিক হয়েছে যে, পুরুষের চরিত্রদোষ নিন্দনীয় নয়, ছোট বেলাকার ধারণা মনের মধ্যে যে ছাপ মারে, তা কি দূর হয় মা ?"

স্নেহভরে ক্ষীরোদা কহিলেন "পাগল ছেলে, তোর এই সব কথা শুনলে লোকে তোকেই পাগল বলবে। পুরুষের সঙ্গে মেয়ের তুলনা! দেখি মনু তোর শাশুড়ী কি করছেন।" ক্ষীরোদা চলিয়া গেলেন, বিনয় মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "মনু, তুমি কিছু বললে না যে, তোমার কি মনে হয় ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল “দাদা, আমাদের বলবার কিছু নেই, পুরুষরা যে দয়া করে আমাদের ঘরে স্থান দিয়েছে, খেতে পরতে দিচ্চে এই যথেষ্ট, যদি মনের মধ্যে অভিযোগ মাথা তুলতে চায়, সে গুলিকে গলা টিপে মেরে ফেলাই নারীর মহত্ব।”

বিনয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল “এ কি কথা মনু, তোমার কথা যে নিতান্ত জড়ের মতো শোনাচ্চে, কথায় প্রাণ কই—উৎসাহ কই? তোমরা মেয়েরা স্বেচ্ছায় যে নিজেদের হীন করে রেখেছ, তোমাদের আসন তোমরা বেছে নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা কর, পুরুষরা সম্ভ্রমে তোমাদের স্থান ছেড়ে দেবে, শক্তির অংশভূতা নারীর যে কত শক্তি আছে, নারী নিজে তা ভুলে গেছে, তাই সমাজ হীনবল হয়ে আছে, শুধু ঘরকন্নার কাজ ছাড়া তোমাদেরও যে অনেক কাজ আছে মনু, জড়ের মতো পড়ে থাকলে চলবে কেন?”

মনোরমা আজ একি নূতন বাণী শুনিল, তাও কি পুরুষের মুখে! পুরুষের এত বড় উদার প্রাণ, এত মহত্বপূর্ণ, এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাহার প্রাণ কি এক অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া সে পার্শ্বস্থিত পুস্তকখানি নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল “দাদা, কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছেন তো, রোহিণীর কুৎসিত চরিত্র নারী জাতির মুখে কি না কালি লেপে দিয়েছে।”

বিনয় কহিল, “আর পুরুষ জাতির মুখে কি কিছু কম কালি লেপেছে কাপুরুষ হরলাল! বিয়ে করব বলে রোহিণীকে দিয়ে উইল চুরি করিয়ে শেষে নির্লজ্জের মতো কি জবাব না তাকে দিলে? রোহিণী যা অন্যায় করেছিল সে কাদের অত্যাচারে? কাদের নির্য্যাতনে? অথচ সমাজ স্বচ্ছন্দে রোহিণীকে বড় গলায় পাপীয়সী, দুশ্চারিণী বোলে, তার মৃত্যুর পর তাকে অনন্ত নরকবাসিনী প্রেতিনী দেখে খুব সুখী হল। একবার কি কেউ ভেবেছিল—এমন কয়জন সমদর্শী আছেন যাঁর কাছে বাস্তব পুরুষ নারীর ভেদ নেই, যিনি তুল্য রূপে উভয়কেই ক্ষমা করেন, উভয়েরই বিচার করেন? আমি তো রোহিণীকে এতটুকু ঘৃণা করি না, শুধু তার প্রতি সহানুভূতিতে আমার প্রাণ পূর্ণ হয়।

মনোরমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, সেদিন যে সমালোচনায় পড়িয়াছিল রোহিণী পিশাচী, আর ভ্রমর দেবী, সমালোচক নিপুণতার সহিত উভয় নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। মনোরমা কহিল, দাদা “আপনি যাই বলুন, রোহিণী ভ্রমরের তুলনায় পিশাচী নয় কি?”

বিনয় কহিল "মনু, তুমি যে ভুলে যাচ্ছ, ভ্রমরের অবস্থায় থাকলে রোহিণীও দেবী হতে পারতো! কাদার উপর—পাঁকের উপর যাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার গায়ে যে কাদা পাঁক লাগবে তা আর আশ্চর্য্য কি?"

এমন সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া কহিলেন "এস বাবা বিনয়, কিছু খাবে এস, তোমার মতো ছেলে যেন সবার ঘরে হয় বাবা।"

বিনয় জানিত, তাহার স্নেহময়ী মাতা সকলের নিকটে পুত্রের প্রশংসায় যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এখানেও তাই করিয়াছেন। তাই সে হাসিয়া কহিল "মায়ের কাছে আমার সুখ্যাতি শুনেছেন বুঝি? পরের মুখে ঝাল খাবেন না নিজের জিনিষের তারিফ সবাই করে থাকে, মায়ের একটি ছেলে, কাজেই খুব বাড়িয়ে দেখেন, আর কি!"

"একা এক সহস্র হয়ে মায়ের কোল-জোড়া করে থাক বাবা, মা দুর্গা তোমার ভাল করুন। এস বাবা,—বৌ মা, পান নিয়ে এস।" (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

বিবিধ

হাজার হাজার বাঙ্গালী সৈন্য চাই।—মানুষের ইচ্ছা সকল সময় পূর্ণ হয় না, কিন্তু প্রত্যেক শুভ ইচ্ছা ভগবানের নিকট কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। কতকাল হইতে বাঙ্গালী সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার চাহিতেছে, কিন্তু বিধির বিধানে সেই দিন এখন কি মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যখন শুনি সংখ্যায় আজও এক সহস্র হয় নাই, তখন কি মনে হয় না, কবে দশ বিশ সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য দেখিব। সে দিন কি দূরে?

দেশময় চরিত্রবান লোক চাই।—ফাল্গুনের প্রবাসীতে "চরিত্রবান লোক চাই" প্যারেগ্রাফে নিতান্ত সময়োপযোগী একটি প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি মূল্যবান অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"পৃথিবীতে, সকল দেশে না হউক, অনেক দেশের সমাজে নারীদের যে স্থান ছিল, এখন তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশের মঙ্গল বলিলে এখন কেবল পুরুষদের সুখ, সুবিধা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা বুঝায় না। নারীদের মঙ্গল, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ যাহাতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানে হয় না, তাহা প্রার্থনীয় নহে। আগে যে দেশে যে নেতার

চরিত্র যেরূপই থাক না কেন, এখন আর এরূপ কেহ ক্ষমতা লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, যাহার নারীজাতির প্রতি ব্যবহার নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটা কারণ এই যে, এরূপ লোকদের দ্বারা সমাজের অর্দ্ধঅংশ নারীদের সম্মান রক্ষিত হইতে পারে না। এবং তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। জননী নারীদের মঙ্গল না হইলে শিশুদের বালকবালিকাদের মঙ্গলও হইতে পারে না।

থিয়েটারে যাওয়ায় আপত্তি কেন ?—কুচরিত্রা নারীর অভিনীত রঙ্গমঞ্চে যাওয়া উচিত নয় কেন, এর উত্তর বহুবার তাঁহারা দিয়াছেন, যাঁহাদের মত বিশ্বাস এ সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে করে। কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মসমাজের নহেন, এমন বহু লোকের মত বিশ্বাসও এখন ঐরূপ থিয়েটারের বিরুদ্ধে দেখা যায়। আসল কথা যাঁহারা এ কথাটা পরিষ্কার বোঝেন যে, ঐ যে কুচরিত্রা নারীগণ, উহারা আমাদেরই সমাজের অঙ্গ ছাড়া নহে, বাস্তবিক তাহারা যদি আমারই পরিবারের কেহ হইত, তবে কি আমি তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শনকে আমোদ চরিতার্থের বিষয় করিতে পারিতাম ? যে কার্য্যে আমার অন্তর ব্যথা পায়, আমি যে সে কার্য্য করিতে পারি না তা নয়, তাহার প্রশ্রয়ও দিতে পারি না। অবশ্য এই উচ্চ নীতিতে যাহাদের বিশ্বাস নাই তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কালীঘাটে যাত্রিনিবাস !—এত দিনের পর কালীঘাটে একটি যাত্রিনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার দ্বার উদ্ঘাটন হইয়াছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন এবং রায় হাজারিমল দুদুওয়ালা বাহাদুর ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় বহন করিয়াছেন। এই যাত্রিনিবাসের খিড়কিতে যে ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকগণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই ঘাট শ্রীযুত রাসবিহারী কড়ুরীর অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রিনিবাসের পার্শ্বে যাত্রীদের যে বিশ্রামস্থল তৈরী হইয়াছে, তাহার ব্যয় শ্রীমতী শ্যামমণি দাসী প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত পি, এন, মল্লিকের পত্নী যাত্রিনিবাসের মেঝেতে পাতিবার জন্য মার্ব্বেল প্রস্তর ও যাত্রীদের বসিবার জন্য কতকগুলি বেঞ্চি দান করিয়াছেন। পরিশেষে ইহার সংলগ্ন যে ঔষধালয় ও হাসপাতাল তৈরী হইয়াছে, হরিরাম গোয়েঙ্কা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাহার খরচা দিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী টাকায় এই যাত্রিনিবাস পরিচালিত হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে দরিদ্র যাত্রিগণের প্রভূত সুবিধা হইবে।

ধূমপান নিবারণ।—বড়দিনের সময় মান্দ্রাজে স্যার্ সুব্রাহ্মণ্য আয়ারের সভাপতিত্বে ছাত্র-সম্মিলন সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ধূমপান নিবারণ প্রস্তাব বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। ধূমপানে ছাত্রগণের যে বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহা সকলেই অনুধাবন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় লিখিয়াছেন—গোয়ালিয়ার পাতার সংস্কৃত নাম গোধাপদী, ল্যাটীন Vitis Peadata. আপাঙ্গের সংস্কৃত নাম অপামর্গ আপাঙ্গ, ল্যাটীন Achyranthes pera বাংলা চিড়্চিড়ে। এই দুটি দেশীয় গাছড়ার বিস্তারিত গুণাগুণ একটি প্রতক্ষীভূত আশ্চর্য্য ঘটনা সূত্রে গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্যই উপরোক্ত গাছড়া দুটির নাম উল্লেখ করিতে হইল। কিছুদিন গত হইল, আমাদের জনৈক আত্মীয় পচা ক্ষতে ভুগিয়া নানা স্থানে ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পাঁয়ের সেই পুঁজহীন ঈষৎ লোহিতাভ কষাণি-গলা ঘা কিছুতেই সারিতেছিল না। শেষ তিনি এক শিশি আলছারিন ডাকে আনাইয়া ঘায়ে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় ঘটনাচক্রে সন্ন্যাসী গোপালদাস বাবা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। গোপালদাস বাবা একজন সাধারণ গঞ্জিকাসেবী সন্ন্যাসী নহেন, অনেক সম্ভ্রান্ত বড়লোক তাঁহার শিষ্য। ফরমূলা কোম্পানীর ঔষধের প্যাক খোলা হইতেছে, দেখিয়া তিনি কিসের ঔষধ জিজ্ঞাসা করায়, ক্ষতের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বলিলেন, এখন আর আলছারিন প্রয়োগের আবশ্যক নাই। আমি যাহা বলি, তাহা একসপ্তাহ করিয়া দেখ, ফল না হয়, তখন অন্য ঔষধ ব্যবহার করিও। এই কথার পর বাবাজী ছোট গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গের মূল তুলিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বারআনা ও সিকি পরিমাণে আপাঙ্গের মূল নিমপাতা ও গরম জলে দুইবেলা ঘা ধুইয়া গাছড়া দুটি বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া বাধিয়া রাখিবে।

অমন যে দুষিত ঘা—যাহা আজ দুই বৎসর ধরিয়া বিবিধ চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, তাহা ১০।১২ দিনের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে। গোয়ালেরপাতা দুই জাতীয় আছে। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদিগকে ছোট গোয়ালিয়ার পাতা অর্থাৎ যে লতার বেলপাতার ন্যায় এক বোঁটায় তিনটা করিয়া পাতা হয় এবং পাতার কিনারা খাঁজ কাটা হইয়া থাকে তাহাই দিয়াছিলেন, দেশীয় গাছড়ার এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি! দুষিত ক্ষতগ্রস্ত রোগী এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন। (কৃষক)

বধূ-বরণ

(মুদ্রিত পত্র হইতে)



এস লক্ষ্মী এস ঘরে
সোনার প্রতিমা তুমি,
রূপে গুণে আলো কর
এ গৃহ-প্রাঙ্গণ ভূমি।

অচেনা অজানা দেশে,
এতদিন কোথা ছিলে!
হাসিয়া মধুর হাসি
হেথা আসি দেখা দিলে।

আনিলে কি সাথে করি
স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া ?
পিতার আলয় হ'তে
প্রেম ভক্তি দয়া মায়া।

তোমার উদয়ে গৃহ
স্বর্গীয় সৌরভময়,
আনন্দ-নির্ঝর ঝরে,
মধুর মলয়া বয়।

বিধির বিধান বলে
বৌদিদি আজ হ'তে,
খেলিতে সংসার খেলা
মিলিলে দাদার সাথে।

এস শান্তিময়ী! গৃহ
কর শান্তি-নিকেতন,
তোমার অতুল গুণে
মুগ্ধ হোক্ সর্ব্বজন।

এ গৃহের সর্ব্বজনে
তুষো তুমি নিজগুণে,
যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ভক্তি
স্নেহ প্রেম প্রদর্শনে।

কায়মনোবাক্যে সতী
সেবি পতি দেবতায়,
জনম সফল কর
হৃদে রাখি বিধাতায়।

ঈশ্বর করুন,—দোঁহে
"অভিন্ন-হৃদয়" হও ;
দিবানিশি হাসিমুখে
চিরশান্তি সুখে রও।

হউক মধুরতর
মধুর হৃদয়-মণি
হৃদয়ের ভালবাসা
লও বৌদিদি-রাণী।

তোমার ছোট্ ঠাকুরপো—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত ২১শে মাঘ, রবিবার প্রাতে ৯ টার সময় খাঁটুরা মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ জন্য স্কুল-গৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর প্রভৃতি গ্রামবাসী অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কুলের প্রধানশিক্ষক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে, বনগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল, গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি এবং সভাপতি মহাশয় সময়োপযোগীভাবে বক্তৃতা করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানশিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কয়েকটি কথায় তাঁহার গুণাবলী বর্ণনাচ্ছলে স্কুলের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক করেন। সহায় নারায়ণ বাবু তাঁহার বক্তব্য মধ্যে স্কুলের প্রতি তাঁহার প্রাণগত অনুরাগ ও খাঁটুরা গ্রামের অবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, বিদ্যার্থে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আবেগময়ী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; খাঁটুরা-স্কুলের মেরুদণ্ডস্বরূপ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতেও তিনি ভোলেন নাই। উপস্থিত পারিতোষিক বিতরণকার্য্যে সহায় নারায়ণ বাবু স্কুলের সম্পাদকের হস্তে ৪০৲ চল্লিশ টাকা প্রদান করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অবশেষে নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে দুঃখের সহিত আমরা দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথমে সভার কার্য্যারম্ভে খাঁটুরা নিবাসী স্বভাব-কবি-সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বিরেশ্বর চৌধুরী, স্বরচিত একটি বাণী-বন্দনা গীত গান করেন। পারিতোষিক বিতরণ সভার পক্ষে তাহা স্বাভাবিক এবং গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ই হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কিছুক্ষণ ধরিয়া যে ঐক্যতান বাদন হয়, তাহা নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছিল; মনে হইতে লাগিল যেন থিয়েটার আরম্ভের পূর্ব্ব লক্ষণ। ২য়, সভাপতি মহাশয় যখন সভার কার্য্যে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন তখনও তামাকু সেবনার্থে তাঁহার হস্তে বাঁধাহুকা প্রদত্ত হয়, এবং তৎপূর্ব্বে স্কুলের সম্পাদক মহাশয় পর্য্যন্ত স্কুল-গৃহের বারেন্দায় প্রকাশ্য স্থানে

তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত ছিলেন। যে স্থলে বালকগণকে "সিগারেট বাড়সাই প্রভৃতি যে কোন প্রকার ধূমপান করা উচিত নহে," এই নীতি, উপদেশ দেওয়া হয়, সেস্থলে নিজেরা ধূমপান করিলে তদ্রূপ উপদেশের কোনো মূল্য থাকে না। যাহা হউক পল্লীগ্রামের সভা-সমিতিতে যেখানে এইরূপ বিসদৃশ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীর শুভ পরিণয়, কলিকাতা বলরামদের ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত গত ১৯শে মাঘ, মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে কৃষ্ণনগর, নাটোর, গৌরীপুর, ময়মানসিংহ, দিঘাপতিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজা মহারাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতিপ্রসন্নেরও বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এক উদযোগে উভয় অনুষ্ঠানে বহুলোক সমাগমে এবং আমোদ-উৎসবে প্রায় পক্ষ কালব্যাপীয়া গোবরডাঙ্গা গ্রাম সমারোহযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু বিবিধ আমোদ প্রমোদের মধ্যে বাইনাচের ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের মনে হয় এই অপবিত্র বিষয়টি প্রদর্শিত না হইলেই ভাল হইত। ইহাতে যে জন সাধারণের মধ্যে দুর্নীতি ও কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহাতে কি কোনও সন্দেহ আছে? বিশেষত: পল্লীগ্রামের লোকে প্রধান ব্যক্তিগণের অনুকরণ সহজেই করিয়া থাকে।

গত ১৮শে মাঘ রবিবার কলিকাতার ২৩নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থ ভবনে ডাক্তার আর, এল, দত্তের পৌত্রী, খাঁটুরার পরলোকগত লক্ষণচন্দ্র আশের দৌহিত্রী, মিসেস্ স্নেহলতা দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী শান্তিলতার সহিত, স্যার এস, পি, সিংহের দ্বিতীয়পুত্র বেরিষ্টার শ্রীমান্ শিশিরকুমার সিংহের শুভ পরিণয় নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই নবদম্পতির জীবনে বিধাতা "সুখী পরিবার" গঠন করুন ইহাই আমাদের কামনা।

☞ ফাল্গুন ও চৈত্রের কুশদহ একত্রে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে বাহির হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কৃষ্ণদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়,
ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

অষ্টম বর্ষ } ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৩ { ১১,১২শ সংখ্যা

সঙ্গীত

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে আছে জগত মাঝে (তুমি) যার মুখ দেখিবে না?
এত কার পাপ ভার (তুমি) যারে ক্ষমা করিবে না?
কে আছে হে এত দুঃখী, (তুমি) করিবেনা যারে সুখী,
(তুমি) ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী, কে তোমারে ডাকিবে না?
তোমার প্রেমের দান, নহে কার দেহ প্রাণ,
কার জীবনে তোমার শুভইচ্ছা পূরিবে না?
কাহাকে সন্তান ব'লে, লবে না স্নেহের কোলে?
কে ভালবাসে না ব'লে (তুমি) তারে ভালবাসিবে না?
আপনি লয়েছ এবার, পাপীর উদ্ধার ভার?
কে আর তোমারে বল, প্রাণ মন সঁপিবে না?

কালীনাথ—

লেখা ও বলা



জগতে মানব অন্তরের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধাণরত দুইটি উপায়ে প্রকাশিত হয়। ১ম, লিখিয়া, ২য়, মুখে বলিয়া। ইহা ভিন্ন নিস্তব্ধভাবে মানব-অন্তর অনেক সময় অনেক কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহা হউক লেখা ও বলা এই দুয়ের মধ্যে কি তারতম্য আছে তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক।

সাধারণত দেখা যায়, লেখা দ্বারা যে কাজ হয়, মুখে বলায় সে কাজ হয় না। আবার অবস্থা বিশেষে সাক্ষাৎভাবে মৌখিক কথায় যে কাজ হয়, লিখিয়া পড়িয়া সে কাজ হয় না। অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয় গম্ভীরতত্ব সকল গ্রন্থাদির দ্বারায় বহুকাল ব্যাপিয়া দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহা যদি লিপীবদ্ধ হইয়া না থাকিত, তবে কোথায় কোন্ কালেরগর্ভে কত অমূল্য জ্ঞান-রত্ন সকল বিলীন হইয়া যাইত,—কতই গিয়াছে কে বলিতে পারে। সাধারণ বিষয় সকল লিখিত পঠিত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

২য়, কথোপকথন দ্বারা নিত্য নিয়ত অজস্রভাবে মানব অন্তরের বিনিময় ও কার্য্য প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। লিখিত বা মুদ্রিত বিষয় অল্প সময়ের মধ্যে সহজে অধিক বিস্তৃতি লাভ করে যাহার উন্নতি বর্ত্তমান সময়ে জগতকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে, কিন্তু মৌখিক বিষয় সাধারণত অল্পের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, আবার কথাবার্ত্তার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের শক্তি স্থান কাল ও অবস্থা বিশেষে যেমন গভীরভাবে অথবা জীবন্তভাবে প্রকাশিত হয়, লেখা দ্বারা তাহা হয় না।

"কুশদহ"র পাঠক পাঠিকা মাত্রেই কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যাঁহারা প্রথমাবধি নিয়মিত ইহার গ্রাহক আছেন, তাঁহারা জানেন "কুশদহ" প্রচারের উদ্দেশ্য কি। সুতরাং সে বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া, সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, একটি শান্তিপ্রদ সদ্ভাব-বার্ত্তা, যাহা ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মৌখিককথায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, হটাৎ দেব-প্রসাদে তাহাই "কুশদহ" আকারে লিখিত পঠিত প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়া এই ৮ বৎসরে যেটুকু কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে কৃতজ্ঞ-ভরে মস্তক অবনত হইয়া সেই বিধাতার চরণে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারে না। বিষয়টি মুদ্রিত হইয়া অল্পকালে এত দূর বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও আশা করি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "কুশদহ" প্রচারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বিশেষভাবে কুশদহবাসির মধ্যে সদ্ভাব প্রচার করা। ঈশ্বর-কৃপায় তাহারও সার্থকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মুদ্রিত কুশদহ প্রচারের সঙ্গে মৌখিক প্রচার কোনো দিন বন্ধ নাই, বরং তাহার প্রয়োজন যেন আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। যেখানে যাই, বন্ধু বলিয়া—প্রিয় বলিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাই, তাহারই মুখে দেখি হাসি নাই, প্রাণে শান্তি নাই। তার পর এই সর্ব্বনাশী যুদ্ধের সময় দেখি, মানব প্রাণে কত আশঙ্কা—কত উদ্‌বেগ। কোথাও শান্তির সমাচার পাই না। এসময় একটি প্রাণের কথা - বিশ্বাসের কথা—আশ্বস্ততার কথা যাহা অন্তরের অন্তস্তল হইতে পাইয়াছি, তাহা বলিতে যাই—কত স্থানে তর্ক উপস্থিত হয়, শেষ যখন দেখি অধিকাংশ স্থলেই সে কথা গৃহীত হয়, শ্রোতাগণের প্রাণে একটুও শান্তির ভাব আসে, তখন কতই আনন্দ হয়। সে কথাটি এই ;—আমরা দেখিতেছি, প্রায় পৌনেতিন বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছে, ইউরোপ —ইংলণ্ডের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তথাপি আজো আমরা এখনো ভারতবাসী—বঙ্গবাসী, রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছি, দুই বেলা মুখে অন্ন দিতেছি। আমরা এখনোপর্য্যন্ত কত বড় দুর্গের আশ্রয়ে আছি। এ জন্য কি আমাদের মনে একটুও কৃতজ্ঞতার ভাব আশা উচিত নয়? এই কথাটি ভাবিলে কি একটুও দুশ্চিন্তা কমে না?

তার পর এখন আবার সকলে ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, এবং বলিতেছেন, "সম্মুখে যে দিন আসিতেছে তাহাতে আর অন্ন মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে," ইত্যাদি। এ বিষয় যাহা বুঝিয়াছি—ভগবান্ যে জ্ঞান বিশ্বাস দিয়াছেন, তাহাই সকলকে বলিতেছি,—ফলত দেখি সে কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হন, সে কথাটি এই ;—বাস্তবিক যদি বর্ত্তমান জগতের কিছু ধন ঐশ্বর্য্য কমিয়া যায়, তাহাতে জনসমাজের মঙ্গলই হইবে। ধন হীনতায় অনেক বিলাসীতা কমিবে। বিলাসীতা মানুষকে কখনো মনুষ্যত্ব লাভের পথে লইয়া যায় না, সুতরাং তাহার অভাবে মনুষ্যত্ব লাভের কোনো হানি হয় না। স্বীকার করি, সংসারে ধনের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। ধনের দ্বারায় সকল অভাব পূরণ হয়, এবং অভাব বোধ মূলে অন্যায় নহে। কিন্তু বাহ্যবস্তুর অভাবের পরিমাণ বোধের সীমা কোথায়? জ্ঞান, সংযম, মিতাচার ভিন্ন সে সীমা দৃষ্ট হয় কি? সে সীমার দৃষ্টিলাভ যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই তো সংসারে শান্তি লাভ করিতে পারেন। তখন দেখা যায়, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রকৃত

অভাব কত কম! মনে যদি একটু সাম্যভাব আনা যায়, তখন কি আর ধন ক্ষয়ে ভয় হয়?

মানুষ দুঃখের কল্পনাতেও যথেষ্ট ভয় পায়; কিন্তু দুঃখ কষ্ট অনিবার্য্য—এমন কি, মানব-জীবন গঠনের পক্ষে উহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না—কেহই করিতে পারেন না। জ্ঞানীগণ দুঃখ ক্লেশের মধ্যেও তাহার এক মঙ্গলময়ীমূর্ত্তি দেখিতে পান। সেই জন্য তাঁহারা মৃত্যু ভয়েরও অতীত হইয়া যান।

এই কথাগুলি এতক্ষণ যাহা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইবে—হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা মনে হয় না। কিন্তু কার্য্যত দেখিয়াছি, এই কথা মুখে বলিয়া বহু স্থানে অন্তত তখনকার জন্যও সকলের প্রাণে শান্তি আনয়ন করিয়াছে। তাহা দেখিয়া প্রাণে কত আনন্দ হয়। ইহা তো অহঙ্কারের কথা নহে, এ যে সত্য কথা! তাই বলিতেছিলাম, যাহা লিখিয়া হয় না, তাহা মুখে বলিয়া হয়। আর এক সময় মুখে বলিয়া যাহার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল না তাহা লিখিয়া প্রকাশ করায় হইল। অথচ লেখা ও বলা, দুয়েরই প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে।

আজ এই অবস্থার কথা স্মরণ হইয়া বড় আনন্দ হইল। তাই "কুশদহ"র ৮টি বৎসর শেষের সময় একবার প্রাণ ভরিয়া বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া—সেই কৃতজ্ঞতা "কুশদহ"র পাঠক পাঠিকাগণের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছি। আত্মীয় বন্ধুগণ, কুশদহ প্রচারের সাফল্যে সকলে সাক্ষ্য দিয়া বিধাতার করুণা স্বীকার করিবেন কি? কারণ ইহা "কুশদহ" সম্পাদকের বিদ্যা-বুদ্ধি ক্ষমতার পরিচয় নহে, এবং তদ্দ্বারা ইহা সম্পন্নও হয় না।

দেবকুমার

—০—

২৪

দেবকুমার স্থির করিয়াছিলেন যে হৈমবতীকে লইয়া দুই-এক দিনের মধ্যে নিকটবর্ত্তী সহরে কোন বন্ধুর গৃহে যাইবেন। সেখানে সকল বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিবেন। এদিকে দুর্গানাথ প্রচার করিয়া দিবে যে তাহার কন্যা মাসীর বাড়ী গিয়াছে।

কয়েকদিনের মধ্যে এই বন্দোবস্ত অনুসারে তিনি হৈমবতীকে লইয়া নৌকায় যাত্রা করিলেন। তিন দিনের পথ যাইতে হইবে।

প্রথম দিনেই দেখিলেন যে, যখনই নদীর তীরে কোন বৃক্ষাবৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হন, তখনই তাহার মধ্যে যেন দুই একজন লোক তাঁহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে আর কাহাকেও দেখিতে পান না। প্রথমে ইহা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু বার বার এইরূপ দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, বোধ হয় কেহ তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। তিনি মাঝিদিগকে রাত্রিতে কোথাও নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিলেন। যাহা কিছু আবশ্যক, দিনের বেলা নৌকা লাগাইয়া সমাধা করিয়া লইতেন। রাত্রিতে নৌকা বরাবর বাহিয়া চলিত।

প্রথম দিন এইভাবে চলিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে হঠাৎ হৈমবতীর উদরাময় হইয়া পড়িল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, কোন চিকিৎসা না করিলে চলে না। তিনি তখন বাধ্য হইয়া নৌকা তীরে বাঁধিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গ্রাম সেখান হইতে তিন চারি মাইল দূরে। মাঝিদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিয়া গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কবিরাজ রাত্রিতে এতদূর আসিতে চাহিলেন না, সুতরাং অবস্থা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ লইয়া আসিলেন। প্রাতঃকালে আসিবেন বলিয়া কবিরাজ আশা দিলেন।

জঙ্গলের পথে আসিতে আসিতে দূরে কেমন অস্ফুট চিৎকারধ্বনি শুনিয়া দেবকুমার দ্রুতগতিতে নদীর নিকট আসিতে লাগিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন যে সকল নিস্তব্ধ। মাঝিদিগকে ডাকিলেও কোন শব্দ পান না। সত্বর নৌকায় উঠিয়া হস্তস্থিত আলোকে দেখিতে পাইলেন, যে নৌকায় রক্তের চিহ্ন, হৈমবতীর মৃতশরীর নৌকার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। ইহা দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে মাঝিদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে, একজন মাঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করিল। "আমরা কিছুক্ষণ অবসর পাইয়া, শুইয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ ১০|১২ জন লোক আসিয়া নৌকার উপর উঠিল। সকলেরই মুখোস পরা, কাহাকেও চেনা যায় না। আমরা ভীত হইয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, "তোদের যম"। ইহা বলিয়াই তাহারা আমাদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল। আমরাও

তাহাদের সহিত কিছুক্ষণ লড়াই করিলাম। কিন্তু শেষে সকলই বৃথা দেখিয়া যে যেখানে পারে জলে পড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পলায়ন করিল। আমি জলে পড়িয়া ডুব দিয়া অনেকদূর গিয়াছিলাম। যখনই মাথা উঠাইয়াছি দিদি-ঠাকুরাণীর ক্রন্দনের স্বর শুনিয়াছি। কিন্তু পরে আর শুনিতে পাই নাই। একবার আমি শুনিতে পাইলাম, "একজন বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল তোর বাবু কোথায়?" তখন দিদিঠাকুরাণীর গলা শুনিতে পাইলাম, "ও বাবু তুমি, দোহাই আমাকে প্রাণে মেরো না।"

দেবকুমার উঠিয়া তখন হৈমবতীর দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন প্রাণ পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। বাক্সগুলি সব ভাঙা, অর্থ সকল অপহৃত। অন্যান্য কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু কিশোরীলালের নিকট হইতে যে দলিল লিখাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা অনেক অনুসন্ধানেও পাইলেন না। অবশেষে তিনি মাঝিদিগকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। দেখিলেন একজন অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, আর একজনের হাত, পা, মুখ বাঁধা। তাহাকে খুলিয়া দিয়া অপরব্যক্তির চেতনা সম্পাদন করিলেন। বার বার ডাকা ডাকিতে একে একে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে রাত্রিতে তটে থাকিয়া পরের দিন দূরবর্ত্তী থানায় সংবাদ পাঠাইলেন। দারগা আসিয়া তদন্ত করিয়া গেল। এবং লাস লইয়া গেল। তখন তাঁহারা পুনরায় গ্রাম অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দুর্গানাথ যখন তাহার কন্যার মৃত্যুসংবাদ শুনিল, তখন সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পরে আর তাহার বুদ্ধি রহিল না। সে কেবল 'ওমা ওমা' এই শব্দ দিবারাত্র করিতে লাগিল। কখনও কখনও আত্মহত্যা করিতে যাইত। ঘোর উন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া আত্মীয়েরা তাহাকে গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিল।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। পুলিশ যথাসাধ্য হত্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোনই কিনারা করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। একদিন দেবকুমার তাঁহার গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন পুলিশের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "হৈমবতী মণ্ডলের খুনের ও নৌকায় ডাকাতি করার অভিযোগে, তোমাকে আমরা ধরিতে আসিয়াছি।" ইঙ্গিতকরা মাত্র একজন আসিয়া দেবকুমারকে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, অনেক লোক দেখিতে আসিল।

দেবকুমার কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। চারুবাবু ছুটিয়া আসিলেন। দেবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, তুমি কি দোষী ?" দেবকুমার কেবল বলিলেন আমি নির্দ্দোষী, বিধাতা জানেন।"

১৫

রায় মহাশয়ের গৃহে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। রায় মহাশয় ও করুণাময়ীর মুখে হাসি নাই, নিরুপমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে। সরলা, নিজের মনের ভাব গোপন করিতে শিখে নাই। বিশেষত রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এমন লোককে গৃহে স্থান দিয়াছি, আমার পরিবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছি ? এ কলঙ্ক আর যাইবে না।" এই কথা শুনিয়া নিরুপমা আরও কাঁদিতে লাগিল।

রায় মহাশয় অবশেষে কন্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "চণ্ডালের বংশে জন্ম, আর কত ভাল হবে ? জাতিগত দোষ কি যায় ? উঠ মা, তুমি আর কেঁদে কি করবে। দেবকুমার আমাদের প্রাণরক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু না করলেই ভাল ছিল। নিরুপমা তখন চক্ষু স্থির করিয়া বলিল, বাবা, তুমি এতকাল বিচার করলে, এখন বিনা বিচারে একজন লোককে এমন দোষী মনে করছ ? দেবকুমার বাবু কখনই দোষী নন ; তিনি ঘোর বিপদে পড়েছেন আমরা কোথায় তাঁকে এখন সাহায্য করব, তা না করে তুমি তাঁকে পরিত্যাগ করছ ? চণ্ডালের ছেলে বলে তোমার সংস্কারের জন্য তাঁকে দোষী মনে করছ। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি তিনি কখনও দোষী নন। আমি কিছুতেই তাঁর দোষের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

রায় মহাশয়। এখন আর এ বিষয় নিয়ে ভাবলে কি হবে। যা হয়, বিচারেই বুঝা যাবে।

হীনজাতির প্রতি তাহার সংস্কার তাঁহার স্বাভাবিক ন্যায়পরতাকে পরাজিত করিতে বসিয়াছে।

নিরুপমা। বাবা, দেবকুমার বাবু এক সময়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, তুমি যদি এই বিপদে তাঁকে সাহায্য না কর, আমি আর এ বিছানা হতে উঠব না। তোমার টাকা আছে, তাঁর জন্য একজন ভাল উকিল দাও। তুমি একবার কলকাতায় গিয়ে একজন ভাল ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত কর, আমি বলছি তিনি ঘোর চক্রান্তে পড়েছেন ; নিশ্চয়ই তা হতে নির্দ্দোষী হয়ে আসবেন।"

করুণাময়ীও এই কথায় সম্মতি দিলেন, ও চারুবাবুকে অনুরোধ করিলেন।

দেবকুমার এমন কাজ করিতে পারে, তিনিও ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। অবশেষে চারুবাবু কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত হাজারিলাল নামক দক্ষ ডিটেক্‌টিভকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসিলেন। একজন শ্রেষ্ঠ উকিলকেও দেবকুমারের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন। ডিটেক্‌টিভ রায় মহাশয়ের পরিচিত বন্ধু ও অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে রহিলেন।

একমাস পরে ম্যাজিষ্ট্রের নিকট সর্ব্বপ্রথমে বিচার আরম্ভ হইল। পুলিশের দারোগা বলিল,"ঘটনার তৃতীয় দিনে আমি একখানি বেনামি চিঠি পাই, তাহাতে লেখা ছিল যে, দেবকুমার কর্ত্তৃক হৈমবতীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য সে তাহাকে দূরদেশে রাখিতে যাইতেছিল। মারিয়া ফেলিলে, সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এই মনে করিয়া ডাকাতির ভাণ করিয়া, তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ; সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেই আপনি জানিতে পারিবেন।" আমি এই পত্র পাইয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছি। হৈমবতীর সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহা ঠিক। ডাকাতির অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেবল মাঝিদের কথার উপর নির্ভর। হয় তো দেবকুমারের বেতনভোগী লোকের দ্বারাও হইতে পারে, অথবা মাঝিদের দ্বারাও হইতে পারে। অর্থের বশীভূত হইয়া তাহারা সত্য কথা বলিতেছে না।

দ্বিতীয়ত আসামীর পূর্ব্বের জীবন সাধারণের অজ্ঞাত, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া যতটা জানিয়াছি, তাহা এই, এই বলিয়া তিনি তাহার বাল্যকালের কথা বলিয়া পরে বলিলেন, "আসামী মাদ্রাজে মিষ্টার আয়ারের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল। সেখানে অনেক টাকা চুরি করায় ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়। মিষ্টার আয়ারের কন্যাকে তাহার সহিত পলাইয়া আসিতে বলে। সেখানে পারিয়া-দিগের সহিত মিশিত, এবং তাহাদের সহিত মদ খাইত ও নানা প্রকারে নিন্দা-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে মিষ্টার আয়ারের লিখিত এফিডেভিট আমি আদালতে দাখিল করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট দেবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" দেবকুমার বলিল, "আমি নির্দ্দোষী। আমার যাহা বলিবার দায়রার বিচারে বলিব।" ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রার বিচারের জন্য হুকুম দিলেন।

২৬

ডিটেক্‌টিভ হাজারিলাল ইতিমধ্যে বসিয়া নাই। সে দেবকুমারের নিকট গিয়াছে। দেবকুমার প্রথমে হৈমবতীর কলঙ্কের কথা সাধারণে রাষ্ট্র করিতে সম্মত

ছিলেন না কিন্তু তিনি ডিটেক্‌টিভের পীড়াপীড়িতে অবশেষে হৈমবতীর সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া বলিলেন, "আপনি গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হতে আসেন নি বলেই আপনাকে বলছি যে, আমার সন্দেহ হয়, হয়তো কিশোরীলাল এর মধ্যে থাকতে পারে।" ডিটেক্‌টিভ প্রথম দিনের বিচার শুনিয়া আবার দেবকুমারের নিকট গেলেন। দেবকুমার বলিলেন, "এ বিষয়ে বীনাপুরমের রাজা, অনাদিনাথ ও মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করলেই সব কথা জানতে পারবেন।" তাঁদের ঠিকানা দিয়া দিলেন।

বিচারের দিন আদালতে লোকারণ্য। গভর্ণমেণ্টের পক্ষের সকল সাক্ষী পুনরায় তাহাদের কথা বলিল। গভর্ণমেণ্ট উকিল তাহাদের জেরা করিতে লাগিলেন। প্রথমত হৈমবতীর সহিত দেবকুমারের অবৈধ সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে কেহ পারিল না। দ্বিতীয়ত দেবকুমার কবিরাজের নিকটে যখন গিয়াছিলেন, এবং আসিয়াছিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নিজের ডাকাতি করা অসম্ভব, একথা কবিরাজের সাক্ষ্যে অনেকটা প্রমাণ হইল।

এমন সময়ে হাজারিলাল উকিলের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন, তিনি আবার জজ সাহেবকে বলিলেন, জজ সাহেব তুইজন পুলিশকে আদালত-গৃহের দ্বারে নিযুক্ত রাখিলেন এবং গোপনে হুকুম দিলেন যে, কাহাকেও বাহিরে যাইতে না দেওয়া হয়। তাহার পরে উকিল ডিটেক্‌টিভের সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকিলেন।

ডিটেক্‌টিভ বলিল, "আমি গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত। আমি ঘটনার স্থান বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাই। তাহাই অনুসন্ধান করিতে করিতে, একটি পুরাতন ডোবার নিকট উপস্থিত হই। সেখানে চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারি যে ঘোড়া অনেকক্ষণ বাঁধা ছিল। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি ডোবাটিতে লোক নামাইয়া বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধান করিয়া জলের মধ্যে কতকগুলি এক সঙ্গে জড়ানো কাপড় উঠে। একখানি বড় পাথর তাহার সঙ্গে বাঁধা ছিল। কাপড়ের মধ্যে কয়েকটি মুখোস, কয়েকটি জামা ও একটি কোট ছিল। কোটে নানা স্থানে এখনও রক্তের দাগ রহিয়াছে।"

সেই কোটের মধ্যে তুইখানি কাগজ পাইয়াছি। একখানি ষ্ট্যাম্প যুক্ত ও আর একখানি কিশোরীলালের লিখিত নন্দলালের নামের চিঠি। আমি এই সকল আদালতে দাখিল করিতেছি, আদালত এ বিষয়ে বিচার

করিবেন। আমি আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, কিশোরীলাল ও নন্দলাল তাহার পূর্ব্বে দুই দিন হইতে গৃহে ছিল না, এবং ঘটনার শেষ রাত্রিতে তাহারা আসিয়াছে। তাহারা যে ঘোড়ায় গিয়াছিল, তাহার পায়ের চিহ্নের সহিত, আমার অনুসন্ধানের ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন একেবারে মিলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা তদন্ত করিয়াছি, তাহা আমার ডায়রিতে লেখা আছে, আমি তাহা আদালতে দাখিল করিতেছি।"

কিশোরীলাল ও নন্দলাল আদালতে ছিল, কোর্ট পাইবার কথা শুনিয়া তাহারা বাহিরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িল না।

উকিল তখন বলিলেন, "মাদ্রাজের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দুইজন সাক্ষী এখানে উপস্থিত আছেন। একজন বীনাপুরমের রাজা, আর একজন পারিয়াদিগের মণ্ডল। তাঁহারাই মিষ্টার আয়ারের এফিডেভিটের জবাব দিবেন।" এই বলিয়া রাজার সাক্ষী আরম্ভ হইল, তাঁহার পরিচয় পাইয়া জজ সাহেব তাঁহাকে চেয়ার দিলেন। ব্যাঙ্ক কি জন্য ফেল হইল, কেন তাঁহার রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গিয়াছিল,এবং পুনরায় তিনি তাঁহার রাজ্য কি উপায়ে ফিরাইয়া পাইয়াছেন সকল কথা বলিলেন। দেবকুমার সেখানে কি করিয়াছেন মণ্ডল কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা বলিল। সে বলিল, "এ বাবু মানুষ নয়, দেবতা। ইনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তা মানুষে করতে পারে না।"

তখন জজ সাহেব মোকদ্দমা শেষ করিয়া রায় দিলেন। "আসামী নির্দ্দোষী। দুষ্টলোকের চক্রান্তে পড়িয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন।" রায় মহাশয় আদালতে ছিলেন, এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না, কেবল তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নন্দলাল ও কিশোরীলাল আদালত গৃহের বাহির না হইতে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসিয়া হাতকড়ি পরাইয়া উভয়কে হাজতে লইয়া গেল।

২৭

রায় মহাশয় আত্মসম্বরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গেলেন। তাড়াতাড়ি পাল্‌কী লইয়া জেলখানার দরজায় উপস্থিত হইলেন। দেবকুমার বাহিরে আসিলেই তাঁহাকে বাহুপাশে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ডিটেক্‌টিভের নিকট পূর্ব্বেই কিছু আভাষ পাইয়া দেব-

কুমারকে অভ্যর্থনা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবকুমারকে বলিলেন, "তোমাকে দেখবার জন্য নিরু ও করুণা বড় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি এস।"

দেবকুমার কহিলেন, "আপনারা যে আমাকে নির্দ্দোষী মনে করেছেন, তাতেই আমি কৃতার্থ, আর কিছু চাহি না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "চল রাজা ও মণ্ডল আরো অনেকেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। অনাদিনাথ অসুস্থ বলে মাদ্রাজ হ'তে আসতে পারেন নাই।"

দেবকুমার রায় মহাশয়ের গৃহে আসিবামাত্র বাজনা বাজিয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক সকলের সহিত সাদরসম্ভাষণ করিলেন। নিরুপমা ও করুণাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজা ও মণ্ডলের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

২৮

দেবকুমার কিছু বিশ্রাম ও আহার করিলে রায় মহাশয় বলিলেন, "আজ তোমাকে একটা নূতন দৃশ্য দেখাব, চল।"

দেবকুমার রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পাঠগৃহের সন্নিকটে বারান্দায় গিয়া দেখিলেন যে, স্তুপীকৃত পুস্তকগুলি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে অনেকগুলি হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিত। এই মূল্যবান পুস্তকগুলি দগ্ধ হইতে দেখিয়া দেবকুমার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রায় মহাশয় বলিলেন, 'আমি এতকাল এই হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের জালে বেষ্টিত ছিলাম। আমি মনে করতাম, জাতিভেদ হেরিডিটির ফল। সেই জন্য তোমার সকল সদ্‌গুণ দেখেও আমি তোমাকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভাবতাম উচ্চজাতির মনের ভাব উচ্চ। কিন্তু এখন আমার সকল মোহ দূর হয়েছে। মিষ্টার আয়ার ও তাঁর কন্যা ব্রাহ্মণ, কিশোরীলাল ও নন্দলাল ব্রাহ্মণ, আর তুমি চণ্ডাল আর এই মণ্ডল পারিয়া। কিন্তু উচ্চ জাতি হলেও ওরা কি জঘন্য, আর নীচ জাতি হলেও তোমরা কি উন্নত। আমার নিরু আজ জয়লাভ করল। আজ আমি সকলের সমক্ষে বলব যে জাতিভেদ মিথ্যা। বংশানুক্রমিক দ্বারা যারা জাতিভেদ সমর্থন করে, তারা ঘোর ভ্রান্ত। আমি ঘোর মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম, আর সে মোহের কারণ এই বইগুলি। মোহের কারণ বলেই আজ আমি এ গুলিকে ভস্মসাৎ করছি। আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে, তোমাকে আর কি বলব।

তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই। তুমি আমার নিকট যা চাইবে, তাই দেব।

দেবকুমার একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "আমার প্রার্থনার বিষয় আছে। কিন্তু আপনি পরিষ্কার করে বলুন, যে জাতিভেদের সকল সংস্কার ছেড়েছেন কি না, অথবা কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাসে এ কথা বলছেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "আমি যে ঈশ্বরকে এতদিন ভাল করে বিশ্বাস করতে পারিনি, আজ তাঁরই সাক্ষাতে তোমাকে সত্য করে বলছি, যে জাতিভেদের কোন সংস্কারে আর আমাকে বদ্ধ করতে পারবে না। যা অসত্য, তা নিয়ে থাকা আমার প্রকৃতি নয়।"

দেবকুমার বলিলেন, "আচ্ছা আমার প্রার্থনা আপনাকে পরে জানাব।"

যথাসময় আহারাদি করিয়া তিনি নিরুপমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যখন সমস্ত শুনিলেন, সে কখনও দেবকুমারের দোষে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য উকিল ও ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিয়াছেন, কত আশঙ্কায় তাঁহার মন আন্দোলিত হইয়াছে, তাঁহার পিতাকে তাহার মতে আনিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এবং ডিটেক্‌ভকে গোপনে তাঁহার বিশ্বাসের কথা বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন—তখন তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, নিরুপমা মানুষী না দেবী! তিনি আরও কিছুক্ষণ কথা বলিয়া রায় মহাশয়ের নিকট আগমন করিলেন।

রায় মহাশয়কে কহিলেন, "আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন বলেছেন। আমি নিরুপমাকে বিবাহ করবার জন্য প্রার্থনা করি। আমি জানি, আমি জাতি হিসাবে নহি, সকল বিষয়ে অযোগ্য। কিন্তু আমার হৃদয় তিনি অধিকার করেছেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তুমি তার মত নিয়েছ?" দেবকুমার কহিলেন, "এইমাত্রও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এসেছি। আপনার যদি মত থাকে, তাঁর কোন আপত্তি নেই। আমরা উভয়ে উভয়কে হৃদয়ে ভালবাসি। আশা করি আপনি অসম্মত হয়ে এ দুটি হৃদয়কে অন্ধকার করবেন না।"

রায় মহাশয়। আমি পূর্ণহৃদয়ে সম্মতি দিচ্ছি। বৎস, যা কিছু বাধা ছিল আজ সে ভ্রম চলে গেছে। নিরুপমার অনুরূপ পাত্র তুমিই। কিন্তু আজ যে রত্ন তোমাকে দিলাম তাকে যত্ন করে সুখে রেখ।

এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নিরুপমার নিকট লইয়া গেলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়ের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ে তাঁর চরণ-ধূলি লইল।

বিবাহের জন্য মণ্ডল ও রাজাকে থাকিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাজের ক্ষতি হইবে বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজা একখানি হীরক ও মণ্ডল একটি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত বেতের বাক্স উপহার পাঠাইয়াছিল। অনাদিনাথও উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

২৯

নন্দলাল সকল কথা স্বীকার করিল। তাহার ছয় বৎসর ও কিশোরীলালের যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হইল। সহকারীদিগের যথাযোগ্য শাস্তি হইল।

নিরুপমা ও দেবকুমার গ্রামেই নূতন গৃহ করিলেন। নিরুপমা স্বামীর কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নমশূদ্রেরা 'রাণী মা' বলিয়া ডাকিত। ক্রমে তাঁহাদের কাজের ভার অপরের প্রতি দিয়া, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। সকলেই শিক্ষিত হইতে লাগিল। আমরা ইহার ফল ক্রমে দেখিতে পাইব।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, সৈয়দ আবদুল রহিম দেবকুমারের বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন, এবং দেবকুমারের উৎসাহে, তিনিও যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ বোস, যিনি এখন মিসেস্ স্যারমন নামে পরিচিত, তিনিও অবশেষে দেবকুমারের স্মরণাগত হইলেন। স্যারমন টাকাগুলি হাতে পাইয়া একেবারে পলাইয়া বিলাতে চলিয়া যায়। সেখানে নানা অসৎ কার্য্যে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। আর ভারতবর্ষে আসিতে চাহে না, সেখানেই নানা দুষ্কার্য্যে জীবন যাপন করিতেছে। দেবকুমার এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার মাতাকে লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত আপন গৃহে রাখিলেন। তিনি নিরুপমার শ্বশ্রুস্থানীয়া হইয়াছিলেন। সমাপ্ত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী (বি-এ)

হৃদয়-কুটীরে



সৃষ্টির প্রথমে যবে এনেছিল ঊষা
রমণীয় বরণীয় সুন্দর প্রভাতে—
আনন্দ-আলোকময় হৈম শতচ্ছদ।
মেলি' তার দলরাজি অম্লান উজ্জ্বল
অপূর্ব্ব হিরণ্যছটা ছড়ায়ে দিগন্তে
আলোকিল নবধরা নবীন উল্লাসে!
আঁকি' দিল স্বর্ণরেখা বিশ্বের নিকষে!
তেমতি হে প্রিয় মোর! তব পূত প্রেম
ছেয়ে দেছে আনন্দের বর্ণজাল মেলি'
আমার এ ক্ষুদ্র হিয়া চিরদিনতরে।

কল্পনা-রচিত তুমি সাধনের ধন!
যুগ যুগান্তের তুমি ধ্যানের দেবতা!
তাই নিরজনে বসি' পূজি গো তোমারে;
পূর্ণিমার পূর্ণ ইন্দু হৃদি-নীলাম্বরে,
চিরদিন পরিপূর্ণ ষোড়শ কলায়—
বিরাজিয়া সুখে দুঃখে বরষিয়া ক্ষেম
অনন্ত অমৃতধারা, চির-স্নিগ্ধ রাখি;
ভাসাইয়া দিতে মোরে শান্তি-সিন্ধু-নীরে।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

মনোরমা

—০—

১০

স্কুল প্রত্যাগত বিনয় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একমনে স্কুলের প্রয়োজনীয় বিষয় কি কি লিখিতেছে, ক্ষীরোদা জল খাবারের রেকাবীখানি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, " বাছা মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে যা ইচ্ছে কর, শরীরটা আগে বজায় রেখে তবে অন্য কাজ। রাত দিন খাটুনিতে বাঁচবি কেমন করে ? একদিনও খাবার চেয়ে খেতে দেখি নে।"

বিনয় হাসিয়া লেখা স্থগিত রাখিল। উঠিয়া মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। আবার হাসিয়া কহিল, "আমার হয়ে যে সর্ব্বদা তুমি মনে রাখছ মা সে জন্য খাবার কথা স্মরণ রাখবার আমার দরকার হয় না, তবে পেটটা এক একবার তাগিদ করে বটে, তা আমার জননী অন্নপূর্ণা সর্ব্বক্ষণই আহার্য্য প্রস্তুত করে বসে আছেন, সুতরাং পেটের তাগিদ শোনবার অবসর কই ? আজ মা বড় ব্যস্ত আছি, রাতে বাড়ী থাকব না, লছমনিয়ার মাকে শুতে বোল, লেখা গুল সেরে এখুনি বেরোব।"

ক্ষীরোদা কহিলেন "বাবা, একটু সাবধানে চলিস, সহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘোরাঘুরি করিস নি। রাতে আজ বাড়ী থাকবি না কেন ?"

"যদুবাবুর প্লেগ হয়েছে, বাড়ীতে তিনটি ছোট ছেলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী একা, খারাপ রোগ, কেউ এগুতে চায় না, কাজেই—"

ক্ষীরোদা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তুই আছিস আর কি ? যদুবাবুর বাড়ী যে সন্ধ্যেবেলা প্রত্যহ দাবা ও পাসার আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সবাই জুটে খেলতো আর তামাক পুড়তো, এখন তারা সব কোথায় গেল ? অসময়ে কারো দেখা নেই ?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "তোমার তো মা জানাই আছে, অসময়ে বড় একটা কারো দেখা পাওয়া যায় না, যা হোক, অন্যের দিকে আমাদের দেখবার দরকার কি ? আমাদের প্রতিবাসির প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তো ? লোকটা কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ? আমি যাব মা, তুমি কিছু মনে কোর না।"

ক্ষীরোদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি কহিলেন, "লোকের সেবায় অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাতে আমি বাধা দি কেমন করে ? কিন্তু বাছা, ছোঁয়াচে ব্যারাম,

সবাই যে ভয় পায়—আমায় রেখে আয়, আমি প্রাণপণে সেবা করব, তুই যাস নে বাছা।”

সানন্দে বিনয়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, “এই তো মায়ের মতন কথা, বেশ মা, চল আমরা দু'জনে যাব, ভয় কি মা, তোমার আশীর্ব্বাদ, অক্ষয় কবচের মতো আমাকে সকল বিপদ—সকল ভয় হ'তে রক্ষা করবে, তুমি তো মা অন্য মেয়েদের মতো দুর্ব্বল-চিত্ত—সঙ্কীর্ণ মনা নও, সেই জন্যই আমার এত মনের বল, এত গৌরব। তোমরা মা জগৎমাতার প্রতিভূ, যিনি মা, তিনি কি একজনেরই মা? তা তো নয়, তিনি শোকার্ত্তের সকল ব্যথিতেরই যে মা, নইলে মা নামের সার্থকতা হয় কই? তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মা আমি সকল বিপদের সম্মুখীন হতে পারি।”

বিনয় ভক্তিভরে মাতার পদধূলি লইল। ক্ষীরোদা সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, “আজ তোর মামীমার চিঠি এসেছে, পড়ে বড় মনটা খারাপ আছে, মনুর জন্যে বড় মন কেমন করে, আহা! অমন সোনারপ্রতিমা, বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আমার বড় সাধ ছিল, বউ করবার, কিন্তু তখন বলতে সাহস হয় নি, বউ এখন সেই কথাই লিখেছে। সকলি অদৃষ্ট, তা ছাড়া আর পথ কি?”

চিঠিখানি টেবিলে রাখিয়া ঘর গুছাইতে ক্ষীরোদা চলিয়া গেলেন। বিনয় একমনে নিজের প্রয়োজনীয় লেখা শেষ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার দৃষ্টি চিঠির উপর পড়িল, অন্যমনস্ক থাকা বশত মায়ের শেষ কথাগুলিতে সে ভাল করিয়া কাণ দেয় নাই। এখন চিঠিখানি বিনয় পড়িতে লাগিল।

প্রিয় ভগ্নী!

ক্ষীরোদা, তোমার চিঠি পেয়ে একটু আশ্বস্ত হ'লাম, মনের দুঃখ তোমায় বলে তবু একটু জুড়ুই। পাঁচটা নয়,—সাতটা নয়, একটা মেয়ে, তা কি না তার অদৃষ্ট এমন হ'ল। আমার যেমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল ভগবান্ তেমনি চূর্ণ করেছেন। আজ বোন্ তোমার কাছে সত্য কথা বলতে কি, আগে এক একবার মনে হোত, বিনয় যেমন মার একটি ছেলে, লেখা পড়ায় মনোযোগী, বাপ মার কথার বাধ্য, ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার আদরের মনুর বিয়ে দিলে বেশ হয়, কিন্তু তোমাদের অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য আবার মন বিরূপ হোত, আসল কথা বোন্ আমার অদৃষ্টই মন্দ। বিয়ের আগে ভাল করে খোঁজ খবর নিতে পারি নি, জামাই রূপে ধনে শ্রেষ্ঠ হলে কি হবে, দুশ্চরিত্র দুর্ব্বিলাসক বলে সব মাটী হয়ে গেছে। হায় হায়, আমার মনু কোথা আজ

স্বামীর আদরে আদরিণী হয়ে থাকবে, তা নয়, বাছা এই ছেলে-বয়সে সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে! মা আমার বড় চাপা, চিঠিতে কিছু লেখে না, এক আধটি কথায় কিন্তু তার প্রাণের দুঃখ আমি বুঝতে পারি। তুমি মাসে মাসে দেখা শুনা কোর, মনোরমাকেও সংশিক্ষা দিও, ভগবান করুন সন্তোষের মন যেন পরিবর্ত্তিত হয়। মেয়ে সে অভিমানিনী, ভয় হয়, কোন্ দিন আত্মহত্যা না করে বসে।" * * *

মনোরমার অবস্থা জানিয়া বিনয় বড় ব্যথিত হইল। আহা! অমন মেয়ে, তাহার অদৃষ্টে এমনই নিগ্রহ ছিল! সন্তোষ এমন স্ত্রীর আদর বুঝিল না। আর একটা কথা বিনয়ের মধ্যে বড় সাড়া দিল, তাহার শৈশবসঙ্গিনী আদরিণী মনোরমা যদি তাহার পত্নী হইত, সে তাহা হইলে সুখী হইত কি? কি সুন্দর মধুর কল্পনা! স্নেহের মনোরমাকে সে শতগুণ স্নেহে সমাদরে বক্ষের মধ্যে স্থান দিত, কিন্তু এ কি দুশ্চিন্তা! মনোরমা পরস্ত্রী, আজ এ ভাবে তাহার চিন্তা মহাপাপ। বিনয় তখনই সেসকল কথা ভুলিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

১১

একদিন মনোরমা গৃহমধ্যে বসিয়া আছে! সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া স্থানীয়া প্রচারিকা মিস্ বুরেশ মহোৎসাহে বাইবেল পাঠ করিয়া তাহার তত্ত্ব মনোরমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন! সেই সময়ে সন্তোষ দ্বারের নিকট আসিয়া গৃহের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কামিনীর অনুসন্ধান করিল। এবং সে নাই দেখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মিসকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। মিস্ বুরেশ ইতিপূর্ব্বে সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহার আলাপও হইয়াছিল, তিনিও সন্তোষকে নমস্কার করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন, সন্তোষ কথা জমাইবার জন্য কহিল, "মিস বুরেশ, আমি অনেক দিন আগে একবার বাইবেল পড়েছিলাম, আমার তা বড় ভাল লেগেছিল, আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে আসবেন, আপনার কাছে তা হলে বাইবেল সম্বন্ধে আবার শুনতে পাব।"

উৎসাহে কুমারীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কুমারী সুদূর আমেরিকা হইতে নূতন এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ধনী পিতা মাতার আদরিণী সুন্দরী যুবতী কন্যা, সুতরাং অনেক পদস্থ যুবক কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু শৈশব হইতেই কুমারীর মনের গতি অন্যরূপ। ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহার প্রবল,

পিতা মাতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুমারী আমেরিকা মিশনে কার্য্য লইয়া সুদূর ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। কুমারীর নবীন উৎসাহ নবীন আশা ও উদ্যম ; কুমারী ভাবিতেন, যীশুর পবিত্র নামে অতি সহজেই ভারতের দুর্দ্দশাপন্ন নরনারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া নবজীবন দিতে পারিবেন। সন্তোষের কথায় কুমারীর বড় আনন্দ হইল, তিনি সাগ্রহে কহিলেন "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ পবিত্র হউক।" মনোরমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আজ কামিনী আসে নি কেন? আমার যাবার সময় হোল, আজ চল্‌লাম, এবারে যেদিন আসব কামিনীকে ডেকে পাঠিয়ো।"

মনোরমা কহিল, "তিনটা বাজে, আপনার টিফিনের সময় হয়েছে যে।"

সন্তোষ কহিল "বেশতো, আমারও জল খাবার সময় হয়েছে, মনোরমা, তুমি দুখানা রেকাবি শীগ্‌গির সাজিয়ে নিয়ে এস।" মনোরমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দুইখানি রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল! সন্তোষ কুমারীকে আহার করিতে অনুরোধ করিল, কুমারী কহিলেন, "মনোরমা, তুমি খাবে না? তোমার জাত যাবে বুঝি, আমি জানি, মেয়েরা বলে, পুরুষদের জাত যায় না, মেয়েদের যায়, নয় কি সন্তোষ বাবু?"

সন্তোষ কহিল, "আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে।"

এমন সময় বিনয় আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মনোরমা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিল, "বসুন দাদা, পিসীমাও এসেছেন না কি?"

"না, আমি একাই এসেছি, সন্তোষ বাবু, ভাল তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি মিস্ বুরেশ, আলাপ করুন, দেশের সম্বন্ধে আপনি তো খুব তর্ক করতে পারেন, এখুনি আমি মিস্‌কে বলছিলাম আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার আছে।"

বিনয় সসম্মানে মিস্‌কে অভিবাদন করিয়া কহিল, আমাদের দেশের জন্য যদি আপনার প্রাণ করুণায় পূর্ণ হয়ে থাকে সে জন্য আপনাকে আমার শত ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এই অনুরোধ, বিচারকের আসনে বসে আমাদের দেশের দোষগুণ বিচার করবেন না, বন্ধুর আসনে বসে হিতসাধন চেষ্টা করবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

কুমারী ততক্ষণ আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন. আহারান্তে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন. "বাবু, আপনারা তো বেশ লেখাপড়া শিখেছেন, মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন কেন?"

ইতিমধ্যে খোকাকে কোলে লইয়া কামিনী আসিল। সে গৃহমধ্যে যেমন প্রবেশ করিতে যাইবে, সন্তোষ ও বিনয়কে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া প্রস্থান করিল। কুমারী হাসিয়া কহিলেন, "বাঘ ভালুকের চেয়ে মেয়েরা দেখছি পুরুষকে বেশী ভয় পায়, আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।"

সন্তোষ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "অথচ ঐ কামিনীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর খুব বন্ধুত্ব, আমাদের দেশে এই যে অবরোধ-প্রথা এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কুসংস্কারের ফল।"

কথাটা মনোরমার অসহ্য বোধ হইল, তাই সে বলিল, "এই অবরোধ প্রথা আছে বলেই মেয়েদের সম্মান বেঁচে আছে, নইলে পুরুষদের নির্লজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে তাদের ভস্ম হয়ে যেতে হোত।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "না মনোরমা, তুমি ভুল বলচ, ভস্ম না হতো, সেটা ছাই মাটি খাদ মাত্র, আসল জিনিষ আরও নির্ম্মল খাঁটি হ'য়ে দাঁড়াত, পুরুষদের অতটা নীচ করে ভাবছ কেন ?"

ভায় এ কেনর উত্তর কি ? সন্তোষ কহিল, দুখানা বই পড়ে ওর পাণ্ডিত্য বেশী কি না ?

মনোরমা সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, "আমার মনে হয়, দেশের যে অবস্থা তাতে স্থানকাল পাত্র ভেদে এই অবরোধ-প্রথা মেয়েদের পক্ষে ভাল বই মন্দ নয়, পুরুষেরা মেয়েদের যে চক্ষে দেখে,—"

"না মনোরমা ও সকল মন্দর দিক ভাবলে চলবে না, আরও একটু উদারভাবে চিন্তা করতে হবে, মেয়েরা সকল জড়তা-সকল সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করে সহজ সরল ভাবে আপনার পথে চললে, পুরুষের সকল দাম্ভিকতা—সকল ধৃষ্টতা সকল নির্লজ্জতা আপনি সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আমি জানি ও বিশ্বাস করি, আমার দেশ তার মায়ের জাতিকে যতটা শ্রদ্ধা সম্মান করতে পারে অতটা আর কেউ পারে না।"

মনোরমা অস্ফুটস্বরে কহিল, আপনি নিজের মতন সকলকার স্বভাব মনে করছেন, সংসারে পিশাচ প্রকৃতির যে অভাব নেই, তা ভাবচেন না।"

বিনয় স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তা থাকুক, দেবত্বের সঙ্গে পিশাচপ্রকৃতির সংগ্রাম কতক্ষণ ? কুমারী বুরেশ, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় প্রীত হলাম, আপনার কথা আমি সেদিন আমার ভগ্নীর নিকট শুনেছি, আপনি ভারতবর্ষকে যথেষ্ট ভালবাসেন, নয় কি ?"

কুমারী প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "আমি কল্পনায় ভারতবর্ষকে বহুদিন হ'তে দেখে আসছি, এখন তো প্রত্যক্ষ দেখছি, আমি যথার্থই এ দেশকে বড় ভালবাসি, কিসে এখানে সকলের উন্নতি হবে তাই আমার আন্তরিক বাসনা, আমি একটি স্কুল খুলেছি, সেখানে অনেকগুলি মেয়ে পেয়েছি, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আমার প্রধান উদ্দেশ্য। প্লেগে গরীব দুঃখীরা বড় কষ্ট পাচ্ছে, মরছেও বিস্তর, সেবার অভাবেই বেশী মরছে। আমরা একটা সেবা-সমিতি খুলেছি, আজকাল আমরা বড় ব্যস্ত—যেহেতু সহরে রোগ খুব দেখা দিয়েছে।"

সন্তোষ কহিল, "মা সেই জন্যে সহর ছাড়তে বড় ব্যস্ত হয়েছেন, আমরা বোধহয় শীগগির কল্‌কাতায় ফিরবো।"

বিনয় কহিল, "ধন্যবাদ কুমারী' হতভাগ্য নিঃসম্বল দরিদ্রের কুটীরে আপনারা মূর্ত্তিমতী দেবীর মতন কল্যাণ-হস্তে যে সেবা করছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ, আর ধন্যবাদ আপনাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রেমকে, যেহেতু সেই বলেই বলীয়ান হয়েই আপনারা এ কাজ করতে পারছেন। মনোরমা দেখ, আমরা প্রতিবাসীর রোগে, ভয় পেয়ে পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছি, আর ওঁরা নিজেদের প্রাণভয় দূর করে, অভয়ার মতো সেই ভয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দমনে সেবা করছেন, আর ভয়ার্ত্তকে অভয় দান করছেন। কবে আমাদের দেশের মেয়েদের মন এমনি নির্ভীক, এমনি প্রেমপূর্ণ, এমনি বিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠবে, শুধু পুঁথিগত লেখাপড়ায় কিছু হবে না; সজীব কর্ম্ম-প্রাণ চাই, ত্যাগস্বীকার চাই, আমরা পুরুষরাও অগ্রসর হ'তে পারছি না, মেয়েরা আমাদের পিছু হতে টেনে রাখছেন, বলে তাঁরা এসে আমাদের সঙ্গে সমানে না চললে আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে।"

সন্তোষ অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "আমি উঠলাম, ওসব কথা আমার মাথায় বড় ঢোকে না, ততক্ষণ কাজের মতো কিছু করিগে, কুমারী আসুন, আপনারও সময় হয়ে গেছে, এগিয়ে দিই চলুন।"

কুমারী ও সন্তোষ চলিয়া গেল, মনোরমা নতমুখে কি ভাবিতেছিল, বিনয় কহিল, "মনু, কি ভাবছ? ভাল আছ তো?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা কহিল, "ভাল? তা—আছি বই কি। শরীর তো রোগশূন্য।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আর মন? সেটা যে নীরোগ তা অবশ্য বলতে সাহস করবে না।"

মনোরমার চক্ষে জল আসিল, বিনয় লজ্জিত হইল, মনে মনে ভাবিল, বালিকার মনের ব্যথা আমি জানিতে পারিয়াছি সেই জন্য বুঝি লজ্জিত হইল?

সহসা বিনয়ের ভাবান্তর হইল। মনোরমার মাতার পত্রের কথা স্মরণ হইল, হায়, সে পত্রের কথা যদি সত্য হইত, এই জ্যোৎস্নারূপিনী সর্ব্বসুলক্ষণা নারী যদি তাহার পত্নী হইত! কিন্তু এ কি অনধিকার চিন্তা! বিনয় নিজেকে সংযত করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "মনু, তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু তাতেই অধীর হলে চলবে কেন? শুধু স্বার্থের জন্যই কি এ দুর্লভ মানব জন্ম? নিজের জন্যই শুধু ভাববে? সংসারে তা ছাড়া কি কিছু ভাববার নেই?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল, "আমি তো কিছু ভাববার পাই না, আপনি না হয় কিছু দেখিয়ে দিন?" কথাটা বিদ্রূপের মতো শুনাইল ভাবিয়া মনোরমা লজ্জিত হইল, পরক্ষণেই কহিল "না দাদা, আপনাকে সত্য বলছি, সময়ে সময়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠে মুক্তি চায়, তা সে দেহ হতেই হোক, কিম্বা প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতেই হোক।"

বিনয়ও বিষম সমস্যায় পড়িল। অবরোধবাসিনী হিন্দুরমণীকে সে স্বামী-সেবা ভিন্ন আর কি ভাবিবার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে? জগতের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার দ্বার যে রুদ্ধ, সে দ্বার খুলিয়া দিবার শক্তি তাহার কই? অধিকারই বা কি? সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, রমানাথ বাবু শীঘ্র আসিবেন লিখিয়াছেন, সে কহিল, "মনু তোমার বাবা বোধ হয় শীগগির আসবেন।"

এ সংবাদে মনোরমা প্রীত হইল না, যেহেতু সে জানে তাহার পিতা মাতা কন্যার জন্য সর্ব্বদাই মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কন্যাকে দেখিলে তাঁহারা অধিকতর যাতনাই পাইবেন মাত্র। মনোরমা কহিল, "এখানে তাঁর এখন না আসাই ভাল, প্লেগের যে উপদ্রব,—ভাল কথা, যে ভদ্রলোকটির আপনি ও পিসিমা সেবা করলেন, তিনি তো মারা গেলেন, তাঁর স্ত্রীপুত্র কোথায় এখন?"

বিনয় কহিল, "আমার বাসায় আছেন। বৌটির বাপ মা নেই, শ্বশুর-বাড়ীরও কেউ নেই, কেঁদে ও ভেবে আকুল হয়েছিল, আমি সান্ত্বনা দিয়ে নিজের বাড়ীতে এখন রেখেছি।"

বিনয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ-মনোরমা, বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে কহিল, 'আহা, আপনি মানুষের মতো কাজ করেছেন, দাদা, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, আমি সেই অভাগিনীর ছেলে মেয়ের জন্য সাহায্য কোরব। তিনটি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কি করে তার দিন চলবে, আপনিই বা কদ্দিন রাখবেন?"

"না মনু, আমি তাঁকে পরমুখাপেক্ষী কোরে রাখতে চাই নে, যাতে ভবিষ্যতে তিনি নিজেই নিজের খরচ চালাতে পারেন সেই পন্থা দেখিয়ে দেব, একটু প্রকৃতিস্থ হলে মিসনরী মেমের কাছে তাঁকে লেখাপড়া ও সেলাই শিখতে দেব, আমার মাও সময় মতো কিছু কিছু শেখাবেন, তাঁর বেশ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, শীগগিরই তিনি উন্নতি করবেন, তার পর একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া মনোরমা কহিল, "কিন্তু দাদা, ও রকম অবস্থায় মেমেরা সুযোগ পেলে প্রায়ই মেয়েদের নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করে।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "সে দোষ কার মনু, মেমদের না মেয়েদের? তার জন্য যে আমরাই দোষী? লক্ষ্যহীন কর্ম্মহীন, জীবনটাকে সহানুভূতি না করে, আর একটা লক্ষ্য নির্দ্দেশ না করে দিয়ে, তাকে আবর্জ্জনার চাপে, নিষ্পেষণ করতে থাকব, তা হতে সে মুক্তি পাবার জন্য ছুটে পালালেই তার দোষ? আর সেই মুক্তির পথে যে টেনে নিয়ে যায়, তার দোষ? ধিক্ আমাদের।"

বিনয়ের উৎসাহদীপ্ত সমুজ্জ্বল প্রশান্ত চক্ষু দুটির প্রতি চাহিয়া মনোরমা ভাবিল, "কি সুন্দর কথা, মহৎ হৃদয়ের কি উদার ভাব, নারী জাতির প্রতি এত যাহার করুণা, ধন্য তাহার মহৎ হৃদয়! আর ধন্য সেই ভাগ্যবতী নারী, যে ইঁহার পত্নীত্ব-সৌভাগ্য লাভ করিবে। কৌতুহল বশত মনোরমা কহিল, দাদা, আপনি বিয়ে করছেন কবে? পিসিমা একলাটি থাকেন, আপনি বিয়ে করলে বৌটি কাজেরও দোসর হয়।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আর আমার কাজেরও বাধা হয়।"

"কেন? তখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবেন? আপনাদের দৌড় কি এই পর্য্যন্ত না কি? এই আপনার উদ্দীপনা? সব ভুয়ো, বক্তৃতাতেই সার?"

হাসিয়া বিনয় কহিল, "আমার হার হয়েছে, বিয়ে যখনি করি, নিমন্ত্রণ তোমাদের করবই।"

"সে তো করবেনই, কিন্তু আসছি না তো, এখন করলে সশরীরে উপস্থিত থাকতাম, নিমন্ত্রণটাও খেতাম, বৌও দেখতাম।"

"আর যদি তোমাদের দেশে গিয়ে করি? মা যে ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁর মতো এক গুণ ব্যস্ততা যদি আমার থাকতো।"

হাসিতে হাসিতে মনোরমা কহিল, "অন্তত প্রকাশ্যে।"

"ভিতরের খবর আর কে জান্‌তে যাচ্ছে।"

সহসা ঝন্ ঝন্ শব্দে উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, যে বিড়ালটি এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া টিপায়ের উপরস্থিত দুধের বাটির দিকে লুব্ধদৃষ্টে চাহিয়াছিল, অথচ পান করিবার কোন সুযোগ পায় নাই, তথাপি নিরাশ না হইয়া, শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে এখন গৃহস্বামিনীকে কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক দেখিয়া যেমন লাফ দিয়া টেবিলের উপর উঠিতে গেল, দুর্ভাগ্যবশত টেবিলের উপর হইতে কাচের চিমনীটি ঝনাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিড়ালটি বেগতিক দেখিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিল না। বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, "বিড়ালটার অদৃষ্ট বড় মন্দ, দুধের বাটি সামনে পেয়েও পান করতে পেলে না, আহা বেচারী!

কথাটা মনোরমার প্রাণে বাজিল, সে কহিল: "মানুষের অদৃষ্টেও সময়ে সময়ে তাই হয়।"

১১

"শুধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো—"

মনোরমা তাহার সুধাপূর্ণ কণ্ঠস্বর হার্ম্মোনিয়ামের সহিত মিলাইয়া গান ধরিয়াছে, কামিনী একাগ্রচিত্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, তাহারই আগ্রহে মনোরমা গাহিতেছে, নতুবা—যদিও গীত-বাদ্য তাহার বড় প্রিয় ছিল, তথাপি সে আর তাহার চর্চ্চা করে না। কামিনীর শিশুটিও তন্ময়-চিত্তে বাজনা শুনিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেছে।

"আর না ফিরিয়া দিল সে দেখা গো—"

প্রতি ছত্রে কি আকুলতা! কি মর্ম্মস্পর্শী সকরুণ ভাব!

"শুধু সে প্রীতিধারা, মধুর স্নেহরাশি,
পিয়াসা আকুলিত করুণ মৃদু হাসি,
সেই সে রেখে গেছে, আঁধার হৃদি মাঝে,
তা'লয়ে বসে আছি বিজনে একা গো।"

বার বার এই শেষ ছত্র কয়টি মনোরমা আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল, আহা! কোন্ সে বিরহ-কাতর হৃদয় তাহার চির প্রিয়ের উদ্দেশে এ সঙ্গীত রচনা করিয়াছে—কিন্তু এই বিরহও কত মধুর! প্রিয়তমের স্মৃতিই যে এই বিরহের মধ্যেও তাহার চিরসান্নিধ্য অনুভব করাইয়া দিতেছে। মনোরমার ললাটে মুক্তা তুল্য স্বেদবিন্দু দেখা দিল। গান শেষ করিয়া সে

জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধা কামিনী কহিল, "কি মিষ্টি গলা বৌ-রাণী, আজ আমার জন্ম সার্থক হোল।"

সরলা কামিনী বিস্মিত নয়নে এই অতুলনীয়া সুন্দরীর রূপ-গুণসম্পন্ন দেহ খানির দিকে চাহিয়া তাহাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল, কিন্তু হায়, মনোরমার হৃদয়—সেখানে যে কি আগুণ জ্বলিতেছিল তাহা সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

দ্বিপ্রহের প্রখর সূর্য্য, দারুণ শীতের শীতল দিবসটিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, সম্মুখস্থ মাঠে দরিদ্র নর নারী সেই রৌদ্রটুকু পরম আরামের সহিত উপভোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছে, একটা বৃহৎ অশ্বত্থ গাছে ঝোলনা বাঁধিয়া একদল ছেলে মেয়ে মহা কলরবে দোল খাইতেছে। একদল মেষ ও মেষ-শাবক স্বচ্ছন্দে সেই মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে, মাঠে ঘাস খুবই অল্প, তবু সেই মেষদল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহা খুঁটিয়া খাইতেছিল, তাহাতেই তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না।

মনোরমা কামিনীকে কহিল, "আচ্ছা, ঐ ভেড়াগুলো চরছে—ওরা এক জায়গাতেই দল বেঁধে রয়েছে কেন? গরু কি ছাগলের মতন এদিকে ওদিকে না গিয়ে সবগুলি এক জায়গাতেই চরছে।"

কামিনী কহিল, "কেন বৌ-রাণী, আপনি কি ভেড়ার দল কখনও দেখেন নি? ওদের একটা যেদিকে যাবে সবগুলি সেইদিকে যাবে, ওরা দল-ছাড়া হয় না।"

মনোরমা কহিল, "আমি কলকাতায় এসব দেখিনি, সেখানে এত বড় খোলা মাঠ কোথায়? বড় বড় রাস্তা, গাড়ি ঘোড়া ট্রাম, বড় বড় দোকান, এই সবই আমরা আজন্ম দেখে মানুষ হয়েছি।"

কামিনীরা দুই তিন পুরুষ এদেশে বাস করিতেছে, কলিকাতার সম্বন্ধে সে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনে, কলিকাতার কালীঘাট ও যাদুঘর দেখিবার তাহার বড় সাধ, কিন্তু তাহাদের মতো অবস্থার লোকের পক্ষে তাহা দুরাশা, সে মনোরমাকে নানা রূপ প্রশ্ন করিয়া স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করে।

কামিনী ছোট বেলায় পিতৃমাতৃ হীন হইয়াছে; সুতরাং তাহার স্নেহ-তৃষাতুর হৃদয়, মনোরমার নিকট তাহার পিতা মাতার কথা, তাহার শৈশবকাহিনী, পিতা মাতার নিকট তাহার আদর আব্দারের কথা শুনিতে বড় ভালবাসে, মনোরমাও হঠাৎ বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। উপস্থিত তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গ তাহাকে

আবার চঞ্চল ও লঘু প্রকৃতি করিয়া তুলিতেছে। সেও সরলচিত্তে, খোলা প্রাণে নিজের ছোট বেলাকার অমূল্য দিনগুলির গল্প কামিনীর নিকট করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে। কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌ-রাণী, আপনার সেখানে ভাল লাগতো, না এখানে ভাল লাগছে?"

মনোরমার ললাট কুঞ্চিত হইল, কহিল, "এখানে এক রকম বেশ আছি, সেখানে যেন, থেকে থেকে হাঁপ ধরতো, শীগ্‌গিরই ফিরতে হবে শুনছি, আমার যেন ভয় হচ্ছে।"

কামিনী অবাক্ হইয়া গেল, সে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় পিতামাতার আদরিণী কন্যা এতদিন পরে পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাইবে, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কত আনন্দ, অথচ মনোরমার তাহাতে আগ্রহ নাই!

কামিনী আগ্রহভরে কহিল, "কেন বৌ-রাণী, একথা কেন বলছেন? বাপ-মার কাছে ফিরে যেতে মন হয় না?"

নিশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা কহিল, "তুমি বুঝবে না বোন্, বাপ-মা আমায় দেখলে মনে কষ্ট পান, আমার জন্য ভেবে তাঁরা বড় দুঃখিত থাকেন, বাপের বাড়ী আর আমার ভাই বোন্ নেই যে, তাদের নিয়ে তাঁরা ভুলে থাকবেন, আমি পোড়াকপালী তাঁদের অশান্তির কারণ হয়ে রইলাম মাত্র।"

জামাতার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়: পুরুষের পক্ষে চরিত্র দোষ এ্যাতো কি অস্বাভাবিক যে, তার জন্য স্ত্রীর পিতামাতা পর্য্যন্ত বিমর্ষ হইয়া থাকিতে পারে! ইহা কামিনীর বোধগম্য হইল না, অথচ সাহস করিয়া সে আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে দাসী চীৎকার করিয়া কহিল, "অহো! মাইয়া খোকা বাবুয়া কোন্ তামাসা লাগায়া হ্যায়, আউর তু সব গপ্পে বেহোঁস হো গিয়া।"

চমকিয়া দুইজনে পশ্চাৎ ফিরিয়া খোকার মসীচিক্কণ মূর্ত্তি দেখিল। কোন্ ফাঁকে খোকা মনোরমার কালীপূর্ণ দোয়াতটি লইয়া মনের সাধে কালী খাইয়া মুখে বুকে পেটে লেপিয়াছে। মনোরমা হাসিয়া উঠিল, কামিনী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আঃ পোড়াকপাল, যা পাবে তাই পেটে পূরবে। এই শীতে জল ঘেঁটে ঘেঁটে অসুখ হবে যে। এখন না ধোয়ালে উপায়ই বা কি?"

কামিনী খোকার হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়া লইল, খোকা প্রথমে আপত্তি করিল, "দিব না, কিছুতেই না" আপত্তি জানাইল, কিন্তু "জোর যার,

মুল্লুক তার” বুঝিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কামিনী খোকাকে খোয়াইয়া মুছিয়া আসিয়া বসিল, কামিনী কহিল “আপনি যে মাকে চিঠি লিখবেন বলেছিলেন, তা লিখুন, শুনে যাই।”

কামিনীর মাতৃস্নেহাতুর হৃদয় মাতা ও কন্যার পত্রের আদান প্রদান সবিস্তার শুনিতে বড় ভালবাসিত।

মনোরমা বলিয়া উঠিল, “পিয়ারীর মা, ঐ ভেড়ার ছানাটি বড় সুন্দর, কোলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। একবার ধরে আন না।”

দাসী কহিল “এ মাই, বাচ্চা পাকড়মে সে সব ভেড়ী হামারা পিছু আওয়ে গা, বহু-রাণীকো ই কোন্ খেল হোগা।”

মনোরমার কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। তখন দাসী মেষ-শাবকটিকে ধরিতে গেল, উহাকে লইয়া আসিবার সময় দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, নচেৎ চীৎকাররবে মেষপাল নিঃসন্দেহ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিত। মনোরমা শাবকটিকে কোলে লইল, খোকার তো আর আনন্দের সীমা নাই, নানা অব্যক্ত ভাষায় মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া সে শাবকটিকে দুই হাতে চাপড়াইতে লাগিল, এদিকে মেষদল দাসীর পশ্চাতে থাকিয়া গৃহদ্বার বন্ধ দেখিয়া পুনরায় সকলে ফিরিয়া মনোরমার সম্মুখে আসিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শাবকটির মাতা মনোরমার দিকে চাহিয়া ক্রন্দনস্বরে যেন সন্তান প্রার্থনা করিতে লাগিল। শাবকটিও মনোরমার আদর উপেক্ষা করিয়া মাতার পানে চাহিয়া চীৎকার করিতেছিল। কামিনী কহিল, “ভাল পাগলামী হচ্ছে বৌ-রাণী, ভেড়া গুলোর চেঁচানিতে কাণ ঝালাপালা হোল যে, আমি তা হ'লে চল্লুম। মনোরমা হাসিতে হাসিতে শাবকটিকে ছাড়িয়া দিবামাত্র, সে ব্যগ্রভাবে জানালার মধ্য দিয়া নিজেদের দলে লাফাইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

একাধারে নরনারী প্রকৃতি

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

সেবকের নিবেদন হইতে

সন্ন্যাস ধর্ম্ম কি? স্ত্রী-পরিবার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবর্জ্জন করিলে অধর্ম্ম হয়? শ্রীচৈতন্য তাঁহার মাতা স্ত্রী আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

অবলম্বন করাতে কি তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল? চৈতন্য সংসারী, চৈতন্য সন্ন্যাসী, এই দুয়ের মধ্যে কি এক ভয়ানক পাপ হ্রদ দেখা যায়? সংসার হইতে সন্ন্যাসে যাইতে হইলে কি কলঙ্কনদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়? যখন গৌরাঙ্গ সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বাহির হইলেন, তখন কি তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইল, তখন কি তাঁহার মহিমাসূর্য্য অস্তমিত হইল? আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক যাঁহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া কত ভক্তি ও সম্মান দিতেছে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কি তিনি অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন? সংসার ত্যাগ করাতে কি তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কোন বৈরাগী আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া এত বড় করিতে পারেন যে, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে কুটুম্ব মনে করিতে পারে, তাহা হইলে সেটি দৌর্ব্বল্য বা অধর্ম্ম নহে। যখন চৈতন্য আপনার (গৃহ) এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, সাধারণ লোকে মনে করিল তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার যে প্রেম অল্প লোকে বদ্ধ ছিল, তাহা এখন সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ হইল। ইহাতে ত্যাগ কৈ হইল? প্রেমের হ্রাস হইল না, কিন্তু উহা প্রশস্ত হইল। যে প্রেমকে ক্ষীণ করে, সঙ্কীর্ণ করে, সেই দোষী। কিন্তু ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা প্রেমের ভূমি বিস্তীর্ণ করেন। ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটি মার পরিবর্ত্তে সহস্র মাকে গ্রহণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন, এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথি সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, একখানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েকজন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন। সন্ন্যাসীর মন অনাসক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত। সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি আসক্তি কাটিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার গৃহ করিয়া লন। বাস্তবিক ভক্ত বৈরাগীদিগের হৃদয়ের ভিতরে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম অবতরণ করে। যখন নীচ স্বার্থপর মায়াবদ্ধ প্রেমের তিরোভাবের পর ভক্তের অন্তরে স্বর্গের প্রশস্ত প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন সেই ভক্তের হৃদয় অতি সুন্দর ও অপরূপ রূপ ধারণ করে।

জগজ্জনের প্রতি প্রশস্ত প্রেম ভিন্ন ভক্ত বৈরাগীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। হিন্দুস্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ নরনারীদিগের মধ্যে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে

রাধাকৃষ্ণের নাম শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা, এই দুইটি নামের প্রতি কি ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই? যাঁহাদিগের নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেমানুরাগ, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের প্রতি কেন শ্রদ্ধাবিহীন? যে সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি সাধন করেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই দুইটি নাম বিশেষ আদরণীয় কেন না হইবে? ব্রাহ্মেরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে ব্রহ্মের কত রূপ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কি কোন দেবভাব দৃষ্ট হয় না? কেবল কৃষ্ণ, কেবল রাধা নহে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ, সংযুক্ত নাম, প্রায় সর্ব্বদাই একত্র উচ্চারিত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ; নরপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতির মিলন। এক দিকে শ্রীরাধা আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য প্রথমে নারীর নাম রাখা হইয়াছে। আগে রাধিকা পরে কৃষ্ণ। রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে হিন্দুস্থান রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন ও ঘোষণা করে।

হিন্দুস্থানের বৈষ্ণবেরা অনেক শতাব্দী রাধাকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দুস্থান, তুমি কি জান না যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তোমার মধ্যে প্রেমের ধর্ম্মসম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ গ্রামে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থান, তোমার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তোমার ইতিহাস পুস্তকের দশ বার পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার এই একটি দোষ হইয়াছে যে, তুমি ইতিহাসকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রহণ করিলে; কিন্তু হে হিন্দুস্থান, এত বড় ঘটনা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, কেন তুমি অস্বীকার করিলে? যদি তুমি পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও তবে ধর্ম্মজগতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীকার করিতে হইবে। অবতারের পর অবতার তুমি মানিয়াছ, সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছ; কিন্তু ভাগবত পর্য্যন্ত মানিয়া কেন ক্ষান্ত হইলে? চৈতন্যচরিতামৃত কেন গ্রহণ করিলে না? নবীন হিন্দুস্থান, তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন মথুরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ নহেন। তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন যুগল মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। এখন একাধারে দেবদেবী উভয় প্রকৃতি, নরনারী উভয় প্রকৃতি। এখন রাধাকৃষ্ণ স্বতন্ত্র নহেন্; কিন্তু দুই এক হইয়া শ্রীচৈতন্যের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন।

চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের একজন প্রধান সংস্কারক। তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত

ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব এবং ব্যবহার সকল বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইল সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেখাইলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ও তাঁহার সময়ে বিধাতার কিরূপ লীলাখেলা হইবে। তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যকে সম্মিলিত করিলেন। তাঁহার চরিত্রে প্রেম ও পুণ্যের বিবাহ হইল। তাঁহার জীবন প্রেম ও বৈরাগ্যের শুভ সম্মিলন। জগতের প্রতি প্রেমোন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার মাতা স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিলেন। জগতের লোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এ ব্যক্তি সংসার ছাড়ে কেন? ইহার অন্তরে এরূপ অপ্রেম নিষ্ঠুরতা কে প্রেরণ করিল? এমন স্নেহের প্রতিমা মা এবং প্রেমের প্রতিমা জায়ার প্রতি এ ব্যক্তি বিমুখ কেন?" এইরূপে নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা কলঙ্ক আরোপ করিল! তাহাদিগের মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারত্যাগী হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিলেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যমতে জন্মভূমি দর্শন নিষেধ, নারীর নিকটে ভিক্ষা লওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ। অজ্ঞ লোকে বলে চৈতন্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, কেন না, তিনি নারীপ্রকৃতিকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু জ্ঞানী বৈষ্ণব বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাহিরের মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়িয়া নিজের হৃদয়ের মধ্যে নরনারীকে এক করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগল্‌ভা ভক্তিই তাঁহার শ্রীরাধিকা, তাঁহার নারীপ্রকৃতি। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কৃষ্ণভাব রাধাভাব উভয়ই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে একাধারে দেবদেবী দুই অবতার। তাঁহার পূর্ব্বে যুগে যুগে একাধারে এক এক ব্রহ্মগুণের অবতরণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাঁহার জীবনে নরনারীর মিলন হইল। তিনি একাধারে রাধাকৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির মিলন, প্রেম পুণ্যের বিবাহ, নরনারীর যোগ, অনুরাগ বৈরাগ্যের সম্মিলন দেখাইলেন।

ব্রহ্ম পিতৃমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি উভয়ের আধার। ব্রহ্মের ভিতরে নরপ্রকৃতি, ও নারীপ্রকৃতি, পিতৃভাব ও মাতৃভাব দুই সম্মিলিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্ম সমুদয় ভাবের পূর্ণাধার; কিন্তু জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এক এক ভাব স্বতন্ত্র হইয়া এক এক অবতারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। যখন প্রেম প্রেম করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়সেবাতে পরিণত হইল, তখন প্রেম ও বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য মহাপুরুষ চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিলেন।

যখন অনেক প্রকার কুসংস্কার ও পাপাচার বঙ্গদেশকে কলুষিত করিল, তখন বঙ্গদেশ ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল—"হে বিঘ্নবিনাশন ভগবন্, আমাকে এই পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকার হইতে রক্ষা কর।" তখন ভগবান বঙ্গদেশের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রেম ও বৈরাগ্য একাধারে রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিলেন। গৌরাঙ্গের তনু হরিপ্রেমে গঠিত। তিনি এত বড় প্রেমিক হইয়াও সংসার ছাড়িলেন। কিন্তু যথার্থ ভাবুক বুঝিতে পারেন, যদিও চৈতন্য বাহিরের সংসার ছাড়িলেন, তাহার প্রকৃত সংসার অখণ্ড রহিল। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সন্তান চৈতন্য সাকার স্ত্রীকে নিরাকার বিষ্ণুপ্রিয়া করিয়া লইলেন। ঘরের বিষ্ণুপ্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রীপ্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্তচূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন।

সাধকের জীবনে যদি নরপ্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতির মিলন না হয়, যদি প্রেম বৈরাগ্যের বিবাহ না হয়,তাহা হইলে পুণ্যশান্তি বহু দূরে। যদি মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করিতে না পারে, তবে পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। যদি নিজের প্রাণের ভিতরে পুরুষ মনের মত নারী, এবং নারী নর না পায়, তবে পুরুষ বাহিরে নারী খুঁজিবে, এবং নারী বাহিরে পুরুষ খুঁজিবে, তাহাতে দুর্নীতি ব্যভিচার পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে করিও না, ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা হরিভক্তিরূপিণী পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জাশীলা গোপনপ্রিয়া, ইঁহারা স্বামীর প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকেন, বাহিরের লোক ইঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। ভক্তের প্রাণের ভিতরে সেই স্বর্গের স্ত্রী আসিয়া পতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আমার নাম ভক্তি, তোমার নাম বৈরাগ্য, এস দুজনে বিবাহ করি।" ভক্ত আপনার স্ত্রী আপনি, আপনার স্বামী আপনি। প্রকৃত ভক্তজীবনে একাধারে নরনারী উভয় প্রকৃতির মিলন, এই রহস্য বুঝিয়া এবং জীবনে ইহা সাধন করিয়া জন্ম সার্থক কর।

বিবিধ

—০—

সমর ঋণ দান,—যুদ্ধের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া দেড়শত কোটি টাকা প্রদান করিবেন। এ পর্য্যন্ত ছয় কোটি টাকার সংস্থান হইয়াছে। দেড় শত কোটি টাকা পূর্ণ হইতে কত সময় লাগিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। এখন দৈনিক সর্ব্বশুদ্ধ ইংলণ্ডের ব্যয় হইতেছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা, সুতরাং ১৫০কোটি টাকা মাত্র ২০ দিনের খরচ। ভারতের কষ্টলব্ধ ১৫০ কোটি টাকায় ইংলণ্ডের যৎসামান্যই সাহায্য হইবে, তবুও এই ঋণ দান করা ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য : যাহা কর্ত্তব্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মানুষ তাহা করে। কিন্তু ইহাতে আমাদের ক্ষতি বিশেষ কিছু নাই, বরং না দিলে যে ৮ কোটি টাকা সুদের বাবদে আমরা ফিরিয়া পাইতাম, তাহা অন্যে—যাহারা ঋণ দিবে, তাহারাই পাইবে। অথচ সুদের টাকা, ট্যাক্সের বাবদে ভারতবর্ষকেই সে ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ,—বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধেও ঐরূপ কথাই মনে হয় ; মহাযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় এবং সৈন্যের অভাব কিরূপ হইতেছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় : সে স্থলে দু চার শত—না হয় দু'এক হাজার বাঙ্গালী, সৈন্য হইবে, ইহাতে যুদ্ধের কতটুকু সাহায্য হইবে ? কিন্তু তবুও যত দূর হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। এতদিন বাঙ্গালীর আত্ম-রক্ষার, শক্তি হীন হইয়াছিল, এখন যদি সেই সুযোগ আসিয়াছে, তাহা ভীরুতা বশত হারানো উচিত নহে। আপন আপন গৃহ পরিবার রক্ষার জন্যও বাঙ্গালীর ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন হইয়াছে :

ভারতবর্ষ শান্তিপ্রিয়,—কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ ধর্ম্মভাব প্রধান মহাদেশ। এখানকার আদর্শ মানুষ, ঋষিগণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বারংবার সংগ্রাম সংঘর্ষ সত্ত্বেও ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম—ত্যাগের ধর্ম্ম—ক্ষমার ধর্ম্ম খর্ব্ব হয় নাই। সুতরাং যুদ্ধের প্রশ্রয় দেওয়া ভারতবাসীর—বিশেষত বঙ্গবাসীর আদর্শ নহে। বাঙ্গালী যদি বহু পরিমাণে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হয়, তবে জাতীয় ধর্ম্মভাব আরও খর্ব্ব হইয়া যাইবে। যে ইউরোপ আজ মহাসমরে প্রবৃত্ত—জগতের মধ্যে সামরিক বলে প্রধান, তাহাদেরই আদর্শ বিশুখৃষ্ট—ক্ষমার অবতার, এমন কি হজরত মহাম্মদ শেষ জীবনে আত্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া

খৃষ্টীয় মণ্ডলী তাঁহার আদর্শকে নিম্ন স্থান দিয়া খৃষ্টের আদর্শ, পূর্ণ আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত লওয়া যাইবেনে নিষিদ্ধ, কিন্তু ইউরোপের জাতীয় জীবন যেন ঠিক তার উল্টা। তাই তাঁহারা বলেন, যেখানে যাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম এখন আবার নূতন করিয়া সাধন করিতে হইবে, সেখানে ভারতবর্ষ কেন সেই উল্টা পথে—নরহত্যা কার্য্যে লিপ্ত হইবে। কিন্তু ভারতে শক্তি এবং ভক্তি দু'য়েরই সাধন চলিয়া আসিয়াছে; তবে কালে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বুঝি আবার এই বিধাতার বিধান আসিয়াছে। ভারতবর্ষে ত্যাগ বৈরাগ্য এবং ক্ষমার ধর্ম্ম কি লুপ্ত হইবে? কিন্তু সে ধর্ম্ম কাপুরুষ ভীরুর লভ্য নহে। যে আপনার গৃহ-পরিবার পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না, তাহার কোন ধর্ম্মেই অধিকার থাকে না। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিরই আত্ম-রক্ষাশক্তির সাধনা করা প্রয়োজন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" যাঁহারা হৃদয়ে ক্ষমা, চরিত্রে সাধুতা এবং বাহুতে বল সাধন করিতে পারিবেন, ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে।

হিন্দু-সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ,—সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে যে, হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ-বাণী অবাধে যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহা এখন বন্ধ করিতে হইবে। কেন না ইহা হিন্দু মুসলমানে মিলনের অন্তরায়। কথাটা সাহিত্য পরিষদের সভায় উত্থাপিত হইয়াছে, ইহা খুবই শুভ লক্ষণ।—এমন কি, হিন্দু চলিত কথায় যেখানে "নেড়ে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর এই অন্তরায় দূরের চেষ্টা, ইহা উভয় দিক হইতে হওয়া আবশ্যক। মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে যে সকল শব্দ ব্যবহার ও আচরণ করেন তাহাও বন্ধ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে গো-বধ একটি সর্ব্ব প্রধান বিষয়। এই মিলন চেষ্টা অগ্রে শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানের মধ্য হইতে হওয়াই সম্ভব।

"কবিভূষণ"—গত ১২ই চৈত্র. রবিবার অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে এক মহতী সভায়, "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে "কবিভূষণ উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক মণ্ডলীর প্রতিনিধি-রূপে,প্রশস্তিপত্র পাঠ করেন। স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল প্রমুখ বঙ্গ-শিরোমণিগণের সম্মুখে এই উপাধি প্রদত্ত হয়। সভায় অনুমান সহস্র লোক সমাগম হইয়াছিল। আমরা বহু পূর্ব্বে যোগীন্দ্র বাবুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন তিনি দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার। সে আজ ৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আজ পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যরূপ দ্রুমের প্রকাশে তিনি মহা সম্মানিত হইলেন, তাহা তাঁহার প্রতি বিধাতার করুণা ভিন্ন আর কি বলিব? ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য।—আড়াই বৎসর হইল, প্রলয় যুদ্ধ চলিতেছে; প্রতিদিন যুদ্ধের জন্য ৭।৮ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে; শ্রমজীবিগণ কারখানার কায ছাড়িয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়াছে; শত শত কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়াছে; তবু ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য হ্রাস হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেই ইংরেজেরা যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা ধার দিয়াছেন, তবু তাঁহাদের সঞ্চিত টাকা ফুরায় নাই। গত ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য প্রায় ৪২৫১ কোটি টাকা ঋণ করিয়াছেন এবং নিয়মিত রাজস্ব হইতে ১২০২ কোটি ৫০ লক্ষ, টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

সম্প্রতি যুদ্ধের জন্য আরও ঋণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংলণ্ডের মন্ত্রীবৃন্দ হইতে ছোট বড় শত শত বক্তা ইংলণ্ডময় বক্তৃতা করিয়া লোককে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া, নরনারী সকলের নিকট ঋণ চাহিয়াছিলেন, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট ৫৲ টাকা সুদে ১০৫০ কোটি টাকা পাইয়াছেন, ঐ টাকাতে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। অতঃপর যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয়, ইংরেজ নরনারী তাহাও প্রদান করিবে, ইংরেজ কি ঐশ্বর্য্যশালী।

হিন্দু ও মুসলমান।—পাটনার নবাব খাজল কলিকাতা ক্লাবে মহম্মদাবাদের রাজা সাহেবের সম্বর্দ্ধনার্থ এক ভোজ দিয়াছিলেন। এই ভোজে ৭০ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, মিঃ কে, বি, দত্ত, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মিঃ গোলাম হুসেন আরিফ, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রভৃতি ছিলেন। এই সম্মিলনী তেমন বৃহৎ নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের যে আন্তরিক সৌখ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অতি মহৎ।

এইরূপ যুবকই ভারতের আশা।—"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউর" সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কেদারনাথ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি, পরীক্ষায় অনারের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেকে শিক্ষাবিভাগের চাকুরীর অন্বেষণ করেন এবং শান্তিতে জীবন যাপন করিতে ব্যস্ত হন! কেহ কেহবা বি, এস, সি, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। শিক্ষার লক্ষ্য অনেকেই ভুলিয়া যান। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, শ্রীমান্ কেদারনাথ ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত সুবিখ্যাত ব্যবসায় ক্ষেত্র হডারস্‌ফিল্ডের এক কারখানায় প্রবেশ করিয়া ভেষজ দ্রব্যের তত্ত্বানুসন্ধান ও ভেষজ দ্রব্য হইতে রং প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন্। রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলেই বিদ্যার সার্থকতা হয়। কেদারনাথের মতো যুবকই আমাদের দেশের আশা ও ভরসা। (সঞ্জীবনী)

ভারতীয় মুসলমান নারী সমাজ।—সম্প্রতি দিল্লীনগরে ভারতীয় মুসলমান মহিলাগণের এক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। মহিলারা সভায় কয়েকটি প্রশংসনীয় প্রস্তাব করিয়াছেন। (১) মুসলমান মহিলাদের নিমিত্ত দিল্লী নগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। (২) মুসলমান মহিলাদের যত্নে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার। (৩) সেণ্ট জন আম্বুলেন্সের কার্য্যে সাগ্রহে যোগদান। এই সভায় বেগম সাহেবা মহম্মদ বেগম সভা কর্ত্রীর কার্য্য করিয়াছেন। দিল্লীর জজ মিঃ রহিমবক্সের পত্নী অভ্যর্থনা সভার কর্ত্রী ছিলেন।

বিষ-বৃক্ষের ফল,—বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের পুত্র, এক নর্ত্তকীর বাড়ী যাতায়ত করিত, পিতা পুত্রকে সে বাড়ী হইতে আনিতে যাইয়া বচসা হয়, রাগ সামলাইতে না পারিয়া নর্ত্তকীকে দুই এক ঘা বসাইয়া দেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পি, কে, বিশ্বাস, পিতার ২০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। থিয়েটার ও নর্ত্তকীগুলি দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তবু ভদ্র নামধারী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বাড়িতে আনিতে এবং থিয়েটারে যাইতে বিরত হইতেছেন না। বিষ-বৃক্ষে বিষম ফল দেখিয়াও সাবধান হউন।

সোহাগা,—রন্ধন পাত্রে পোড়ার দাগ হইলে তাহা সোহাগা মিশ্রিত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে পোড়ার দাগ উঠিয়া যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—o—

কানাই-নাট্যশালা।—আলো ছায়া সর্ব্বত্র সমান ভাবে অবস্থান করে না। যখন উদয়ের মধুর আরক্তিম রাগ একস্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেয়, তখন প্রদোষের ঘোর অন্ধকার অন্য স্থানকে আবৃত করিয়া রাখে। উত্থান পতন, জগতের নিয়ম, আজ তুমি ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া ধরাকে সরার মত দেখিতেছ —কাল যে তুমি দারিদ্রের ভীষণ তাড়নে অস্থির হইবে না কে বলিতে পারে ? কে ভাবিয়াছিল—অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, এথেন্স ও রোমের পতন হইবে ? উত্থান পতন জগতের নিয়ম ! আজ তুমি পদতলে নিস্পেষিত হইয়া সঙ্কুচিত অবস্থায় জগতের এক কোণে দাঁড়াইয়া আছ—কাল হয় তো জগত তোমাকে মাথায় রাখিয়া গৌরব মনে করিবে। কে বলিতে পারে—কুশদহের মধ্যে বৈষ্ণব প্রধান কানাই-নাট্যশালা, গোপিনী-পোতা প্রভৃতি যমুনা নদী তীরস্থ স্থানগুলি এক সময়ে সপ্তগ্রামের সহিত বাণিজ্যে প্রতিযোগীতা করিত না ? যমুনে—তুমি ভিন্ন এই স্মরণাতীত ইতিহাসবিহীন কালের কথা কে বলিয়া দিবে ? কিন্তু তুমিও যেন "অতীত সুখের দিন," আর স্মরণ করাইয়া কাতর হইতে চাও না ! অথবা সেই সুখের দিন ভাবিয়া দিন দিন ক্ষীণাঙ্গী হইতেছ ? বুঝিয়াছি তুমি বলিবে না—তবে জনশ্রুতি ও কল্পনে—তোমাদের আশ্রয় ভিন্ন কুশদহের অতীত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। তাই তোমাদের আশ্রয় লইলাম।

গত মাঘ মাসের সুন্দরবন প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগে এই কুশদহ (যাহা সেই সময়ে সমতট নামে খ্যাত ছিল) ধন জন পূর্ণ স্থান ছিল ! কানাই নাট্যশালা, গোপিনীপোতা প্রভৃতি স্থানগুলি সেই সময়ের অথবা গৌরাঙ্গ দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচলনের পর হইতে স্থাপিত হইয়াছে।

বৈদিকযুগ হইতে "গো" অর্থাৎ গাভী আমাদের দেবতা ভগবতী বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রে অঘ্ন্যা অর্থাৎ অহন্তব্যা এই বিশেষণ গাভীতে দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধাদিতে বৃষোৎসর্গের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও "গো" কে সম্মান দেখান হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে অতি প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থান "গো" সেবার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই "গো" আবার শ্রীকৃষ্ণের আদরের জিনিষ। যে

স্থানের স্ত্রীলোকেরা "গো" সেবা করিত সে স্থানের নাম "গোপীপোতা" কালে অশুদ্ধ উচ্চারণে "গোপিনীপোতা" নাম হইয়াছে। কানাই নাট্যশালা ঘোষপুর, গবেশপুর, গোপীপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি নাম "গো" শব্দার্থক বলিয়া বোধহয়। *

১৪৮৫ খৃঃ অব্দে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৫১০ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে দেশে একটা রব উঠিল:—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে,
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে"

এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু—নদে ভেসে যায়।" কুশদহের এই স্থান যে না ভাসিয়াছিল, কে বলিতে পারে? সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রত্নেশ্বর এখানকার রাজা ছিলেন। পূর্ব্বে ৫।৬ খানি গ্রামের মালিক হইতে পারিলেই রাজা হওয়া যাইত। যমুনা নদীর তীরস্থ এই গ্রামগুলি উক্ত রাজার অধিকারে ছিল। রাজা রত্নেশ্বর একজন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি নাট্যশালা গ্রামখানি স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুসারে কানাই-নাট্যশালা নাম রাখেন। বৃন্দাবনের অনুকরণে এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কার্য্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যমুনা নদী তীরস্থ এই সকল স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি করিলেও এই স্থানে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায়ও তিনি উৎসাহ দিতেন। এই জন্য আমরা গোবরডাঙ্গায় ও ইছাপুরে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত এদেশে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলন করেন। ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন ও বিষ্ণুপুরের দারকেশ্বর নদের তীরবর্ত্তী দোয়ারকা গ্রাম নিবাসী "শূন্যপুরাণ" প্রভৃতি প্রণেতা রামাই পণ্ডিত কুশদহে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলন করেন। সে সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম খুব প্রচলিত ছিল। কুশদহের নদী তীরস্থ গ্রামবাসী সেই সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য-উপলক্ষ্যে সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিত। প্রতাপাদিত্যের সময়েও তাঁহার রণতরী এইসকল স্থানের তলবাহিনী যমুনা নদী দিয়া ভাগীরথীতে পতিত হইত। পর্ত্তুগীজ বণিক সকল এই যমুনা নদী দিয়া অনেক সময়ে গতায়াত করায় কুশদহ এক সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

* লেখক কি বলিতে চান, এ দেশটা গো-প্রধান দেশ! (সম্পাঃ)।

অনেক দিন হইতে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের মধ্যে একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী (Reserved Tank) খননের স্থান নির্ণয় লইয়া বড়ই মতভেদ চলিতেছিল। কেহ কেহ ৬নং ওয়ার্ড গৈপুর গ্রামেই যাহাতে হয় তাহার পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ তাহাতে অমত প্রকাশ করেন, এই মত বিরোধ ব্যাপার বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, ৪ নং ওয়ার্ড খাঁটুরাগ্রামে শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র পালের পুষ্করিণী গ্রহণ করা হউক, কিন্তু কার্য্যত তাহাতেও নানা অসুবিধা এবং বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া এত দিন সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কমিশনারগণের ঐক্যমতে গৈপুরগ্রামে বসুদিগের বাটীর সম্মুখে ঐ পুষ্করিণী হওয়া ধার্য্য হইয়াছে। সুসংবাদ বটে, এখন শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইলেই গ্রামবাসী সুখী হইবে।

গত ১৯শে ২০শে ফাল্গুন, শনিবার ও রবিবার খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ১৬ই ফাল্গুন স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমন—দ্বিতীয় বার্ষিক দিন উপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম বর্ষের ন্যায় খাঁটুরা-স্কুল-গৃহে সমবেতভাবে একটি স্মৃতি-সভা' যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। অন্যান্য বৎসর দুই দিবস মাত্র উৎসবের কার্য্য হয়, এবার ১৬ই তারিখ হইতে ২০শে পর্য্যন্ত ৫ দিন উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রচারক এবং ব্রাহ্মগণ আসিয়া উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থানীয় জন-সমাজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যাহাতে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শুনিতে পাই অর্থাভাবে তাহা হয় না; তাই আমরা মন্দিরের ট্রষ্টিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করি, বরং ৫ দিনের উৎসবে যে ব্যয় হয়, সেই অর্থে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা কিছু হয় কি না? তদ্ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের জন্য যে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে এখন ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তি রক্ষারভাবে বৎসরান্তে একবার উৎসব করিয়া, সেই স্থান ব্যক্তিবিশেষের উদ্যান-বাটীকারূপে পরিণত করা কি উচিত? এ সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা বলিবার আছে, প্রয়োজন হইলে বলিব।

খাঁটুরা-হৃদয়দাদপুর গ্রামে একটি হরিসভা হইয়াছে। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে সেখানে নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। গত আষাঢ় মাসের "কুশদহে" আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। গত ১লা চৈত্র হইতে ১২ চৈত্র পর্য্যন্ত তাহার একটি

উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বক্তা এই কীর্ত্তনীয়া আনাইয়া বক্তৃতা এবং সঙ্কীর্ত্তন করানো হইয়াছিল। প্রচলিত সংস্কার এবং ধর্ম্মভাব অনুসারে অনেকে এইরূপ হরিসভায় যোগ দিয়া সাময়িকভাবে বেশ তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু সত্যানুরাগী হইয়া জ্ঞান লাভ করাই যদি ধর্ম্মসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে এইরূপ সভা সে পক্ষে প্রকৃত সহায় হইতে পারে কি না তাহা ভাবিবার কথা নয় কি? যদ্দারা জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, সত্যের উজ্জ্বল-জ্ঞান, চরিত্রের পবিত্রতা, এবং সেবানুরাগ লাভ হয়, সেই তো প্রকৃত সাধন-পন্থা। আমরা এজন্য সুখী হইলাম যে, এই সভার নামকরণ করা হইয়াছে, "কুশদহ হরিসাধন সমিতি" ইহা উদারভাবের পরিচয় বটে; কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় এই সমিতি হইতে যদি একটিও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন উৎপন্ন হয় তাহা হইলেও এই সমিতি সার্থক হইবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, খাঁটুরা নিবাসী, সুতা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কালীশ্বর রক্ষিত মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কুশদহর জন্য দুই দফায় ৯২॥০ টাকার ১৮ রিম কাগজ খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঐ খরিদ দরে প্রয়োজন মতো আমরা তাহা পাইয়াছি। ইহাতে অত্যন্ত সুবিধা এবং সাহায্য হইয়াছে! ভগবান্ দাতার মঙ্গল করুন। আগামী বৎসরের জন্যও এইরূপ সাহায্য ব্যতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় ভাবনার কথা, কে আছেন সাহায্যকারী অগ্রসর হউন।

বিশেষ সাহায্য প্রাপ্তি:—যাঁহারা "কুশদহ"র চাঁদার অতিরিক্ত সাহায্য করিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দান প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান্ দাতৃগণের মঙ্গলবিধান করুন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, মাটকোমরা ... ... ৫৲
শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় (ইঞ্জিনিয়ার) কাশ্মীর ... ৫৲
শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র শীকদার, শ্যামপুকুর ... ... ৫৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, ধানকুড়িয়া... ... ৫৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রক্ষিত, খাঁটুরা ... . ৪৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ পাল, বাগবাজার ... ... ৪৲
শ্রীযুক্ত লীলাচল মুখোপাধ্যায় বি-এল, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট... ৪৲
শ্রীযুক্ত সহায় নারায়ণ পাল, পটলডাঙ্গা ... ... ১০৲

———

বর্ষশেষে

বিধাতার কৃপায় "কুশদহ"র অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইল। যে শক্তির দ্বারা মানুষের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সিদ্ধিপথে সাহায্য পায়, সে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যে না করে—সে অত্যন্ত মূঢ়।

"কুশদহ" পরিচালনা এবং সংরক্ষণকার্য্যে আত্মীয়-বন্ধুগণ সম্পাদকের অনেক প্রশংসা করেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরে কি একটা আঘাত লাগে তাহা বোধহয় তাঁহারা দেখিতে পান না। যদি সম্পাদকের বিদ্যা বুদ্ধি এবং ক্ষমতার দ্বারায় "কুশদহ" সম্পাদিত হইত তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা ছিল। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, "কুশদহ" প্রচার বন্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিতেছে, তখন কোথা হইতে বিধান ব্যবস্থা শক্তি-সাহায্য আসিয়াছে। সুতরাং আজ বর্ষশেষে সে বিষয়ে একটুও আভাস না দিয়া কি থাকা যায়?

এই সংখ্যায় প্রথমে "লেখা ও বলা" প্রবন্ধে যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও এই বক্তব্যেরই একটি প্রথম অংশ মাত্র। যাঁহার করুণায় "কুশদহ" প্রচারের উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সফল হইয়াছে, সেই করুণাময় বিধাতার চরণে মস্তক অবনত না হইয়া কি থাকিতে পারে?

দ্বিতীয়, যেরূপ কঠিনতার মধ্যে বর্ত্তমান বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইতে আরও অধিক কঠিন বিষয় হইয়াছে—কাগজের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। নূতন গ্রাহক এবার কয়েকটি মাত্র হইয়াছে, অর্থাৎ এত কম গ্রাহক লইয়া কোন বৎসর কার্য্য শেষ করিতে হয় নাই। সুতরাং এত অনাটনের মধ্যেও বারমাসের সংখ্যা যে পূর্ণ হইল, তাহাতেও বিধাতার করুণা অনুভব করিতেছি। এত অনাটনের মধ্যেও যাঁহারা কিছু কিছু বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া দাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

তৃতীয়তঃ—ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীগণ পাওনা টাকা বাকী রাখিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

৪র্থ;—কাগজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীবাবুর উপকার আমরা সর্ব্বান্তকরণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

অবশেষে একটি দুঃখের কথাও প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ সেটিও এখন মঙ্গলবিধানের বহির্ভূত কথা বলিয়া মনে হয় না, বাধা-বিঘ্ন পরীক্ষায় না পড়িলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ হয় না। "কুশদহ"র গ্রাহক গ্রাহিকাগণের মধ্যে বোধহয় অনেকেই ইহার পূর্ব্ব ঋণের কথা অবগত আছেন। সে ঋণ তো অদ্যাপি পরিশোধ হয় নাই, তাহার উপর বর্ত্তমান বর্ষে আরো ১৫০৲ দেড়শত টাকা ঋণ বৃদ্ধি হইল। এ সম্বন্ধেও ছাপাখানার মালিকগণ যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আমাদের কোন কোন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করেন, এমন ঋণ করিয়া কাগজ চালাইবার ফল কি? তাহার উত্তর—প্রথম ঋণ হওয়ার কারণ, সচিত্র ৫ ফর্ম্মা উত্তম কাগজ—উত্তম ছাপায়, ১৲ টাকা মূল্য রাখা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি না করা, সেটিও স্বভাবে হইয়া পড়িয়াছে। এখন সেই ঋণভার মস্তকে লইয়া কাগজ বন্ধ করিলে ঋণ পরিশোধের আর আশা থাকে কই? কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বরং আশা ও বিশ্বাস করা যায় যে, সম্পাদককে ঋণমুক্ত করিয়া দিবার জন্য কাহারো না কাহারো অন্তরে শুভইচ্ছার উদয় হইতে পারে। দু' তিন শত টাকা এমন কি অসম্ভব ব্যাপার? এজন্য একমাত্র বিধাতার উপর নির্ভর করিয়াই থাকিতে হইয়াছে। এই সঙ্কটকালে আগামী বৎসরে একটিও গ্রাহক গ্রাহিকা যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন।

এইবার আর একটি কথা বলিয়া এবারকার বক্তব্য শেষ করিব। কুশদহ-বাসীর বংশাবলী প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছুক হইয়া তাহার চেষ্টা করিতেছি। এ সম্বন্ধে গত বর্ষের লেখা ছাড়া, বর্ত্তমান বর্ষের পৌষ সংখ্যার শেষে "কুশদহ-পঞ্জি" শিরোনামে একটি আদর্শ দিয়া যে আবেদনটি প্রকাশ করা হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তাহার একখানিও উত্তর পাওয়া গেল না। যাহা হউক ঐ আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত নহি; কিন্তু এই সংগ্রহ কার্য্যেও লোকবল, অর্থবল প্রয়োজন। সম্পাদককে এজন্য সকলে সহায়তা না করিলে, কার্য্যটি সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। ইচ্ছা ছিল, আগামী বৈশাখ হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ করা হইবে। কিন্তু তাহা এখনো সকলের সচেষ্টতার উপর নির্ভর করিতেছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স্‌ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮। ১ নং সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।